স্বাধীনতা '৭১

দ্বিতীয় খণ্ড

কাদের সিদ্দিকী
বীরোত্তম

পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন
স্টল নং-৩৪, ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা - ৭০০০৭৩

উৎসর্গ

সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের শিকার উপমহাদেশের দুই মহান জ্যোতিষ্ক শহীদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ভারতের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর

স্মৃতিতে—

কিছু কথা

"স্বাধীনতা '৭১" এক খণ্ডে প্রকাশ করা গেলে খুবই ভাল হতো, কিন্তু আকার অনেক বড় হয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হলোনা। যখন শুরু করেছিলাম তখন ধারণা ছিল '৭১ এর সেই উত্তাল দিনগুলির সকল বাধা যে ভাবে রক্ত ঘাম একত্র করে দ্রুত অতিক্রম করতে পেরেছিলাম লেখাটাও বুঝি তেমনি এগিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু না, একটা যুদ্ধ বা আন্দোলনের উপর বস্তুনিষ্ঠ একটা কিছু লেখাও যুদ্ধ বা আন্দোলনের চাইতে খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে ঘটনার সাথে নিজে জড়িত থাকায় লিখতে গিয়ে সামান্য এদিক-ওদিক হলেই মন বিদ্রোহ করে বসতো। আবার চেষ্টা করতাম, ঠিক সেই সময়ের মত করে ভাবতে ছবি আঁকতে। সে সময় আমার চোখ যা দেখেছে মন যা বলেছে শত চেষ্টা করেও তা তুলে ধরতে পেরেছি এমন বলার দুঃসাহস রাখিনা। কথার মালা গাথা কিম্বা ছবি আঁকা, ও-দুটো জন্মগতভাবেই আমার আয়ত্বের বাইরে রয়ে গেছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই ১৪ বছরে বহু অদলবদল হয়েছে। অনেক স্বাধীনতা বিরোধীরা যেমনি স্বাধীনতা প্রেমির মর্যাদা ভোগ করছে তেমনি সে সময়ের অনেক অনেক প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও আবার ষড়যন্ত্রে পরে স্বাধীনতা বিরোধীর কলংকজনক আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছেন, এবং এখনও হচ্ছেন। স্বাধীনতার পর পরই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, কি করে '৭১-এর মূল্যবোধ ধ্বংস করা যায়। পুরোপুরি না হলেও কুচক্রীরা আংশিক সফল হয়েছে। এর মধ্যেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বপরিবারে স্বাধীনতা বিরোধী জাতীয় আন্তর্জাতিক শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। জেলে নিহত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের চার সিপাহশালার স্বর্জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান। এখানেই শেষ নয়। জীবন দিতে হয়েছে জীয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, আবু তাহের ও মঞ্জুরের মত আরো অনেক বীর সেনানীকে। এদের জীবন দানের প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেও একই নীল নক্সায় তাদের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। আজ সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারাই শুধু অবহেলিত ও নির্যাতিত নয়। সামরিক বাহিনীর যে সমস্ত বীর সৈনিকরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারাও অনেকেই কোণঠাসা হয়ে পরেছেন, কেউ কেউ চাকরি হারিয়েছেন, আবার কেউ কেউ প্রাণ হারিয়েছেন। বেসামরিক সরকারি কর্মচারী যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাথে ছিলেন তারা প্রাণে বাঁচলেও নানা ভাবে নাজেহাল হয়ে তাদেরও প্রাণ

যায় যায় অবস্থা। এই অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। চলতে দেয়া যায় না। এর আশু অবসান হওয়া উচিত। '৭০ এর দশকের মূল্যবোধ আবার আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। কোন ব্যক্তি স্বার্থে নয় বৃহত্তর জাতির স্বার্থেই এটা করা প্রয়োজন। কোন জাতির জন্ম ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করে আজ অবধি কেউ সফল হয়নি। আমাদের দেশেও কেউ হতে পারবেনা। হয়তো জাতীয় ভিতকে কিছু সময়ের জন্য দুর্বল করে রাখলেও রাখতে পারে। আমার বিশ্বাস, যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন তারা যত বেশী করে সেই দিনের কথা জাতির সামনে তুলে ধরতে প্রয়াসী হবেন ততই মঙ্গল। তা না হলে মিথ্যা জঞ্জালের নিচে আস্তে আস্তে সত্য চাপা পরতে থাকবে। আমাদের ভাবা উচিত, আজ যারা বলিষ্ঠ যুবক এরাই স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নিঝড়া দিনগুলিতে ছিলেন শিশু। শুধু তাই নয় লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মেছে মহান স্বাধীনতার পর। এদের প্রত্যেককে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য অবহিত করা যেমন সরকারের দায়িত্ব তেমনি জ্ঞানীগুণী বুদ্ধিজীবিদেরও। এ পর্যন্ত বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছে, আমার আন্তরিক বিশ্বাস আরো অনেক হবে।

সেপ্টেম্বরের শেষে আমার দেশে ফেরা থেকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়াজীর "নতজানু আত্মসমর্পণ", বঙ্গপিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সহ ২৪শে জানুয়ারী '৭২, বঙ্গপিতার পদতলে "টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর ঐতিহাসিক অস্ত্র জমা" এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাংলাদেশের কর্ণধার হিসাবে রাজধানীর বাইরে প্রথম জনসভার ব্যাপক বিবরণ রয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডের পাতায় পাতায়।

বই লেখা এবং প্রকাশে শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ও শ্রীসুধাংশুশেখর দে সহ যারাই সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রুফ দেখার জন্য স্নেহাস্পদ শ্যামল কুমার রায়চৌধুরীকে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা জানাচ্ছি।

শত চেষ্টার পরও কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়াতে দুঃখিত। লেখাটা আপনাদের কারো যদি ভাল লাগে তবে বুঝবো শ্রম সার্থক হয়েছে।

ধন্যবাদ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মুক্তিবাহিনী

কাদের সিদ্দিকী

সূচীপত্র

ছালাম—
ফারুক-
হামিদ—
ছবি তোলার সময়
ওরা কি জানতো
স্বাধীনতা সংগ্রামে
তিন জনকেই
জীবন দিতে হবে?

দুইজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে কেদারপুরে কবর দেবার সময় জানাজার ব্যাপারে লেখক মওলানার সাথে কথা বলছেন

ডিসেম্বরের গোড়ায় একটি প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করছেন
বাঁ থেকে - কয়েকজন প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধা, ব্রিগেডিয়ার
ফজলুর রহমান, লেখক, ক্যাপ্টেন আবদুর সবুর খাঁন -

কমান্ডারদের সাথে কথা বলছেন - বাঁ থেকে - কয়েকজন
কমান্ডার, লেখক, ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান, ক্যাপ্টেন
হাইদুর ও আবদুর রহমান মোমেন -

ঢাকা-টাংগাইল সড়কের একটি সেতু ধ্বংসের পর—
সামনে, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ,
পিছনে আরিফ আহম্মদ দুলাল ও
অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা—

ঢাকা দখলের পূর্বে মিত্রবাহিনীর মেজর জেনারেল নাগরা ও ব্রিগেডিয়ার ক্লের কথা বলছেন

মেজর জেনারেল নাগরা

কর্ণেল জিয়াউর রহমান

ব্রিগেডিয়ার সান সিং

ঢাকা দখলের আগে মিরপুর সেতু থেকে সামান্য দূরে শেষবারের মত ম্যাপ দেখে নিচ্ছেন - কর্ণেল কুলকার্ণি লেখক, ব্রিগেডিয়ার ক্লের ও অন্যান্য কয়েকজন -
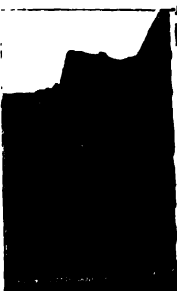
বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে লেখক

ব্রিগেডিয়ার ক্লের সাথে লেখক
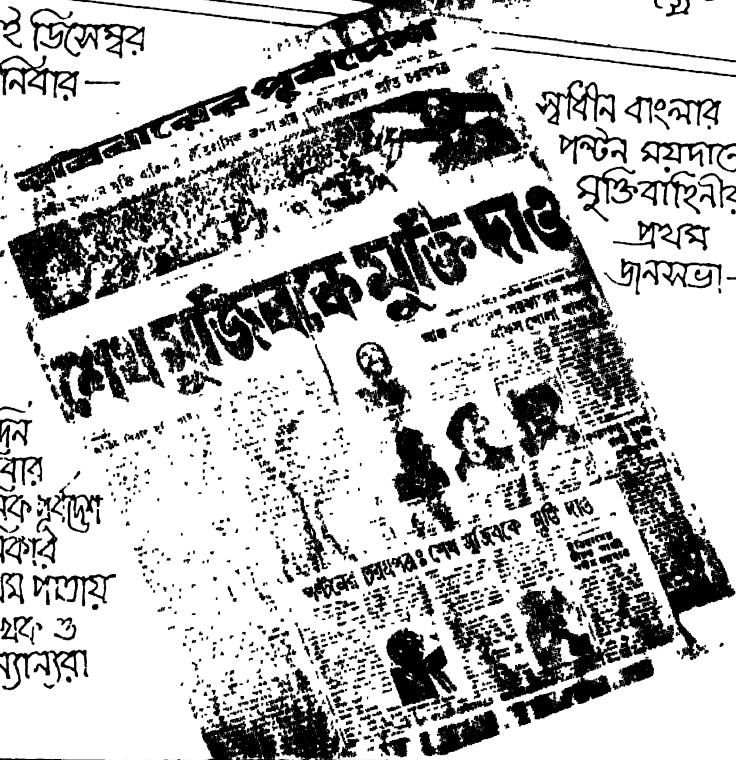
বীর মুক্তিযোদ্ধা ঢাকাওয়াত হোসেন মান্নান, কস্তুরীপাড়ার সামছুল হক, আবদুল হালিম, ছোট্ট মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও ৬ষ্ঠ বিহার রেজিমেন্টের কর্ণেলের সাথে লেখক ও ক্যাপ্টেন ফজলুল হক।

'টাংগাইলে অরোরা' সম্বর্ধনা দিতে বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল অরোরাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাঁ থেকে - এনায়েত করিম, লেঃ জেনারেল অরোরা, আনোয়ার উল আলম শহীদ, লেখক, ব্রিগেডিয়ার সান সিং, ব্রিগেডিয়ার ফজলুল রহমান ও হামিদুল হক
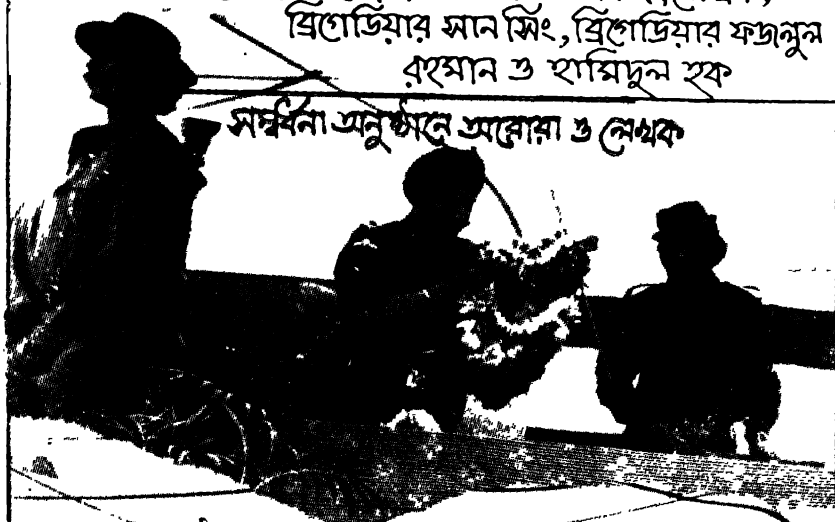
সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অরোরা ও লেখক
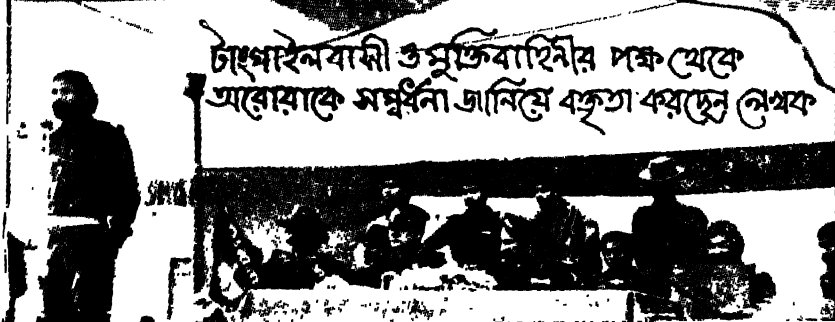
টাংগাইলবাসী ও মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে অরোরাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বক্তৃতা করছেন লেখক

বিদেশী টেলিভিশন টিমের সামনে লেখক ক্যামেরার সামনে মুক্তিযোদ্ধা হানোয়ার, ফারুক আহমেদ, আব্দুস হামাদ, মেজর আব্দুল গফুর, ক্যাপ্টেন রবিউল আলম, লেখক, ক্যাপ্টেন খোকা ও এনায়েত করিম

বল্লার জনসভায় লেখক

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের সামনে, বাঁ থেকে - গণপরিষদ সদস্য আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, রহিমা সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার মান সিং ও শুশ্রুমা সিদ্দিকী

জাহাঙ্গীর স্মৃতি সেবাশ্রমে আবু সাঈদ চৌধুরী - বাঁ থেকে - ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাদেকুল হক, মুক্তিযোদ্ধা হেলু, অধ্যাপক রফিক আজাদ, হানু, জেলা প্রশাসক মোহম্মদ ইসহাক, হামিদুল হক, নজরুল ইসলাম, ডাঃ মিসেস শাহজাদা চৌধুরী, লেখক, আবু সাঈদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন সবুর খাঁন, ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী আনোয়ার উল আলম শহীদ ও বিখ্যাত নুরুন্নবী

২৪ শে ডিসেম্বর '৭১ মুক্তিবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রতিনিধি-দের হাতে প্রকাশ্য জনসভায় বেসামরীক প্রসাশনের দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে। বাঁদিক থেকে – সভার শুরুতে মওলানা কোরান তেলাওয়াত করছেন, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম, লেডার মর্শেদ উদ্দীন, লেখক, গণপ্রতিনিধি শামছুর রহমান খান শাহজাহান হুমায়ুন খালিদ, ভারতীয় সমন্বয়কারী অফিসার, গণপ্রতিনিধি আব্দুল বাসেত সিদ্দিকী, মুক্তি-যোদ্ধা আবুল কালাম, হানু, ক্যাপ্টেন বকুল, আতাহারুল ইসলাম, বজলুর রহমান, আনোয়ার ও ক্যাঃ আব্দুস সবুর খাঁন

পালামে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য
নেতাদের সাথে তেজগাঁ বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধু

২৪ শে জানুয়ারী '৭২
টাংগাইলের প্রান্তসীমায়
বঙ্গবন্ধুর আগমন
প্রতিক্ষায় - বাঁ থেকে -
মুক্তিযোদ্ধা আবু নসর
মুহম্মদ, আব্দুল বাতেন
সিদ্দিকী, লেখক, গণপরিষদ
সদস্য হাতেম আলী তালুকদার
ও শামছুর রহমান খান
শাহজাহান

টাংগাইলের পথে বঙ্গবন্ধুর সাথে
মাইক্রোফোন হাতে লেখক

'ঐতিহাসিক অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে' বাঁ থেকে শহীদ বঙ্গবন্ধুর পিছনে ডানে শেখ জামাল বামে হানিফ, অস্ত্রহাতে লেখক

হাঁটু গেড়ে বঙ্গবন্ধুর সামনে অস্ত্র রাখছেন লেখক, বঙ্গবন্ধুর বামে ছোট ছেলে শেখ রাসেল

অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন বঙ্গবন্ধু

অস্ত্র জমাদেওয়ার পর
মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন
লেখক ॥ রুমালে চোখ মুছছেন বঙ্গবন্ধু

মাঝে - অস্ত্র পরিদর্শনরত
বঙ্গবন্ধু - লেখক
খোরশেদ আলম
আরে ও.,
রফিক আজাদ,
লোকমান হোসেন.
বজলুর রহমান ও
মহম্মদ সরোয়ার্দী

বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে জমাকৃত অস্ত্রের একাংশ
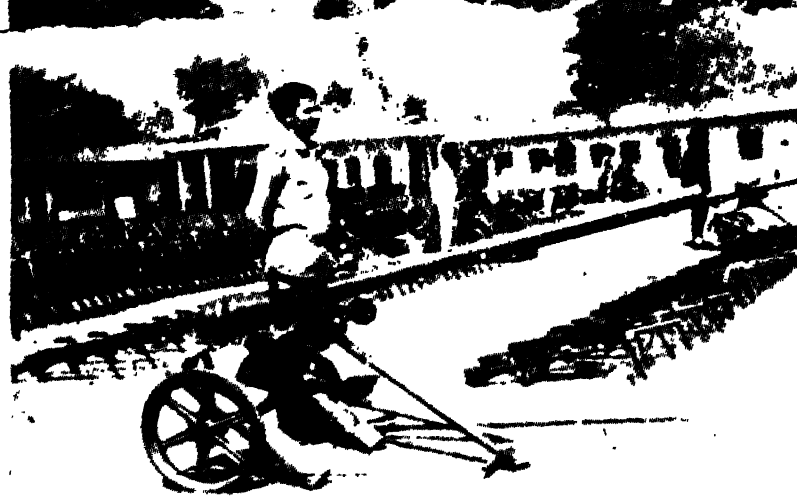
২৪শে জানুয়ারী '৭২ - টাংগাইল পার্ক ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভায় জনগণ ও মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে মানপত্র দিচ্ছেন আনোয়ার উল আলম শহীদ

জনসভায় - বাঁ থেকে - লেখক, মেজর আব্দুল হাকিম আলী আজগর খান দাউদ, শেখ কামাল ও বঙ্গবন্ধু

জনসভায় উত্তাল জনতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে লেখক

একটা অধ্যায়ের শেষ হল।

আমার মন জুড়ে আলোড়ন তুলছে মহান ভারতে কয়েকটা দিনের স্মৃতি। আস্তে আস্তে আমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে আসাম মেঘালয়ের পাহাড়গুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। আর ফিকে হয়ে আসা দৃষ্টি-সীমায় মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে, জল্লাদ হানাদারদের ঘৃণিত মুখ। আমাদের সত্তর জনকে নিয়ে দুটি নৌকা ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্রের বুক চিরে। সত্তর জনের মধ্যে ভারতে আসার সময়ের দলটি তো ছিলই, উপরন্তু বিখ্যাত সামাদ গামার নেতৃত্বে দশজনের একটি 'মর্টার সেকশন' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া নাগরপুর, মানিকগঞ্জ ও বরিশালের তের জন সদস্যকে দলভুক্ত করেছি। তিনটি বেতার যন্ত্রসহ আরো বার জনের একটি 'সিগন্যাল সেকশন' গড়া হয়েছে।

রওনার সময় মেজর হাকিম কুড়ি-পঁচিশ টাকার একখানা সুন্দর চাদর কিনে দিয়েছিল। কমাণ্ডার হাকিমের জানা ছিল, আমি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গাছের নীচে শুয়ে বিশ্রাম নিতাম। চাদরটি মাটিতে বিছিয়ে শোবার জন্য সত্যিই উপযোগী ছিল। পরবর্তীতে বেশ ভাল কাজ দিয়েছে।

আমাদের নৌকা দু'টি দক্ষিণে স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলেছে। কিছু দূর এগিয়ে দেয়ার জন্য বিশ্বস্ত দুই সহযোগী মোয়াজ্জেম হোসেন খান এবং নূরুল ইসলাম সাথে এসেছেন। দুই জনেই নদীপথটি খুব ভাল চিনেন। মোয়াজ্জেম হোসেন খান এবং নূরুল ইসলাম বাহাদুরাবাদ ঘাটের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা-যমুনা যেখানে একত্রিত হয়েছে সে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ভারতে ফিরে যাবেন।

২৩শে আগস্টের শেষ রাতে আমরা ভারতে প্রবেশ করেছিলাম। এবং ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আবার দেশের অভ্যন্তরে ফিরে আসি। ২৩শে আগস্ট থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর এই সময়ের অনেকগুলো ঘটনার কথা বলেছি, তবুও কিছু ছোটখাটো ঘটনা হয়ত বাদ পড়ে গেছে। ব্রিগেডিয়ার সান সিং নিজে আমাদের ডালুর সীমান্ত থেকে তুরার রওশন আরা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিলেন। রওশন আরা ক্যাম্পে পৌঁছানর পর তিনদিন পর্যন্ত আমার অবস্থান গোপন রাখা হয়েছিল। রওশন আরা ক্যাম্পে পৌঁছানর পর ব্যবহারের জন্য দুটি জীপ আমাকে দেয়া হয়েছিল। যার একটি আমেরিকান উইলি অন্যটা জাপানী টয়োটা জীপ। দুটি জীপই আমি ব্যবহার করেছি।

গুলিবিদ্ধ হওয়াতে মূলত চিকিৎসার জন্য আমি ভারতে গিয়েছিলাম। ভারতে পৌছানর পরই আমার হাত ও পায়ের ক্ষতের চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। ২৭-২৮শে আগস্ট পর্যন্ত হাতের যন্ত্রণা ও ফোলার কোন উপশম না হলেও পায়ের ক্ষত অনেকাংশে কমে গিয়েছিল। পায়ের ক্ষতে শুধু ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেই স্বচ্ছন্দে চলতে পারতাম। ২৪শে আগস্ট থেকে যারপরনাই যত্নের সাথে আমার চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। ফলে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে হাতের যন্ত্রণা ও ফোলা কমে এসেছিল।

এক্স-রেতে কোন ত্রুটি ধরা পড়েনি। ৬-৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরতে সক্ষম হয়েছিলাম। তবে গাড়ির ঝাঁকিতে একটু ব্যথা অনুভব করতাম। ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাও অনেকাংশে কমে যায় এবং ক্ষত শুকাতেই যা একটু সময় নেয়। ২০শে সেপ্টেম্বর দেশে ফেরার সময় হাতে ব্যাণ্ডেজ ছিল তবে কোন ব্যথা বেদনা ছিল না। প্রায় শুকিয়ে আসা ক্ষতে যাতে ধুলোবালি না লাগে তার জন্যই শুধু ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখা।

ভারতে অবস্থানের সময়ের একটা বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। কারণ এই বিষয়টি উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে। আমি যখন ভারতে অবস্থান করছিলাম তখন পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু সেনাপতিদের সাথে দেখা হয়েছে, তাঁরা অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আমার সাথে কথা বলেছেন, খোঁজ-খবর নিয়েছেন, সম্বর্ধিত করেছেন। অথচ আমি চিকিৎসা ও যোগাযোগের জন্য ভারতে অবস্থান করছি এটা ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কোন খোঁজ-খবর নেন নি। এমনকি একটা শুভেচ্ছা বার্তাও পাঠান নি। কেন এটা হয়েছে তা বলা আমার সাধ্যের অতীত।

পূর্বদিগন্ত লাল হয়ে এসেছে। ভোরের আলো ফুটতে আর বেশী দেরী নেই। আমাদের দুইটি নৌকা ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও তিস্তার মোহনায় এসে ভিড়ল। এক মাসের সামান্য কিছু কম সময় পর নব উদ্দীপনায়, নবপ্রেরণায় উজ্জীবিত আমরা জন্মভূমির মাটিতে প্রথম সূর্যোদয় দেখলাম। মোয়াজ্জেম হোসেন ও নূরুল ইসলামকে বিদায় জানানো হলো। তাঁদের দায়িত্ব দেয়া হলো, পালা করে প্রতিমাসে দু'বার দেশের অভ্যন্তরে এসে আমার সাথে দেখা করবেন। নূরুল ইসলাম ও ও মোয়াজ্জেম হোসেন খান শরণার্থী বোঝাই একটি নৌকায় আবার ভারতে ফিরে গেলেন।

আমরাও অপেক্ষা করতে চাইলাম না, ভোরের আলো স্পষ্ট হতে না হতেই হানাদার সুরক্ষিত বাহাদুরাবাদ ঘাট পেরোতে চাই। আমাদের ভরসা একটাই যে, স্রোত অনুকূলে। তবু বাহাদুরাবাদ ঘাট বাঁয়ে রেখে খানিকটা পশ্চিমে সরে স্রোতের অনুকূলে দক্ষিণে চললাম। আমাদের গতিপথ থেকে হানাদার-ঘাঁটির দূরত্ব প্রায় দু-আড়াই মাইল। ডানে বামে দু' দিকেই চর। মাঝখানে একশ-দেড়শ গজ চওড়া একটি শাখা বয়ে গেছে। দক্ষিণে প্রবাহিত এই শাখানদী দিয়ে যাওয়াই উপযুক্ত মনে করলাম। কারণ ডান-বাঁয়ে দু'দিকেই চর। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এটা ভাল করেই বুঝেছি, পাক-হানাদারদের হাতে সর্বাধুনিক অস্ত্র যতই থাকুক না কেন, একবার মাটিতে নেমে রুখে দাঁড়াতে পারলে আমাদের কাছে হানাদাররা কিছুই না! তাই নদীপথেও আমি মাটির কাছাকাছি থাকতে চেয়েছি। তবে মূল নদীকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় আমাদের কিছুটা কষ্ট করতে হলো। ছোট নৌকাটি অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারলেও পানি কম হওয়ায় বড় নৌকাটি ঠেকে গিয়ে সে এক বিশ্রী ব্যাপার হলো। শক্তিশালী চুম্বকে লোহা যেমন আটকে যায়, তার চাইতেও শক্তভাবে বালুতে নৌকা আটকে গেল।

খালটি মোটামুটি প্রশস্ত হলেও কোন গভীরতা ছিল না। কোথাও হাঁটু জল,

কোথাও বা তার চেয়ে একটু বেশী। এ অবস্থায় জনা পঞ্চাশেক সহযোদ্ধার সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বলতে গেলে নৌকাটি কাঁধে তুলে মাইল খানেক বয়ে নিয়ে গেলাম।

নিরাপদে বাহাদুরাবাদ ঘাট পেরিয়ে আসতে পেরে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ আনন্দিত। আমি ভারত থেকে রওয়না হবার সময় মনে মনে স্থির করেছিলাম, ফেরার পথে জামালপুর সরিষাবাড়ী রেলসড়কের বাউশি সেতু ভেঙে দিয়ে যাব। বাউশি সেতু ভাঙতে পারলে জামালপুর সরিষাবাড়ী যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এটা যদি করা যায় তাহলে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট এমনিতেই শত্রু-মুক্ত হয়ে যাবে। এতে আরেকটি বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। তা হলো, জগন্নাথগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ ঘাটের মধ্যে যে ফেরী চলাচল করে, তাও স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে। এতে ভারতে যাতায়াতের পথ নিরাপদ হবে। এসব চিন্তা করে বাহাদুরাবাদ ঘাটের মাইল পনর ভাটিতে পুব দিকের একটি শাখা নদীতে ঢুকে পড়লাম। এ-শাখাটি বাউশি সেতুর নীচে দিয়ে গেছে। ছোট্ট নদীটি ধরে প্রায় মাইল কুড়ি এগোবার পর নৌকা থেকে নেমে পড়লাম। আমাদের কাছে যে পরিমাণ গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক ছিল, তা বহনের জন্য অতিরিক্ত একশ লোকের প্রয়োজন ছিল। বাউশি সেতুর দু-তিন মাইল উত্তরে দুটি গ্রাম থেকে লোক সংগ্রহ করে, তাদের সাহায্যে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এগিয়ে চললাম।

সন্ধ্যা সমাগত। সামনেই জামালপুর সরিষাবাড়ী রেল সড়ক। একমাইল পশ্চিম-দক্ষিণে চিহ্নিত সেই বাউশি সেতু। আমাদের পরিকল্পনা রেলসড়ক পার হয়ে পুব পাশে গিয়ে অতিরিক্ত জিনিসপত্র নিরাপদ স্থানে রেখে অথবা আরও দূরে কোনও নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বাউশি সেতু আক্রমণ করব। বাউশি সেতু সুরক্ষিত। তাই এই সতর্ক ব্যবস্থা। আমরা রেল লাইন ঘেঁষে গ্রামের আড়ালে পুব উত্তরে চলেছি। এমন সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। আগের রাতে একদল মুক্তিবাহিনী এসে আধমাইল ব্যাপী রেললাইন বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়েছিল। রেললাইন মেরামতের কাজ তখনও চলছে। এমন সময় উত্তর দিক থেকে একদল হানাদার রেললাইন ধরে দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছিল। হানাদারদের দেখা মাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হলো। হানাদার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে ব্যবধান শুধু একটি খাল। খাল অতিক্রম করে রেললাইনে যাওয়া যেমন আমাদের পক্ষে অসম্ভব তেমনি হানাদারদের পক্ষেও। সবাইকে পজিশন নিতে নির্দেশ দিলাম। এর আগে কখনও হানাদারদের এত কাছে পেয়ে নাস্তানাবুদ না করে ছেড়ে দিইনি। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র উঁচিয়ে গ্রামের আড়ালে বসে গেল। দক্ষিণে চলে যাওয়া রাস্তাটিকে নিরাপদ মনে করে, হানাদাররা নিবিষ্ট মনে, হেলে দুলে চলছে।

গুলির ভাষা যখন নীরব

সহযোদ্ধাদের প্রতি নির্দেশ, আমি গুলি ছুঁড়লেই আঘাত হানবে, আগে নয়। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের চোখের সামনে বিশাল দেহধারী হানাদারদের একের পর এক যেতে দেখছে, অথচ আমার দিক থেকে কোনও সাড়া-শব্দ নেই। আমার আঙুল ট্রিগারে। হানাদার দলের মূলনেতাকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করে ফেলেছি। হানাদার নেতার কাঁধে ক্যাপ্টেনের স্টার দেখা যাচ্ছে। আমার বুক উত্তেজনায় ঢিপঢিপ

করছে। ট্রিগার টিপব, ঠিক তখন আমার কানে এল একটি শব্দ। আমি তন্ময় হয়ে গেলাম। হাত জমে গেল। গুলি ছোঁড়া আর হলো না। বেত হাতে ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক ভাঙা রেললাইন মেরামতরত বাঙালী শ্রমিকদের বলছেন, 'ভাই, তোমলোগ ক্যাইসা আদমী হো! তোমহারা ভাইওনে আজাদীকে লিয়ে ইসকো তোড়া, উনলোগ আজাদী কি লিয়ে লড় রেহে হ্যায়, আউর তোমলোগ আজাদী রুখনে কে লিয়ে গোলামী মে হো! ইয়ে ছোড় দো। ভাগ যাও। হো স্যাকে তো উন ভাইও কো মদত করো যিনোনে আজাদী কে লিয়ে আপনা খুন বহারাহে হ্যায়।'

ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক ছিলেন একজন পাঠান। তার কথা শোনার পর আমার পক্ষে আর তাঁকে গুলি করা হলো না। স্বাভাবিক কারণেই তারা নিরাপদে বাউশির দিকে চলে গেল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অতিথিপরায়ণ পাঠান সৈনিকরা যে বাংলায় জল্লাদ ইয়াহিয়ার হত্যালীলা কোনক্রমেই সমর্থন করেননি। স্বাধীনতা যুদ্ধে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।

আমরা আরও দক্ষিণ-পূবে এগিয়ে চললাম। ঠিক সন্ধ্যায় জামালপুর-সরিষা-বাড়ী রেললাইন অতিক্রম করলাম। দলের অধিকাংশের মাথাতেই গোলা-বারুদের বোঝা। তাই অনেকক্ষণ ম্যাপ দেখে একটি নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করে স্থানীয় একজন লোককে একটি গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটি অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রামটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি দেখছি এখানকার সব গ্রামের নামই জানেন। আপনি এর আগেও এখানে এসেছিলেন?' আমি কোন উত্তর দিলাম না।

রাত কাটানোর জন্য জামালপুর থানার ভ্যাবলা গ্রামকে বেছে নেয়া হলো। পরদিন সকালে দেখা গেল, ম্যাপ দেখতে আমার ভুল হয়েছে। আমি পশ্চিমে সরিষা-বাড়ী-জামালপুর রেললাইন যাতে প্রায় তিন মাইল দূরে থাকে, এমনি একটা স্থান নির্ধারণ করেছিলাম। পশ্চিম দিকে রেল লাইনের দূরত্ব ঠিকই আছে। কিন্তু বিপত্তি বেধেছে পূব দিকের পাকা সড়কটি নিয়ে। আমার কাছে সেই ১৯৩৫-৩৭ সালের পুরানো মিলিটারী ম্যাপ। তা দেখেই আমরা পথ চলছিলাম। ৩৫ সালে যেখান দিয়ে জামালপুর থেকে মধুপুর টাঙ্গাইল পাকা রাস্তা হওয়ার কথা ছিল, বৃটিশদের ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর সেখান দিয়ে জামালপুর-মধুপুর পাকা সড়ক হয়নি। পাকা সড়ক হয়েছে আরও পশ্চিমে ঘেঁষে। ম্যাপে দুটি রাস্তারই উল্লেখ রয়েছে। পশ্চিম দিকের পাকা রাস্তাটি কাঁচা রাস্তা বলে উল্লেখিত হয়েছে। আর যেটি পায়ে হাঁটা কাঁচা রাস্তা সেটিই পাকা রাস্তা হিসাবে ম্যাপে চিহ্নিত।

এই ভুলের মাশুলও আমাদের গুণতে হলো দারুণ ভাবে। অপরিচিত হাওর এলাকার কারণে সকালবেলা না, সারাদিন অপেক্ষা করে বিকেলে রওনা হবো? এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। এমন সময় ২২শে সেপ্টেম্বর সকালে খবর এল দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর দিক থেকে মিলিটারী, রাজাকার ও মিলিশিয়ারা গ্রামটিকে ঘিরে ফেলতে এগিয়ে আসছে। আমি দ্রুত রফিক, ফজলু, কাসেম ও ভুয়াপুরের দুলাল সহ আট-ন'য় জনের একটি দল গ্রামের দক্ষিণে পাঠিয়ে দিলাম। তাদের একমাত্র কাজ কেবল একবার হানাদারদের উপর একঝাঁক গুলি ছুঁড়ে পিছিয়ে আসা। পূবে

প্রবেশের পর প্রথম সংঘর্ষ

ও পশ্চিম দু'দিকেই খোলা। কিন্তু আমাদের অবস্থান থেকে সোজাসোজি পূব অথবা পশ্চিম, কোন দিকেই যাবার উপায় নেই। কারণ সমস্ত এলাকাটা জুড়ে পানি আর পানি। সর্বত্র পানি থৈ থৈ করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে দক্ষিণে একটি বাড়ীতে গেলাম যেখানে সামাদ গামা তার দল নিয়ে ছিল। গামা পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাকে মর্টার সহ আমাকে অনুসরণ করতে বললাম। বাড়ীর পশ্চিমে গিয়ে মর্টার বসিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে দশ-বার রাউন্ড গোলাবর্ষণ করা হলো। পিন্টুকে বললাম অন্যদের নিয়ে ঘরের সমস্ত গোলা-বারুদ ও বিস্ফোরক গ্রামের পশ্চিমে সরিয়ে নিতে। মুক্তিবাহিনী কিছুটা অসুবিধায় পড়লেও ভাগ্য হয়তো সুপ্রসন্ন ছিল। গ্রামের পশ্চিমে বিলে বুক সমান পানি এবং সারা বিলে ধান বোনা ছিল। আল্লাহর আশীর্বাদ হিসাবে অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রাণকর্তার মত চার পাঁচটি কোষা নৌকা ধান ক্ষেতের মধ্যে ছিল। পিন্টু মুক্তি যোদ্ধাদের নিয়ে চটপট সমস্ত মালপত্র কোষা নৌকাগুলোতে উঠিয়ে নিল।

দক্ষিণ দিক থেকে হানাদার বাহিনী গ্রামটির উপর প্রথম আঘাত হানতে চেয়ে ছিল। কিন্তু তারা রফিকের দলের হাতে প্রথম বাধা পেয়ে কিছুটা থমকে গেল। এ সময় ৩ইঞ্চি মর্টার থেকে পরপর দশবারটি গোলা ছোঁড়াতে হানাদাররা কিছু সময়ের জন্য একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। শত্রুপক্ষেও যে ভারী অস্ত্র আছে, তা তারা সহজেই বুঝতে পারল। নির্দেশ মত প্রথম একঝাঁক গুলি ছুঁড়েই রফিকের দল শত্রুকে আড়াল করে পিছিয়ে এল। আমি খুব তাড়াতাড়ি দলকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেললাম। এক ভাগ থাকবে আমার সাথে, বাকী অংশ সোজা গ্রামের পশ্চিমে কোষা নৌকাগুলোর দিকে চলে যাবে, এবং পিন্টুর সাথে মিলিত হবে। তাদের উপর কড়া নির্দেশ, 'ধরা পড়ার পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত তোমরা একটা গুলিও ছুঁড়বে না। আমাদের এবার চরম পরীক্ষা। আমি চেষ্টা করছি শত্রুদের আস্তে আস্তে তোমাদের দিক থেকে সরিয়ে নিতে পারি কিনা।' সামাদ গামা ফজলুল হক সহ প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধা আস্তে আস্তে গ্রামের পশ্চিমে কোষা নৌকা-গুলোর কাছে চ'লে গেল। সেখানে একাধারে কোমর পানি অন্য দিকে ধানগাছগুলো পানির উপর একহাত জেগে আছে। সামান্য একটু নীচু হলেই মুক্তিযোদ্ধাদের আর দেখা যাচ্ছিল না। আমরা কিছু উত্তরে চলে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়লাম। এতে মোটামুটি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলো। হানাদার বাহিনী পিন্টু-সামাদের দলকে বাঁয়ে ফেলে গুলির শব্দ লক্ষ্য করে আমাদের দিকে এগুতে থাকল। আমরা আরও কিছুটা উত্তরে চলে এলাম।

রাতে আমরা যে বাড়ীতে কাটিয়েছি, সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল উত্তরে সরে এসে পূব দিকে যাবার একটি রাস্তা পেয়ে গেলাম। সে-রাস্তা ধরে পূবে এগুতে থাকলাম। সামান্য একটু পূবে এগিয়ে আবার এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়লাম। এভাবে গুলি ছোঁড়ার উদ্দেশ্য একটাই, গুলি ছুঁড়ে বিভ্রান্ত করে, হানাদারদের আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে প্ররোচিত করা, যাতে বাকী দলটা নিরাপদ হতে পারে। হয়েও ছিল তাই।

আমার সাথে ত্রিশজনের একটি দল। তাও আবার দু'ভাগে বিভক্ত। ছ'-সাত জন আমার সাথে। বাকীরা বামন আটার ক্যাপ্টেন হাবির সাথে। তারাও আবার দু'ভাগে

চলেছে। আমরা পূর্ব দিকে এগিয়ে একেবারে জামালপুর-মধুপুর পাকা সড়কের কাছাকাছি এসে গেলাম। রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে দেখলাম কুড়ি-পঁচিশজন পাক হানাদার রাস্তার মুখ আগলে মেশিনগান হাতে বসে রয়েছে। কাঁচা রাস্তার ডান বাম উভয় দিকেই পানি। জামালপুর মধুপুর পাকা সড়কের পূবপাশে যেতে হলে, হানাদারদের মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে হবে। আমরা আবার পশ্চিমদিকে পিছিয়ে এলাম। কিন্তু পশ্চিমে বেশী দূর যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ একদল হানাদার পশ্চিম দিক থেকেও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এই সময় আমার দেহরক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত নূতন কমান্ডার ক্যাপ্টেন হবি, একেবারে ভেঙে পড়ে বলল, 'স্যার, আমরা মরি ক্ষতি নেই, আপনি কয়েকজন নিয়ে যে দিকে পারেন চলে যান। আপনি ধরা পড়লে কিংবা মরে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে।'

—কোথায়? কোন দিকে যাব?

—স্যার, আপনার পায়ে পড়ে, যে দিকে খুশি চলে যান। আপনি মারা গেলে আমি মুখ দেখাতে পারব না। সবাই আমার নিন্দা করবে।

—ভেঙে পড়ো না। তোমরা মরেওতো আমাকে বাঁচাতে পারছ না। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে দেখা যাক কি হয়!

—স্যার, এরপরও ধৈর্য!

পূব দিকই কিছুটা নিরাপদ। মরণপণ করে তাই আবার পূবদিকে চলা শুরু করলাম। সামনের দলকে আদেশ দিলাম, 'ডান ও বাঁয়ে, যাবার মত কোন নৌকা পেলেই তাতে উঠে বস। আর নৌকা না পেলে এই রাস্তা দিয়েই পাকা সড়ক অতিক্রম করতে হবে। এতে যে ক'জন বেঁচে থাকি তাই লাভ।' এখানে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। আমি যখন পাকা রাস্তায় ওঁৎ পেতে বসে থাকা হানাদারদের দেখে পশ্চিমে এসে গুলি চালিয়েছিলাম, তখন রাস্তার ডান বামে কোন নৌকা দেখতে পাইনি। মরিয়া হয়ে আবার যখন পূবদিকে এগুতে থাকি, তখন ডানপাশে দু'টি নৌকা দেখতে পেলাম। একটি ঢাকাইয়া ধরনের যাত্রীবাহী, অন্যটি সাধারণ কোষা নৌকা। আমার আগে আগে যাওয়া চব্বিশ-পঁচিশ জনের দলটি ইতিমধ্যেই বড় নৌকাটিতে উঠে চলতে শুরু করেছে। দেরী না করে আমরাও কোষা নৌকাতে উঠে পড়লাম। আমাদের থেকে হানাদারদের দূরত্ব পূব ও পশ্চিমে তখনও প্রায় এক মাইল। হানাদাররা যেমন আমাদের দেখতে পাচ্ছে; তেমনি আমরা তাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ভরসা শুধু এইটুকু যে, এতদূর থেকে নিশানা ঠিক করে গুলি লাগানো সম্ভব নয়।

রফিক নৌকা বাইতে শুরু করলো। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে যত দ্রুত নৌকা চালনা দরকার রফিক তা পারছিল না। আমি রফিকের হাত থেকে লগি নিয়ে সবাই কে নীচু হয়ে বসে থাকতে বললাম। আমি নৌকা বাইতে জানতাম। তবে অনেক-দিন নৌকা না বাওয়ায় কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। তৎসত্ত্বেও রফিকের চাইতে ভাল ও দ্রুত নৌকা চালাচ্ছিলাম।

চার-পাঁচ'শ গজ এগুতে একটি ধান ক্ষেত। ক্ষেতে পানির গভীরতাও কম। তাই নৌকা বাইতে বেশ সুবিধা হচ্ছিল। ক্ষেতের মাঝে কয়েকটি বাড়ী। বাড়ী-

গুলোর পাশ দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছিলাম ঠিক তখন হানাদাররা আমাদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করলো। মুক্তিবাহিনী ও হানাদারদের মধ্যকার দূরত্ব প্রায় সাত-আটশ গজ। আমি খুব দ্রুত নৌকা বেয়ে বাড়ীগুলোর আড়ালে চলে এলাম। সৌভাগ্য ক্রমে কারো গায়ে গুলির একটি আঁচড়ও লাগল না। আরো একটু উত্তরে এগোতেই মাটি পেয়ে নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়লাম। অন্যেরাও আমাকে অনুসরণ করল। তবে বড় নৌকাটি কিছুটা পশ্চিম-উত্তরে সরতে সরতে আমাদের হারিয়ে ফেলল।

জামালপুর-মধুপুরের পাকা রাস্তা আমাদের থেকে একশ কি দেড়শ গজ দূরে। বাড়ীর আড়াল থেকে আমরা হানাদারদের দেখতে পাচ্ছিলাম। হানাদাররা আমাদের দেখতে পাচ্ছিল না। কিছুটা উত্তরে গিয়ে পাটক্ষেত আড়াল করে, পাকা সড়কের কুড়ি-পঁচিশ গজের কাছাকাছি এলাম।

কাছে এসে বুঝতে পারলাম, রাস্তায় যারা টহল দিচ্ছে, তারা মিলিটারী নয় রাজাকার। আর এই সময় কেন যেন রাজাকাররা উচ্চৈস্বরে বলছিল, 'আমরা এখানকার লোক না। মিলিটারীরা নিজেরাই মুক্তিবাহিনীর সাথে পারেনা, আর এই অচেনা জায়গায় আমাদের রাইখ্যা গেল। এখন যদি মুক্তিবাহিনী আসে, আমরা কি উপায় করমু!' এ কথা শুনে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। রফিক, ভুয়াপুরের দুলাল, ছোট সামসু ও আমি এক সাথে 'ইয়া, ইয়া' বলে হুংকার ছেড়ে রাস্তার উপরে লাফিয়ে পড়লাম। আমাদের হুংকারে রাজাকাররাও এক অভূতপূর্ব খেল দেখাল। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কোন গোলাগুলি না ছুঁড়ে উত্তর ও দক্ষিণে দে ছুট। আধমাইল না গিয়ে বোধ হয় তারা পিছনে ফিরে তাকায় নি। আমরা অনায়াসে রাস্তার পূব পাশে চলে এলাম। কিন্তু পিছনে তাকিয়ে দেখি তখনও একজন রাস্তা পার হতে পারেনি। সে হলো আবদুল হালিম। আমি আবার দৌড়ে গিয়ে বলতে গেলে, তাকে ধরে টেনে হিঁচড়ে রাস্তার পূব পাশে নিয়ে এলাম। শারীরিক দিক থেকে দুর্বল কিন্তু প্রচণ্ড সাহসের অধিকারী আবদুল হালিম এদিন একটু আগেই আরেক বার এমনি অসুবিধা ঘটিয়েছিল। ভ্যাবলা গ্রাম। ভ্যাবলা গ্রাম থেকে প্রায় আধমাইল উত্তরে এসে আমরা পূব দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছি। সামনে পড়ল ছোট্ট একটি খাল, কাপড় ভিজিয়ে হাতিয়ার সহ সবাই খাল পার হয়ে গেল। কিন্তু হালিমের অস্ত্রটি ফস্কে গভীর পানিতে পড়ে গেল। আমি পিছনে ছিলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার হাতিয়ারটা ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'তুই এটা ধর। এগিয়ে যা। আমি ডুব দিয়ে তোর গানটি তুলে আনছি।' খালটিতে আট-ন ফুটের বেশী পানি ছিল না। আমি এক ডুবেই হালিমের স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি উঠিয়ে এনেছিলাম।

পাঁকা রাস্তা অতিক্রম করে আমরা সত্যিই কিছুটা স্বস্তিবোধ করলাম। কিন্তু অন্য দলটি কোথায় গেল, তাদের কি হলো, ধরা পড়ল কিনা?—এইসব দুশ্চিন্তা আমার ও দলের নিরাপত্তাবোধে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। তবু আরও কিছুটা পূব দিকে এগোলাম। পাকা সড়কের পশ্চিম পাশে সর্বত্রই কেবল পানি আর পানি কিন্তু পূব পাশে তা নয়। পাকারাস্তা থেকে দেড়-দুমাইল পূবে এসে একটি বাড়ীতে উঠলাম। সকাল ন-টা থেকে দেড়টা, এই সুদীর্ঘ সময় আমাদের হাপিত্যেশ দৌড়াদৌড়ি ও উৎকণ্ঠায় কেটেছে। ফলে প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করছিলাম। বিরাট বাড়ী কিন্তু জন-

মানব শূন্য। বাড়ীতে একজন মাত্র কাজের মহিলা। আর তাঁর তিন-চার বছরের ছোট্ট একটি বাচ্চা। ক্ষুধার জ্বালায় আমাদের পেট পুড়ে যাচ্ছে, খাবারের আবেদন জানালে মহিলা বললেন, 'বাড়ীতে অনেক চাল আছে কিন্তু লবণ, তেল, ডাল অন্য কিছু নেই। মনিবরা তিন-চার মাস আগে বাড়ী ছেড়ে ভারতে চলে গেছেন। এখন আপনারাই বলুন আমি কি করি?' মহিলাটিকে বললাম, 'আপনি দয়া করে শুধু অল্প কিছু ভাত রেঁধে দিন।' মহিলাটি ভাতের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এই সময় ঐ গ্রামেরই মাঝারী বয়সের একজন লোক এলেন। তিনিই লবণ, তেল ও আধসের আলুর ব্যবস্থা করে দিলেন। এই দিয়ে এ দিনের মত আমরা আহার-পর্ব সমাধা করলাম।

পেটের জ্বালা সামান্য একটু কমল কিন্তু হারিয়ে যাওয়া সহযোদ্ধাদের জন্য দুশ্চিন্তার জ্বালা শতগুণ বেড়ে উঠলো। আমি ছটফট্ করতে লাগলাম। সাত-আট বছরের পুরানো ঘনিষ্ঠ অনুসারী আরিফ আহমেদ দুলাল সহ ছাইদুর, খোকা তমছের নিখোঁজ হওয়া দলে রয়েছে। অন্য দিকে বহুদিন পর একবুক আশা নিয়ে যে ছোট ফজলু আমার নিত্য সহচর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেও রয়েছে প্রথম দলের সঙ্গে। আমরা তখনও কিছুই জানি না তারা কোথায়। এবং তাদের কি হয়েছে। সব মুক্তিযোদ্ধারাও আমার মত খুবই ছটফট করছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকে অসংখ্যবার বিপদে পড়েছি। দু'একবার ছাড়া এভাবে মূল দলের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। এদিকে সূর্য অস্তগামী। সন্ধ্যায় আমরা আরও কিছুটা পূবে এগিয়ে এক বিডি মেম্বারের বাড়ীতে উঠলাম। মেম্বার ভদ্রলোক বাড়ীতে ছিলেন না। মেম্বরের স্ত্রী দু' সন্তানের জননী। অপূর্ব সুন্দরী মহিলা। নির্ভয়ে আন্তরিকতার সাথে আমাদের খাবার ও থাকার ব্যবস্থা করলেন। শাশুড়ীকে নিয়ে আমাদের খাবার পরিবেশন করলেন। খাওয়া শেষ হলে, মহিলাটি বললেন, 'দেখুন, আপনারা দেশের জন্য লড়াই করছেন। আমরা তো আর কিছু করতে পারছি না, আমাদের সামান্য একটু যত্ন যদি দেশের কোন কাজে লাগে, তাই চেষ্টা করছি। আমার কথায় আপনারা ভুল বুঝবেন না। আপনারা আমার ভাইয়ের মত। আপনারা যদি সূর্য উঠার আগে এখান থেকে চলে যান, তাহলে এখানকার কেউ যেমন জানতে পারবে না, তেমনি আমাদের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়ারও কোন ভয় থাকবে না। আমার অনুরোধ, আপনারা দয়া করে একটু কষ্ট করে সূর্য উঠার আগেই চলে যাবেন।' মহিলাটি হয়তো কলেজ পড়ুয়া। তিনি অত্যন্ত গুছিয়ে কথা বলছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে আন্তরিকতার ছাপ ফুটে উঠছিল।

আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আপনাদের মত মায়েরা বোনেরা আছে বলেই আমরা হানাদারদের বিরুদ্ধে এতটা দুর্বার হতে পেরেছি। আপনি আমাদের ক্ষুধায় অন্ন জুগিয়েছেন, রাতে আশ্রয় দিচ্ছেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন, সানন্দে আমরা আপনার অনুরোধ রক্ষা করবো।'

সারারাত আমাদের ঘুম হলো না। এপ্রিল মাসে বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকীকে হারিয়ে যেমন বিনিদ্র রজনী কেটেছিল—এ রাতটাও ঠিক তেমনি কাটল। ভোর চারটায় বিছানা ছেড়ে উঠে, হাত মুখ ধুয়ে, অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়তে আমরা প্রস্তুত। বাড়ীর কর্ত্রী নিজে আমাদের সকলের হাতে চা তুলে দিলেন। এতটুকু

জড়তা নেই। এ যেন নিজেরই ছোট ছোট ভাইদেরকে কোথাও যাওয়ার আগে তৈরী করে দিচ্ছেন। আমরা সকলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান করে গৃহকর্ত্রীকে হাজার হাজার ধন্যবাদ ও ছালাম জানিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

বাড়ী থেকে সম্ভবত ১০০ গজও এগোতে পারিনি। হঠাৎ পূর্বদিক থেকে দশ-বারো বছরের একটি ছেলেকে ছুটে আসতে দেখলাম। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে ধরা হলো। বন্দুক দেখেই সে জিজ্ঞেস করে বসলো, 'আচ্ছা আপনারা কি কাদের সিদ্দিকীর লোক? আপনারা কি মুক্তিবাহিনী?' কারণ জিজ্ঞাসা করার সে আবার বলল, 'গতরাতে কাদের সিদ্দিকীর একদল মুক্তিযোদ্ধা চেয়ারম্যানের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁরা এই দিকেই আসছেন। আপনারা যদি কাদের সিদ্দিকীর দলের লোক হন, তাহলে বলুন, আমি দৌড়ে গিয়ে তাদেরকে খবর দেব।' ছেলেটিকে আর কিছু বলতে হলো না। তার আগেই পূর্বদিক থেকে কুয়াশার ভিতর দিয়ে লম্বা সারিতে একটি দলকে আবছা আবছা দেখা গেল। আমার থেকে প্রায় তিন-চার'শ গজ আগে আগে যাওয়া স্কট পার্টির রফিক এবং সামচু দলটিকে চ্যালেঞ্জ করল। সাথে সাথে দলটি থমকে দাঁড়াল। গলার আওয়াজ ও দু' একটি কথা শুনে বুঝা গেল, তারা গতকাল দুপুরে হারিয়ে যাওয়া দলের অংশ। আগত দলের খোকা চিৎকার করে বলল, "রফিক ভাই, আমি খোকা, আমি খোকা। উনিশ-কুড়ি ঘণ্টার দারুণ দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার অবসানে আমাদের মিলন হলো। মিলনের সে কি আনন্দ! এ যেন মহামিলনের মহাআনন্দের জোয়ার! সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরছে, পারলে একজন আর একজনকে কোলে তুলে নিচ্ছে। আমিও বন্যায় উপচে পড়া নদীর মত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। পরক্ষণেই আমার আনন্দে নেমে এলো বিষাদের ছায়া। জানি না, পিন্টু, ফজলু, সামাদ গামার দলের খবর কি? তারা কোথায় আছে এবং কেমন আছে?

আমরা পূব দিকে এগিয়ে চললাম। ভোর পাঁচটায় তুলসীপুর বাজারে পৌঁছলাম, এখান থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে জামালপুর-মধুপুরের পাকা সড়ক। মাইল দুই আড়াই পূবে মধুপুরের পাহাড়। তুলসীপুর থেকে সোজা দশমাইল উত্তরে জামালপুর এবং দশমাইল দক্ষিণে ধনবাড়ী। তুলসীপুর হাইস্কুল ঘরের মাটিতে বসে আবার ম্যাপ খুললাম। এবার আমার চোখে আগের ভুল ধরা পড়ল।

জামালপুর থেকে তুলসীপুর বাজারের উপর দিয়ে সোজা ধনবাড়ীতে গিয়ে যে কাঁচা রাস্তাটি মিলেছে, সেটিই আমার ম্যাপে পাকা রাস্তা বলে চিহ্নিত রয়েছে। সামান্য ভুল যে কত বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে, কতবড় ক্ষতির কারণ হতে পারে তার এক মস্ত বড় শিক্ষা আমি এই ঘটনা থেকে পেলাম।

ভ্যাবলা গ্রাম থেকে অত্যন্ত সফলতার সাথে হানাদারদের বিভ্রান্ত ও প্রলুব্ধ করে আমরা পিছু টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম। ফলে পিন্টু, ফজলু, সামাদ গামার দলকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি। তারা সম্ভাব্য বিরাট বিপদ ও প্রভূতক্ষয় ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়। ভ্যাবলা গ্রামের পশ্চিমে কোমর সমান পানিতে মুক্তিযোদ্ধারা নীচু হয়ে ধান ক্ষেতের সঙ্গে মিশে রয়েছে। তাদেরই শ' তিনেক গজ সামনে দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে

সামাদ গামাই

হানাদার বাহিনী আমার দলকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। পিন্টু, ফজলু, সামাদ গামার দল অস্ত্রবোঝাই কোষা নৌকাগুলো ঠেলতে ঠেলতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে গিয়ে একটি পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ পুরানো বাড়ীর শূন্য ভিটায় আশ্রয় নেয়। মুক্তি-যোদ্ধারা চরম উৎকন্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে জঙ্গলের ভিতর চুপ মেরে বসে আছে। গোলাবারুদগুলো কোষা নৌকাগুলোতেই রয়ে গেছে। ধান ক্ষেতের মধ্যে থাকার নৌকাগুলো দূর থেকে দেখার উপায় নেই। শুধু তাই নয়, কাছে এসেও খুব নিখুঁত ভাবে লক্ষ না করলে নৌকাগুলি দেখা যাচ্ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন ও ভীত সন্ত্রস্ত। অন্য দিকে দারুন ক্ষুধার্ত, ক্লান্তও। অধিকন্তু নেতৃত্বহীন হওয়ায় ও অন্য দলের কোন খোঁজ খবর না জানায় তারা খুবই বিমর্ষ হয়ে উদ্দেশ্য-বিহীন ভাবে অপেক্ষা করছিল। তবে এমনি ভাবে তাদের বেশী সময় কাটেনি। কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকার পরেই জঙ্গল বাড়ীতে জনৈক পূর্ণবয়স্ক লোক প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আসেন। তিনি কেবল মাত্র পায়খানায় বসেছেন—এদিক ওদিক তাকিয়ে আশেপাশে অনেকগুলো লোককে হঠাৎ দেখতে পেয়ে তাঁর পায়খানার বেগ একেবারে চলে যায়। তিনি বসা থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারাও তাঁকে ধরে ফেললো।

মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে পেয়ে লোকটি যেমন চমকে যান, তেমনি মুক্তিযোদ্ধারাও লোকটিকে জঙ্গলের দিকে আসতে দেখে কিছুটা বিচলিত হয়। জঙ্গলে পায়খানা করতে আসায় লোকটির প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের কোন সন্দেহ জাগেনি। তবে তিনি ফিরে গিয়ে হয়ত মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের কথা ফাঁস করে দিতে পারেন—এটাই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আশংকা। তাই লোকটিকে আটক করা। লোকটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বললেন, 'আমি আপনাদের অবস্থা বুঝতে পেরেছি, আমাকে যেতে দিন। আপনাদের কোন ক্ষতি হবেনা।' কেন যেন মুক্তিযোদ্ধারা লোকটির কথা সহজে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিল। একটু পরেই একটি বাইকে করে দু' কলসী পানি ও কয়েকটি গ্লাস নিয়ে এলেন। এরপর আধ ঘণ্টা পর পর জঙ্গলে এসে মুক্তি-যোদ্ধাদের খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। দেখা হওয়ার প্রায় আড়াই ঘণ্টার মধ্যে আরও দু'জন লোকের সহায়তায় ঝুড়িতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার নিয়ে এলেন। গ্রাম বাংলার চিরাচরিত খাবার ডাল-ভাত। লোকটি সারা দিন পরম আন্তরিকতা ও যত্নের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখাশোনা করেন। সন্ধ্যায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন গ্রামবাসীসহ মুক্তিযোদ্ধারা কোষা নৌকা থেকে গোলাবারুদ মাথায় তুলে দক্ষিণে ভুয়াইল-কেন্দুয়ার দিকে রওনা হয়। এর পরই শুরু হয় সামাদ গামার ভূমিকা।

গ্রামবাসীরা বিশেষ সতর্কতা ও যত্নের সাথে গোলাবারুদের বোঝা বহন করেছেন। গোলাবারুদ বহন গ্রামবাসীদের কাছে এক পরম পবিত্র আমানত মনে হচ্ছিল। গোলা-বারুদ বহন করার দুর্লভ সুযোগ পাওয়ায় তাদের বুক গৌরবে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। আর তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠছিল সৃষ্টি-যুগের এক অনাবিল আনন্দ।

মালপত্র প্রচুর হওয়ায় এবং তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক কম থাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের বোঝার পরিমাণ একটু বেড়ে যায়। এমনিতেই তখন মুক্তিযোদ্ধারা ছিল বিমর্ষ-

হতোদ্যম। তিন সাড়ে তিন মাইল চলার পর কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা যেন ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়ে। দলের সামনে পিন্টু। মাঝখানে ফজলুল হক। আর পিছনে সামাদ গামা। হতোদ্যম মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে চলছে। হঠাৎ সামাদ গামা লক্ষ করল, তার মর্টারের একটা অংশ "বেস্‌প্লেট" পড়ে আছে। কাউকে কিছু না বলে সে সেই অংশটি কাঁধে তুলে নেয়। আর একটু সামনে এগুতেই গুলির একটা থলি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে, সেটাও সে তুলে নেয়। এর পরেই শুরু হলো, গুলির থলি রাস্তায় পড়ে থাকার পালা। পঞ্চাশটি করে গুলির থলিগুলো এমন ভাবে তৈরী যে, কোমরে বেঁধে বা কাঁধে ঝুলিয়ে বহন করা যেত এবং প্রতিটি থলির মুখ ক্লিপ দিয়ে বন্ধ করা থাকতো। সামাদ গামা এগিয়ে যাচ্ছে। আর রাস্তায় পড়ে থাকা গুলি ভর্তি থলিগুলো একে একে কাঁধে তুলে নিচ্ছে। এক সময় রাস্তার একপাশে মর্টারের আর একটি অংশ "বাইপার্ট" পড়ে থাকতে দেখে, সামাদ গামা রাস্তায় পড়ে থাকা "বাই-পার্টটি"ও তুলে নেয়। মর্টারের ব্যারেল আগে থেকেই সে বহন করছিল। উল্লেখ্য যে, ব্যারেল, বাই পার্ট এবং বেস্‌প্লেট—এই তিন অংশ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মর্টার। যেকোন একটি না থাকলেই অস্ত্রটি সম্পূর্ণ অকেজো। দলের সঙ্গে তখন দেড়'শটি ৩" মর্টারের গোলা ছিল। রাস্তায় কয়েকটি গোলা পড়ে থাকতে দেখে সে সেগুলোও তুলে নেয়। রাস্তায় যা কিছুই পড়ছে, সামাদ গামা বিশেষ যত্নের সাথে তা-ই উঠিয়ে নিচ্ছে। যেন সব কিছু উঠিয়ে নেয়ার দায়িত্বটা তারই। এমনি করে দীর্ঘ ছয় মাইল পথ অতিক্রম শেষে যখন মুক্তিযোদ্ধারা ভুয়াইল-কেন্দুয়া এসে নৌকায় উঠে, তখন পাহ্‌লোয়ান সামাদ গামার কাঁধের দু' দিকে ঝুলানো ৩০৩, ৭'৬৫ ৭'৬২-এর তিন হাজার গুলি, মর্টারের তিনটি অংশ এবং আট পাউন্ড ওজনের মর্টারের আটটি গোলা। সব মিলিয়ে ওজনের পরিমাণ সাড়ে চার-পাঁচ মনের কম হবেনা। এই বোঝা হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের মধ্যে কয়জনে বহন করতে পারে? সামাদ সত্যিই এক ব্যতিক্রম, এজন্যই আমি বলছি, বলতে বাধ্য হচ্ছি, সামাদ গামা, গামাই। গামার মতই এক বিস্ময়কর পাহ্‌লোয়ান।

কেন এমন হলো? অর্থাৎ কেন রাস্তার উপর গোলাগুলি পড়ে ছিল? এ প্রশ্নের জবাব সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। হতোদ্যাম, ব্যাথাতুর মুক্তিযোদ্ধারা চলতে চলতে অতিরিক্ত বোঝা বইতে পারছিল না। হাঁটতে হাঁটতে তাদের কেউ কেউ কাঁধ অথবা কোমর থেকে পঞ্চাশ রাউন্ডের গুলির থলিগুলো আস্তে করে রাস্তার উপর ফেলে দিচ্ছিল। এভাবে গোলাগুলি ফেলে দিয়ে তারা নিজেদের একটু হাল্‌কা করতে চেয়েছিল। তারাও বুঝত, এভাবে গুলি ফেলে দেয়া মুক্তিবাহিনীর জন্য খুবই ক্ষতিকর। তবুও তাদের উপায় ছিল না। মর্টার সেকশনের সদস্যরাও একই কারণে মর্টারের অংশগুলো ফেলে দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু এইভাবে গোলাগুলি ফেলে যেতে সামাদ গামা একেবারেই নারাজ। তাই সে কিছুই পড়ে থাকতে দেয়নি। ঐ দিন সামাদ গামা, বিশেষ করে মর্টারের পরিত্যক্ত অংশ দু'টি যদি কুড়িয়ে না আনত তাহলে একটি মর্টার সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যেত। ভুয়াইল কেন্দুয়া থেকে সামাদ গামা পিন্টু ও ফজলু তাদের দল নিয়ে নিরাপদে নলীন ভুয়াপুরের কাছাকাছি অন্য মুক্তি-যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়।

আমি তুলসীপুর স্কুল ঘরে পাটি বিছিয়ে বসে আছি। তুলসীপুর বাজারের একমাত্র ঔষধের ডিসপেন্সারীর বৃদ্ধ ডাক্তার 'কাদের সিদ্দিকী' এসেছেন এমন একটা খবর শুনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে ছুটে এলেন। কিন্তু আমি আগেই সহযোদ্ধাদের বলে দিয়েছিলাম, আমার তুলসীপুর বাজারে অবস্থানের কথা যেন বাইরে জানানো বা প্রচারিত করা না হয়। অথচ ডাক্তার ভদ্রলোক তার ডিসপেন্সারী ফেলে ছুটে এসেছেন কাদের সিদ্দিকীকে এক নজর দেখতে। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে যখন বলল, 'কাদের সিদ্দিকী তো এখানে আসেন নি, তার প্রধান সহকারী এসেছেন। আপনি হয়তো ভুল শুনেছেন। আপনি যদি তার সাথে দেখা করতে চান, তা হলে আমরা কমান্ডার সাহেবকে জানাতে পারি।' ডাক্তার সাহেব কাদের সিদ্দিকীর সহকারীর সাথেই দেখা করতে রাজী। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসা হলো। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর বয়সী ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, 'আমি শুনছিলাম কাদের সিদ্দিকী এখানে এসেছেন, বড় আশা ছিল তাঁকে দেখার, তাঁর সাথে দুটি কথা বলার। তাঁর সম্পর্কে কত শুনেছি কিন্তু চোখে দেখিনি। আপনি তাঁর প্রধান সহকর্মী। আপনার সাথে দেখা হল, এতেই আমি খুশী।' তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বললেন, 'আমার এক ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে। সে, সেই জুন মাসে একবার এসেছিল। এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, কিছুই জানি না।'

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ছেলের নাম কি?' ভদ্রলোক বললেন, 'আমার ছেলের নাম আবুল মনসুর। সে ময়মনসিংহ শহীদ মিন্টু কলেজে পড়তো। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নাকি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমি শুনেছি, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, আর মনসুর যখন জুন মাসে এসেছিল, তখন সে বলেছিল, সে তার অধ্যক্ষ স্যারের সাথে আছে।'

ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হলাম। একজন মুক্তিযোদ্ধার পিতার এই ধরনের মন-মানসিকতা দেখে খুশী না হয়ে পারলাম না। ঘটনাক্রমে ঢালু ক্যাম্পে আমার সাথে মনসুর ও অধ্যক্ষ মতিয়ার রহমানের সাক্ষাৎ হয়েছিল। পিতা ও ছেলের চেহারায় যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তাই তাঁকে বললাম, 'আমিও কিছুদিন আগে ভারতে গিয়েছিলাম। আপনার ছেলেকে আমি দেখেছি। সে অত্যন্ত ভাল ছেলে, এবং মুক্তিযুদ্ধে বেশ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের স্যার (কাদের সিদ্দিকী) ভারতেই আছেন। আপনি যদি আপনার ছেলেকে কোন চিঠি পত্র দিতে চান, আমাকে দিতে পারেন। আমি অবশ্যই পেঁছে দেব।'

দুপুরের মধ্যেই প্রচার হয়ে গেল ওখানে কাদের সিদ্দিকী আসেন নি। কাদের সিদ্দিকীর প্রধান সহকারী এসেছেন। দুপুর থেকে তুলসীপুর বাজার লোকে ভরে যেতে লাগলো। তারা কাদের সিদ্দিকীর সহকারীকে দেখবেন। এত ঔৎসুক্যের কারণ কিছুদিন আগে এইখানে আমার এক কোম্পানী কমান্ডার মেজর হাবিব প্রায়

সপ্তাহ খানেক ছিল। তারা ধনবাড়ীর কাছে চাঁদপুর গ্রামে হানাদারদের সাথে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এতে হানাদাররা বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। একটি হানাদারের লাশ সহ নানা প্রকারের পনেরটি অস্ত্র তারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই দিন মুক্তিযোদ্ধারা একজন সাথীকে চিরতরে হারিয়েছিল। তুলসীপুর চাঁদপুর যুদ্ধে শাহাদৎ বরণকারী মুক্তিযোদ্ধার নাম বজলুর রহমান। বজলুর রহমান উপলদিয়ার ফজলুর চাচাতো ভাই। যাদের বাড়ীতে গত এপ্রিল মাসের চরম দুঃসময়ে আমাকে পরম যত্নের সাথে রাখা হয়েছিল।

কমাণ্ডার হাবিব তার মধুর ব্যবহার ও অসীম সাহসিকতায় এ এলাকার সকলের অন্তর জয় করেছিলেন। তাই কাদের সিদ্দিকীর প্রতি তাদের এত ঔৎসুক্য, একই কারণে তার দলের প্রতিও। তুলসীপুর বাজারে যতই লোক বাড়তে থাকল, মুক্তি-যোদ্ধারা জামালপুর-তুলসীপুরের রাস্তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ততই সুদৃঢ় করতে থাকল। কারণ হানাদারদের আসার এটিই একমাত্র রাস্তা। সমবেত জনতার চাপে বাধ্য হয়ে আমি ভিন্ন নামে কাদের সিদ্দিকীর সহকারী সেজে বিকাল চারটায় তুলসী-পুর বাজারে একটি টুলের উপর দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার সামনে উদাত্ত কণ্ঠে বক্তব্য রাখলাম। বক্তৃতার সময় দু'তিনবার বাধলেও খুব উদ্দীপ্ত ও আবেগ-মিশ্রিত বক্তব্য রাখতে সক্ষম হলাম।

কাদের সিদ্দিকীর প্রধান সহকারীর বক্তব্য শুনে লোকজনের মধ্যে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। জনতার মাঝ থেকে কেউ কেউ বললেন, 'আমরা কাদের সিদ্দিকী সাহেবের একজন কমাণ্ডারকে সপ্তাহ খানেক আগেও দেখেছি। তার মধুর ব্যবহার আমাদের অন্তর জয় করেছে। আজ তাঁর প্রধান সহকারীকে দেখলাম। এর বক্তব্য আমারের শুধু উদ্বুদ্ধই করেনি, আমাদের শরীর ও মনে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দিল। আমরা যদি স্বয়ং কাদের সিদ্দিকীকে দেখার সুযোগ পেতাম, তাহলে শত গুণ সাহস ও শক্তি অনুভব করতাম, ধন্য হয়ে যেতাম।'

বক্তৃতা শেষে জনগণের মাঝে এই ধরনের কথোপকথন, মন্তব্য শুনে বললাম, 'দেখুন, প্রয়োজন হলেই আমাদের স্যার এখানে আসবেন। আমরা তাঁকে দেখেছি যেখানেই তাঁর প্রয়োজন, সেখানেই তিনি হাজির হয়েছেন।' এ কথা শুনে জনৈক শ্রোতা বললেন, 'তা কি করে হয়? সিদ্দিকী সাহেব নিজে এখানে আসবেন?' আমি আবার বললাম, 'প্রয়োজনে অবশ্যই আসবেন।'

সন্ধ্যার পর আমরা আবার দক্ষিণে যাত্রা শুরু করলাম। উদ্দেশ্য—ধনবাড়ীকে সামান্য বাঁয়ে রেখে নলীনের কাছে ধলেশ্বরী-যমুনার পাড়ে গিয়ে পৌঁছানো। পথ চলতে চলতে গভীর রাতে ধনবাড়ী থেকে প্রায় মাইল চারেক উত্তরে এক বিডি চেয়ার-ম্যানের বাড়ীতে উঠলাম, এ বাড়ীতে খাবার চাওয়া হলে বাড়ীর একজন খাবার প্রস্তুতে অসুবিধা আছে বলে জানালো এবং আমাদের কিছু চিড়া-মুড়ি খেতে দিল। আমি ঝামেলা করার পক্ষপাতী ছিলাম না। চিড়া-মুড়িই সই। চেয়ারম্যান বাড়ীর পাশের বাড়ী, আমার ছাত্রজীবনের সহকর্মী নরুল ইসলামদের। মুক্তিযোদ্ধারা চেয়ারম্যান বাড়ীতে উঠেছে, এই খবর পেয়ে নরুর ছোট ভাই চেয়ারম্যান বাড়ীতে এসে হাজির হলো। পনের ষোল বছরের কিশোর। নরুল ইসলামের সাথে হুবহু

সাদৃশ্য দেখে ছেলেটিকে নূরুর ভাই বলে সন্দেহ জাগল। আমি উঠে গিয়ে ছেলেটিকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি নূরুর ছোট ভাই?' প্রশ্নের মুখে ছেলেটি থ'মেরে গেল। বলল, 'হ্যাঁ', সেও পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

—তোমার চেহারা দেখে। তোমার বাবা মার খবর কি?

—ভাইজান, পাশের বাড়ীটা আমাদের—এটা জেনেও আপনি আমাদের বাড়ী না উঠে এই দালাল চেয়ারম্যান বাড়ীতে উঠলেন কেন? আপনি আমাদের বাড়ীতে চলুন। মা-বাবার সাথে দেখা করবেন।

—লক্ষী ভাইটি, আজ আমি তোমাদের বাড়ী যাবনা। আর দেখ, আমি তোমাকে কত দূরে এনে কথা বলছি, আমি জেনেশুনেই দালাল বাড়ী উঠেছি। তুমি তোমার বাবা-মাকে আমার ছালাম দেবে। নূরু খুবই ভাল আছে এবং আশে পাশেই আছে। আমি ইচ্ছা করেই ওকে বাড়ী আসতে বারণ করেছি। ও বাড়ী আসলে এই দালাল চেয়ারম্যান তোমাদের হয়রানি করার সুযোগ পাবে। নূরুর কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে তোমার মা বাবা যেন শুধু বলেন 'আমরা জানিনা। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা পিতামাতার কথাবার্তা খুব বেশী শুনে না। তাই নূরুর ব্যাপারে আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই।'

নূরুর ছোট ভাই বায়না ধরলো, 'আমি মুক্তিবাহিনী হব। আমাকে মুক্তি-বাহিনীতে ভর্তি করে নিন। আমি আপনার সাথে থাকব। আমি আপনার মত হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'না ভাই, তা হয়না। তোমার বয়স অল্প। মুক্তিযোদ্ধা হ'তে গেলে তোমার আরও তিন বছর সময় চাই। অতদিন যদি যুদ্ধ চলে, তা হলে তুমি অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা হতে পারবে।' এ কথায় নূরুর ছোট ভাই দুর্বল হয়ে গেল, উৎসাহ স্তিমিত হল। তবুও সব শেষে সে আবদার করে বলল, 'সকালে আপনারা যখন যাবেন, আমি তখন আপনাদের পথ দেখিয়ে দেব।' তাতেও আপত্তি জানালাম। 'দেখ ভাই একেত আমার কাছে রাস্তা চেনার যন্ত্র আছে, তাছাড়া এই এলাকার সমস্ত রাস্তাঘাট আমার চেনা। সুতরাং আমাদের এগিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। তুমি বা তোমরা বারবার মুক্তি-যোদ্ধাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ কর এটা আমি চাইনা।'

চেয়ারম্যানের বাড়ীতে আমরা রাতটা জেগেজেগেই কাটিয়ে দিলাম। ভোর হয়ে এল, পাখি ডাকছে। মসজিদে ভোরের আজান শুরু হলো। আর একটু পরেই পূব দিগন্তে হবে সূর্যোদয়। সুতরাং আর বিলম্ব করা চলে না। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আঁধার আবরণ থাকতে থাকতে জামালপুর-মধুপুর পাকা রাস্তার পশ্চিম পাশে এসে পড়লাম। আমরা পাকা রাস্তা থেকে মাইল আড়াই পশ্চিমে মধুপুর থানার পাকসী ইউনিয়নের এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠলাম। বাড়ীর মালিক এক বিচিত্র চরিত্রের জীব।

বাড়ীতে উঠতে না উঠতেই একেবারে শস্যক্ষেতে ঢুকে পড়া গরু তাড়ানোর মত করে তিনি আমাদের তাড়াতে এলেন। লোকটির বিন্দুমাত্র ভাবনা চিন্তা নেই, তাঁর সামনে সাতাশ-আঠাশ জন সশস্ত্র মানুষ। তবুও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর

রূঢ় ভাষণের প্রথম কথা, 'আমি কোন মুক্তিবাহিনী-টাহিনী থাকতে দিতে পারব না। আর আপনারা জানেন না, এই ইউনিয়নে আমি এবং আমার চেয়ারম্যান হলাম গিয়া শান্তি কমিটির মেম্বার। আমরা দু'জনেই এই এলাকায় পাকিস্তানের খুঁটি। এই সব জেনেশুনেও আপনারা আমার বাড়ীতে উঠেছেন? আপনাদের সাহস তো কম নয়? আপনাদের সাহসের তারিফ না করে পারা যায় না।' অসন্তোষ, বিরক্তি আর উত্তেজনা প্রকাশ করে লোকটি বলে চললেন, 'জানেন, আমিও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছি। আওয়ামী লীগ করতাম। কিন্তু এখন আমি শান্তি কমিটির মেম্বার।' 'কত লোক রাজকারে ভর্তি করলাম। আমি আপনাদের ক্ষতি করতে চাইনা, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন।'

বিচিত্র মেম্বার

বাড়ীর মালিকের কথা আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে শুনলাম। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বললাম, 'এতগুলো সশস্ত্র লোক দেখেও আপনি যে ভাবে কথাগুলো বললেন, তাতে আমাকেও আপনার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। তবে আপনি কি মনে করেন আমাদের জোর করে তাড়াতে পারবেন? অথবা আপনার কথার ধাক্কায় আমরা আপনার বাড়ী থেকে চলে যাব?' এতে যেন বাড়ীর মালিকের সামান্য একটু পরিবর্তন ঘটলো। আমি আবার বললাম, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা মুক্তিবাহিনীর প্রতি আপনার এত আক্রোশ কেন?' এবার কিন্তু ভদ্রলোক স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। বললেন, 'দেখেন আপনাদের কিছুটা মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনী মনে হচ্ছে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীরা মিলিটারী আসার আগেই পালায়, এদের দিয়ে কিছু হবে? তাই আমি এতটা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছি। তবে যাই বলেন, কাদের সিদ্দিকীর একটা দল আছে, শুনেছি কাদের সিদ্দিকীর মুক্তিবাহিনী নাকি পালায় না, তারা জাহাজ মেরেছে। মধুপুরের ক্যাম্প দখল করেছে বলেও শুনছি। বাড়ীর মালিকের এ সমস্ত কথায় কিছুটা ভরসা পেয়ে বললাম, 'আমরাও কাদের সিদ্দিকীর দলের লোক।' কথাটা শুনেই লোকটি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বিস্মিত চোখে বললেন, অ্যাঁ! তাহলে আপনারা আমার বাড়ীতে থাকেন, কিন্তু আপনারা যে কাদের সিদ্দিকীর দলের লোক তার প্রমাণ কি? আমাকে প্রমাণ দিতে হবে।'

ভদ্রলোক প্রমাণ চান, প্রমাণ ছাড়া তিনি কি করেই বা বিশ্বাস করবেন যে আমরা কাদের সিদ্দিকীর দলের লোক? বিপদে পড়লে অনেকেই তো অনেক কথা বলে, অনেক অমুক্তিযোদ্ধাও 'কাদের সিদ্দিকীর দলের লোক' বলে পরিচয় দিয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করতে পারে। এক্ষেত্রেও তেমন হওয়া বিচিত্র নয়। তাই ভদ্রলোক মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয়ের প্রমাণ চান। কিন্তু আমরা কাদের সিদ্দিকীর দলের লোক, এটা কিভাবে প্রমাণ করবো? আমরা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনি কি কাদের সিদ্দিকীকে চিনেন?' তার সাফ জবাব, 'না, আমি কোন দিন কাদের সিদ্দিকীকে দেখি নাই।' এখন উপায়? প্রমাণ ছাড়া তিনি আমাদের থাকতে দিবেন না। কিছুতেই না। ইতিমধ্যেই অবশ্য বুঝে ফেলেছি লোকটার কথাবার্তা রুক্ষ হলেও মানুষ হিসেবে খারাপ নন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তাঁকে দেখেন নি, তাঁকে চিনেনও না। তাহলে আমরা যে তার দলের লোক তা কি করে প্রমাণ করবো?' গৃহকর্তা একটি প্রমাণের পদ্ধতি বাতলে দিলেন। তিনি বললেন, 'সিদ্দিকীকে

না চিনলে কি হবে, তাঁর হ্যান্ডবিল আছে না ? আমার কাছে তাঁর অনেক হ্যান্ডবিল আছে। তাতে সিদ্দিকী সাহেবের দস্তখত আছে। আপনারা যদি তাঁর লোক হন তাহলে তাঁর লেখা দেখান। তাহলেই চিনতে পারব।' আমার কাছে পরিচয়-পত্র নেই। যদিও অন্যান্য কমান্ডারদের জন্য পরিচয়-পত্র ইস্যু করতাম। কিন্তু আমি আমার পরিচয়-পত্র ইস্যু করি কিভাবে ?

অবশ্য এ সমস্যা নিয়ে আমাদের বেশীক্ষণ চিন্তা করতে হলো না। বুদ্ধিমান সহযোদ্ধা মকবুল হোসেন খোকা এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল। সে আমাকে একটু দূরে নিয়ে বললো, 'স্যার', পায়খানায় যাওয়ার ছল করে একটু দূরে গিয়ে পরিচয়-পত্র লিখে আপনার পকেটে রাখুন। পরে এসে লোকটিকে তা দেখালেই চলবে। মকবুল হোসেন খোকার পরামর্শ আমার মনঃপূত হলো। তাই করলাম। পরিচয়-পত্র পেয়ে লোকটি যেন আমাদের একেবারে আপন করে নিলেন। তাঁর বাড়িতে দুটি বাচ্চার গুটি বসন্ত হয়েছিল, তা সত্বেও তিনি অন্য বাড়ী থেকে রান্না করিয়ে আমাদের খাওয়ালেন।

এর পর শুরু হলো এক এক অদ্ভুত ব্যাপার ! খাওয়া শেষে লোকটি আমার কাছে এসে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন 'আচ্ছা, আপনারা কোন দিকে যাবেন ?' উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার বললেন, 'যদি পশ্চিমে যান তাহলে বেলা দু'টর আগে অথবা সন্ধ্যা ছ'টার পরে যেতে হবে। আর পূর্ব দিকে যদি যেতে চান—তাহলে সন্ধ্যার আগে কিছুতেই যাবেন না। বাড়ীর মালিকের কথায় কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম, 'কোন্ দিকে যাব, কখন যাব, কোথায় যাব, এসব আপনার জানার কথা নয়।' লোকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর ঘুরে এসে একই কথা বলতে লাগলেন। আমরা যেমন বাড়ীটির চারদিকে বহু দূর পর্যন্ত তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখছিলাম তেমনি বাড়ীর মালিক শান্তি কমিটির সদস্যটিও সমস্ত রাস্তার খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তাঁর নিজস্ব লোক লাগিয়ে রেখেছিলেন। যদিও এ বিষয়টি ঐ বাড়ী থেকে চলে আসার আগে পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারিনি।

কোন ভদ্রলোক বেলা দু'টার আগে বাড়ী থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে বলছেন তা জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমি বলতে পারব না। তবে আপনাদের চলে যাওয়া উচিত।' অনেক ভেবেচিন্তে তাঁর কথামত বেলা একটা-প'য়তাল্লিশ মিনিটে আমরা পশ্চিমে ভুয়াইল-কেন্দুয়ার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। লোকটাকেও সাথে নেয়া হলো। দু'জন ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধা বাড়ীর মালিককে সাথে করে আগে আগে চলল। তাদের প্রায় পাঁচশত গজ পিছনে ছয়-সাত জনের একটি অগ্রবর্তী দল। তার পরেই আমি, ছদ্মবেশী দু'জন মুক্তিযোদ্ধার কাছে দুটি রিভলবার। তাদের উপর নির্দেশ আছে, লোকটির আচরণ সন্দেহজনক লক্ষ করলে তৎক্ষণাৎ গুলি করবে। না, তিনি তেমন কিছু করেননি। আমরা প্রায় সাড়ে তিনটায় ভুয়াইল-কেন্দুয়া খেয়া পার হয়ে লোকটিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় দিলাম।

খেয়া পেরিয়ে আধমাইল দক্ষিণে এগুতেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল কেন বাড়ীর মালিক দু'টার আগে তার বাড়ী থেকে আমাদের যেতে বলছিলেন। আমরা মাত্র আধমাইল দক্ষিণে এসেছি। এমন সময় চার-পাঁচ'শ রাজাকার ও মিলিশিয়া

ডুয়াইল-কেন্দুয়া বাজারে এসে জ্বালাও পোড়াও শুরু করেছিল। ঐদিন চারটায় কেন্দুয়া বাজারে সরিষাবাড়ী থেকে যে হানাদাররা আসবে এটা ঐ শান্তি কমিটির সদস্যের জানা ছিল, তাই বিকাল চারটার আগেই ডুয়াইল-কেন্দুয়া অতিক্রম করতে আমাদের তিনি বারবার তাগিদ দিচ্ছেলেন। যদিও তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। এমনি করে নানা জনে, নানা ভাবে বাংলার স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন। মুক্তি-যোদ্ধাদের সাহায্য করছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান রেখেছেন।

বিচ্ছিন্ন অবস্থার অবসান

আমরা ঝাউয়াইল ভেঙ্গুলা নদীর পাশ দিয়ে দক্ষিণে যাচ্ছি, আর হানাদাররা প্রায় আধমাইল দূরে নদীর পূব পার দিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে। হানাদাররা তাদের সেদিনের অপারেশন শেষ করে ঘাঁটিতে ফিরছিল। আমরা আমাদের ঘাঁটির দিকে এগিয়ে চলেছি, আমি সেই বিচিত্র ও দুর্লভ চরিত্রের মেম্বারের বাড়ীতে থাকতেই খবর পেয়েছিলাম যে, হুমায়ুন কোম্পানীর অতিরিক্ত রসদ ও গোলাবারুদ হানাদারবাহিনী দখল করে নিয়েছে। আমাদের যুদ্ধ রসদ আমার সামনে দিয়েই জল্লাদ বাহিনী বয়ে নিয়ে যাবে—এটা কখনও ভাবতে পারিনি। অথচ অভাবিত ব্যাপারটিই ঘটল। আধ মাইল দূরে নদীর পূব পাশ দিয়ে গরুর গাড়ী বোঝাই করে হানাদাররা আমাদের রসদ নিয়ে গেল। চোখের সামনে দিয়ে আমাদের গোলাবারুদ নিয়ে যাচ্ছে—এ দেখেও কিছুই করার ছিল না। দশ-বারোটি গরুর গাড়ীতে নানা ধরনের প্রায় পাঁচ লক্ষ গুলি, পনের হাজার পাউণ্ড বিস্ফোরক, কয়েকশ ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন এবং তিন হাজার গ্রেনেড সহ আরও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম। সত্যিকার অর্থে এই প্রথম মুক্তি-বাহিনীর কাছ থেকে হানাদাররা গোলাগুলি ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলো।

হানাদাররা আমাদের দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেলে, আমরা আরো দক্ষিণে এগোলাম, এই সময় মানসিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি পেতে একটি মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতে সহকর্মীদের বললাম। পরদিন ২৫ কি ২৬শে সেপ্টেম্বর দুপুরে হেমনগর ইউনিয়নের একটি গ্রামে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো।

মিলাদ মাহফিলের জন্য ঝাউয়াইল বাজার থেকে কিছু মিষ্টি আনা হলো। আমার কাছে মাত্র আড়াই'শ টাকা ছিল। তা থেকেই মিষ্টি আনা হলো। তখন মিষ্টির দাম অবশ্য খুব একটা বেশী ছিল না। রসগোল্লা, চমচম ও সন্দেশের দাম ছিল যথাক্রমে দু' টাকা, আড়াই টাকা ও ছয় টাকা সের। কুড়ি-পঁচিশ টাকার মিষ্টি মিলাদের জন্য যথেষ্ট। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একজন মৌলবী পাওয়া গেল। মৌলবী দেখতে অতিশয় কদাকার কুৎসিত। গায়ের রং ভোটকা কালো। কোমর অবধি উঠানো কুর্তা, হাঁটুর সামান্য একটু নীচু পর্যন্ত লুঙ্গি ঝুলিয়ে মৌলবী সাহেব মিলাদ পড়াতে এলেন। মৌলবীকে দেখে প্রথমে আমি বীত-শ্রদ্ধ হলাম। অন্তর থেকে সম্মান শ্রদ্ধা বা ভক্তি করতে পারলাম না। কিন্তু মৌলবী যখন মিলাদের সুরা পড়তে শুরু করলেন, তখন মৌলবীর মধুর কণ্ঠ শুনে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি ইতিপূর্বে এত সুমধুর কণ্ঠে কোরান পাঠ শুনিনি। মৌলবী সাহেবের প্রতিটি সুরাই আমার মনে গভীর রেখাপাত করল। মিলাদ শেষে অশ্রুসিক্ত নয়নে মৌলবী সাহেবকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ভদ্রলোককে ডেকে আনার সময় মিলাদের পারিশ্রমিক হিসেবে পনের-কুড়ি টাকা দেব—ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু সুমধুর কণ্ঠে কোরানের আয়াত শুনে আর ঐ সামান্য পারিশ্রমিক দেয়ার কথা ভাবতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল, এমন সরল, স্নিগ্ধ ও মধুর কণ্ঠের অধিকারীকে

মিলাদ- মাহফিল

সমস্ত জগৎটা দিয়ে দিলেও তাঁর পূর্ণ মর্যাদা দেয়া হবেনা। অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে খালি হাতে মৌলবীকে বিদায় জানালাম।

মিলাদ শেষে আবার রওনা হলাম, শুরুতেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ঈশান কোণ কালো হয়ে তর্জন-গর্জন করে মেঘ ঘনিয়ে এলো। বৃষ্টি শুরু হলো, আমরা দৌড়ে গিয়ে ছোট্ট কয়েকটি শনের ঘরে আশ্রয় নিলাম। আমরা যখন বৃষ্টি থেকে বাঁচতে বাড়ীগুলোতে উঠি, তখন বাড়ীর মা-বোনেরা রান্নাঘরে ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে উঠতে দেখে একজন মা-বোনও কিছু মাত্র আপত্তি কিংবা অস্বস্তিবোধ করলেন না। ঘণ্টাখানেক মুষলধারে বর্ষনের পর বৃষ্টি কিছুটা কমল। আমরা কচুর বিরাট বিরাট পাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই আবার পথ চলার উদ্যোগ নিচ্ছিলাম। বাড়ীর মা-বোনেরা বারবার বললেন, 'বাবারা, তোমরা এই ভর সন্ধ্যায় কোথায় যাবে? এখানেই থেকে যাও।' ছোট্ট ঘর। নিজেদেরই থাকবার জায়গা নেই। শত অসুবিধা জেনেও তারা আমাদের থাকতে অনুরোধ করলেন। মুক্তি-যোদ্ধাদের অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্টকে বাংলার মা বোনেরা নিজেদেরই দুঃখ-কষ্ট বলে মনে করেছেন। গ্রাম বাংলার মেয়েদের মন-মানসিকতা শহুরে লোকদের মত অতটা কৃত্রিম নয়। নাগরিক জীবনে নানা সমস্যাজড়িত লোকদের আদর-আপ্যায়নের মধ্যে একটা আন্তরিকতার অভাব অনুভব করা যায়। গ্রামের লোকের আদর-আপ্যায়নের মধ্যে এখনো রয়েছে উষ্ণ অন্তরিকতার স্পর্শ। আমরা থাকলাম না বা থাকতে পারলাম না। বাড়ীর লোকজন ও মা-বোনদের অজস্র ধন্যবাদ ও সালাম জানিয়ে, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে কচুর পাতায় মাথা বাঁচিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আমরা যমুনা নদীর পূর্ব পারের ওয়াপদার বাঁধ ধরে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হচ্ছি। পাশের জমি থেকে বাঁধের উচ্চতা প্রায় পনের-কুড়ি ফুট। বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে টাংগাইলের পোড়া বাড়ী পর্যন্ত প্রায় একশ মাইল উত্তর দক্ষিণে লম্বা এই বাঁধ। অন্য দিকে যমুনার পশ্চিম পারেও এই বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় দু'শ মাইল। এই বাঁধ দু পাশের ঘরবাড়ী ও শস্যক্ষেত্রগুলোকে প্রবল বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র রক্ষাকবচ।

জামালপুরের ভ্যাবলা গ্রামে হানাদার বাহিনীর আক্রমণে মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে খুবই মর্মপীড়া ও অস্বস্তিবোধ করছিলাম। আমার অস্বস্তি ও মর্মপীড়ার বড় কারণ সামাদ গামা, পিন্টু ও ফজলুদের দলের কোন খোঁজ-খবর জানিনা। একটার পর একটা বাঁধা বিপদ যেন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছিল। সেই অবস্থাতে মিলাদ-মাহ্‌ফিল শেষ করে, সন্ধ্যার অল্প পরেই ওয়াপদার বাঁধ ধরে দক্ষিণে চলছিলাম। হঠাৎ আমার বাঁ পাশ থেকে কিছু একটা সরে যাওয়ার শব্দ অনুভব করলাম। নলিন বাজারের দেড় দু'শ মাইল উত্তরে থাকতে কিছু সরে যাওয়ার অনুভূতি পেয়ে সবাইকে থামিয়ে দিলাম। অগ্রগামী দলকে বারবার জিজ্ঞেস করলাম, আশে পাশে কোন কিছু দেখেছে, বা কারও চলাফেরা অনুভব করেছে কিনা? 'না', স্কট পার্টির চৌকশ দশজন যোদ্ধার একই কথা, তারা কারও চলে যাওয়ার শব্দ বা মানুষের কোন অস্তিত্বও অনুভব করেনি। আমার সন্দেহ দূর হয়না। পিছনের আরও পাঁচ জনকে আধ মাইল এগিয়ে রাস্তার দুই পাশে দেখে রিপোর্ট করতে নির্দেশ দিলাম। ফিরে এসে তারা

রিপোর্ট দিল—না, রাস্তায় কোন অস্বাভাবিক কোনকিছু অথবা মানুষের অস্তিত্ব নেই।

আবার চলতে শুরু করলাম। আমাদের অগ্রবর্তী দল ৫০০ গজ আগে চলেছে। দ্বিতীয় বার চলা শুরু করে মাত্র দু'শ গজ অগ্রসর হয়েছি, রাস্তার পাশ থেকে একজন সামনে এসে চুপ করে সামরিক কায়দায় ছালাম করল। এরকম একটা আকস্মিক অবস্থা ও ঘটনার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত ছিলাম না। চমকে উঠলাম। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। নিজেকে সামলে নিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে যাব, এমনি সময় আগন্তুক বললো, 'আমি হনুমান কোম্পানীর লোক। আমাদের কোম্পানী, স্যার, এখান থেকে আধামাইল দক্ষিণে আছে। আমরা আপনার আসার খবর পেয়ে অপেক্ষা করছিলাম।'

আমি তো অবাক! দু' দু'বার অগ্রবর্তী দলের সদস্যরা খুব তীক্ষ্ণভাবে রাস্তার উভয় পাশে দেখে ফিরে এসে রিপোর্ট করেছে, 'রাস্তা এবং রাস্তার আশে পাশে কিছুই নেই।' অথচ আমি কিছু একটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া অনুভব করছিলাম সেটা মিথ্যা নয়। আগন্তুকের একজন সাথী প্রায় তিন'শ গজ উত্তরে এসে অনুরূপ লক্ষ্য রাখছিল। সে আমাদের দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে ত্বরিৎ দক্ষিণে ছুটে যায়। মুক্তি-যোদ্ধাটি তার সাথীকে নিশ্চিত করে দিয়ে যায় যে, হ্যাঁ তাদের খবর নির্ভুল। এগিয়ে আসা দলটিতে স্বয়ং সর্বাধিনায়ক আছেন। তুমি আমাদের দলের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রথম স্বাগত জানাবে। আমি পিছনে গিয়ে কোম্পানী কমাণ্ডারকে খবর দিচ্ছি।

আমাদের কথা শেষ হতে না হতেই এসকর্ট পার্টির সাথে 'হনুমান কোম্পানীর' কমাণ্ডার হুমায়ুনের দেখা হলো। সে আমাদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসছিল। অগ্রবর্তী দলের খোকা এবং সামসু দৌড়ে এসে খবর দিলে, কোম্পানী কমাণ্ডার হুমায়ুন সামনে অপেক্ষা করছেন। তাকে আসতে দেয়া হবে কিনা?

—'হ্যাঁ, তাদের আসতে দাও।' মিনিট খানেক পর কোম্পানী কমাণ্ডার হুমায়ুন আবার সামনে হাজির হলো। যথারীতি ছালাম বিনিময়ের পর আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এবার হুমায়ুন এবং তার দল পথ-প্রদর্শক হিসাবে আগে চললো। পরে আমরা নলিন বাজারের কাছে একটি বাড়ীতে উঠলাম। নলিন-ঝাউয়াইল-ভেঙ্গুলা এলাকায় সপ্তাহ খানেক যাবত হুমায়ুন অবস্থান করছিল। তার লুকিয়ে রাখা অস্ত্র-শস্ত্র হানাদারবাহিনী নিয়ে গেছে, তা আগেই উল্লেখ করেছি। হুমায়ুনের ব্যর্থতা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেব, তা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। কোম্পানীর অন্যান্য সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে নানা ধরনের রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানী কমাণ্ডার হুমায়ুন কে গোলা বারুদ খোয়ানোর দায় থেকে অব্যাহতি দিলাম। শুধু তাই নয়, হুমায়ুন ও তার সহযোদ্ধাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'তোমরা ভাল ভাবে কাজ কর। অস্ত্র খোয়া যাওয়ার জন্য মন খারাপ করো না। অস্ত্র যোগান দেয়া আমার কাজ, যুদ্ধে ব্যর্থতা দেখালে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতাম। অস্ত্র খোয়ানোর জন্য আমি তা' করতে চাইনা। অস্ত্রের চাইতে সহযোদ্ধারা আমার কাছে অনেক মূল্যবান।' আমার কথা শুনে কোম্পানী কমাণ্ডার হুমায়ুন

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এসময় অতগুলো অস্ত্র খোয়া যাওয়ার জন্য অনুশোচনা ও শাস্তির ভয়ে সে দু'দুইবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। তারই সহযোদ্ধা সরিষাবাড়ীর নুরু ও আনোয়ারুল আলম শহীদের চাচাতো ভাই আবদুল করিম অস্ত্র খোয়া যাওয়ার পর তাকে সারাক্ষণ অনুসরণ করছে, এবং আত্মহত্যার প্রচেষ্টা থেকে তারাই তাকে বিরত রেখেছিল। তাই আমার কথায় কোম্পানী কমান্ডার হুমায়ুন নতুন জীবন পেল। অনুশোচনাও অনেকটা কেটে গেল, যদিও সঠিক ভাবে অস্ত্র লুকাতে ব্যর্থ হওয়ার কারনে অনেক দিন পর্যন্ত সে নিজেকে দারুণ অপমানিত বোধ করেছিল। হুমায়ুন কোম্পানী ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে তার পরিচয় রাখতে পারেনি। এ কোম্পানীর ক্রমিক সংখ্যা ছিল ৪৭-খ। জুলাই থেকে ৪৭-খ কোম্পানী বারবার হানাদারদের উপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। যুদ্ধে প্রভূত নৈপুণ্য ও সফলতা অর্জনে'র কারণে হানাদারদের কাছে এই কোম্পানী হনুমান লোক বলে পরিচিত হয়ে যায়, অক্টোবরের শুরু থেকে এই কোম্পানীর নাম ৪৭-খ থেকে "হনুমান কোম্পানী" হয়। মোটা বুদ্ধির হানাদাররা শেষ অবধি বিশ্বাস করতো যে, কাদের সিদ্দিকী একটি 'হনুমান কোম্পানী' গঠন করেছেন। হুমায়ুনের কোম্পানীকেই তারা "হনুমান কোম্পানী" বলে অভিহিত করত।

১৯৭১ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। রাত আনুমানিক আটটা। কমান্ডার হুমায়ুন আমার কাছে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করলো। আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে ব্যাপক গড়মিল দেখে তাকে বললাম, 'অস্ত্র খোয়া যাওয়ার ক্ষতি আমি স্বীকার করলেও আর্থিক লেনদেনের ত্রুটি কখনও সহজভাবে নেবনা। তোমার মনে রাখা উচিত, আমার অত্যন্ত প্রিয় সহকর্মী এবং তোমার চেয়ে অনেক বেশী সফল ও বয়োঃজ্যেষ্ঠ কোম্পানী কমান্ডার শওকত মোমেন শাজাহানকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আয়-ব্যয়ের ত্রুটি ও জনগণের উপর আদেশ সুচক চাহিদা-পত্র প্রেরণের অপরাধে পদচ্যুত করে বন্দী করা হয়েছিল। ভুল রিপোর্টে'র ভিত্তিতে তার উপর শারীরিক নির্যাতনও করা হয়েছে। একজন নিষ্ঠাবান সফল ও সাহসী কমান্ডার হওয়া সত্ত্বেও তাকে রেহাই দিতে পারিনি। সাবধান, কোন কোম্পানী কমান্ডারের অর্থসংগ্রহের কোন এক্তিয়ার নেই। তবু কোন সময় বিশেষ প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে সঠিক হিসাব নিকাশ অবশ্যই থাকা চাই। কমান্ডার হুমায়ুনকে আরও বললাম, 'কত অর্থ সংগ্রহ করা হল। কত খরচ হল এসব ব্যাপারে গুরুত্ব দেবার চাইতে আমি গুরুত্ব দিই, অর্থ কতটা ন্যায়সংগত ভাবে ব্যয়িত হয়েছে, এবং তার যুক্তিসংগত হিসাব আছে কিনা।'

কমান্ডার হুমায়ুন সামান্য টাকা আদায় এবং টাকা ব্যয়ও করেনি। নলিন ঝাউয়াইল ও ভেঙ্গুলা থেকে সাত দিনে সে একলাখ আশি হাজার টাকার উপর চাঁদা ও প্রায় কুড়ি হাজার জরিমানা আদায় করেছে। এর মধ্যে সে ছেষট্টি হাজার টাকা খরচ করেছে। কিন্তু টাকা সংগ্রহ ও ব্যয়ের সর্বাঙ্গীন ও লিখিত রিপোর্ট না থাকায় তাকে বিশেষ ভাবে সাবধান করে দিলাম। সমস্ত টাকা এবং কাগজপত্র হুমায়ুনের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'সাত দিনের মধ্যে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুষ্ঠু হিসাব তৈরি করে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবে। এর পরেও এ টাকা থেকে

সহযোদ্ধাদের প্রয়োজনে যুক্তিসংগত ভাবে খরচ করতে পার। আমি শুধু চাই সুষ্ঠু হিসাব এবং খরচের যুক্তিসংগত কারণ।'

সমস্ত অর্থ হুমায়ুনের হাতে তুলে দিয়ে ছোট্ট একটি কাগজে 'আমাকে দুই হাজার টাকা দেয়া হোক' লিখে নীচে স্বাক্ষর করে হুমায়ুনের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা নিলাম।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

নলিনের দু'মাইল পশ্চিমে জগৎপুরা চরের ধনেশ্বরী নদীর পারে আলি আকবরের বাড়ীতে উঠলাম। এই সময় অবিরাম তিনদিন ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় কোথাও বেরোতে পারলাম না। এই তিনদিন চল্লিশ জন সহযোদ্ধাসহ একবার মাত্র আড়াইসের চালের ভাত খেয়ে কাটাতে হল। তৃতীয় দিন ক্ষুধার জ্বালায় এতই কাতর হয়ে পড়লাম যে নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। আমাদের এ অবস্থা দেখে বাড়ীর মালিকের দয়া হলো, সে ঘরের কোণে রাখা ৭০০ সবরী কলার তিন-চার ছড়া নামিয়ে দিল। কলাগুলির কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা। কাঁচা পাকা প্রায় আশিটি কলা আমি একাই সাবাড় করে দিয়েছিলাম। যদিও কলাগুলি খুবই ছোট ছিল।

চতুর্থ দিনে আকাশ মেঘমুক্ত হতে শুরু করলো। ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে ঘর থেকে বেরোবার একটা উপায় হলো। আলি আকবরের হাতে এক'শ টাকা দিয়ে বললাম, 'দেখুন, আপনারাও পুরো তিনদিন না খেয়ে আছেন। আপনাদের যে চাল ছিল, তাতো প্রথম দিনেই আমাদের খাইয়েছেন। তাড়াতাড়ি বাজার থেকে চাল এবং অন্যান্য তরিতরকারী যা পাওয়া যায় এনে আমাদেরও দুটো খেতে দিন, আপনারাও খান, আমরা আর ঘণ্টাখানেক বা দু ঘণ্টার বেশী অপেক্ষা করতে চাইনা।' এই সময় অর্জুনার মজিবর মিয়া নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তাঁকে দুটি নৌকার ব্যবস্থা করতে বলা হলো। তিনি খুব খেটে খুটে এক ঘণ্টার মধ্যেই দু'টি নৌকা সংগ্রহ করে আনলেন। জগৎপুরার চরে তিনদিন না খেয়ে থাকার পর চতুর্থ দিন সকালে খাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

জগৎপুরা থেকে সোজা কয়েক মাইল পশ্চিমে শশুয়ার চরে এই প্রথম এলাম। শশুয়ার চরের স্বেচ্ছাসেবক কমাণ্ডার বাহাজ উদ্দীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের এম. এ. শেষ বর্ষের ছাত্র। ২৩শে জুন আমার সাথে তার মাত্র একবারই সাক্ষাৎ হয়েছিল। শশুয়ার চরে এসেই বাহাজ উদ্দীনকে ডেকে পাঠালাম। জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত উলট পালটই না হয়ে গেছে। কিন্তু বাহাজ উদ্দীন ও তার স্বেচ্ছাসেবক দলের সবাই ঠিক আছে। শশুয়ার চরটি সাত-আট মাইল উত্তর দক্ষিণে লম্বা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ও তিন-চার মাইল দূরে অবস্থিত। চতুর্দিকেই পানি আর পানি, মনে হয় চরটি যেন পানির উপর ভাসছে। মুক্তিবাহিনী যখন বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত তখনও বাহাজ উদ্দীন তার স্বেচ্ছাসেবকদল নিয়ে আগের মতই উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ও আশ্রয় দিয়েছে।

১৯৭১ সালের ২রা অক্টোবর খবর পেয়ে বাহাজ উদ্দীন পাগলের মত দৌড়ে নদীর

ঘাটে এল। একটু পরেই দু'তিনশ স্বেচ্ছাসেবক পঙ্গপালের মত ছুটে আসতে থাকে। আমাকে তারা নৌকা থেকে অতি যত্ন ও সম্মানের সাথে নামিয়ে নিল।

তারা সবাই আনন্দে উল্লসিত। চরের প্রত্যেকটি অধিবাসীর চোখ মুখ খুশীতে উজ্জ্বল। আমাকে নিজেদের এলাকায় নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা পরম ভাগ্যবান। সমাদরের কোন শেষ নেই। এই রকম ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সমাদর সম্ভবতঃ ধর্মীয় নেতারাই পান। রাজনৈতিক নেতা কিংবা যোদ্ধা অথবা অন্য কেউ এইভাবে উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধামেশানো ভালবাসা পেতে পারে তা' আমার ধারণায় ছিল না। শশুয়ার চরের স্বেচ্ছাসেবক ও জনগণের মিলিত আনন্দ ও উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ লিখে কাউকে বুঝানো আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

শশুয়ার চরের জনগণের অনুরোধ ও চাপাচাপিতে একটি সভায় বক্তৃতা দিলাম। স্বেচ্ছাসেবকরা আমাকে সামরিক অভিবাদন জানালো। চরের অধিবাসীরা ভালবাসা ও স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ একটি খড়ের টুপি ও একটি পাখা (চর এলাকায় খড় দিয়ে তৈরী) উপহার দিলেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি কামনা করে একটি মিলাদ-মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হলো। সারা দিন শশুয়ার চরে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর আবার মাল্লাদের স্রোতের অনুকুলে নৌকা ভাসাতে বললাম। এবার গন্তব্যস্থল সেই জাহাজ মারা ঘাট—মাটি কাটার চর।

১১ই আগস্ট কমান্ডার হাবিবের নেতৃত্বে হানাদারদের যে দুটি জাহাজ মুক্তি-বাহিনী দখল করেছিল—তা এর আগে আমি স্বচক্ষে দেখিনি। অবশ্য জাহাজ দুটি কত বড়, তা কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম। তবে ৩রা অক্টোবর প্রত্যূষে সামান্য কুয়াশার মধ্যে বহু দূর থেকে নদী মাঝে বট গাছের মত একটা কিছু দেখে সহ-যোদ্ধাদের জিজ্ঞাসা করলাম 'নদীর মাঝে ঐ বটগাছ দেখা যাচ্ছে কেন?' সহযোদ্ধা দুলাল আমার ভুল ভেঙে দিয়ে বললো, 'স্যার, ঐ যে নদীর মাঝখানে কালো বিরাট পাহাড়ের মত দেখা যাচ্ছে, ওটা গাছ নয়। ওটাই আমাদের হাতে বিধ্বস্ত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ।' উল্লেখ্য আমার সহযোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র ভুয়াপুরের দুলালই জাহাজ মারার সময় কমান্ডার মেজর হাবিবের সঙ্গে ছিল। দুলালের কথা শুনে দূরবীন চোখে তুলে নিলাম, দূরবীন দিয়ে ভালো করে ভাঙাচোড়া জাহাজ পরিস্কার দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলাম। সেই আগস্ট থেকে এত দিন পর্যন্ত জাহাজ দুটি সম্পর্কে যত কল্পনাই করেছি, তা সবই ছিল একেবারেই অপ্রতুল। জাহাজ দুটি যে কত বড় তার অর্ধেকও আমি অনুমান করতে পারিনি। কাছে গিয়ে জাহাজ দেখার কৌতুহল হাজার গুণ বেড়ে গেল। আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছিলাম না। দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের কাছে যেতে চাচ্ছিলাম। পাহাড়ের মত বিরাট জাহাজ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দেড় ঘন্টা পর জাহাজের কাছে নৌকা পেঁছিল। জাহাজ দুটি এত বিরাট ছিল যে দশ-বার মাইল দূরে থেকে তা খালি চোখে দেখা যেত। ভোরে কুয়াশার কারণে সাত-আট মাইলের মধ্যে এসেও আমরা জাহাজটা ভাল ভাবে দেখতে পারছিলাম না। জাহাজ দুটির কাছে এসে দেখলাম এতো জাহাজ নয় এ যেন দোমড়ানো লৌহস্তূপ, লৌহ পাহাড়। গোলার আঘাতে

মাটিকাটা চরে

আঘাতে প্রায় দু'তিনশ ফিট লম্বা দু'খানা অতিকায় জাহাজের ধ্বংসাবশেষ ধলেশ্বরীর বুকে মুখ থুবড়ে পড়ে থেকে পাক হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহজটির চার পাশে ঘুরে ঘুরে আমাদের সবার বুক আনন্দ ও প্রত্যয়ে ভরে উঠেছিল। জাহাজ দেখা শেষে আবার দক্ষিণে অগ্রসর হলাম।

নিকড়াইল স্কুলের পাশে আমাদের নৌকা বাঁধা হলো। আমার মন আনন্দে ভরপুর, গৌরবে উদ্দীপ্ত। জাহাজ সম্পর্কে নানা অনুভূতির রেশ তখনো কাটেনি। এমন সময় খবর এলো, পিংনার কাছে দু'দিন আগে আবদুল হাকিম এসে পেঁছেছে। সে আমার সাথে দেখা করতে নিকড়াইলে এসেছে।

নিকড়াইলে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আমরা নিকড়াইল ঘাটে এসেছি, এই খবর পেয়ে মেজর আবদুল হাকিম তার লোকজন নিয়ে উল্কা বেগে ঘাটপাড়ে ছুটে এলো। কাছে আসতেই হাকিমকে জাপটে ধরলাম। হাকিমের পাশে দাঁড়ানো পিন্টু। পিন্টুর দিকে চোখ পড়তেই আমার দেহ ও মনে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। হাকিমকে ছেড়ে পিন্টুকে জাপটে কোলে তুলে নিয়ে ধপ্ করে ছেড়ে দিয়ে, উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পিন্টু, তুই হাকিমের সঙ্গে কেন? বাকীরা কোথায়? আমরা সরে যাবার পর তাদের কি হয়েছিল?' হাঁপাতে হাঁপাতে এক নিশ্বাসে অনেকগুলো প্রশ্ন করলাম। পিন্টু আদিঅন্ত ঘটনা বর্ণনা করলো, যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেবল অনুল্লেখ ছিল যে, পিন্টুদের দলের অপারেটর সহ দু'টি ওয়ারলেস সেট ভ্যাবলার বিপর্যয়ে খোয়া যাওয়ার কথা।

পিন্টুকে পেয়ে আনন্দে উন্মাদ হয়ে উঠলাম। সব হারিয়ে আবার একে একে সব ফিরে পেতে শুরু করেছি। পিন্টু ও মেজর হাকিম অন্যান্যদের সাথে কথাবার্তার সময় আরও একটি লোভনীয় খবর এলো। ৭ই সেপ্টেম্বরের পর আনোয়ারুল আলম শহীদ এক সপ্তাহের মধ্যে আস্তে আস্তে হেড কোয়ার্টার তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছিলেন। হেড কোয়ার্টারের বিশেষ দূত দু'তিন দিন আগে আমার খোঁজে পশ্চিমাঞ্চলে এসেছিল। হেড কোয়ার্টারের খবর ছিল আমি দেশের ভিতরে প্রবেশ করেছি এবং পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করছি। হেড কোয়ার্টারের দূতের কাছে পূর্বের উল্লেখিত সমস্ত ঘটনা শুনে এবং একটি লিখিত রিপোর্ট পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। আমি তখন নিজেকে আর সামলাতে পারছিলাম না। নিয়তির বিধানই এই। চরম উৎকণ্ঠা ও বেদনার পরই নেমে আসে পরম আনন্দ, শান্তি ও তৃপ্তি। এখানেও তাই হ'লো। আমাদের কুশল সংবাদ সহ হেডকোয়ার্টারের সবার প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে ছোট্ট একটা বার্তা সহ দূতকে পাঠিয়ে দিলাম।

৩রা অক্টোবর। সন্ধ্যায় নিকড়াইল থেকে আরও কয়েক মাইল ভাটিতে গিয়ে জোগার চরের পশ্চিমে বারই পোটল চরে ঘাঁটি গাড়া হলো। এবং দ্বিতীয় বার যুদ্ধ পরিকল্পনা করা হলো। আমি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি প্রায় পনের-ষোল দিন হয়ে গেছে। এরমধ্যে কয়েকদিন সবার থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিলাম। ৩রা অক্টোবর থেকে স্বাভাবিক যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু হলো।

ভারত থেকে বারই পোটল চরে মোয়াজ্জেম হোসেন খান এসে হাজির হলেন। সে এসেই বললেন, 'স্যার, আমি নয়শত ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে এসেছি। আমিতো স্যার, ভারতে আপনার রাষ্ট্রদূত। এবার আমাকে যে ধরনের কাজ দেবেন সেটাই করবো। এই যে ব্রিগেডিয়ার সান সিং আপনাকে একখানা পত্র দিয়েছেন।' —বলেই সসম্মানে পত্রখানা আমার হাতে তুলে দিলেন, মোয়াজ্জেম হোসেন খান এখন যেন গর্বে ফেটে পড়ছিলেন। আমি দেশে প্রবেশ করার পর মোয়াজ্জেম হোসেন খানই প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সহ ভারতে টেনিং প্রাপ্ত নয়'শ মুক্তি যোদ্ধা নিয়ে প্রথম এসেছেন। এতে তার গর্ব যেন হাজার গুণ বেড়ে গেছে। আর সত্য কথা বলতে কি পুরোটা মুক্তিযুদ্ধে তিনি গর্ব অনুভব করার মত কাজই করেছেন।

মোয়াজ্জেম হোসেন খান যখন এলেন তখন কয়েকজন কমাণ্ডার নিয়ে নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিলাম। মেজর হাকিম জাহাজ মারা দুর্ধর্ষ কমাণ্ডার মেজর হাবিব, হনুমান কোম্পানীর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন হুমায়ুন, মেজর আংগুর, মেজর আরজু, সরিষাবাড়ীর মেজর আনিস, বামন আটার হাবি, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ সরিষা-বাড়ীর লুৎফর রহমান, গোপালপুরের মেজর তারা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কোম্পানী কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন রেজাউল করিমকে নিয়ে পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। এবং সিদ্ধান্ত হয়, ৭ ই অক্টোবর রাতে টাংগাইল ময়মনসিংহ সড়কের একটি সেতু ধ্বংস এবং ভুয়াপুর ও গোপালপুর এ দুটি থানা পূর্ণ দখল নিতে হবে। আক্রমণের ফলাফল কি হয় তা জেনে যেতে মোয়াজ্জেম হোসেন খানকে দু'এক দিন অপেক্ষা করতে বলা হলো।

অপারেশন ট্রায়ো

৭ই অক্টোবর, ১৯৭১ সাল। পবিত্র শবেবরাতের রাত, প্রতিটি মুসলমানের কাছে শবে বরাতের রাতটি খুবই পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মনে করেন শবেবরাতের রাতে আল্লাহর দরবারে প্রতিটি মানুষের পরবর্তী বছরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। তাই শবে বরাতের রাতে প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সারারাত ইবাদত বন্দেগী করে বিনিদ্ররজনী কাটিয়ে দেন। ৭ই অক্টোবর রাতে আমরা আর একটি মিলাদ মাহফিলের ব্যবস্থা করতে পাশের গ্রামের স্বেচ্ছাসেবক কমাণ্ডারকে নির্দেশ দিয়েছিলাম।

পবিত্র শবে বরাতে মুক্তিযোদ্ধারা একটি মিলাদের আয়োজন করেছে। অনেক হিন্দু ও দুই এক জন খৃষ্টান সহযোদ্ধাও মিলাদ মহফিলে বসেছে। অন্য সহযোদ্ধারা ইচ্ছে করলে আলদা ভাবে যাতে সময়টা কাটাতে পারে—সে রকম ব্যবস্থাও করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার জনৈক মৌলবীকে নিয়ে এসেছে। শুরু হলো মিলাদ মাহফিল, মৌলবী রসুলে করিম (দঃ) মের চরিত্র ও কর্মময় জীবনী নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে শুরু করলেন: ছ-সাত দিন আগে অনুষ্ঠিত ঝাউয়াইল ভেঙ্গুলার মিলাদ মাহফিলের মৌলবীর মতই এ মৌলভীও আবেগময় কণ্ঠে দোয়া দরুদ পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মুগ্ধ করে ফেললেন, মিলাদ শেষে মোনাজাতের জন্য মৌলভী আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

শবেবরাত উদ্‌যাপন

মোনাজাতের আগ পর্যন্ত দোয়া দরুদ করে মৌলভী সবাইকে মুগ্ধও অভিভূত করে ফেলেছিলেন, কিন্তু মোনাজাতের সময় তিনি একটি অভাবনীয় কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন। হাত তুলে অনেক সুরা পড়ে যখন বাংলায় বলা শুরু করলেন, 'হে পরম করুণাময় আল্লাহ, তুমি পাকিস্তানের দুশমনদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর। তুমি সকলকে ঈমান দাও, পাকিস্তানকে বালা মুছিবত থেকে বাঁচাও। ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সাহায্য কর, হে আল্লাহ গো আমাদের পাকিস্তানের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জেহাদ করার তৌফিক দাও। (আল্লাগো বলে কেঁদে বুক ভাসিয়ে) এরা যে উদ্দেশ্যে হাত তুলেছে সেই উদ্দেশ্য সফল কর। তাদের তুমি জয়ী কর। তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।' এই সময় আমার পাশে বসা স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিল! তার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা, সর্বনাশ! মৌলবী করছে কি? মুক্তিবাহিনীর মিলাদে হানাদারদের সফলতা কামনা করছে? পাক-দুশমনদের খতম কামনা করছে? নির্ঘাত মৌলবীর গর্দান যাবে।

মৌলবীর আজব মোনাজাত

মিলাদ মাহফিলের মৌলবী কিন্তু মোটেই জানতেন না যে তিনি যাদের মাঝে বসে

মিলাদ পড়ছেন—তারা কারা ? পাকসমর্থক না মুক্তিবাহিনী, তাই অত্যন্ত নিঃসংকোচে দরদ দিয়ে পূর্বোল্লেখিত কায়দায় মোনাজাত করলেন। মোনাজাত শেষে মৌলবীর সাথে মোসাভা করলাম। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার তখনও কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত। মৌলবীকে মোনাজাতের জন্য কিছু বললাম না। বরং যথাযথ সম্মান দেখিয়ে কুড়িটি টাকা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারের সাথে ছোট্ট ডিঙ্গিতে নামিয়ে দেয়া হলো।

পরের দিনের ঘটনা। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার দুরু দুরু বুকে সাহসে ভর করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'গতরাতে মৌলবী অমন মোনাজাত করার পরও কেন কোন প্রতিক্রিয়া দেখলাম না।' আমরা তখন বিজয়ী, মিলাদ শেষে একটি অপারেশনে গিয়ে ছিলাম। সফল অপারেশন শেষে ফিরে এসেছি। হাসতে হাসতে বললাম, 'মৌলবী তো কোন ভুল করেনি, সেতো আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দোয়াই করেছিল। আর তাতে তো আমরা জয়ী হয়েছি। তাই ঐ অবুঝদের নিয়ে অত মাথা ঘামানো উচিত নয়। লোকটা যদি জানতো আমরা মুক্তিবাহিনী—তাহলে আমাদের জন্য খোদার দরবারে মোনাজাত করে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফেলতো। আমি মোনাজাতের সময় মৌলবীর অনুসরণ করিনা। হাত উঠিয়ে আমার মন-যা বলে আমি তাই কামনা করি। আল্লাহুর কাছে আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের কি চাইবার আছে তিনি তো সবই জানেন। তাই কি চাইবৃ ? আল্লার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

এখন দুটি বিয়োগান্ত ঘটনার উল্লেখ করছি। ২৩শে জুন ভুয়াপুর থেকে লাবিবুর কোম্পানী নাগরপুর আক্রমণে যাচ্ছিল। সেখানকার রাস্তার সাথে পরিচিত দাবী করে জাহাঙ্গীরও তাদের সাথী হয়েছিল, দুজনই টাংগাইলের স্বদলীয় বিশ্বাস-ঘাতকদের হাতে নিহত হয়। এরাই টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহীদ। ঠিক এমনি একটি বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটলো ৭ই অক্টোবর রাতে। তবে পূর্বের মত স্বদলীয়দের হাতে নয়—যুদ্ধক্ষেত্রে হানাদারদের গুলিতে। ঘটনাটি এই রকম : ভুয়াপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল কুদ্দুস আমার বহুদিনের ছাত্র সহকর্মী। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে আমার সহযোদ্ধা, জুন মাস থেকে আবদুল কুদ্দুস আমার সর্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল। এমনকি মাকড়াই-এর বিখ্যাত যুদ্ধ, তারপর ভারত গমন ও প্রত্যাগমন সর্বসময় সে আমার দলভুক্ত ছিল। কিন্তু ৭ই অক্টোবর দুপুরে যখন ভুয়াপুর গোপালপুর থানা পূর্ণ দখলের পরিকল্পনা হলো, তখন আবদুল কুদ্দুস বিনীত অনুরোধ করলো, 'স্যার, যারা ভুয়াপুর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন আমি তাদের সঙ্গী হয়ে আক্রমণে অংশ নিতে চাই। ভুয়াপুর থানা আক্রমণ ও দখলের যুদ্ধে অংশ গ্রহণে শুধুমাত্র একদিনের জন্য ছেড়ে দিলে আমি চিরঋণী থাকবো।' থানা দখলের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আবেদন জানিয়ে আব্দুল কুদ্দুস আরও বললো, 'স্যার, আপনি তো জানেন, অনেকদিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি। সেই আন্দোলনই আজ স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। আমার নিজের থানা শত্রুমুক্ত করার যুদ্ধে অংশ নিতে পারব না—এমন শাস্তি আমাকে দিবেন না। আপনি দয়া করে, থানা দখলের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন।' এরপর আমার আর কিছু বলার থাকেনা। কুদ্দুসকে অনুমতি দিতে হলো। মুক্তিযোদ্ধারা থানাও দখল করেছিল। কিন্তু কুদ্দুস আর ফিরে আসেনি।

রাতের ঘটনায় ফিরে আসছি। মিলাদ শেষে, '৭১ সালের শবে বরাতের রাতটা কিন্তু আমরা আল্লার দরবারে এবাদত ও কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিইনি। রাতে সেতু আক্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

জোগার চর থেকে দুটি নৌকায় এলেঙ্গার কাছে এসে নামলাম। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দু'মাইল পাড়ি দিয়ে ফুলতলা গ্রামের ভিতর দিয়ে নিরাপদে ফুলতলা ব্রীজের কাছে পৌঁছে গেলাম। রাত তখন আনুমানিক দু'টা, আমরা উত্তর দিকে রাস্তার উপর উঠে সোজা পুলে আঘাত হানলাম। আমার সহযোদ্ধারা এমনিতেই খুব পারদর্শী, তার উপর আমি তাদের একেবারে পাশে। ফুলতলা সেতু দখল আমাদের কাছে ডাল-ভাত, পনের মিনিটের এক তরফা গুলিতে ফুলতলা সেতুর এক অংশের পতন ঘটলো। কিন্তু সমস্যা ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালো একজন মিলিশিয়া। সে একটি বাংকার থেকে অনবরত লাইট মেশিন গানের গুলি বর্ষণ করে চলেছে। সেতুটির উত্তর অংশ মুক্ত হলেও দক্ষিণ অংশ দখল করা যাচ্ছিল না। এই সময় সহযোদ্ধা মকবুল ছুটে এসে বললো, 'স্যার, আমারে যদি পারমিশন দেন, তাহলে ঐ শালার বাংকারে গিয়ে গ্রেনেড মারি।' 'তুই পারবি' বলে অনুমতি দিলাম। মকবুল সেতুর উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে মিলিশিয়াটির বাংকারে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করলো। আগেও প্রায় একশ খানা গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে। হাত বোমার শব্দে মাঝে মধ্যে সমগ্র এলাকাটি প্রচন্ড ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু মকবুলের হাতে বোমা যেন আগের সব বোমার শব্দ ও কাঁপনকে হার মানিয়ে দিল। হাত বোমা বিস্ফারিত হওয়ার সাথে সাথে এল. এম. জি. বন্ধ হয়ে গেল এবং হাত বোমার আঘাতে বাংকারে মিলিশিয়াটির দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পুল পুরোপুরি মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে গেল। এই একজন মিলিশিয়াকে মারতে বা স্তব্ধ করতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় দশ মিনিট লেগেছিল।

ফুলতলা সেতু ধ্বংস

ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ বিস্ফোরক লাগানো শুরু করে দিল। বিস্ফোরক লাগানো শেষ হলে দেখা দিল আরেক বিপত্তি। পুলের ঠিক নীচে গলা সমান পানিতে কয়েকজন রাজাকার ঘাপটি মেরে বসে আছে। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের দেখে চিৎকার করে উঠলো, 'বেটা শয়তানরা। বাঁচতে চাস ত তাড়াতাড়ি ভাগ।' বেকুব, হতচকিত রাজাকাররা করুণ কণ্ঠে বললো, 'আমরা যুদ্ধ করি নাই। আমাগো মাফ করেন। আমরা কিছু করি নাই। মাফ চাইতাছি।" মুক্তিযোদ্ধারা চিৎকার করে বললো, 'বেটারা পালা এক্ষুণি পুল ভেঙে পড়বে।' (পুল ভাঙতে বা ভেঙে পড়তে তো রাজাকাররা দেখেনি। তাই ঠিক আন্দাজ করতে পারছিল না।) মুক্তিযোদ্ধাদের ধমক খেয়ে কাকুতিমিনতি করতে করতে তারা পুলের নীচ থেকে সরে গেলে সাথে সাথে পুলে বিস্ফোরণ ঘটানো হলো।

আমার নিজের দলের এটা তৃতীয় বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণে সেতুটি সম্পূর্ণ ধসে গেল না। দেড়-দু' ফুট নীচু হয়ে সেতুর মাঝখানের চার পাঁচ ফুট ভেঙে পড়ল। অতিরিক্ত বিস্ফোরক না থাকায় সেতুটি পুরোপুরি ধ্বংস করার বিষয় নিয়ে আমরা

আর মাথা ঘামালাম না। ৪ খানা রাইফেল ও একখানা এল. এম. জি. বগলদাবা করে যখন সরে যাবো—ঠিক তখন মুক্তাগাছার মকবুল বলল, 'স্যার, পুলের ওপাশে রাজাকারদের টিনের ঘরটা জ্বালাইয়া দিয়া আস।' মকবুলের প্রস্তাবটা খুবই লোভনীয়, অনুমতি না দিয়ে পারলাম না। মকবুল সহ চার-পাঁচ জন যোদ্ধা দৌড়ে গিয়ে রাজাকারদের পঞ্চাশ-ষাট হাত লম্বা ছাপড়া ঘরের উত্তর পাশে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আমি দ্রুত রাজাকারদের জ্বলে ওঠা ঘরে গেলাম। উদ্দেশ্য—ভস্মীভূত হওয়ার আগে ঘরে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু না! কোন কাগজপত্রের বালাই নেই। তবে কাঁথা, বালিশ, কম্বল, চেয়ার, টেবিল, আলমারী, ঘড়ি ইত্যাদি কোন কিছুর অভাব নেই। হঠাৎ দেখলাম ঘরের মাঝখানে একজন লোক পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখলাম লোকটির হৃদক্রিয়াও স্বাভাবিক চলছে। প্রথম মনে করেছিলাম লোকটির গুলি লেগেছে। না তার কিছুই হয়নি। আক্রমণের সময় সবাই যখন পালিয়ে যাচ্ছিল—তখনও সে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠে সবাইকে পালিয়ে যেতে দেখে সে না পালিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। পুলে প্রচন্ড বিস্ফোরণের সময়ও সে নড়াচড়া করেনি। তার ধারণা ছিল পুল ভেঙে মুক্তিবাহিনী চলে যাবে সে ততক্ষণ ঘুমের ভান করে কাটিয়ে দেবে। বাইরে আগুন, ঘরেও আগুন, চারিদিকে মুক্তিবাহিনীর আনাগোনা। এতসব দেখেও সে পালায়নি বা পালাবার চেষ্টা করেনি। হাঁদা রাজাকারটিকে বেত দিয়ে খোঁচা মারলাম। তখনও বেটার নড়াচড়া নেই। বললাম, 'বেটা শয়তান, ঘুমের ভান করছিস্? ঘরে আগুন জ্বলছে। পুড়ে ছাই হবি। মুসলমানের ছেলে, পুড়ে ছাই হলে ধর্ম যাবে। বেটা ওঠ, তোদের সবাই পালিয়েছে, তুইও পালা। বলেই রাজাকারের পিঠে সপাং সপাং কয়েক ঘা বেত বসিয়ে দিলাম। বেতের আঘাতে বেটা রাজাকার ঘুম ভাঙার ছুতো খুঁজে পেলো। বেত খেয়ে লাফিয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'এঁ্যা! কি হইছে? আমারে মাফ করেন। আমি কোন দোষ করি নাই।' রাজাকারটির পিঠে আরও কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'যা, ভাগ্'। রাজাকারটি পড়িমড়ি করে ছুট দিলে, আমরা সফল অভিযান শেষে রাত চারটায় কমান্ডার আমান উল্লার এলেঙ্গা-হাকিমপুরের বাড়ীতে এলাম।

হাকিমপুর. আমান উল্লাহর বাড়ী, অতীতে বহুবার এসেছি। তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম এলাম। আমাকে দেখে আমান উল্লাহর বাবা, চাচারা এবং বৃদ্ধা দাদী বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়লেন। অন্যদের মত এ পরিবারের সবাই শুনেছিলেন, আমার গুলি লেগেছে। তাই দাদীর নজর আমার কোথায় গুলি লেগেছে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি গুরুতর কোন আঘাতের দাগ খুজে পেলেন না। বারে বারে আমার শরীর হাতিয়ে দাদীর হয়তো মনে হলো, তাদের চেনা, প্রিয় বন্ধু আগের চেয়ে আরও সহজ সরল ও বলিষ্ঠ হয়েছে। আমান উল্লাহর বাবা ময়েজ সরকার ও চাচা ওমর আলী আমাকে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। তাঁরা একেবারে আত্মহারা। আমাকে তাঁরা সবাই নিজেদের ঘরের ছেলের মত মনে করতেন ও ভালবাসতেন। আমি এখনও তাঁদের ঘরের ছেলের মত রয়েছি কিনা—

সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু সেই বন্ধু একই রয়েছে দেখে তাঁরা খুশীতে কাঁদবেন না হাসবেন, বুঝতে পারছিলেন না। তবে খুশীতেই হোক আর বেদনায়ই হোক, বাড়ীর প্রতিটি নারী পুরুষের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

বাড়ীর উঠানে বসে কথাবার্তা শেষ করে ভোরের আলো না ফুটতেই বেরিয়ে পড়বো এমন সময় ঐ গ্রামেরই দুইটি ছেলে ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমানের কোম্পানী থেকে সিগন্যাল নিয়ে এলো। সদর দফতর ক্যাপ্টেন ফজলুর উপর দায়িত্ব দিয়েছে, সর্বাধিনায়ক সদর দফতরে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি কখন কোথায় আছেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য যেন নিয়মিত সদর দফতরে সরবরাহ করেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর দুই দূত রাতে আইসড়া থেকে হাকিমপুরে এসেছে। আর পাঁচ মিনিট পরে এলে হয়তো দূতদ্বয় আমার দেখা পেতো না। তারা সদর দফতরের বিশদ খবরাখবর ও সদর দফতরের প্রধান কর্মকর্তার একটি লিখিত পত্র আমার হাতে তুলে দিল। আমিও ভারত থেকে ফেরার পর দ্বিতীয় বার সংবাদবাহকের হাতে সদর দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তাকে একটি লিখিত নির্দেশ পাঠালাম, 'আমি এক সপ্তাহের মধ্যে সদর দফতরে আসার একদিন আগে তারিখ ও মোটামুটি একটা সময় জানাবো। আমার অনুপস্থিতির সময়ের একটা পরিপূর্ণ রিপোর্ট তৈরী রাখতে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর আভ্যন্তরীণ কাজকর্মে হাত দেয়ার আগে পাহাড়ী এলাকার জনগণের সামনে হাজির হতে চাই। এ জন্য খুব অল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে যাতে একটা জনসভা করা যায়, এমন ব্যবস্থা রাখতেও বলা হচ্ছে।' দূত দুজন ভোর না হতেই ছুটলো পূর্বদিকে, আমরা প্রশান্ত ও উৎফুল্ল মনে চললাম পশ্চিমে। গন্তব্যস্থল যোগার চর, যেখানে শবে বরাতের রাতে মিলাদ পড়েছিলাম। সেই সেখানে এবং সেই নৌকায়।

হেডকোয়ার্টারের সাথে সংযোগ

৮ই অক্টোবর। দুপুর একটা পেরিয়ে গেল। কোন সিগন্যাল এলো না। ভুয়াপুর এবং গোপালপুর অভিযানের সংবাদের আশায় ছট্ ফট্ করছি। মোয়াজ্জেম হোসেন খান বারবার বলছেন, 'স্যার, আমাকে অনুমতি দিন। আমি একদৌড়ে ভুয়াপুর গিয়ে সমস্ত খবর নিয়ে আসি।' তাঁর কথায় মনে হতে পারে ভুয়াপুর যেন হাতের কাছে, দু'চার'শ গজের মধ্যে। আদতে কিন্তু তা মোটেই নয়। যোগার চর থেকে ভুয়াপুরের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। ঘড়ির কাঁটা ঠিক দুটার ঘরে। এমন সময় উত্তর দিক থেকে দশ-বারো জনকে একটি লোকের পিছে ছুটে আসতে দেখা গেল। লোকগুলো আমাদের পাশ কাটিয়ে যোগার চর খেয়াঘাট পেরিয়ে গেল। আগে আগে ছুটে পালানো লোকটি খেয়াঘাট পার হয়েই স্থানীয় জনসাধারণের হাতে ধরা পড়ে গেল। লোকটি ধরা পড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল উত্তর দিক থেকে আরো তিন-চার জন দৌড়ে আসছে। তাদের হাতে এবং কাঁধে হাতিয়ার। অস্ত্রসহ লোকজন আসতে দেখে আমরা সতর্ক হয়ে গেলাম। লোকগুলো একটু কাছে আসতেই তাদের চিনতে পারলাম। তারা মুক্তি বাহিনীর সদস্য। চিৎকার করে ডাক দিতেই আমাদের নৌকা থেকে প্রায় দু'শ গজ

বিজয় সংবাদ

দূরে তারা থমকে দাড়ালো। 'এই দিকে আস' দ্বিতীয়বার আহ্বানের পর তারা সন্দেহমুক্ত হয়ে নৌকার দিকে ছুটে এলো। কিন্তু নৌকাতে আমি আছি, এটা ঐ চারজন মুক্তিযোদ্ধা কল্পনাও করেনি। আচমকা আমাকে দেখে তারা প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। দৌড়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তারা প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল, 'গত রাত একটায় ভুয়াপুর মুক্ত হয়েছে। প্রায় সত্তর-আশি জন রাজাকার ধরা পড়েছে। আমাদের দুই জন শহীদ হয়েছেন। এই দিকে ভুয়াপুর রাজাকার বাহিনীর সহকারী কমাণ্ডার পালিয়ে এসেছে, তাকে ধরতে আমরা ছুটে এসেছি।'

অন্যদিকে স্থানীয় জনসাধারণ ও স্বেচ্ছাসেবকরা পালিয়ে আসা যুবকটিকে ধরে আমাদের নৌকার কাছে নিয়ে এলো। যুবকটিকে দেখেই চিনতে পারলাম। যুবকটি বড়ভাই লতিফ সিদ্দিকীর অতিঘনিষ্ঠ ও প্রিয় শিষ্য সল্লার মজনুর স্ত্রী সানুর চাচাতো ভাই। ডাকনাম খোকা, আমি যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি মিঞা রাজাকার হয়েছ? খোকা কান্নায় ভেঙে পড়লো। ছুটে পালিয়ে আসায় সে তখনও হাঁপাচ্ছে, স্থানীয় জনসাধারণের হাতে ধরা পড়েছে। নিশ্চয়ই জান যাবে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। সামনে আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো, হয়ত বাঁচার একটা ক্ষীণ আশাও সেই সাথে তার মনে ঝিলিক দিয়েছিল। মানুষ তৃণখণ্ড ধরেও বাঁচতে চায়। খোকার অবস্থাও তাই হলো। কাঁপতে কাঁপতে কান্নাজড়িত কণ্ঠে অনুনয় করে বললো, 'ভাইজান; আপনে ত আমাগোরে ভাল কইরাই চিনেন। কি করমু? চেয়ারম্যান আমারে জোর কইরা রাজাকারে ভর্তি কইরা দিছে?' আমি ক্রুদ্ধস্বরে ধমক দিয়ে বললাম, 'মিঞা, জোর করে রাজাকারে ভর্তি করে দেয়া যায়। কিন্তু তুমি সক্রিয় না হলে কমাণ্ডার হলে কি করে? মিষ্টি কথায় চিড়া ভিজাতে চেষ্টা কোরো না।' ভুয়াপুর থেকে আসা চার জন মুক্তিযোদ্ধাদের খোকাকে হাতে কোমরে দড়ি বেঁধে ভুয়াপুরে নিয়ে যেতে বলে, খবরেব জন্য দেরি না করে, ভুয়াপুর ছুটলাম।

বিজয়ের সংবাদ মুক্তিযোদ্ধাদের দেহে যেন সিংহের তেজ এনে দিল। হাঁটা নয় দৌড়ে শুধু ভুয়াপুর পৌঁছার প্রতিযোগিতা শুরু হলো। কার আগে কে পৌঁছতে পারে, এ নিয়ে শুরু হলো প্রতিযোগিতা। নিকড়াইল গ্রাম পার হয়ে একটু সময়ের জন্য দৌড়ে বিরতি দিলাম। এখানে দলটিকে দুই ভাগে ভাগ করলাম। যারা-ছুটতে পারছিলো না তাদের কয়েকজন ও সবল বুদ্ধিমান কয়েকজনের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে একটি বাড়ীতে রাখা হলো। আবার রওনার সময় বারবার বললাম, 'তোমরা দুইজন করে পালা করে সবসময় পাহারায় থাকবে। রাতে যে কোন মুহূর্তে আমরা আসতে পারি! উপলদীয়ার ফজলু ও টাংগাইলের দীঘুলিয়ার ফুলকে দলটি দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হলো। ফজলু এই প্রথম একটা দায়িত্ব পেল।

বিকাল চারটায় ছুটতে ছুটতে ভুয়াপুর এসে পেঁাছলাম। ভুয়াপুর দখল হয়েছে সত্তর আশি জন রাজাকার ধরা পড়েছে এবং দুই জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছে, তা জেনেছি। কিন্তু শহীদের মধ্যে আমার নিত্য সহচর ভুয়াপুরের কৃতী সন্তান কদ্দুছ রয়েছে, তা জানা ছিল না। ভুয়াপুরের আরেক কৃতী সন্তান বড়লোকের পাড়ার আব্দুস সালামও তার নিজের থানা মুক্ত করার যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ করেছে।

ভুয়াপুর কলেজ মাঠে বন্দী রাজাকারদের দেখার সময় আমাকে যখন শহীদের নাম জানানো হলো তখন কুদ্দুছের নাম শুনে শিশুর মত করে কেঁদে ফেললাম। ৭১'এর মুক্তিযুদ্ধে যে কোন সহযোদ্ধার মৃত্যুতে আমি একই রকম ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু তারপরও কথা থাকে। জাহাঙ্গীর ও কুদ্দুছের মৃত্যু যেমন আমার বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়েছিল, তেমনি হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় হানাদার খতম করার তীব্র আকাঙ্ক্ষার আগুন। কুদ্দুসের মৃত্যু সংবাদ শুনে অনেকটা সময় স্বাভাবিক থাকতে পারলাম না। অসহায়ের মত কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে এক সময় মেজর হাবিবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুদ্দুছ ও সালামের লাশ কোথায় ?'

—'সালামের লাশ বড়লোকের পাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তা দুপুরের আগেই যথাযথ মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। কুদ্দুছের লাশও তার গ্রামের বাড়ী ছাবিশাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে আপনার জন্য এখনো দাফন করা হয়নি।' মেজর হাবিবের কথা শুনে লাফিয়ে উঠলাম। কুদ্দুছের মুখ শেষবারের মত দেখার আশায় ছাব্বিশার দিকে ছুটতে শুরু করলাম। কুদ্দুছের বাড়ী লোকে লোকারণ্য। আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীরা তো আছেনই, এ ছাড়াও প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক এবং দু'শ মুক্তিযোদ্ধা সুশৃংখল ভাবে কুদ্দুছের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপেক্ষা শুধু আমার জন্যে। আমি কুদ্দুছের বাড়ী পেঁছিলে কুদ্দুছের বাবা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কুদ্দুছের বাবা সারাদিন কাঁদতে কাঁদতে হয়তো শোকের জ্বালা কিছুটা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে তিনিই প্রথম সান্ত্বনা দিলেন। তিনি কান্নাজড়িত ধরা গলায় বললেন, 'বাবা কেঁদোনা, তুমি ভেঙে পড়োনা। তুমি কাঁদলেও আমি আমার ছেলেকে ফিরে পাব না। আমি জানতাম আমার কুদ্দুছের তোমার উপর কতখানি আস্থা ছিল। তুমি তাকে কতখানি ভালবাসতে তাও আমি জানি। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে যেয়ে আমার ছেলে মরেছে। বুকে গুলি লেগে আমার ছেলে শহীদ হয়েছে। তার পিছনে তো গুলি লাগেনি ! এমনিতে অসুখ হয়েত সে মরতে পারতো। তুমি কান্না বন্ধ কর। যারা আমাকে ছেলেহারা করল তাদের তুমি শায়েস্তা কর। যে জন্য আমার ছেলে জীবন দিল সেই কাজ পূর্ণ কর। এরপরও আমি ঠিক পূর্ণ শক্তি ফিরে পাচ্ছিলাম না। দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ ও অভিমানে আমার হাত পা থর থর করে কাঁপছিল। কুদ্দুছের মুখ দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। কবরের পাশে মাটিতে বসে পড়লাম। কয়েকজন সহযোদ্ধা ধরাধরি করে আমাকে একটু সরিয়ে নিল। চার বৎসরের বিশ্বস্ত, আদর্শসচেতন সহকর্মীকে এই ভাবে চির বিদায় দিতে হবে তা একবারও ভাবিনি। নিজে লাশ কবরে নামাতে চাইলাম। কিন্তু সহকর্মীরা আমার নাজুক অবস্থা দেখে রাজি হলো না। আমার সামনে কুদ্দুছের বাবা, কুদ্দুছের ছোটভাই আজিজ ও সহযোদ্ধারা লাশ কবরে নামাল। কাঁদতে কাঁদতে শেষবার মুখের কাফন সরিয়ে দিতে বললাম। কুদ্দুছের মা ছোটবোন ও মহিলা আত্মীয়স্বজনরা শেষ বারের মত কুদ্দুছের মুখ দেখলেন। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে কুদ্দুছের দাফন শেষ হলো, দাফন শেষে কুদ্দুছের বাড়ী থেকে হেঁটে ভুয়াপুর ফিরতে পারছিলাম না। সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছি। সবকিছু থাকতেও

যেন কিছু নেই, সব হারিয়ে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে গেছি। আমার অসহায় অবস্থা দেখে দুলাল ও কাসেম এগিয়ে এলো। তারা দুই পাশ থেকে ধরে বলতে গেলে উঁচু করে আস্তে আস্তে ভুয়াপুর নিয়ে এলো। কুদ্দুছের নাম অনুসারে এরপর থেকে ভুয়াপুর 'কুদ্দুছ নগর' বলে চিহ্নিত হয়।'

কুদ্দুছনগরে ডাকবাংলোর সামনের মাঠে ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে থেকে আস্তে আস্তে ধৃত রাজাকারদের সামনে গেলাম। কলেজ মাঠে এক'শ আট জন রাজাকারকে কোমরে দড়ি বেঁধে পাশাপাশি লাইন করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রত্যেককে ভালোভাবে দেখলাম। এত দুর্বলদেহী রাজাকারদের দেখে কিছুটা বেদনাহত হলাম। রাজাকাররা কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। খালি গায়ে সবাইর বুকের সবকটা হাড় গোনা যাচ্ছিল। সবার শরীরই শীর্ণ, ক্ষীণ ও লিকলিকে। নিজেদের শরীরের বোঝাই তারা বইতে পারছেনা। এরা গোলা-বারুদের বোঝা বইবে কি করে? তার উপর আবার দেশপ্রেমের আগুনে পোড়া খাঁটি স্বেচ্ছাসৈনিকদের সাথে মোকাবেলা করার দুরূহ কাজকে সম্ভব করবে কি করে? ধৃত রাজাকারদের কয়েকজনকে বেশ ভাল ভাবেই চিনতাম। যেমন আমাদের বাড়ীর পাশে ছোট্ট একটি চায়ের দোকানের চোদ্দ-পনের বছরের কাজের ছেলে পাতলা লিকলিকে দুলাল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও দু'তিন দিন সে চায়ের দোকানে যথারীতি কাজ করেছে। সেও আজ রাজাকার। আর একজন ঝাংড়ার বাস কন্ডাকটার। মাঝে মধ্যে সে বাবার কাছে মামলা মোকাদ্দমার কাজে আসতো। সেও রাজাকার হয়েছে! আগেই বলেছি, মজনু ভাইর স্ত্রী সানুর চাচাত ভাই খোকা কুদ্দুছনগরে রাজাকারদের সহকারী কমান্ডার ছিল। এই সমস্ত দেখে সত্যিই রাজাকারদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছিল।

৭ই অক্টোবররের রাত। মুক্তিবাহিনীর তিনটি দল অভিযানের তিনটি লক্ষ্য বস্তু ঠিক করে তিনদিকে বেরিয়ে পড়ে। আমার নেতৃত্বে একটি দল কুলতলা সেতু ধ্বংস করতে যায়। চার'শ মুক্তিযোদ্ধার দ্বিতীয় দলটি মেজর হাবিব, ক্যাপ্টেন আজাদ, ক্যাপ্টেন আঙ্গুরের নেতৃত্বে কুদ্দুছনগর দখলের অভিযানে এগিয়ে যায়। মেজর হাকিম, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন, ক্যাপ্টেন বেনু, ও ক্যাপ্টেন তারার নেতৃত্বে পাঁচ'শ জন মুক্তিযোদ্ধার তৃতীয় দলটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গোপালপুর থানার উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করে। গোপালপুর থানা অভিযানের দল নিম্নলিখিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল—

এক. একটি ৩ ইঞ্চি মর্টার
দুই. দুটি রকেট লান্সার
তিন. একটি ৮ ব্লান্ডার সাইট
চার. দশটি ২ ইঞ্চি মর্টার
পাঁচ. কুড়িটা গ্রেনেড থ্রোয়িং রাইফেল
ছয়. পঞ্চাশটি এল. এম. জি

অন্যান্যদের কাছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। তেমনি কুদ্দুছনগর অভিযানকারী দলের অনুরূপ একই সংখ্যক ৩ ইঞ্চি মর্টার, রকেট লান্সার, ব্লান্ডার সাইট, ২ ইঞ্চি মর্টার, গ্রেনেড

থ্রোয়িং রাইফেল, এল. এম. জি. ছিল। গোপালপুরের চাইতে কন্দুছনগর অভিযানে যোদ্ধাদের সংখ্যা কম হওয়ায় ছোট অস্ত্র কিছু কম দেওয়া হয়।

রাত বারোটায় মেজর হবি তাঁর দলকে দু'ভাগে ভাগ করে কন্দুছ নগর আক্রমণ পরিচালনা করে। মেজর হবির নেতৃত্বে মূল আক্রমণকারী দলটি কন্দুছনগরের সোজা উত্তরে এবং আঙ্গুর, আজুর্, বান্দুছ, রফিকের নেতৃত্বে অন্য দলটি পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করবে। পরিকল্পনামত কন্দুছনগরের বাজারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হানাদার ঘাটিতে মেজর হবিব প্রথম আক্রমণ শুরু করলো। মিনিট দশেক অবিশ্রান্ত গুলি ছুঁড়ে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে। উত্তর দিক থেকে মেজর হাবিবের দলটি গুলি ছোঁড়ায় বিরতি দেওয়ার সাথে সাথে পশ্চিমের দলটি শত্রুঘাঁটির উপর মুষল ধারায় ১০ মিনিট গুলিবর্ষণ করে। তাদের গুলি ছোঁড়া বন্ধের পর পরই পশ্চিমে তিন মাইল দূরে থেকে মোজাম্মেল ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। যুদ্ধে এই প্রথম গোলা নিক্ষেপ। এর আগে অবশ্য তাকে মর্টারের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুর উপর সে কখনও গোলা ছোঁড়েনি। তবে তার প্রথমবারের গোলা নিক্ষেপ এত নিখুঁত ও কার্যকরী হয় যে, অনেক অভিজ্ঞ মর্টার বিশারদও তাতে নিঃসন্দেহে অবাক হবেন। মর্টার থেকে মোজাম্মেল প্রায় দশ-মিনিট নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ৫০ রাউন্ড ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে। মর্টারের গোলা ছোঁড়া বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই, জয় বাংলা জয় মুক্তিবাহিনী, জয় বঙ্গবন্ধু, ইয়া আলী' প্রচণ্ড শ্লোগান তুলে উত্তর দিক থেকে মেজর হাবিবের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু একি, ঘাঁটিতে একজন হানাদারও নেই। অন্যদিকে পশ্চিম দিক থেকে গুলি বর্ষণের সময় হানাদারদের একটি গুলি আচমকা কন্দুছের বুকে লাগে। ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা নিক্ষেপ শুরুর পূর্বেই সে সাহাদৎ বরণ করে। মেজর হবি ক্যাম্পে উঠার পর এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে মাত্র ১০জন রাজাকার ধরতে সক্ষম হয়। বাকীরা পালিয়ে গেছে।

মেজর হবি অভিযান সফলের সংকেত দিতেই পশ্চিম দিক থেকে আংগুর, আরজু, রফিকের দল এগিয়ে আসে। তারা এসেই মেজর হবিকে জানায় তাদের দলের আবদুল কন্দুছ শহীদ হয়েছে। অন্যদিকে মেজর হবির দলের আবদুস সালাম হানাদারদের ছোঁড়া এক ঝাঁক গুলি বিদ্ধ হয়ে সাহাদৎ বরণ করে। এই দুইজন ছাড়া কোন মুক্তিযোদ্ধার গায়ে একটু আঁচড়ও লাগেনি। মুক্তিযোদ্ধারা যখন কন্দুছনগরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে সাত-আট জন রাজাকারও ধরা পড়েছে—সেই সময় দু'টি রাজাকার একটি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটায়। ক্যাপ্টেন মোতাহার, মাহফুজ, গৌরাঙ্গীর দুলাল ও গিরানী কলেজের দিক থেকে হাইস্কুল ঘেঁষে কন্দুছনগর ডাকবাংলোর দিকে যখন যাচ্ছিল তখন গাছের নিচের অন্ধকারের ভিতর থেকে দু'জন রাজাকার হঠাৎ তাদের সামনে এসে বলে, 'আমরা সারেন্ডার করমু'। মুক্তিযোদ্ধা চারজন তো অবাক! প্রায় আধঘণ্টা চারিদিক তল্লাশী চালিয়ে কোন রাজাকারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। অথচ এরা এখানে এলো কি করে? খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখে রাজাকার দু'জনই বিবস্ত্র। রাইফেলের বেল্ট ও ম্যাগাজিন খুলে একহাতে রাইফেল অন্যহাতে বোল্ট ম্যাগাজিন নিয়ে হাত তুলে দুই রাজাকার তাদের

সামনে দাঁড়িয়ে। মুক্তিযোদ্ধারা দুইটাকে ধরে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দেয়ার পর কলেজে নিয়ে এসে কাপড় পরতে দেয়। পরদিন এই দুই রাজাকারকে যখন আমি দেখতে গেলাম তখন তারা বললো, 'আমরা সালেন্ডার করছি।' কৌতুহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ভাবে সারেন্ডার করেছ?'

'—স্যার, গুলাগুলির সময় আমরা ভয়ে বাংকার ছাইড়া স্কুলের দালানে গিয়া পালাইয়া আছিলাম। তারপর জামাকাপড় খুইল্যা, রাইফেলের বেল্ট-ম্যাগাজিন আলাদা কইরা গাছের নীচে খারাইয়া যাছি। অনেক বাদে গাছের কাছে চার-পাঁচ জনেরে আইতে দেইখ্যা আমরা গাছের আড়াল থাইক্যা বারাইয়া কইলাম, আমরা স্যালেন্ডাল করমু। সালেন্ডাল স্যার ভালই। তয় পয়লা পয়লা একটু কিল গুটা খাইতে অয়।' এমনি বেকুব রাজাকারের উপর ভরসা করে পাকহানাদাররা লড়াই করছে! কন্দুছনগরের যুদ্ধশেষে এক'শ-আট জন রাজাকার ধরা পড়ে। এর মধ্যে আটানব্বই জনকে স্থানীয় জনগণ ও স্বেচ্ছাসেবকরা ধরে মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দেন। সব রাজাকারই অস্ত্রসহ ধরা পড়ে। শুধুমাত্র দু'জন রাজাকার ছাড়া পালিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত রাজাকারদের পাকড়াও করতে স্বেচ্ছাসেবক ও জনগণের একটুও বেগ পেতে হয়নি। জনসাধারণের হাতে ধরা পড়ার দু'টি ব্যাতিক্রম ঘটনা তুলে ধরছি।

গোলা-গুলি চলার সময় একজন রাজাকার দক্ষিণ দিকে ছুটে পালাচ্ছিল। শিয়ালখোলের কাছে এলে সেখানকার জনগণ রাজাকারটিকে ধরার জন্য তাড়া করেন। বেকুব রাজাকারটি পনের-কুড়ি জন লোকের বেষ্টনীতে পড়ে তার হাতের রাইফেল উঁচিয়ে ধরে। জনগণ তখন চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'শালা রাজাকার, যদি গুলি ছোঁড়স্ তাইলে একেবারে জান শেষ কইরা ফালামু।' একদিকে সাবধাণ বাণী, অন্যদিকে পিছনথেকে একজন দ্রুত ছুটে এসে ধারালো দা দিয়ে এককোপে রাজাকারের রাইফেল ধরা ডান হাতের কব্জি কেটে ফেলেন। রাজাকারটি বুঝার আগেই তার হাত থেকে রাইফেলটি পড়ে যায়। হাত কাটা অবস্থাতেই স্থানীয় জনগণ তাকে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে পৌ'ছে দেন।

অন্য ঘটনাটি ঘটে ছোট লোকের পাড়ায়। (এখানে ছোট লোকেরা বাস করেন না। গ্রামের নাম ছোটলোকের পাড়া। এখানকার লোকদের মন অনেক বড়) ছোটলোকের পাড়ার উপর দিয়ে একটি রাজাকার অস্ত্র নিয়ে দৌ'ড়ে পালাচ্ছিল। স্থানীয় জনসাধারণ তাকে ধরতে গেলে সেও রাইফেল উঁচিয়ে ধরে। এখানেও একজন সাহসী লোক নিমেষে রাইফেল উ'চিয়ে ধরা রাজাকারটির দিকে ছুটে গিয়ে ধানকাটা কাস্তে দিয়ে একহে'চকা টানে রাজাকারের বাঁ কান কেটে ফেলেন। আচমকা ঘটে যাওয়া ঘটনায় রাজাকারটি হতভম্ব হওয়ার সাথে সাথেই তিন-চার জন তাকে জাপটে ধরে রাইফেল কেড়ে নেন। এই দুটি ঘটনা ছাড়া বাকী সকল রাজাকার বিনাবাধায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও জনসাধারণের হাতে ধরা দেয়।

৭ই অক্টোবর গভীর রাতে গোপালপুরে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। মেজর হাকিম, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন, ক্যাপ্টেন তারা ও ক্যাপ্টেন বেনুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল

বিক্রমে সারা রাত এবং ৮ই অক্টোবর সারা দিন যুদ্ধ চালালো। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হানাদার ঘাঁটির পতন তারা ঘটাতে পারলো না। ৭ই অক্টোবর যখন যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় তখন ঠিক হয়েছিল, যাকে বা যাদের যে যে অভিযানের দায়িত্ব দেয়া হবে তাকে বা তাদেরকে সেই অভিযানে অবশ্যই সফল হতে হবে। হানাদারদের ঘাঁটি দখল না করে ফেরা চলবে না। কুলতলা সেতু ধ্বংস ও কন্দুছনগর দখলের পর গোপালপুর অভিযান মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সম্মানের লড়াই হয়ে দাঁড়ায়। তারা গোপালপুর থানা দখল না করে পিছু হটতে রাজী নয়। ৮ই অক্টোবর সারাদিন গোপালপুর থানার উপর নির্ভুল লক্ষ্যে প্রায় তিন শত ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করার পরও যখন গোপালপুর হানাদার ঘাঁটির পতন ঘটলো না তখন পরবর্তী রণকৌশল ও পরিকল্পনা কি হওয়া উচিত মেজর হাকিমকে তা ভাবিয়ে তুলল। ইতিমধ্যে আক্রান্ত ঘাঁটিকে সাহায্য করতে ময়মনসিং-টাংগাইল থেকে হানাদার বাহিনীর তিন'শ জন নিয়মিত সৈন্যের একটি দল গোপালপুর এসে পৌছে। তাতে গোপালপুরের হানাদারদের মনোবল অনেকটা বেড়ে যায়।

গোপালপুর অভিযান বাং

৮ই অক্টোবর, সন্ধ্যায় গোপালপুর অভিযানের নেতা মেজর হাকিমকে নির্দেশ পাঠালেন, 'যেহেতু গত রাতের মুক্তিবাহিনীর প্রথম আঘাত হানাদাররা সামলে নিয়েছে সেই হেতু গোপালপুর ঘাঁটি দখল কষ্টসাধ্য হবে। আজ যে বিপুল পরিমাণ গোলা-গুলির শ্রাদ্ধ হয়েছে তা একেবারে নিষ্প্রয়োজন। গোলাগুলি আর খরচ না করে গোপালপুর থানাকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখ এবং সময় ও সুযোগ মত চোরা গোপ্তা আঘাত হান। তোমরা ঘাঁটি দখল করতে পারনি বলে লজ্জা অথবা অপমানবোধের কোন কারণ নেই। গোপালপুর ঘাঁটি থেকে হানাদারদের অবাধে বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিতে পারলেই আমি খুশী হব।' মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত সফলতার সাথে গোপালপুর ঘাঁটির হানাদারদের, বলতে গেলে শিবির বন্দী করে রাখতে সমর্থ হয়। হানাদারদের অবরুদ্ধ রাখার সময়ে কয়েকটি অভুতপূর্ব ও চমকপ্রদ সাফল্য আসে। তার একটি হচ্ছে মেজর হাকিমের কোম্পানীর বারো-তের বৎসরের এক ক্ষুদে মুক্তি-যোদ্ধা চায়ের দোকানের কাজের ছেলের ছদ্মবেশে গোপালপুর হানাদারদের ঘাঁটিতে প্রবেশ করে সেখানে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আটজন হানাদার খতম করতে সক্ষম হয়। গোপালপুরের হানাদারদের আরও একঘরে করে ফেলার উদ্দেশ্য মেজর হাকিমের দল টাংগাইল-ময়মনসিংহের দিক থেকে গোপালপুরে আসার একমাত্র পাকা রাস্তার উপর সবচাইতে বড় সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। শহিদ ওরফে লালু, তুলু ও অন্যান্য চার পাঁচ জন ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধার প্রতি রাতে ঘাঁটির আনাচে কানাচে গ্রেনেড নিক্ষেপের চোটে গোপালপুরের হানাদারদের টিকে থাকা বেশ দুষ্কর হয়ে পড়ে। অন্য দিকে এমন কোন দিন যায়নি যেদিন ওৎ পেতে বসে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে দু'এক জন হানাদার অক্কা পায়নি। গোপালপুর থানা অবরোধে ক্যাপ্টেন তারার কোম্পানী দুর্দান্ত সফলতা লাভ করে।

রাজাকারদের মাশুয়ার চরে পাঠিয়ে দিতে এবং সদর দফতরকে সত্বর এবং

অন্যান্যদের আমার সাথে মিলিত হতে নির্দেশ পাঠিয়ে পশ্চিমে নিকড়াইলের দিকে যাত্রা করলাম। কন্দুছনগর আসার পথে নিকড়াইলে আমার দলের একটা অংশকে রেখে এসেছিলাম। রাত ২টায় নিকড়াইল গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাপারটা বললে তারা খোঁজ-খবর নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান বের করলো। মুক্তিযোদ্ধারা নির্দিষ্ট বাড়ীর আশেপাশেই ছিল। তবে প্রথানুযায়ী কোন প্রহরা না রেখেই তার ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি বাড়ীতে গিয়ে ঘুমন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জাগালাম। কমান্ডার ফজলুল হক ও সহকারী কমান্ডার ফুলকে তীব্র, কঠিন তিরস্কার করলাম। উভয়কেই প্রচন্ড জোরে দু'ঘা করে বেত মারলাম। এরপরও রাগ সামাল দিতে পারছিলাম না। ক্রোধ ও উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। এত উত্তেজিত এর আগে খুব কম সময়েই হয়েছি। রাগে কথা বলতে পারছিলাম না। একটু পরে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বললাম, 'তোমাদের বার বার করে বলে গেছি, যত পরিশ্রমই হোক, যতই ক্লান্তি আসুক তবুও পাহারা না রেখে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে না। অথচ তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছো। একদিকে আমার কথা অমান্য করেছ, অন্যদিকে যদি হানাদাররা এসে তোমাদের এইভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরতে পারতো তাহলে তোমাদের জীবন তো যেতই, উপরন্তু আমাদের জন্য ওঁৎপেতে বসে থেকে সহজেই আমাকে সহ আমার দলকেও ধরতে সক্ষম হতো।' আমার কথা শুনে ও বুঝে কমান্ডার ফজলু ও ফুল তাদের অপরাধের গুরুত্বটা বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁরা আর কোনদিন মুক্তিবাহিনীর কোন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় নি।

আবার নিকড়াইলে

পরদিন ৯ই অক্টোবর সকালে এলাম শওয়ার চর। রাজাকারদের শওয়ার চরে নিয়ে আসার নির্দেশ আগেই দেয়া হয়েছিল। শওয়ার চরে এক'শআট জন রাজাকারের সাথে এক এক করে কথা বললাম। কমান্ডার ও কন্দুছনগরের আসেপাশের লোকজনদের কাছে ভাল ভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে রাজাকারদের তিন ভাগে ভাগ করলাম। প্রথম ভাগকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলাম। বাকী দু'ভাগের চল্লিশজনকে মোয়াজ্জেম হোসেন খানের সাথে চল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধার পাহারায় ভারতে পাঠিয়ে দিলাম। চল্লিশ জন রাজাকারের তালিকায় প্রত্যেকের সম্পর্কে আমি নিজস্ব মন্তব্য রাখলাম। চল্লিশ জনের মধ্যে সাত আটজনের নামের পাশে মারাত্মক শব্দ প্রয়োগ করে বাকীদের বিষয়ও পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করলাম, সত্যিকার অর্থেই এরা দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তবে মারাত্মক নয়, চল্লিশ জন রাজাকারকে ভারতে পাঠানোর কারণ, আমি যখন ভারতে ছিলাম তখন দেখেছি নকসা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দী হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর এলাকার রাজাকারদের অথবা পাকিস্তানী হানাদার সমর্থকদের ধরে আনা হতো এবং তাদের নিয়ে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় ছবি সহ বিরাট বিরাট সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হতো। সেই উদ্দেশ্যেই একদল রাজাকার পাঠিয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে শেষ অনুরোধ জানিয়েছিলাম—এরা যত মারাত্মকই হোক সম্ভব হলে একজনকেও যেন মৃত্যুদন্ড দেওয়া না হয়।

রাজাকার নিয়ে মোয়াজ্জেম হোসেন খান ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণে অগ্রসর হলাম। পথে সবুর দশ-বারো জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমার সাথে মিলিত হলো। ১২ই আগস্ট গণপরিষদ সদস্য বাসেদ সিদ্দিকীর বাড়ী থেকে ছুটি নিয়ার পর এই প্রথম আবার আমার সাথে মিলিত হয়ে নিত্য সহচর দলের অন্তর্ভুক্ত হলো।

মাজানি চরে সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন নায়েব সুবেদার মইনুদ্দীনের নেতৃত্বে একটি মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ শিবির খোলার আগে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক ছাত্র-যুবক সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের মানকায় চর চলে যেত। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে প্রশিক্ষণ শিবির খোলায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের ভারতে যাবার প্রবণতা অনেকাংশে কমে যায়। তারা পর্যায়ক্রমে সাহজানি চরের প্রশিক্ষণ শিবিরে সামরিক কসরত শিক্ষালাভ করতে থাকে। সত্যিকার অর্থে মইনুদ্দীন ও তার সহযোগীরা দক্ষতার সাথে রেখে খব সুন্দর ও কার্যকরী প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলছে। ৯ই অক্টোবর, দক্ষিণে যাবার পথে যাত্রা বিরতি দিয়ে মইনুদ্দিনের সাহজানি ট্রেনিং ক্যাম্প পরিদর্শন করলাম। প্রশিক্ষণ শিবির ঘুরে ঘুরে দেখে ও প্রশিক্ষণরত যোদ্ধাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে যারপরনাই মুগ্ধ হ'লাম। মইনুদ্দীন ও প্রশিক্ষণ শিবিরের অন্যান্যরা জুলাই মাস থেকে আমার নেতৃত্বে গঠিত টাংগাইল মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছিল। প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন শেষে ক্যাম্প কমাণ্ডার মইনুদ্দীনকে নদীপথে নজর রাখতে একটি অতিরিক্ত দল গঠনের নির্দেশ দিলাম। ১২ই অক্টোবর থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কমাণ্ডার মইনুদ্দীনের গঠিত দল নদীপথে কড়া পাহারায় ও সফলতার সাথে জলপথ কর আদায় করতে সক্ষম হয়। তারা হিসাব-কিতাবেও অত্যন্ত নিখুঁত ও আধুনিকতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। যদিও আগে থেকে উত্তরে আলিম এবং নাগর পুরের দক্ষিণে আবদুস সামাদের নেতৃত্বে জলপথ কর আদায় করা হচ্ছিল। কমাণ্ডার মইনুদ্দীনকে নতুন করে জলপথ কর ও জলপথের উপর নজর রাখার দায়িত্ব দেয়া হলে নদীপথে নিরাপত্তা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি কর আদায়ের ব্যবস্থাও সুগম হয়। ছ'-সাতটি ঘাটিতে কর আদায় করা হলেও আব্দুল আলিমের মূল নেতৃত্বে কমাণ্ডার মইনুদ্দীন ও আব্দুস সামাদের সমন্বয়ে সুষ্ঠভাবে কোন ভুল বোঝাবুঝি ছাড়াই কর আদায়ের কাজটি সুসম্পন্ন হয়।

১৯৭১ সাল, ১০ই অক্টোবর। আমরা নাগরপুরের দিকে চলেছি। আশপাশের কোন কোন স্থান তখনও পুরোপুরি নিরাপদ ছিল না। চারাবাড়ি ও পোড়াবাড়ি ঘাটকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে পোড়াবাড়ির একমাত্র পাকা সড়কের বড় সেতু ও পাশের আর একটি সেতু ধ্বংস করে দিলাম। সন্তোষে মওলানা আবুল হামিদ খান ভাসানীর বাড়ির গা ঘেঁসে এই সেতুটি এবং কিছু দূরে বেলতা সেতু ধ্বংস করে দেওয়ার পর চারাবাড়ি-পোড়াবাড়ি ঘাট বলতে গেলে শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। কারণ টাংগাইল থেকে কোন যানবাহন নিয়ে স্বচ্ছন্দে চারাবাড়ি-পোড়াবাড়ি যাওয়া হানাদারদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। সন্তোষ থেকে তিন মাইল পায়ে হেঁটে চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার কষ্ট স্বীকার তেমন কিছু না হলেও মুক্তিবাহিনীর ভয়ে হানাদাররা এদিকে আসতে চায়নি।

১১ই অক্টোবর রাতে আমাদের তিনটি নৌকা ভাররা ঘাটে ভিড়লো। ইতিপূর্বে দেড়'শ জনের 'হনুমান কোম্পানী'র ভাররা বাজারে এসে অপেক্ষা করার কথা ছিল। নাগরপুর হানাদার ঘাঁটির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব তার (ক্যাপ্টেন হুমায়ুন) উপর ছিল। ১১ তারিখ রাতে ঘাট ও তার পাশে অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও 'হনুমান কোম্পানী'র কাউকে না পেয়ে নদীর অপর পারে গেলাম। সেখানেই বাকী রাত কাটালাম। ১২ তারিখ প্রত্যুষে গোয়েন্দাদের সূত্রে খবর পেলাম, টাংগাইল থেকে ত্রিশ-চল্লিশ জন রাজাকার ও কয়েকজন মিলিশিয়া খাবারদাবার ও অন্যান্য রসদ পত্র নিয়ে এলাসিন নাগরপুর রাস্তা ধরে যাবে। তাই আমরা এলাসিনের পথে ওঁৎ পেতে রইলাম।

এলাসিনে শত্রুর রসদ দখল

গোয়েন্দা বিভাগের খবর যে মোটেই ভুল নয়, তা সকাল আটটার মধ্যেই বোঝা গেল। চার-পাঁচটা গরুর গাড়ী ও তিন-চারটা রিক্সা নিয়ে হানাদার পাকিস্তানীদের ফেউ রাজাকার ও মিলিশিয়ার একটি দল এগিয়ে আসছে। আমরা ২০ জন তাদেরকে স্বাগত জানাতে ওঁৎপেতে রয়েছি। রাজাকার ও মিলিশিয়ারা অত্যন্ত ঢিলেঢালা চালে উর্দু সিনেমার চটুল গান গাইতে গাইতে উত্তর থেকে দক্ষিণে আসছে। তাদের অত নিরাপদ বোধ করার কারণ, এর আগে এলাসিনের রাস্তায় তারা কোনদিন আক্রান্ত হয়নি। রাজাকার ও মিলিশিয়ারা এলোমেলো, আমাদের বন্দুকের নলের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। পিছনে এলাসিন বাজার আর সামনে এলাসিন স্কুল। এমন জায়গায় পিছন ও ডানপাশ থেকে তারা আক্রান্ত হল। মুহূর্তে রাজাকার ও মিলিশিয়ার দলটি তালগোল পাকিয়ে গেল। কয়েকজন মিলিশিয়া ছুটে পালাতে পারলেও কুড়িজন রাজাকার লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকার মত রাইফেল হাতে অসহায় অবস্থায় ধরা পড়লো। গাড়ীর গরুগুলো দাঁড় ছিঁড়ে হাম্বা হাম্বা চিৎকার করে পালালো। রসদ বোঝাই গাড়ীগুলো রাস্তার এপাশে ওপাশে ছিটকে পড়ে গেল। রিক্সা ফেলে চালকেরা দে ছুট। আমাদের আচমকা আক্রমণে তিনজন রাজাকার নিহত ও এগারো-জন আহত হয়। মাত্র কয়েকজন মিলিশিয়া ছাড়া বাকী রাজাকাররা ধরা পড়লো। নাগরপুর ঘাঁটির জন্য নিয়ে যাওয়া সমস্ত রসদ মুক্তিবাহিনীর হাতে এসে গেল। সবুর, সাইদুর, কাসেম ও রফিককে নিয়ে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় এলাসিন বাজারে একটি ঔষধের দোকানে আহত রাজাকারদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। গোলাগুলি ও অস্ত্র ছাড়া বাকী রসদ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করালাম। খাদ্যদ্রব্য বিলাতে গিয়ে প্রথমে সামান্য একটু অস্বস্তি ও অসুবিধার সম্মুখীন হলাম। কেউ খাদ্যদ্রব্য নিতে সাহস পাচ্ছে না দেখে, স্থানীয় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বললাম, 'হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া খাদ্যদ্রব্য মোটেই ধনীলোকের জন্য নয়। যারা অসহায় দরিদ্র, মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে—তাদের জন্যও নয়। দরিদ্র ভাই-বোনদের এই খাদ্য দ্রব্য ভাগাভাগি করে নিতে কোন অসুবিধা কিংবা ভয়ের কারণ থাকতে পারে না। বন্ধুরা, আপনারা এই খাবার ভাগাভাগি করে নিন। এর জন্য যদি আপনাদের সামান্যতম অসুবিধা হয় আমরা তার প্রতিকার করবো। একথার পর ১৫০ জন হানাদার সৈন্য ও রাজাকারের একসপ্তাহের খাবার প্রায় ৫০০ জনসাধারণ ও দরিদ্র ভাই-বোনেরা ভাগাভাগি করে নিলেন।

সত্তেরটি রাইফেল ও তিন হাজার গুলি বগলদাবা করে ও হানাদার বাহিনীর খাদ্যদ্রব্য দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে বেলা এগারোটায় আবার পশ্চিমপাড়ে, ভারবা ঘাটে এলাম।

এলাসিন বাজারে গোলাগুলি চলার সময়েই ক্যাপ্টেন হুমায়ুনের একজন সিগন্যাল এসে হুমায়ুনের অবস্থান ও নাগরপুরের প্রয়োজনীয় সমস্ত খবর দিয়েছিল। আমাদের নৌকা আবার ভারবা ঘাটে ভিড়ার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন হুমায়ুন এসে স্বাগত জানালো। দুপুরের খাবার শেষে ক্যাপ্টেন হুমায়ুনকে নাগরপুর থানা আক্রমণের নির্দেশ দিলাম। ক্যাপ্টেন হুমায়ুনের সংগৃহীত তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সময়টা থানা আক্রমণের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। পরিকল্পনা অনুসারে সামাদ গামার মর্টার প্লাটুনের সহায়তায় ক্যাপ্টেন হুমায়ুন তার কোম্পানী নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আঘাত হানবে। আমরা সোজা উত্তর থেকে থানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।

১২ই অক্টোবর দুপুরে হুমায়ুনের নেতৃত্বে দুশ মুক্তিযোদ্ধা নাগরপুর থানায় আঘাত হানতে এগিয়ে গেল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা থানা থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে হানাদার সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়। তুমুল যুদ্ধ চললো। ভারবা বাজার থেকে কমান্ডার হুমায়ুনের যাত্রা করার প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে খবর এলো, মুক্তিবাহিনী হানাদারদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করেছে। উপরন্তু থানার উত্তর অংশের সমস্ত এলাকাটাই মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। খবর পেয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মত টাংগাইল নাগরপুর রাস্তা ধরে নাগরপুর থানার দিকে এগুলাম। কুড়িজন মুক্তি যোদ্ধা আমাকে অনুসরণ করলো। অস্ত্রের মধ্যে ভুিয়ার কাছ থেকে আনা সেই ৩ইঞ্চি মর্টারসহ দলের প্রত্যেকের কাছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। আমরা যখন নাগরপুর থানার আধমাইল উত্তরে, ঠিক তখন ডানে বিরাট শষ্যক্ষেতের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক দেখতে পেলাম। লোকগুলো যে নিরস্ত্র নয় সে সম্পর্কেও আমরা নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম।

নাগরপুর অভিযানে বিভ্রান্তি

তারা পশ্চিম-উত্তর দিকে গুলি ছুঁড়ছিল। এই অবস্থা দেখে আর দক্ষিণে না গিয়ে ডান পাশে অর্থাৎ পশ্চিমে একটি গ্রামের মধ্যে চলে গেলাম। এবং পশ্চিম-উত্তর মুখী সৈনিকদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলাম। এরকম জটিল অবস্থার প্রেক্ষিতে আক্রান্ত সৈন্য ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেল। তারা পিছনে ফিরে গুলি চালাতে শুরু করলো। এর মধ্যে আবার কেউ কেউ হাত তুলে চিৎকার করে কি সব বলতে লাগল। আমি দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। তিন-চার'শ গজ দূরে যুদ্ধরত অস্ত্রধারীরা কারা? মুক্তি বাহিনী? অথবা হানাদার? তা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারছিলাম না। দূতের সংবাদ অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীর এখানেই থাকার কথা। তাই একটু বিভ্রান্তিতে পড়লাম। গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে ওদের পরিচয় জানার চেষ্টা করলাম। ধানক্ষেতের মাঝ থেকে প্রায় সত্তর-আশি জন আমাদের দিকে আপন জনের মত আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগলো। অগ্রসরমান সৈনিক দল

মুক্তিবাহিনী অথবা হানাদার, এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির ঘোর তখনও কাটেনি। কেবল তাকিয়ে আছি, লক্ষ্য করছি, সশস্ত্র লোকেরা আমার সামনে দিয়ে প্রায় ১০০ গজ দূরত্ব বজায় রেখে নাগরপুর-টাংগাইল রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে রাস্তার দূরত্ব এক'শ গজ। সশস্ত্র লোকদের কাছ থেকেও ঐ রাস্তার দূরত্ব এক'শ গজ। এমনি সময় আমার বিভ্রান্তি কাটলো। সর্বনাশ! এতো হানাদার বাহিনী! আর একটু পূবে সরে গিয়ে নাগরপুর-টাংগাইল রাস্তার উপর উঠতে পারলে হানাদাররা যেমন নিরাপদ হবে ঠিক তেমনি আমরাও চরম বিপদে পড়বো। কারণ আমাদের পিছনে এক হাজার গজের মধ্যে হানাদারদের নাগরপুর থানার সুদৃঢ় ঘাঁটি। সহযোদ্ধাদের দ্রুত ডানে সরে রাস্তার উপরে উঠে হানাদারদের রাস্তায় উঠার পথ রোধ করতে নির্দেশ দিলাম। দলের প্রায় অধিকাংশ সদস্য দৌড়ে রাস্তায় উঠে কিছুটা উত্তরে এগিয়ে গেছে; কিন্তু হানাদারদের রাস্তায় উঠা থেকে বিরত করতে পারছে না। হানাদারদের প্রতিহত করতে হলে আরোও উত্তরে যাওয়া চাই। আরোও উত্তরে যেতে হলে ছোট্ট একটা পুল অতিক্রম করা দরকার। এদিকে তখন হানাদাররা পুলটিকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। পুলের উপর দিয়ে উত্তরে যাওয়া অসম্ভব। পুলটির নীচ দিয়েও যাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে বুক সমান পানি। অধিকন্তু প্রায় ত্রিশ-চাল্লিশ ফুট লম্বা সেতুটির নীচের সমস্ত অংশটাই হানাদারদের দিক থেকে সম্পূর্ণ খোলা।

মুক্তিবাহিনীর প্রথম দলের যখন এই অবস্থা তখন আব্দুস সবুর খান, মকবুল, আমি ও আরো কয়েকজন হানাদারদের উপর গুলি বর্ষণ করছিলাম, এমন সময় খবর এলো, অগ্রবর্তী দলের কেউ রাস্তা মুক্ত রাখতে পারছে না। খবর পেয়ে সঙ্গের যোদ্ধাদের উত্তরে পাঠিয়ে দিলাম। পিছনে পড়ে থাকলাম কেবল আব্দুস সবুর এবং আমি। সবুর আমার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ পূবে সরে পজিশন নিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকলে আমি সবুরের কুড়ি-পঁচিশ গজ পূবে এসে দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়তে শুরু করলাম। এরপর সবুর পজিশন ছেড়ে আরোও পূবে রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। সামনেই রাস্তা। মাঝে কুড়ি-পঁচিশ গজ ফাঁকা জায়গা। হানাদাররা ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ্য করে অবিরাম গুলি ছুঁড়ে চলেছে। অপেক্ষা করার কোন উপায় নেই, সময়ও নেই। গুলি বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। দু'এক মিনিট দেরী হলেই চরম বিপদে পড়ে যাব। এর অর্থ মারা যাওয়া অথবা ধরা পড়া। দুঃসাহসিক সবুর ঐ গুলি বৃষ্টির মাঝ দিয়ে পূবের বাড়িতে অবস্থান নেয়ার জন্য ছুটে গেল। আমি তার পিছু পিছু ছুটলাম। দুজনের তখন প্রায় একই গতি—নিশ্চিত মৃত্যুর গহবর পেরিয়ে জীবনকে ছোঁয়ার দুরন্ত অবিশ্বাস্য গতি। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও একই জায়গা দিয়ে চলে গেছে। দুই বাড়ির মাঝে ডোবায় সামান্য একটু জায়গায় আট-দশ আংগুল পানি। সবুর ঠিক ঠিক পেরিয়ে গেল। আমি সবুরের ঠিক পিছু পিছু না গিয়ে তিন-চার হাত ডানে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই বিপদে পড়লাম। সবুরের পেরিয়ে যাওয়া রাস্তার তিন-চার হাত ডান দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার সময় অথৈ পানিতে তলিয়ে গেলাম।

এটা ছিল একটি গভীর ডোবা। আমি পানিতে তলিয়ে যাচ্ছি। ঠাঁই পাচ্ছি

না। এটা কিন্তু সবুরের দৃষ্টি এড়ায়নি। অথৈ পানিতে ডোবার পড়ে আমার বহুদিনের ব্যবহৃত বৃটিশ এল. এম. জিটি ধরে রাখতে পারছিলাম না। বারবার ভেসে উঠার চেষ্টা করেও ডুবে যাচ্ছিলাম। আমার অবস্থা দেখে সবুর খুব তৎপরতার সাথে আস্তে করে বললো, 'স্যার, আইস্যা পড়েন, আমি বুঝছি। ব্যস, ঐটুকুই। সত্যিই সেদিন সবুর যেমন আমায় অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিল, আমিও সবুরের ঐ 'বুঝতে' পারার সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। সবুরের ইংগিত পূর্ণ কথা শুনামাত্র মুঠ আলগা করে প্রিয় এল. এম. জিটি ছেড়ে দিলাম।

এল. এম. জিটি ছেড়ে দিয়ে ধুপ্ ধাপ্ করে পানা সরিয়ে পানি থেকে উঠে দৌড়ে একটি বাড়ির আড়ালে চলে এলাম। সবুরও সাথে সাথে সামান্য দক্ষিণে সরে পূব দিকে চলে এলো। সবুরের ভাগ্য সত্যিই সুপ্রসন্ন। সে উন্মুক্ত জায়গায় বসে হানাদারদের উপর দুই মিনিট গুলি চালালো। অথচ তার গায়ে একটি গুলিও হানাদাররা লাগাতে পারলো না। যদিও তার আশেপাশে অসংখ্য গুলি এসে পড়ছিল। আমি ও সবুর রাস্তায় এসে তাজ্জব বনে গেলাম। বাড়ী থেকে মাত্র কুড়ি-পঁচিশ গজ উত্তরে এগিয়ে সব মুক্তিযোদ্ধারাই গুটলী পাকিয়ে রয়েছে। হানাদাররা যদি আরে একমিনিট সময় পায় তাহলে তারা নাগরপুর টাংগাইল রাস্তার আড়ালে পেয়ে যাবে। এমনকি তারা রাস্তাটি অবরুদ্ধ করে ফেলতে পারবে। চিন্তাভাবনার সময় নেই, একমিনিটের মধ্যেই এক'শ গজ উত্তরে যেতে হবে। সামছু, হালিম, খোকা, দুলাল, মকবুল ও দুরমুজ খানকে সাথে নিয়ে বুক সমান পানি ঠেলে পুলের নীচের বিপদসংকুল জায়গাটা পার হলাম। এই সময় সবুর পুল থেকে উত্তর পশ্চিমে হানাদারদের লক্ষ্য করে মুষলধারে গুলি বর্ষণ শুরু করলো। আমি চরম ঝুঁকি স্বীকার করে ছ-সাত জন সহযোদ্ধা নিয়ে হানাদারদের একেবারে সামনা-সামনি এসে হাজির হলাম। আমরা এক'শ গজেরও বেশী এগিয়ে এসেছি। এখন আর রাস্তা অবরোধ করে মুক্তি বাহিনীর উত্তরে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখা হানাদারদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কিছু হানাদার ইতিমধ্যেই নাগরপুর টাংগাইল রাস্তার পশ্চিমে অবস্থান নিয়েছে। ব্যাপারটি তখন এমন যে পঁচিশ-ত্রিশ ফুট প্রশস্ত রাস্তার পূব পাশে মুক্তিবাহিনী পশ্চিম পাশে হানাদার বাহিনী। দু দলই মুখোমুখি। মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা যে হানাদারদের কাছে কোন হাত বোমা ছিলনা। মুক্তিবাহিনী যখন রাস্তার পশ্চিম পাশে আট দশটি হাতবোমা নিক্ষেপ করে, তখন হানাদাররা কোন হাতবোমা ছুঁড়তে পারেনি। রাস্তার পশ্চিম পাশের হানাদারদের গুলি ছুঁড়ে হটাতে না পারলেও হাতবোমা ছুঁড়ে সরানো গেল। সবুর বাকী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে চলে এলো। আমরা যেমন আস্তে আস্তে উত্তরে সরে এসে ভাল ও মজবুত অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করছিলাম, ঠিক তেমনি হানাদাররাও আস্তে আস্তে দক্ষিণে সরে গিয়ে বাড়ীর আড়াল নিয়ে অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালাচ্ছিল।

চরম ঝুঁকি পূর্ণ অবস্থান নিয়ে সবুর হানাদারদের উপর যে ভাবে নিরন্তর গুলি বর্ষণ করছিল তা শুধু বাংলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেই নয় যে কোন যুদ্ধের ইতিহাসেই এক বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা।

সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে উঁচু জায়গায় আড়াল নিয়ে গুলি ছোড়া হয়। এখানে

ঘটে ছিল একেবারে উল্টো। আমাকে গুলি বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে সবুর উঁচু জায়গা পিছনে রেখে উন্মুক্ত জায়গায় বসে শুধু হাতের উপর এল. এম. জি. নিয়ে প্রায় দুই মিনিট গুলি ছোঁড়ে। ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল মুক্তিযোদ্ধা ও আমার অভিমত আব্দুস সবুর খান ঐ দিন ঐ ভাবে গুলি চালাতে না পারলে আমার মৃত্যু অবধারিত ছিল।

আস্তে আস্তে যুদ্ধের গতি স্তিমিত হয়ে এলো। আমরা আরও এক হাজার গজ উত্তরে সরে একটি পুল সামনে রেখে সারাদিন অবস্থান নিয়ে থাকলাম। এসময় প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার পেটে আগুন, ক্ষুধার আগুন। ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। গ্রামের লোকেরা পান্তাভাত, চিড়া-মুড়ি, ছাতু ও কলা মুলা আলু এনে রণক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ালেন, কিন্তু আমি কিছু খাওয়া দূরে থাকুক এক-ফোটা পানিও মুখে তুললাম না। আমার মনোবেদনার কারণ কি সবুর তা বুঝতে পারে।

টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধে সবুরের মত সাহসী হাস্যোজ্জল প্রাণবন্ত, খোলামেলা নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা বিরল। সবুর তেমন লেখাপড়া জানে না এটা ঠিক, তবে তার সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা অনেক অনেক তথাকথিত শিক্ষিত লোকের চাইতে হাজার গুণ বেশী। সবুর অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বললো, 'স্যার, আপনি খান। আপনার অস্ত্র সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আইন্যা দিমু।'

—'ঠিক আছে। সন্ধ্যা হোক, তুই অস্ত্র আইন্যা দে, তারপর খাব।' সবুর কিন্তু সত্যিই তার কথার মর্যাদা রাখলো। একজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে একটি গামছা পরে বলতে গেলে হানাদার রাজাকারদের ভিতর দিয়ে নির্ভুল ভাবে নির্দিষ্ট স্থানে পেঁছিল। এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, একডুবে প্রায় আট-দশ হাত পানির নীচ থেকে কদু করা এল. এম. জিটি তুলে নিয়ে এলো। ওখানে সবুর আর এল. এম. জির দুটো চেইন ফেলে এসেছিল। তাও একই সাথে তুলে নিয়ে আসে। রাত দশটায় সবুর বিজয়ীর বেশে এসে বহু স্মৃতি বিজড়িত এল. এম. জিটি আমার হাতে তুলে দিল।

রাত বারোটায় সারাদিনের যুদ্ধ, ও দৌড়াদৌড়িতে ক্লান্ত হয়ে ভাররা বাজারে মূলদলের সাথে এসে মিলিত হলাম। ভাররা এসে জানতে পারলাম কমাণ্ডার হুমায়ুন আক্রমণ করেছিল ঠিকই এবং যখন কিছুটা এগিয়েছে তখনই তাঁরা বিজয়ের সংবাদ পাঠায়। আমরা যখন এগিয়ে যাচ্ছিলাম সেই সময় হুমায়ুন আবার কিছুটা বিপদে পড়ে যায়। আর শুধু বিপদ নয়, পূর্বের দু'একটি স্থানের মত এখানেও সে হানাদারদের সঙ্গে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে না পেরে 'দে চম্পট নীতি' অবলম্বন করে। ফলে যা কিছু দুর্ভোগ, তা আমাদেরই পোহাতে হয়।

সামাদ গামা কমাণ্ডার হুমায়ুনের যুদ্ধ পরিচালনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। তার আফসোস প্রায় পঞ্চাশটি ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপের পরও হুমায়ুন কোম্পানী এগিয়ে না গিয়ে বরং পিছিয়ে এলো। তাই আমার কাছে অনুমতি চাইল রাতে নাগরপুর মুলহাটির উপর সে ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করবে। অনুমতি দিয়ে বললাম, 'বৃটিশ ৩ ইঞ্চি মটার থেকে নয়, চাইনীজ ৩ ইঞ্চি মটার থেকে গোলাবর্ষণ করতে হবে।

কারণ চাইনীজ মর্টারের গোলার কোন অভাব নেই, কিন্তু বৃটিশ ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলার পরিমাণ সীমিত।' সামাদ গামা তাতেই রাজী, সে নাগরপুর থানা থেকে এক দেড় মাইল উত্তরে একটি অত্যন্ত নিরাপদ জায়গা থেকে নাগরপুর থানা লক্ষ্য করে দু'শ চাইনীজ ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, তার ঐ রাতের গোলা নিক্ষেপ ছিল খুবই নির্ভুল। প্রায় এক'শ গোলা থানার সীমানায় পড়েছিল এবং সে রাতে হানাদারদের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল।

হেডকোয়ার্টার অভিমুখে

১৩ই অক্টোবর সকালে। হুমায়ুনের দলকে ঐ এলাকায় রেখে আরো দক্ষিণ নাগরপুর থানার কেদারপুরে এলাম। এখান থেকে মানিকগঞ্জের মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম সাহেবকে একটি পত্র পাঠালাম। পত্রের মূল বক্তব্য, যোগাযোগ সংক্রান্ত সামান্য ভুল বোঝাবুঝি দূর করা। উল্লেখ্য যে, জুলাই মাস থেকে নদী পথে সকল নৌযান থেকে টাংগাইল মুক্তিবাহিনী কর আদায় করছিল। টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর ইস্যুকৃত কর আদায়ের কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও কর প্রদানকারী নৌকাগুলো থেকে মানিকগঞ্জ মুক্তিবাহিনী দু'একবার কর আদায় করেছিল। মানিকগঞ্জ এলাকায় কর প্রদানকারী নৌকাগুলো থেকে দ্বিতীয়বার কর আদায়ের অথবা তাদের কাউকে নাজেহাল করার ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছিল। এরকম ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তাই সকল এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি ত্বরিৎ ও বাস্তবোচিত সমন্বয় বিধানে ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম সাহেবের কাছে প্রস্তাব পাঠালাম, 'নদী পথে কোন নৌকায় কর আপনারা নিয়েছেন, এমন প্রমাণপত্র থাকলে উজান এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা তা অত্যন্ত মর্যাদার সাথে মেনে নেব। ভাটিপথে কোন নৌকা যদি উজানের মুক্তিবাহিনীর বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারে তাহলে আশাকরি আপনারাও তা মেনে নেবেন। বিশেষ করে ঢাকার দিক থেকে আসা যে কোন নৌকার কর আপনারা আদায় করলে আমরা তা মেনে নেবে। এই ব্যাপারে আপনার কাছে একটি কর আদায়কারী প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছি। আশা করি আপনার দিক থেকেও প্রতিনিধি দল এসে পর্যায়ক্রমে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলবেন।' আমার এই পত্র ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম সাহেবের কাছে পৌঁছানর পর কর আদায় সংক্রান্ত অথবা অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে মানিকগঞ্জ বিক্রমপুর এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আর কোন অসুবিধা বা ভুল বোঝাবুঝি হয়নি। বরং একটা সুন্দর সৌহাদ্যপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

১৫ই অক্টোবর সারাদিন কেদারপুর, লাউহাটি এবং আশেপাশের বেশ কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখলাম। জুনমাসে লাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীর বাহেনের দলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যেখানে সাহাদৎ বরণ করেছিল সেই স্থানটিও দেখতে গেলাম। কোম্পানী কমাণ্ডার গোলাম সরোয়ার ও লাল্টুর বর্ণনামত লাউহাটি, কেদারপুর রাস্তার পাশে তিন চারটি শনের ঘর তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। আমার সহযোদ্ধাদের রক্তে সিক্ত পায়ে চলার পথটিতে দাঁড়িয়ে, প্রিয় সহযোদ্ধাদের বিয়োগব্যথায় কান্নায় বুক ভেঙে আসলো। সহযোদ্ধাদের শহিদ হওয়া স্থানটি নানাভাবে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে অশ্রুসিক্ত নয়নে সেখান থেকে ফিরে এলাম।

লাবিব জাহাঙ্গীর যেখানে নিহত হয়

বিকালে কেদারপুর ঘাটে নৌকায় বসে কি করে গ্রেনেড ফাটে, কেন ফাটে, আবার

মাঝে মাঝে দু'একটি কেন ফাটে না ইত্যাদি সহযোদ্ধাদের নানাভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। অন্যদিকে শতেক গ্রেনেড পরিষ্কার করে ব্যবহারের জন্য তৈরী করে নেয়া হচ্ছিল। গ্রেনেড মুছে ডেটোনেটর ভরে একের পর এক বেসপ্লেটগুলো শক্ত করে আটা হচ্ছে। এমন সময় আমার হাত থেকে হঠাৎ একটি গ্রেনেড ফসকে সামনে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়া মাত্র গ্রেনেডটিতে ভোঁ ভোঁ শব্দ হতে থাকে। গ্রেনেডের ধর্ম এই যে, পিন খুলে গ্রেনেড ছোড়ার চার সেকেন্ড পর তা বিস্ফোরিত হয়। তখন চার সেকেন্ড সময়ও নেই। চৌদ্দ পনের জন সহযোদ্ধা চারপাশে জড়াজড়ি করে বসে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হলে তার আঘাতে সবাই ক্ষতবিক্ষত হয়ে দানা পাকিয়ে যাবে। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে তপ্ত গ্রেনেড ধরে নিমেষে নৌকার ছোট্ট ফোকর দিয়ে নদীতে ছুঁড়ে মারলাম। গ্রেনেডটি পানিতে পড়ামাত্র ফেটে গেল। পানির প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকাটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সকল মুক্তিযোদ্ধাই অক্ষতভাবে বেঁচে গেল।

দুর্ঘটনা থেকে অব্যাহতি

আমি তখনও উত্তেজিত। আমার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। উত্তেজনায় শরীর ঝিমঝিম করছে। সৃষ্টিকর্তাকে লাখোলাখো শুকরিয়া জানালাম। অতীতে বহুবার আমি এমনি চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। অসংখ্য মানুষের প্রীতি, ভালবাসা এবং প্রকৃতির অপার মহিমায় বারবার বিপদমুক্ত হয়েছি। এবারও হলাম। সহযোদ্ধারা পুরো ব্যাপারটা বুঝার আগেই এত বড় একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল। গ্রেনেড ফেটে নৌকায় ধাক্কা লাগবার পর মুক্তিযোদ্ধারা যখন ব্যাপারটার গুরুত্ব ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করলো, তখন আমার প্রতি তাদের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস আরো বহুগুণ বেড়ে গেল। এরকম চরম মুহূর্তে চরম উত্তেজনাকর অবস্থাতেও ধৈর্য ধরে ধীর স্থির থেকে পুরোপুরি সফলতার সাথে কাজ করতে পারলাম। এটা দেখে সহযোদ্ধারা খুবই গর্ব অনুভব করলো।

এ অভাবনীয় চরম উত্তেজনাকর ঘটনার রেশ কেটে যেতে না যেতে সাত-আট জনের একটি দল একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে চল্লিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে কেদারপুর ঘাটে এসে পেঁছিল। 'পরদিন হেডকোয়ার্টারে পেঁছিবো'—এমন একটি খবর দিয়ে দূতদের একজনকে হেডকোয়ার্টারে যেতে নির্দেশ দিলাম। এতে তার কোন দুঃখ নেই, ক্লান্তি নেই অনিচ্ছা নেই, আমার বার্তা সে হেডকোয়ার্টারে প্রথম বয়ে নিতে পারছে, এই দুর্লভ সুযোগ পেয়ে নিজেকে সে পরম ভাগ্যবান মনে করলো। সীমাহীন আনন্দে সে উদ্বেলিত। শুধু হেঁটে নয়, যেন নাচতে নাচতে ছুটে চললো।

১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যার একটু আগে আমরা তিনটে নৌকা বিদায় করলাম। তিনটি নৌকার মধ্যে দুখানা জেলে নৌকা: নৌকা দুটি বারোদিন আগে ২রা অক্টোবর জগতপুর চর থেকে নেওয়া হয়েছিল। আর একটি শাহজানীর কমাণ্ডার মইনুদ্দীন জোগাড় করে দিয়েছিল। মাঝিদের বিদায় দেওয়ার সময় একটা কিসের ব্যথা অনুভব করলাম। আমরা নৌকার মাল্লাদের সাথে এতোগুলো দিন রাত কাটিয়েছি, থেকেছি, খেয়েছি। একটা মধুর আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের সাথে।

মাল্লাদের বিদায়

জেলে নৌকা দুটির মাল্লা পাঁচজন। পাঁচজনের প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের অধিকারী। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে সমুজ্জল। পাঁচজনের মধ্যে আট-দশ বৎসরের একজন বালক, আরেকজন বৃদ্ধ—বয়স ষাট্ট-পয়ষট্টি। বাকী তিনজন, বলিষ্ঠ যুবক। সকলেরই বাড়ী সরিষাবাড়ী থানায়। গোপালপুর কালিহাতী থানার নলিন, নিকড়াইল, শশুয়া থেকে জোগারচর—এই সমস্ত এলাকায় তারা প্রতি বছর মাছ ধরতে আসেন। মাছ ধরাই তাদের পেশা—জীবিকা। এদের দীর্ঘ দশ-বার দিনের মধুর ব্যবহারে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন মুগ্ধ অভিভূত তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের কছে থেকে সম্মান ভালবাসা ও মর্যাদা পেয়ে তারাও তৃপ্ত, অভিভূত ও উল্লসিত। জেলেরা চার পাঁচ দিনের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ছিল যে, তাদের সাথে যে লোকটি অতি সাধারণ ভাবে দিনরাত কাটিয়ে দিচ্ছে এবং সাদামাটা ব্যবহার করছে—তিনি আর কেউ নন, তিনি এলাকার মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতা।

কয়েকদিনে বাচ্চাছেলেটি আমার কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। বৃদ্ধের প্রতিও আমার মনে একটা অপরিসীম মায়া, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মেছিল। তাই এদের বিদায় জানাবার সময় আমরা দারুণ ব্যথা অনুভব করলাম। বিদায়কালে যখন মাল্লাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনাদের কত টাকা দিলে প্রাপ্য টাকা দেওয়া হবে।' তখন বৃদ্ধ মাল্লাটি বললেন,

—'বাবা আপনেরা যহন আমাগোর নায় উঠেন, তহন আমরা খুব এডা খুশী অইয়া আপনেগো নায়ে উঠাই নাই। আমরা মাছ ধরবার আইছিলাম। আপনেগো জন্যে হেই মাছ ধরায় ক্ষতি অইলো। পয়লা পয়লা আমাগোর তাই মনে অইছিল।

বর মিঞা (মুজিবর রহমান) সাহেব আমাগোর বইলা দিছি লাইন আপনেরা দুই-তিন দিন নাও দুইডা রাখ বাইন। দুইডা নায়ে দৈনিক একশ কইরা টেহা দিবাইন। কিন্তুক দিন অইয়া গেল তের চোদ্দটা। আমরা পয়লা পয়লা খুশী অইতে না পারলেও পরে কিন্তুক নিজেগো খুব ভাগ্যবান মনে করছি। আমরা গরিব জাইল্যা মানুষ। আপনেগো মতন লোকের সাথে অ্যাগপাকে খাইতে পারমু, এক বিছানে হুইতের পারমু, এইড্যা তো জন্মেও ভাবি নাইক্যা। তাই বাবা টেহা পয়সা আমরা কিছু চাই না। আপনেগো লগে আমাগো তো প্যাট ভরছে। বাড়িতে দুই চাইরড্যা প্যাট আছে, ওগো জন্যে আপনে ইচ্ছা করনে দুই-তিন'শ টেহা দিতে পারেন। আপনেরা যুদ্ধ করছেন। আমরা কিছু কইরতে পারিনা। তয় আমরাও স্বাধীন হইবার চাই। এই যে কয়দিন আপনেরা আমাগো লগে আছিলেন আমাগো এই মেহনতটাই স্বাধীনতার জন্যে থাইক।' বৃদ্ধের কথা শুনে আমার চোখে জল ছলছল করে উঠলো। বৃদ্ধকে বুকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে বললাম, 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমি কোথাও কারো সাথে এত দীর্ঘ সময় একত্রে কাটাতে পারিনি। আপনাদের পাশে এই দীর্ঘ দিন থাকার স্মৃতি সবসময় আমাদের উৎসাহিত করবে। আমাদের যুদ্ধটা সাহেব সুবাদের জন্য নয়। একেবারে আপনাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য। আপনারা আমাদের দোয়া করবেন। আমি এই যে টাকাটা দিচ্ছি এটা আপনাদের পারিশ্রমিক হিসাবে নয় আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা

হিসাবেই দিচ্ছি। বৃদ্ধটি বারবার অর্থগ্রহণে আপত্তি করেন। কিন্তু আমার অশ্রুসিক্ত আবেগজড়িত অনুরোধ শেষ অবধি বৃদ্ধ মাঝি উপেক্ষা করতে পারেননি। টাকা তাকে নিতেই হল। বাচ্চা ছেলেটির হাতেও আরোও কয়েকটি টাকা ধরিয়ে দিলাম।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সরিষাবাড়ির নৌকায় মাল্লাদের আড়াই হাজার এবং বাচ্চাছেলেটাকে তিন'শ টাকা দিয়ে বললাম, 'এরপর আপনাদের কখনো কোন কিছুর দরকার পড়লে আমার খোঁজ করবেন। আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলে আমি খুশী হবো।' আমার কথা যেন বৃদ্ধের অতীত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার জগতে প্রচণ্ড ভাবে খোঁচা মারলো। বিগত সুদীর্ঘ জীবনে বৃদ্ধ অগণিত মানুষ দেখেছেন তাদের সাথে থেকেছেন, খেয়েছেন, উঠাবসা করেছেন। বৃদ্ধ মাঝি অনেক সাহেবসুবা, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের দেখেছেন, যারা বিপদে পড়ে তাদের মত জেলে মুটে মজুরদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে, কাজ উদ্ধারের জন্য তোষামোদ করেছে অথচ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পর তারা শুধু সব কিছু ভুলেই গেছে তা নয়, পরবর্তী কালে এই সাহেবসুবরাই তাদের (খেটে খাওয়া মানুষদের) চরম তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করেছে। কাদের সিদ্দিকীও যে আরও উপরে উঠে সম্মানিত ও বিখ্যাত হয়ে সাধারণ মানুষের কথা ভুলে যাবেন না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? এ রকম মনে মনে ভেবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বৃদ্ধ জেলে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আমাগোরে এর পর দেখলে আপনি চিনতে পারবেন তো ?' বৃদ্ধের কথার অন্তর্নিহিত ও ইঙ্গিত পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করে বললাম, 'দেখবেন, ঠিক পারব।' সত্যিকথা বলতে কি এরপর দেখা হলে আমি তাদের বারবার চিনতে পেরেছি এবং যথাসাধ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেছি।

সাহজানীর চর থেকে ভাড়া করা নৌকার মাল্লাদের প্রতি অত আকর্ষণ না জন্মালে, তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণস্পর্শ করতে পেরেছিল। সাহজানীর নৌকার মাল্লাদেরও ৫০০ টাকা দিয়ে খুব সম্মান দেখিয়ে সকলের সাথে বুক মিলিয়ে বিদায় জানানো হলো।

১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যা, সূর্য আস্তে আস্তে ডুবে গেলো। আকাশের গাঢ় লাল রংটুকুও মিলিয়ে যাচ্ছে। পাখীরা দিনান্তে যার যার ঠিকানায় ফিরে যেতে শুরু করেছে। আকাশে দু' একটি তারা মিট মিট করে জ্বলছে। বইছে মৃদুমন্দ বাতাস। এ যেন বাতাস নয় ঝির ঝির বাতাসের আড়ালে প্রকৃতি যেন কথা কইতে চায়। প্রকৃতি যেন প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার কানে কানে বলতে চায়, আহ্বান জানায় তোমরা এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

আমরা এগিয়ে চলেছি। কেদারপুর থেকে সখীপুরের অনেকটা পথ আমি চিনি না। প্রথম এই রাস্তা দিয়ে চলছি। হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ মত কর্নেল ফজলুর দলের যারা এসেছে, তাদের মধ্যে আজহারুল ইসলাম, ফজলু আবদুল লতিফ ভোম্বল ময়থার বেনু, জাহাঙ্গীরের নাম উল্লেখযোগ্য। আর যাকে অগ্রিম পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, তার নাম দুরমুজ খাঁ। সে ঘাটাইল থানার গৌরাঙ্গ ইউনিয়নের অধিবাসী। ঐ পথ অতিক্রম করতে দুরমুজ খাঁকে বেশ কষ্ট ভোগ করতে হবে, এটা ভেবে আমি প্রথমে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু আমরা যখন এগুতে শুরু

করলাম তখন কর্নেল ফজলু কোম্পানীর যোদ্ধাদের নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতা দেখে অবাক ও বিস্মিত হয়ে গেলাম। দুরমুজ খাঁকে পাঠিয়ে দেয়ার অস্বস্তিও ভুলে গেলাম।

কেদারপুর থেকে হেডকোয়ার্টারের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল। ক্যাপ্টেন ফজলুর উল্কা গতি সম্পন্ন সহযোদ্ধারা এদিন সকালে বহেরাতলী থেকে কেদারপুরে আসে। তারাই আবার সন্ধ্যায় আমাকে পথ দেখিয়ে হেড-কোয়ার্টারে নিয়ে চলেছে। তাদের আনন্দ যেন ধরেনা। কর্নেল ফজলুদলের সদস্যারা পালা করে দু' এক মাইল সামনে ছুটে গিয়ে আবার পেছিয়ে এসে বারবার রাস্তার নিরাপত্তা খবর আমাকে অবহিত করছিল। রাত দশটার দিকে বন্নী গ্রামের মাঝ দিয়ে বাঐখোলায় ঢাকা-টাংগাইল পাকা সড়ক অতিক্রম করলাম। ক্যাপ্টেন ফজলু কোম্পানীর এই দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় কম করেও তিন চার বার এদিক ওদিক করেছে। ফলে তাদেরকে এক'শকুড়ি মাইলের মত পথ চলতে হয়েছিল।

ঢাকা টাংগাইল রাস্তা অতিক্রম করে কাশিল বিয়ালা ঘাট থেকে নৌকায় পাহাড়ের দিকে এগুলাম। কাশিল বিয়ালার মাঝামাঝি হাইলারাজার বাড়ীর পাশ ঘেঁষে

তেজপুর ঘাটে

বাথুলী হয়ে এগিয়ে চললাম। ১৫ই অক্টোবর ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আমাদের নৌকাগুলো বহেরাতলীর তেজপুর এসে ভিড়ল। এখানেই ক্যাপ্টেন ফজলু আমাদেরকে স্বাগত জানাতে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তেজপুরে আসার আগে পর্যন্ত হেডকোয়ার্টারে খবর ছিল যে, 'কাদের সিদ্দিকী আসছেন', তবে কখন কিভাবে আসছেন তা তাদের জানা ছিল না। তেজপুরে প্রাতঃরাশ সারলাম। বহুদিন পর পাহাড়ের প্রাণজুড়ানো বাতাস আমার শরীরে আনন্দের শিহরণ বইয়ে দিচ্ছিল। আমি এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে, পাহাড়ের মাঝে যেতে ছট্‌ফট্‌ করছিলাম। কিন্তু ক্যাপ্টেন ফজলুর এক কথা, 'স্যার, আমাদের একঘণ্টা সময় দিতে হবে। এখন আমরা আপনাকে পাহাড়ে যেতে দিতে পারিনা। আমাদের কিছু আনুষ্ঠানিকতা সারতে হবে।' বাধ্য হয়ে তেজপুরে একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো।

সকাল আটটা। তিনটি নৌকায় আমরা বহেরাতলী রওনা হলাম। তেজপুর থেকে বহেরাতলী দেখা যায়। দূরত্ব দেড় মাইলের বেশী নয়। মাঝখানের জায়গাটা বর্ষার পানিতে থৈ থৈ করছে। তেজপুর ঘাটের পুব পাশে আসতেই সামনের দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। চার-পাঁচ শত গজ দূরে পানির মধ্যে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমটায় ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অত পানির মধ্যে লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে কিভাবে! পরে খুব খেয়াল করে দেখলাম, লোকজন কেউ পানিতে দাঁড়িয়ে নেই। সকলেই নৌকার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, নৌকায় ছই নেই বলে প্রথম অবস্থায় নৌকাগুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল না। আমার নৌকা যখন দু'সারিতে বাঁধা অসংখ্য নৌকার মাঝে এলো তখন সেকি গগন বিদারী শ্লোগান! থৈ থৈ পানির মধ্যে শ্লোগানের এমন প্রচণ্ড আওয়াজ হতে পারে তা ভাবাই যায়না। জনতার মুখে তখন একই শ্লোগান—"তূর্য নিনাদ, বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ। হানাদারদের বাঁধবো। বঙ্গবন্ধুকে আনবো। জয় বাংলা জয় কাদের সিদ্দিকী, জয় মুক্তিবাহিনী।"

উত্তাল শ্লোগানের মাঝ দিয়েই আমরা বহেরাতলীতে পেঁছিলাম। তেজপুর থেকে বহেরাতলী পর্যন্তই শুধু নয়। বহেরাতলী থেকে সংগ্রামপুর পর্যন্ত একই ভাবে নৌকা এবং মানুষের সারি। তাদের বুকে হিম্মত, হাতে বৈঠা, মুখে শ্লোগান।

১৫ই অক্টোবর ক্যাপ্টেন ফজলু অথৈ পানিতে দু'সারিতে নৌকা বেঁধে আমাকে যে গণসম্বর্ধনা দিয়েছিলেন—তা সত্যিই চমকপ্রদ ও অতুলনীয়। তেজপুর থেকে বহেরাতলী হয়ে সংগ্রামপুর এই তিন মাইল জুড়ে দু'সারিতে নৌকা আর নৌকা। নৌকার উপরে হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দাঁড়িয়ে যে উন্নত মানের শৃংখলাবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাও অতুলনীয়। বহেরাতলীতে ক্যাপ্টেন ফজলুর দল গার্ড অব অনার প্রদান করলো।

বহেরাতলীতে ক্যাপ্টেন ফজলু ও অন্যান্যদের সাথে কথা বলে সখীপুর রওনা হলাম। সংগ্রামপুর ঘাটপারে। হামিদুল হক, খোরশেদ আলম আর. ও., সৈয়দ নুরু, ফারুক আহম্মেদ, নুরুন্নবী, মাষ্টার আমজাদ হোসেন এবং শওকত মোমেন শাজাহান সহ অন্যান্যরা স্বাগত জানান। বাজারের পাশের বিড়ি-পাতার ব্যবসায়ী-দের ক্যাম্প তখনও আগের মতই ছিল। এখানেই ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সংগঠিত অভিযান পরিচালনা করেছিলাম। ভারত প্রত্যাবর্তনের পর পাহাড়ে প্রবেশের সময় আবার সংগ্রামপুর এসেছি। আসলে জায়গাটির নাম শালগ্রামপুর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে লোকেরা জায়গাটির নামকরণ করেন সংগ্রামপুর। পাঠান পাতার-ব্যবসায়ীরা ফুল ও মালা দিয়ে আমাদের অভিনন্দিত করলেন।

বহেরাতলী থেকে সখীপুর

আবার শুরু হলো পথচলা। দুপুর বারোটা। সংগ্রামপুর সখীপুরের রাস্তাধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। রাস্তার দুপাশে মানুষ আর মানুষ। এত মানুষ এতদিন কোথায় ছিল তা আল্লা মালুম। সবাই কথা বলতে চান। হাত মিলাতে চান। চার পাঁচ শত গজ এগিয়ে যেতেই এক এক জন কোম্পানী কমান্ডার এগিয়ে এসে তার কোম্পানীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সে এক দেখার মত দৃশ্য!

সংগ্রামপুর থেকে সখীপুর মাত্র চার মাইল। এই সামান্য চার মাইল অতিক্রম করতে সময় লাগলো সাড়ে তিন ঘণ্টা। রাস্তার উভয় পাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানো মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবকদের অসংখ্য পরিচিত মুখ। প্রায় দুমাস পর আবার দেখা। সবার সাথেই দু'-একটি কথা বলতে হচ্ছিল। আর জনসাধারণ তো আছেই। তারা আরোও উদগ্রীব আরো উৎসাহী। তাদের কেউ হাত মিলাচ্ছেন, কেউ বুক মিলাচ্ছেন আবার কেউ বা মাথায় হাত রেখে দোয়া করছেন। কেউ কেউ পদধূলি নিচ্ছে। মানুষের পায়ের চাপে শুধু ধূলি উড়ছে। সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন একবিরাট ধূলি মেঘ সৃষ্টি হয়ে সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে।

আমরা সখীপুরের দিকে এগুচ্ছি। শত শত ক্লান্তিহীন মানুষ আমাদের পিছু নিয়েছেন। বলতে গেলে সখীপুরে আহূত সভার চার ভাগের এক ভাগ লোক

সখীপুরে জনসভা

আমাদের পিছু পিছু আসছেন। ঠিক সাড়ে তিনটায় সখীপুর বাজারে এলাম। সখীপুর স্কুল মাঠে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। হাজার হাজার লোক। এ যেন এক মিলনোৎসব। সখীপুর কমিউনিটি

সেন্টারের সামনে, আনোয়ারুল আলম শহিদ, ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী, গণপরিষদ সদস্য আবদুল বাছেত সিদ্দিকী, টাংগাইল বাস এসোসিয়েশনের সম্পাদক হাবিবুর রহমান (হবি মিয়া), বাসাইল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল আউয়াল সিদ্দিকী, সুসাহিত্যিক ও মুক্তিবাহিনীর প্রচার দপ্তরে নিয়োজিত অধ্যাপক মাহবুব সাদিক, অধ্যাপক কাজী আতোয়ার সহ অন্যান্যরা অভিবাদন জানালেন।

আমি হেডকোয়ার্টারে আসছি—এটা নিশ্চিত হয়ে বেসামরিক প্রধান আনোয়ারুল আলম শহীদ তার সহকর্মীদের নিয়ে এলাকার কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। স্থলপথ নিরাপদ হলেও আকাশপথ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে তখনও নিরাপদ ছিল না। স্থলপথে এগিয়ে আসা হানাদারদের মোকাবেলা করার সাহস ও শক্তি থাকলেও বিমান হামলা মোকাবিলা করার পুরোপুরি ক্ষমতা মুক্তিবাহিনীর ছিল না। ভারত সফরের পর প্রথম পাহাড়ে আসছি এবং খোলা মাঠে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে না পারলে যে কোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সখীপুরের চারদিকে প্রায় বিশ মাইল জায়গা জুড়ে স্থায়ী ঘাঁটিগুলোকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু অতিরিক্ত সাড়ে তিন-চার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে সখীপুর বাজারের দু-আড়াই মাইল দূরে থেকে পাঁচ-ছ মাইল এলাকা ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অতিরিক্ত তিন-চার হাজার মুক্তিযোদ্ধার প্রথম ও প্রধান কাজ আকাশ পথে হামলা প্রতিহত করা। মোট ৮টি ভারী মেশিনগানের আটটিই এখানে নিয়োজিত করা হয়েছে। সত্তর-আশিটি এম. এম. জি., তিন'শ এল. এম. জি. এবং আড়াই হাজার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল সদা প্রস্তুত। লক্ষ্য উপরে, আকাশ পথে। যেকোন সম্ভাব্য বিমান আক্রমণ প্রতিহত করতে মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যদিও সেদিন বিমানহামলা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের কলাকৌশল ও নৈপুণ্য দেখে এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, বিমান হামলা হলেও তা সফলতার সাথে মুক্তিযোদ্ধারা রুখতে পারতো।

সভায় অসংখ্য লোক হয়েছে। এর আগে ৫ই আগষ্ট কচুয়ার স্কুল মাঠে যে লোক সমাগম হয়েছিল—তার চাইতেও দ্বিগুণ-তিন গুণ লোক হয়েছে। জনতার উৎসাহ উদ্দীপনা যেন অন্য যে কোন জনসভার চাইতে হাজারগুণ বেশী। সখীপুর ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সামনে পেঁছিলে অভিবাদন শেষে আনোয়ারুল আলম শহীদ তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে সভাস্থলে নিয়ে গেলেন। কমান্ডার মতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে ৩০০ মুক্তিযোদ্ধার একটি সুসজ্জিত দল আনুষ্ঠানিক 'গার্ড-অব-অনার' প্রদান করল। 'গার্ড-অব-অনার' শেষে মুক্তিযোদ্ধারা বসে পড়লো। স্থানীয় ছোটছোট ছেলে মেয়েরা জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" পরিবেশন করলো। তারপর কোরান, গীতা পাঠের মাধ্যমে ভারত প্রত্যাগমনের পর প্রথম পাহাড়ী এলাকায় জনসভার কাজ শুরু হলো।

সর্বপ্রথম বেসামরিক প্রধান আনোয়ারুল আলম শহীদ স্বাগত জানিয়ে অভিনন্দিত করে তার বক্তব্য রাখলেন। স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে জয়নাল মওলানা একটি অতি সুন্দর বাস্তবমুখী বক্তব্য রাখলেন। গণপরিষদ সদস্য জনাব বাসেত সিদ্দিকী আবেগজড়িত কণ্ঠে অসীম সাহসিকতার সাথে হানাদারদের মোকাবেলা করতে ও

মুক্তিযোদ্ধাদের সকলপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও অসুস্থদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের জেল থেকে ছিনিয়ে আনার সংকল্প ঘোষণার মাধ্যমে সিদ্দিকী সাহেব তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

বেসামরিক প্রধান আনোয়ারুল আলম শহীদ জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'এবার আমি আপনাদের পক্ষ থেকে ঢাকা-টাংগাইল-ময়মনসিংহ-পাবনা মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা জনাব আবদুল কাদের সিদ্দিকীকে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।' তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনিতে সমগ্র সভাস্থল উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তাঁরা এতক্ষণ অসীম ধৈর্য ও আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শুভক্ষণটি সমাগত। তাই তাঁরা আনন্দিত, উদ্দীপ্ত ও উদ্বেলিত। করতালি ও শ্লোগানের মাঝে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই জনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। মাত্র দু'-ঘন্টার নোটিশে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ সখীপুর স্কুল মাঠে সমবেত হয়েছেন। এ যেন একটা সাধারণ সভা নয়, সুশৃংখল একটি বাহিনীর সভা। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। যেদিকে তাকাই, শুধু পরিচিত আর পরিচিত মুখ। অসংখ্য পরিচিতদের মধ্যে হাঠুভাঙ্গার স্বেচ্ছাসেবক কমাণ্ডার বারেক, কালমেঘার কমাণ্ডার কেতাব আলী, ফুলবাড়ীর আক্কেল আলী সিকদার, বাঘের বাড়ীর আবু বক্কর, ধনগড়ার সাজাহান ও সিরাজ, সাগরদীঘির মগদুস, দেওপাড়ার করিম মুন্সী, বহেরাতলীর গফুর সহ আরও অগণিত চেনা মুখ। তাদের কেউ কুড়ি মাইল, কেউ পঁচিশ মাইল আবার কেউ এসেছে ত্রিশ মাইল দূর থেকে।

আমি শান্তভাবে উচ্চারণ করলাম, 'আপনাদের সকলের উপর পরম করুণাময় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনারা আমার সশ্রদ্ধ ছালাম গ্রহণ করুন। প্রায় দীর্ঘ দু'মাস পর আবার আপনাদের সামনে হাজির হতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত ও গর্বিত। আজ এই ভাবে আপনাদের দেখে আনন্দে ও গর্বে আমার বুক ভরে গেছে। আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি শহিদী আত্মাদের, আমি আশু সুস্থতা কামনা করছি তাদের—যারা আহত হয়েছে। আমি ছালাম ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি সহযোদ্ধাকে, প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক ও প্রাণপ্রিয় জনসাধারণকে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ ও মোবারক বাদ জানাচ্ছি আনোয়ারুল আলম শহীদ, ইদ্রিস আলী, হামিদুল হক, আব্দুস সবুর খান, নুরুন্নবী, শাহাজাদা চৌধুরী, খোরশেদ আলম আর. ও. সাহেব, আমজাদ আলী মাষ্টার, ফারুক সৈয়দ নুরু, মোকাচ্ছেদ, মতিয়ার রহমান, কমাণ্ডার লতিফ, শওকত মোমেন শাজাহান ও অন্যান্যদের। আমি তাদের এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা যে বিশেষ সাহস ও কৃতিত্বের সাথে মুক্তিবাহিনীতে একতা ও শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছে। আরো যারা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে সে সব কোম্পানী কমাণ্ডার যোদ্ধাসহ অন্যান্যদেরও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের দোয়ায় আমি আবার

আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন আমাদের আঘাত করার ক্ষমতা আগের চাইতে অনেক গুণ বেশী। মুক্তিযুদ্ধে আবার আমি মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে কাজ করতে পারবো। আপনারা স্থির জেনে রাখুন, স্বাধীনতা বেশী দূরে নয়। জয় আমাদের হবেই। তবে আপনারা যে ত্যাগ ও দুঃখ কষ্ট স্বীকার করেছেন, তা অবর্ণনীয়। শুধু আপনারা কেন, সারা বাংলার মানুষ দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেছে। আপনাদের এই ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই, আমাদের দেশের লাখো লাখো ভাইবোন, মা, বাবা নির্যাতন ভোগ করেছেন, জালেমের হাতে শহীদ হচ্ছেন। শহীদদের রক্ত কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারেনা। ভাইয়েরা, বোনেরা, বন্ধুরা, আমি ভারতে যেতে চাইনি। বাধ্য হয়ে গিয়েছিলাম। ঐ সময় আমার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। আমার চিকিৎসার কোন সুযোগ ছিল না। আমি জানি আমার অবর্তমানে আপনাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। আমার অপারগতার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ইচ্ছা করে ভারতে না গেলেও, এখন দেখছি ভারতে গিয়ে ভালই হয়েছে। একদিকে যেমন আমাদের স্বাধীনতার প্রতি ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কি গভীর সহানুভূতি রয়েছে, তা আমি লক্ষ করেছি। অন্যদিকে লাখো লাখো ছিন্নমূল বাস্তুহারা-দের কি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, তাও আমি দেখেছি। সে সব ছিন্নমূলদের কথা মনে পড়লে এখনও আমার চোখে পানি আসে। তারা কেউই পরাধীন দেশে ফিরতে চায় না, তারা সবাই স্বাধীন বাংলাদেশ দেখতে চায় এবং এজন্য তারা আরও দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে স্বীকার করতে প্রস্তুত।

যদিও আমার পক্ষে কলকাতা বা ভারতের বড় বড় শহরে গিয়ে বড় বড় নেতাদের দেখার সুযোগ হয়নি বা আমি দেখতে যাইনি। তবে সেখানে আমাদের নেতাদের কে কি করছেন তার কিছু কিছু শুনেছি। আপনারা যখন আপনাদের কষ্টার্জিত অন্ন নিজেরা না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে তুলে দিচ্ছেন—তখন আমাদের কিছু কিছু নেতা কলকাতা, দিল্লি, বোম্বে সহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বিলাসবহুল হোটেলে আরামে দিন কাটাচ্ছেন। এসব নেতাদের কারও কারও চরিত্র সম্পর্কে আমি এমন সব অভিযোগ শুনেছি, যা উচ্চারণ করতেও ঘৃণাবোধ হয়। লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। সীমান্তের মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে যখন আমাদের যোদ্ধা ভাইয়েরা অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, শীত বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, রোগে ঔষধ পাচ্ছে না, শুনেছি তখনও ঐ সব নেতাদের দু'চারজন রিলিফের মাল বিক্রি করে তাদের ভোগ বিলাসের উপকরণ বাড়িয়ে তুলছেন। উদগ্র লালসা চরিতার্থ করে চলেছেন। বন্ধুরা, আমরা ঐ সব চোর, চোট্টা, লম্পটদের পরোয়া করি না। আমরা অস্ত্র ধরেছি, বঙ্গবন্ধুর আহবানে, তিনিই আমাদের নেতা। আমরা অস্ত্র ধরেছি আপনাদের মুক্তির জন্যে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে। স্বার্থপর, লোভী, চরিত্রহীন কিছু সংখ্যক বর্ণচোরাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা অস্ত্র ধরি নাই। বাংলার বুক থেকে হানাদারদের চিরতরে নির্মূল করাই আমাদের একমাত্র প্রথম কাজ ও প্রধান কর্তব্য। আমাদের নেতা আজ হানাদারদের জিন্দানখানার বন্দী। স্বাধীনতা এবং নেতাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবেই, চলবে। দুর্নীতিবাজ, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ বদমাইশদের

কথা ভাববেন না। একদিন না একদিন ওদের জনতার আদালতে বিচার হবেই।

আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই। পাহাড়ের মানুষ, চরের মানুষ আমাদেরকে সাহায্য না করলে আজকের এই অবস্থায় কিছুতেই আসতে পারতাম না। বন্ধুরা, মুক্তিসংগ্রামে আপনারা যে ভাবে সাহায্য করে চলেছেন তা ইতিহাসে এক দৃষ্টান্তহীন নজীর হয়ে থাকবে। আমি শেষবারের মত আবার আপনাদের অনুরোধ করছি ইস্পাত-কঠিন মনোবল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করুন। হানাদারদের ভারী অস্ত্রগুলো আমরা গুঁড়িয়ে দেবো। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে আমাদের হাতিয়ার হবে লাঙ্গল, কোদাল, কুড়াল, হাতুড়ি, কাস্তে। হানাদারদের ভারী ভারী অস্ত্রগুলি গলিয়েই তা করা হবে।

স্বেচ্ছাসেবক ভায়েরা, দীর্ঘ সময় তোমরা দেখেছ, একটি সুসংগঠিত সরবরাহ ব্যবস্থার কত প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মতৎপরতা ও যোগ্যতার উপর মুক্তিযুদ্ধের গতি ও সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল, মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা, আমি আবার তোমাদের সালাম জানাই। আমি এখন তোমাদেরই পাশে। তোমরা শত্রুর বুকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হও। পাহাড়ের জনগণ ও মা বোনেরা আবার আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা শপথ নিচ্ছি, বঙ্গপিতাকে যতদিন পর্যন্ত না হানাদারদের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করে আনতে পারবো, বাংলা থেকে হানাদারদের যতদিন পর্যন্ত উৎখাত করতে না পারবো—ততদিন পর্যন্ত আমাদের জন্য আরাম হারাম। শহিদী আত্মার মাগফেরাত, আহতদের আশু সুস্থ কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মুক্তিবাহিনী।'

সভাশেষে মওলানা জয়নাম একটি স্মরণীয় মোনাজাত করেন।

হাজার হাজার মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্যে আমার মন ভরে উঠলো। সভাস্থলে জনসাধারণের বেশী সময় অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। জনসাধারণকে তাড়াতাড়ি সভাস্থল ত্যাগ করতে বলা হলো। আস্তে আস্তে তারা যে যার বাড়ি যেতে লাগলেন। জনগণ তখন নূতন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। তাদের বুক ভরা আশা। আর কোন ভয় নেই, চিন্তা নেই। এবার এক এক করে হানাদারদের ঘাঁটিগুলোর পতন ঘটবে। হলোও তাই। ১৯৭১ সালের ২১শে অক্টোবরের মধ্যে টাংগাইল জেলা নতুন শহর বাদে সমগ্র এলাকাই মুক্ত হয়ে গেল। টাংগাইল পুরানো শহরও ১৯শে নভেম্বর একরাত মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

সভাশেষে দশ মিনিটের মধ্যে বগারচালার হেডকোয়ার্টারে এলাম। হেডকোয়ার্টারে এসেই আমাদের বাহিনীর শক্তি, পরিধি আঘাতের ক্ষমতা ও যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা সভায় বসলাম। পর্যালোচনার সময় দেখা গেল আগের তুলনায় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ ক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে। সমগ্র টাংগাইল, ঢাকা জেলার তিনটি থানা, ময়মনসিংহের চারটি এবং পাবনার চারটি থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর সাতানব্বইটি কোম্পানী ছড়িয়ে আছে। এই কোম্পানীগুলোর হাতে পদাতিক বাহিনীর ব্যবহারোপযোগী প্রায় সব রকম হাল্কা মাঝারী ও ভারী অস্ত্র শস্ত্র রয়েছে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিন্যাস

ভারী অস্ত্রের মধ্যে ৩ইঞ্চি মর্টার, রকেট লান্সার ব্লান্ডারসাইট, হাল্কা কামান, অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি ভারী মেশিনগান, শতাধিক এম. এম. জি, ছ'-সাত'শ'র উপর এল. এম. জি. রাইফেল, স্টেনগান, পিস্তল ও রিভলভার তো সাধারণ ব্যাপার। গোলাবারুদের সংখ্যা কত তার হিসাব রাখাই কঠিন। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৭১ সালের আগস্টের পর টাংগাইল মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদের কথা ভাবতে হয়নি।

পর্যালোচনার সময় আরোও লক্ষ করা গেল, ১৫ই অক্টোবর অবধি মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে চৌদ্দ হাজার। তালিকাভুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যাও ষাট হাজারের উপরে। এ দিনের পর্যালোচনা সভায় সমগ্র এলাকাকে ৫টি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হলো। প্রত্যেক এলাকা একজন সেক্টর কমান্ডার ও কয়েকজন কমান্ডারকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হলো। পর্যালোচনা সভায় নতুন পরিকল্পনা নেবার পরই যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি আরেকবার পাল্টে যায়।

এই সভাতে বেশ কয়েকজন কমান্ডারের পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। একজন কর্নেল কয়েকজন মেজর ও ক্যাপ্টেন এবং কয়েকজন কমান্ডার পদে উন্নীত হলো। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য এখানেই ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমানকে কর্নেল পদে উন্নীত করে একটি সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হলো।

সামরিক অঞ্চলগুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

সেক্টর নম্বর এক ঃ টাংগাইল-মধুপুর সড়কের পশ্চিম থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা। লক্ষ্য ঃ গোপালপুর, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, ধনবাড়ীর, শরিষাবাড়ী ঘাটি এবং টাংগাইল-মধুপুর-ধনবাড়ী সড়ক। বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সরিষা বাড়ীর কমান্ডার আনিসের উপর ধনবাড়ী, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট আক্রমণের দায়িত্ব অর্পিত হলো। কমান্ডার আনিস তার কোম্পানী নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে এই দু'স্থানে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেন। গোপালপুর থানার দায়িত্ব পেল মেজর আঙ্গুর, ক্যাপ্টেন আরজু, মেজর তারা, ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন হাবি। আরও চারটি কোম্পানী তাদের সাথে সংযুক্ত হলো। ঘাটাইল-কালিহাতী সড়কের দায়িত্ব দেয়া হল ক্যাপ্টেন চাঁদ মিয়াকে। এই সকল কোম্পানির মূল নেতৃত্ব ও কাজের সমন্বয় সাধনের ভার পেল দুর্ধর্ষ কমান্ডার মেজর আব্দুল হাকিম। কমান্ডার হাকিম গোপালপুরের নলিন বাজারে তার সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলো।

সেক্টর নম্বর দুই—নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকা ঃ ঢাকা-টাংগাইল সড়কের পশ্চিমে মির্জাপুর, নাগরপুর-টাংগাইল থানা, মানিকগঞ্জের ধামরাই, ঘিওর, খাটুরিয়া পাবনার চৌহালী ও বেতিল থানা। ধামরাই ও ঘিওর থানার দায়িত্ব কমান্ডার সুলতান এবং বেতিল ও চৌহালীর দায়িত্ব কমান্ডার মইনুদ্দীন ও কমান্ডার মোজাম্মেলের উপর অর্পিত হলো। নাগরপুর, মীর্জাপুর, ঘিওর, ঢাকা টাংগাইল সড়ক নজর রাখার দায়িত্ব পড়লো অন্য আরোও ছয়টি কোম্পানীর উপর। সঠিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় বিধানের ভার পেলো বহুল আলোচিত ও বিখ্যাত জাহাজমারা কমান্ডার মেজর হাবিবুর রহমান। নাগরপুর থানার সলিমাবাদে মেজর হাবিব তার দু'নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে এবং সলিমাবাদের কোম্পানী কমান্ডার, করটিয়া

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শাহআলমকে সেক্টর হেডকোয়ার্টার দেখাশোনার দায়িত্ব অপর্ণ করে।

সেক্টর নম্বর তিন ঃ আওতাভুক্ত এলাকা ; ঢাকা টাংগাইল সড়কের পূব পাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং টাংগাইল জেলা শহরের শত্রু ঘাঁটি। এই অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়করা হলো, মেজর মনিরুল ইসলাম, মেজর মোস্তাফা, মেজর লোকমান, ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন কলিবুর রহমান বাঙ্গালী, কমান্ডার মতি, কমান্ডার মোকাচ্ছেদ, পাক বাহিনীর গেরিলা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমান্ডার ক্যাপ্টেন আজাদ কামাল, ক্যাপ্টেন জসিম এবং ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহর কোম্পানীসহ আরও চারটি কোম্পানী। এদের তত্ত্বাবধানে রইলেন মুক্তিযুদ্ধের বিরল চরিত্রের অধিকারী কর্নেল ফজলুর রহমান। কর্নেল রহমান তাঁর সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলেন বহেরাতলীতে।

সেক্টর নম্বর চার—টাংগাইল-মধুপুর সড়কের পূবের সমস্ত এলাকা এই সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত। এদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কালিহাতী ও ঘাটাইল থানা. এবং টাংগাইল-ময়মনসিংহ পাকা সড়কে শত্রুর কনভয়। এই অঞ্চলের দায়িত্ব পেল ক্যাপ্টেন গোলাম সরোয়ার, ক্যাপ্টেন আব্দুল লতিফ, ক্যাপ্টেন রিয়াজ, ক্যাপ্টেন শাহজাহান। সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত হল মেজর নবী নেওয়াজের উপর। সে তার সদর দফতর স্থাপন করলো মরিচাতে।

সেক্টর নম্বর পাঁচ ঃ মধুপুর মুক্তাগাছা ও ভালুকার সমগ্র অঞ্চল। আঘাত ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ও লক্ষ্য বস্তু হল ঃ শত্রুর মধুপুর ঘাঁটি, জলছত্র ঘাঁটি, মুক্তাগাছা ত্রিশাশ ও ভালুকা থানা, এবং টাংগাইল-ময়মনসিংহ ও ভালুকা সড়কে শত্রুর কনভয়। কোম্পানী সহ দায়িত্ব প্রাপ্ত কমান্ডাররা হল ক্যাপ্টেন ইদ্রিস, মেজর আব্দুল গফুর, কমান্ডার আব্দুস সামাদ, ক্যাপ্টেন লাল্টু ও আরোও দু'টি কোম্পানী। এই সেক্টরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হলো। পূর্বাঞ্চলের পূর্ণ দায়িত্ব পেলো মেজর আকছার ; এবং পূর্ব-উত্তর অঞ্চলের দায়িত্বে থাকলো ক্যাপ্টেন লাল্টু।

মুক্তাঞ্চল সেক্টর বিভক্তি ও বিন্যাসের সময় পঞ্চাশটি কোম্পানীকে নিয়মিত, স্থায়ী ঘাঁটি রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হলো। বাকী কোম্পানীগুলোকে চলমান রাখা হলো। যখন যে প্রয়োজন সেখানেই ঝটিকা আক্রমণ করবে অথবা যুদ্ধে সাহায্য করবে।

টাংগাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের রণকৌশল ছিল গেরিলা যুদ্ধের চিরাচরিত কৌশলের অনেকটা বিপরীত। গেরিলাদের যুদ্ধনীতি হলো, আঘাত করে পালিয়ে যাওয়া। আমাদের প্রাথমিক নীতি ছিল, 'আঘাত কর ও অবস্থান কর।' এবার সেই নীতিরও পরিবর্তন ঘটানো হলো। এবার টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর নতুন নীতি, "আঘাত কর, অবস্থান কর ও এগিয়ে যাও"। আমাদের এই নতুন ও দুঃসাহসিক রণকৌশলের মুখে হানাদার বাহিনী বেশ বেকায়দায় পড়ে যায়। এই সময় ভেতরে আঘাতের প্রচন্ডতা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি সীমান্তের দিক থেকে হানাদার বাহিনীর উপর চাপও বৃদ্ধি পায়। ভিতর ও বাইর কোনদিক তারা সামলাবে, এ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হানাদাররা সীমান্ত নিয়ে তেমন চিন্তিত ছিল না। অক্টোবর নভেম্বর থেকে তাদের সীমান্তের দিকটাও সামলাতে হচ্ছিল। হানাদারদের এই উভয় সংকটে আমরা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যাই।

সামরিক বিভাগের কাজকর্ম শেষ করে বেসামরিক বিষয়াদির উপর দৃষ্টি দিলাম। প্রথমে হাসপাতাল ও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। হাসপাতালটি মুখ্যতঃ মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজনের তাগিদে গঠিত হলেও পরবর্তীতে জনসাধারণের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতেও সক্ষম হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত হবার পর আমরা এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে, সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব আমাদের উপর আপনা-আপনিই এসে গেছে। শুধু নিজেদের চিকিৎসা, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের কথা চিন্তা করলে চলবে না। সমগ্র অঞ্চলের সকল জনগণের কথা ভাবতে হবে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা এভাবে চিন্তা করে কর্মতৎপর হতে সক্ষম হয়েছিলাম বলেই জনগণের কাছে আমরা প্রিয় ও বরণীয় হতে পেরেছি।

স্বাস্থ্য দফরের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের বিভিন্ন দিক আলোচনা ও পর্যালোচনা করে দেখা গেল, সামরিক বিভাগের মত এই বিভাগটিও বিশেষ দক্ষতা ও সফলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। স্বাস্থ্য দফতরের সাথে সংশ্লিষ্ট সহকর্মীরা প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র, একটি করে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল ও মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকার জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ করে চলেছে। স্বাস্থ্য দফতরকে আর কোন নতুন নির্দেশ দেয়ার ছিল না। সহকর্মীদের আরোও নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় হতে পরামর্শ দিলাম। হাসপাতালের প্রাণশক্তি ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী সহ অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানালাম। একে একে অর্থ, যোগাযোগ, গণসংযোগ ও কারা বিভাগের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে খুবই সন্তুষ্ট হলাম। ভারত থেকে ফিরে প্রথম স্মরণীয় রাতটা হেডকোয়ার্টারে অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সাথে কাটালাম।

কারও চোখে ঘুম নেই। সকলের মনেই এক অপার আনন্দের অনুভূতি। অনেক যোদ্ধা একত্র হলে যা হয়। এখানেও তাই হলো। গানে, গল্পে, অভিজ্ঞতা বর্ণনায় রাত কেটে গেল। একদল আরেক দলের কাছে, বিগত দু'মাসের নানা অভিজ্ঞতা ক্লান্তিহীন ভাবে বর্ণনা করছে। শহীদ সাহেব কি ভাবে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে আবার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে এলেন, হামিদুল হক ও আর. ও. সাহেব কি ভাবে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন, আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে জনগণ সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, আমজাদ মাষ্টার কিভাবে দিনের পর দিন অসুস্থদের পাশে কাটিয়েছে, হেডকোয়ার্টার খাদ্য দফতরের দায়িত্ব প্রাপ্ত করটিয়া কলেজের এম. এ. শেষ বর্ষের ছাত্র, ওসমান কিভাবে আত্মগোপন করে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ করেছে, আর কিভাবেই বা হানাদাররা পাহাড়ের ভিতরে এসে আবার চলে গেল—ইত্যাদি সমস্ত ঘটনার আদি অন্ত একের পর এক সকলে সোল্লাসে বর্ণনা করলো। চরম সময়ের অভিজ্ঞতাগুলো বর্ণনা করতে যেন দাউদখান, হামিদুল হক ও অধ্যাপক মাহবুব সাদিকের জুড়ি নেই। তাদের ভীতিপ্রদ চরম চাঞ্চল্যকর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনে অনেক মুক্তিযোদ্ধাই শুধু নন—আমিও উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠতে চাইছিলাম।

হেডকোয়ার্টারে নিদ্রাহীন রাত

শহীদ সাহেবতো তার ভারত থেকে ফিরে আসার ঘটনা বলতে বলতে নিজেকে সামাল দিতে পারছিলেন না। রাতে হেডকোয়ার্টারে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম জানতে পারলো যে, কাদের সিদ্দিকীর নাম ও নির্দেশের বরাত দিয়ে শহীদসাহেব গত ৭ই সেপ্টেম্বর কমান্ডারদের নিয়ে যে সভা করেছিলেন—ঐ সভার ব্যাপারে আমার সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিল না। অর্থাৎ আমি তাকে কোনো নতুন নির্দেশ দিই নি। ৭ই সেপ্টেম্বরের সেই বিশৃংখল ও বিভেদপূর্ণ অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্যেরা যদি জানতেন যে, শহীদ সাহেব আমার সাথে মিলিত হননি, নির্দেশও পাননি, তাহলে অনেকে হয়তো অত তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইত না বা সাহসী হতো না। বিপদসংকুল সময় পেরোনোর পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসায় সত্য প্রকাশে আর কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ ছিল না, হলোও না। অসময়ে সত্য গোপন ও সময় মত সত্য প্রকাশ করার এই সিদ্ধান্ত টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, বাঙালী জাতির বুদ্ধিমত্তা প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ইতিহাসেও তা প্রভুত প্রশংসার দাবীদার।

এক টানা ঘণ্টাদুই সহকর্মীদের মন্তব্য, বক্তব্য ও নানা কাহিনী শোনার পর আমি আমার ভারত গমন থেকে প্রত্যাগমনের সমস্ত ঘটনা এক এক করে বর্ণনা করলাম। আমাকে ভারত সরকার, ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও জনগণ কিভাবে দেখেছেন, ভারত গমনের ফলে দেশের অভ্যন্তরস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কর্তৃপক্ষের যোগাযোগের সুযোগ হওয়ায় পরবর্তী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, ভারতে অবস্থান কালে দেশের সকল স্থানের মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে কিভাবে অভিনন্দিত করেছেন, বিশেষতঃ ভারতীয় জেনারেলরা কিভাবে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেছেন, ইত্যাদি ঘটনার কোন কিছুই সহযোদ্ধাদের জানাতে বাকী রাখলাম না। এমনকি গণপরিষদ সদস্যদের মনোভাব, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোন আগ্রহ বা সাড়া না পাওয়া এবং দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্তের পশ্চাতে সেই ঘটনা, সবই সহকর্মীদের সামনে একে একে তুলে ধরলাম। আলাপ করতে করতে সকাল হয়ে গেল।

আমার অনুপস্থিতির সময় ১৯৭১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আনোয়ারুল আলম শাহীদ, হামিদুল হক, নুরুন্নবী, খোরশেদ আলম, আর. ও. শওকত মোমেন শাহাজান, সৈয়দ নুরুল ইসলাম, ফারুক আহমেদ, ক্যাপ্টেন আব্দুস সবুর, ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আলী, ক্যাপ্টেন মোকাদ্দেছ, ক্যাপ্টেন মতি, ক্যাপ্টেন লতিফ এবং আরও কয়েকজন অক্লান্ত পরিশ্রম করে, মুক্তিবাহিনীতে শৃংখলা ও মনোবল ফিরিয়ে আনে। এ সময় মুক্তিবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার ভবানীপুর থেকে বগার চালায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

আমার অনুপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা

ক্যাপ্টেন আজাদ কামাল এমনিতেই মির্জাপুর থানার লোক। আর যুদ্ধের পুরোটা সময় বলতে গেলে সে মির্জাপুর ও কালিয়াকৈর থানা এলাকার মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছে। ২০-২১শে সেপ্টেম্বর আজাদ কামালের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি দল দেওহাটা রাজাকার ঘাঁটিতে এক ঝটিকা আক্রমণ চালায় এবং বিন্দু মাত্র ক্ষয়

ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে তিন-চার হাজার গুলি ও পনেরটি নানা ধরণের অস্ত্র উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। আজাদ কামালেরই অন্য একটি দল ফুলবাড়ী প্রাইমারী স্কুলে রাজাকারদের ঘাঁটির উপর গ্রেনেড হামলা করে। এতে পাঁচজন রাজাকার আহত ও দু'জন নিহত হয়। এ অভিযানে ডুবাইলের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আমিজ শাহাদৎ বরণ করে।

এদিকে নাটিয়াপাড়া (ইসলামপুর) পুল ধ্বংস করা দরকার। বিখ্যাত কমান্ডার ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে একটি দল ২রা অক্টোবর নাটিয়াপাড়া পুল ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পুলের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত রাজাকারদের উপর হামলা চালায়। পুল থেকে রাজাকারদের বিতাড়িত করে আট-দশটি রাইফেল হাজার তিনেক গুলি, কুড়িটি গ্রেনেড উদ্ধার করতে পারলেও এখানে মুক্তিবাহিনীর বীরযোদ্ধা ইব্রাহীম শহীদ হয়। মুক্তিযোদ্ধা ছানু সহ অন্য জন সামান্য আহত হয়। শহীদ ইব্রাহীম ছিল ই. পি. আর এর নায়েক। মর্টার থেকে গোলা ছোঁড়ার সময় শত্রুদের একটি গুলি তার বুকে বিদ্ধ হলে সে সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সেতু দখলে তিন জন রাজাকার নিহত হয়।

১৯৭১ সালের ৬ই অক্টোবর টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বেদনার ও গৌরবের দিন। বল্লার শত্রু ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধারা অবরোধ করে রেখেছে। ক্যাপ্টেন ফজলুর নেতৃত্বে তিন'শ মুক্তিযোদ্ধা চারদিন ধরে শত্রুর উপর চরম আঘাত হেনে চলেছে। বল্লার দখল তাদের চাই-ই। ৬ই অক্টোবর দুপুরে পনের-কুড়ি জন মুক্তিযোদ্ধা ঘনাবাড়ীর একটি বাড়িতে খেতে বসেছে। এই সময় একজন হানাদার দালাল শত্রু শিবিরে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের খবর দেয়। প্রথমত মুক্তিযোদ্ধারা পাহারা রেখে দুপুরের খাবার খেতে বসেছে, ঠিক এমন সময় পাহারারত মুক্তিযোদ্ধাটি খবর দেয়, হানাদাররা বাড়ীটি ঘিরে ফেলেছে। কুড়ি জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে পনের জনই খেতে বসেছিল। খাওয়া রেখে অস্ত্র হাতে দুশমনের মোকাবেলায় তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিন দিকে ছুটলো। বাড়ীটি ঘিরে ফেললে ষোল-সতের জন হানাদার বুকে হেঁটে পশ্চিম দিক থেকে বাড়ীটিতে উঠতে যাচ্ছিল। এটা লক্ষ করে মোমেন ও আবু হানিফ দৌড়ে গিয়ে তাদের উপর গুলি ছোঁড়া শুরু করে। সামান্য একটু আড়াল নিয়ে দশ-বারো গজ দূর থেকে হানাদারদের উপর এমন দুঃসাহসিক আক্রমণ খুব কমই হয়েছে। মোমেন ও আবু হনিফ এবং আরো দু'জন মুক্তিযোদ্ধার অবিরাম গুলির মুখে পশ্চিম দিকে হানাদারদের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। শুধু রুদ্ধ নয়—সেখানে আটজন হানাদার নিহত ও চারজন মারাত্মক ভাবে আহত হয়। অবস্থা চরম প্রতিকূল ও ভয়াবহ দেখে হানাদাররা লাশ ফেলে পিছু হঠছিল। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আরও বেড়ে যায়। তারা আড়াল থেকে বেরিয়ে আরোও এগিয়ে হানাদারদের উপর গুলি চালাতে থাকে। হঠাৎ হানাদারের একটি গুলি এসে মোমেনের বুক ভেদ করে বেরিয়ে যায়। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। হানিফের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে বিরামহীন ভাবে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। হঠাৎ একটি গুলি এসে হানিফের বক্ষ ভেদ করে চলে যায়। সেও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মোমেন, হানিফ শহীদ হলে বাড়ীর পশ্চিম দিকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে

দেখে তা সুদৃঢ় করতে এগিয়ে আসে রকেট ও আমীর। আমীরের নাম যদিও তার পিতামাতার দেয়া তবে রকেটের আসল নাম কি তা মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। দ্রুত চলতে পারতো বলে জুলাই মাসের শেষে হেডকোয়ার্টারের সহকর্মীদের অনুরোধে তার নাম দেয়া হয়েছিল রকেট। সে সময় থেকে রকেট নামের নীচে তার আসল নাম চাপা পড়ে যায়। রকেট ও আমীর পশ্চিমদিকে এসে অবস্থান নেয়ায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তুমুল যুদ্ধ চলেছে। মুক্তিবাহিনীর দু'জন শহীদ ও তিন জন আহত হয়েছে।

এ দুঃসংবাদ ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমানের কাছে পৌঁছলে তিনি তার দুর্ধর্ষ সহকারী ক্যাপ্টেন মোস্তফাকে পুরো দল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্ধার ও হানাদারদের ঘিরে ফেলতে ঘনাবাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। ঘণ্টাতিনেক যুদ্ধ চলার পর বাড়ীর উত্তর পশ্চিম দিক থেকে কয়েকজন হানাদার রকেটের অবস্থান নেয়া বাড়ীতে উঠতে চেষ্টা করে। এটা লক্ষ করে আমীর ও রকেট ত্বরিৎ গতিতে সেদিকে ছুটে যায়। হানাদারদের কাছাকাছি হতেই রকেট শুনতে পায় একজন হানাদার কয়েকজনের কাছে গুলি চাইছে। এদিকে রকেটের গুলিও শেষ। নিজের গুলির ভাণ্ডার শূন্য তা বুঝতে না দিয়ে হানাদারদের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য সে 'হ্যাণ্ডস আপ' 'হ্যাণ্ডস আপ' বলে তাদের সামনে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে। হানাদাররা হাত উঠাতে নারাজ। সম্ভবতঃ হানাদারদের কাছেও গুলি ছিল না। রকেট তার রাইফেল দিয়ে একটি হানাদারের মাথা লক্ষ্য করে সজোরে আঘাত হানে। আঘাতে হানাদারটির মাথা দু'টুকরো হয়ে মগজ মাটিতে ছিটকে পড়ে। এই সময় অন্য একজন স্বাস্থ্যবান হানাদার রকেটের মাথায় আঘাত হানে, রকেট তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায়। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেলের বাটের এক আঘাতে আরেকটি হানাদারের মাথা উড়িয়ে দেয়। আর এ সময় রকেটকে আঘাত করতে উদ্যত হানাদারটিকে আমীর রাইফেল দিয়ে ক্রমাগত পিটাতে থাকে। বিশাল ও দানবাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধা আমীরের রাইফেলের দুইটি আঘাতও সে সহ্য করতে পারলো না। সে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু আমীরের রাইফেলের বাটটি ভেঙে বহু দূরে ছিটকে গেল।

মুক্তিযোদ্ধা রকেট মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তার দেহ প্রাণহীন হিম শীতল। শত্রুনিধনে তৎপর ও উন্মত্ত আমীরের সেদিকে কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ক্ষিপ্রতার সাথে রকেটের রাইফেল তুলে নিয়ে অবশিষ্ট হানাদারটিকে বারবার মরণাঘাত হানতে থাকে। হানাদারটিও কম যায়না। সেও আমীরকে পাল্টা আঘাত হানতে থাকলো। এক সময় আমীর হাতিয়ার ছেড়ে কোমর থেকে বেওনেট বের করে মাখনে ছুরি চালনোর মত হানাদারটির পেটে ঢুকিয়ে দিল। আমীর স্থান ত্যাগ করবে এমন সময় পাশ থেকে একটি গুলি এসে তার বাম পাঁজরে বিদ্ধ হয়। সেও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এদিকে অবস্থা গুরুতর দেখে হানাদাররা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

ঘনাবাড়ীর যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর চারজন দুরন্ত বীর শাহাদৎ বরণ করে এবং দু'জন আহত হয়। হানাদারদের ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল প্রচুর। মুক্তিযোদ্ধারা

ঘনাবাড়ীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কুড়িটি হানাদার লাশ দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। স্থানীয় জনসাধারণের মতে হানাদারদের পক্ষে পঞ্চাশজন নিহত ও আশি জন আহত হয়েছিল। এই যুদ্ধ যেমন স্থানীয় জনসাধারণের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিল; ঠিক তেমনি বল্লা হানাদার ঘাঁটিতে সরবরাহকারী কুখ্যাত দালালটিও উপযুক্ত শাস্তি-ভোগ করেছিল। উপযুক্ত শাস্তিটা কি ধরনের? তিনদিন পর স্থানীয় জনগণ তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।

ঘনাবাড়ীতে চারজন শহীদ ও ছ'জন আহত হওয়ার ঘটনার পরদিন বল্লার যুদ্ধেও দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। আমীর, রকেট, মোমেন ও আবু হানিফ চারজন সুযোগ্য সহযোদ্ধা হারিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। এর জের হিসাবে ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় শত্রুর গুলিবৃষ্টির মাঝে হেঁটে, মুক্তিবাহিনী বল্লা ঘাঁটি দখল ও কুড়িজন হানাদার বন্দী করতে সক্ষম হয়। বল্লা ঘাঁটিতে তখন প্রায় এক'শ নিয়মিত হানাদার ও দু'শ রাজাকার ছিল। ৭ই অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের সামনে তারা দাঁড়াতেই পারেনি।

আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে টাংগাইল শহরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে গিয়ে সালাহউদ্দীন ও বাকু শহীদ হয়।

১৯৭১ সালের ২৯শে আগস্ট। কমান্ডার আবদুল হাকিম ভারতে যাওয়ার পথে ঝাউয়াইল-ভেঙ্গুলার কাছে গোপালপুর থানার পানকাতায় শত্রুদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। সে হেমনগর হয়ে ঝাউয়াইলের মাঝ দিয়ে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট পেরিয়ে যমুনা ধলেশ্বরীতে নৌকায় উঠবে, এই চিন্তা করে এগুতে থাকে। পথে ২৯শে আগস্ট সে পানকাতায় একদম অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কানুটিয়ার মুস্তাফিজুর রহমান, কালিহাতীর সাইদুর রহমান, ছোট চওনার ইদ্রিস সহ আট জন মুক্তিযোদ্ধা পানকাতার যুদ্ধে শাহদৎ বরণ করে। আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের অমূল্য জীবন দিয়ে তিন'শ মুক্তিযোদ্ধার দলটিকে বিপদমুক্ত করে বাঁচিয়ে গেল।

হানাদাররা ঘেরাও করতে এসে অক্ষত ও নির্ঝঞ্ঝাটে যেতে পারেনি। তাদেরকেও প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছিল। পানকাতার যুদ্ধে হানাদারদের ষোলজন নিহত হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মেজর আফছার আমার সাথে যোগাযোগ করতে ভারতের আগরতলায় যান। তিনি আগরতলায় মুক্তিবাহিনীর নানা ক্যাম্প দিন দশেক অতিবাহিত করেন। এসময় তুরা থেকে বাংলাদেশে অভ্যন্তরে প্রবেশের মুখে আমি মেজর আফছারকে দেশের ভিতরে চলে যাবার নির্দেশ দিই। মেজর আফছার দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভালুকা, ফুলবাড়িয়া ও ত্রিশালের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি সুবিন্যস্ত ও সুসংহত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে, হাজার হাজার

অনন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

স্বেচ্ছাসেবকরা যে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে তা বাংলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অকুণ্ঠ সমর্থন সহযোগিতা ও সাহায্য দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের কাজের বোঝাই শুধু কমিয়ে দেয়নি—অনেক অনেক জায়গায়, মহামূল্যবান

তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করে তারা যুদ্ধের গতি প্রকৃতি পর্যন্ত পাল্টিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বাহাত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের সকলের কথা আলোচনা করতে পারব না যদিও সবার কথাই আলোচিত হওয়া উচিত। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতীক হিসাবে দু'চার জনের কথা আলোচনা করছি। মূলত এদের কথা ও অবদান আলোচনা না করলে টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমি যখন নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন বাঘের বাড়ীর আবুবকর বিশেষ আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে যথেষ্ট সহায়তা ও সাহায্য করেছিল। আবুবকরই সর্বপ্রথম আমাকে বলেছিল, 'কাদের ভাই কয়েকটা বন্দুক এনে দিন। হানাদারদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি বা না পারি চোর ডাকাত দমন করতে তো পারব। তাতে লোকেরা কিছুটা শান্তি পাবে।' পরিচয়ের পর থেকে, মুক্তিবাহিনী গঠন, যুদ্ধপরিচালনা, স্বাধীনতা লাভ ও স্বাধীনোত্তর পর্যায় সকল অবস্থাতেই দৃঢ়চেতা আবুবকর পূর্বের মানসিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

এমনি একজন স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার দুর্গাপুরের হাসান ডাক্তার। এই ভদ্রলোক বিগত ৩রা এপ্রিল রাতে তার ভাইকে দিয়ে গরুর গাড়ী এনে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তার সহযোগিতার সূত্রপাত করেন। মুক্তিবাহিনীর খাবার জোগাড়, থাকার ব্যবস্থা, খবর সংগ্রহ করে আনা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গোলাগুলি সরবরাহ ইত্যাদি কর্মকান্ডে হাসান ডাক্তার তার স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ভন্ডেশ্বর ইউনিয়নের আবু হানিফ এমনি আর একটি বিরল চরিত্র। দেওপাড়া থেকে বল্লা, মরিচা থেকে দেড়পাড়া, পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চল আবার পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চল যেখানেই, যেদিকেই মুক্তিবাহিনীরা যাবে বা যাচ্ছে, ভন্ডেশ্বর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার আবু হানিফের সহযোগিতা তাদের চাই চাই-ই। সত্যিকার অর্থে, ঐ এলাকায় তার সহযোগিতা ছাড়া মুক্তিবাহিনী একেবারেই অচল অকেজো। হানিফ নেই মানে সব থাকলেও যেন মুক্তিবাহিনীর পা নেই। তাই আর চলা সম্ভব নয়। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে সব আছে কিন্তু হানিফের যোগাযোগ নেই। বুঝতে হবে মুক্তিবাহিনীর গুলি নেই। আবু হানিফের সাথে যোগাযোগ হওয়া মানেই গোলাবারুদ, খাবার দাবার সহ সব অসুবিধার অবসান।

ঘাটাইল থানাধীন রসুলপুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার আবুল কাসেমের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। আবুল কাসেম জুলাই মাস থেকে মুক্তিবাহিনীর 'সিগন্যালম্যান' এ পরিণত হয়। তার যোগ্যতাও ছিল অপরিসীম। সারা রসুলপুর তো বটেই পাশের সাগরদীঘি, কাজলা, কামালপুর, পেঁচার, আটা শনখলা এইসব ইউনিয়নও তার নখদর্পণে। আবুল কাসেম নুরুন্নবী ও ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে আমার মা ও ভাইবোনদের স্বেচ্ছায় ঢাকা পৌঁছে দেয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করেছিল।

রসুলপুরের পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন সাগরদীঘি। সাগরদীঘির স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার পাগড়িয়ার রূপা সিকদারের দুই ছেলে মখদম ও জামাল সিকদার। এদের কর্মতৎপরতা বর্ণনা করে শেষ করবার নয়। সাগরদীঘি থেকে বড়চওনা এই বিরাট

এলাকার খবরাখবর তারা যে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে পেঁাছে দিয়েছে—তার কোন তুলনা নেই।

দক্ষিণাঞ্চলে বংশীনগরের স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার আবুলের নিয়ন্ত্রনাধীন স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাপার স্যাপার ছিল আলাদা ধরনের! শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার দিক থেকে তারা যেকোন সর্বাধুনিক বাহিনীকে হার মানাতে পারে।

কার কথা রেখে কার কথা বলবো? বংশীনগরের স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার আবুল, কাল মেঘার কিতাব আলী, ফুলবাড়িয়ার আক্কেল আলী সিকদার, হাটু ভাঙ্গার আব্দুল বারেক, গজারিয়ার মোজাম্মেল, বড় চওনার শাহজাহান—এদের নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে চওনা, কচুয়া বাটাজোড়, কাছিনা, কালমেঘা, হাতেয়া, পাপুড়িয়া চালা, বংশীনগর, হাটুভাঙা, পাথরঘাটা প্রতিমাবংকী, নাংগুলিয়া, দারিয়াপুর ইত্যাদি এলাকার সব খবর নখদর্পণে। আধুনিক যানবাহনে চলাচলকারী হানাদারদের চাইতেও দ্রুততার সাথে এরা সকল প্রকার ঝুঁকি ও বিপদ মাথায় নিয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানের খবর ও তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের জন্য খবর ও তথ্য সংগ্রহ করা তাদের কাছে যেন এক অতীব সম্মান ও গৌরবের বিষয়। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের কর্তব্য কর্মে এতই দক্ষতা অর্জন করেছে—এতই পারদর্শী হয়ে উঠেছে যে, সকল এলাকার সবরকমের তথ্য তাদের কাছে চাইবা মাত্র পাওয়া সম্ভব। টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইতিমধ্যেই একবিশাল সকল খবর সংগ্রহ ও পরিবেশন সংস্থায় পরিণত হয়েছে। যার শাখা প্রশাখা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

কমান্ডার আবুলের নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাসেবকদের হাজারো উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা তুলে না ধরলেই নয়। স্মরণীয় যে, আমি আক্কেল আলী সিকদারকে সাক্ষাতদান ও মুক্তিবাহিনীতে কাজ করতে সুযোগ দিয়েছিলাম। এবং এক'শ সাঁয়ত্রিশ জন রাজাকারের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলাম। আলোচ্য ঘটনা সেই দিনের। আমরা পাথরঘাটা থেকে বাঁশতলী হয়ে হতেয়ার দিকে এগুচ্ছিলাম। তখন দুপুর গড়িয়ে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে কিছুটা হেলে পড়েছে। আমাদের সামনে একটি বাইদ। কয়েকদিন ধরে কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বাইদে কোথাও হাঁটু কোথাও আবার কোমর সমান পানি। অপরিচিত কেউ দূরে থেকে দেখলে নীচু বাইদকে একটি বিরাট নদী ছাড়া আর কিছুই ভাবতেন না। আমরা হতেয়ায় যাচ্ছি। সারা রাস্তায় মুক্তিবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষ থেকে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুরো রাস্তাটাই সুগম নিরাপদ। আমাদের তিনটি দল একের পর এক চলে গেছে। তিনটি দলের পিছনে আমি। আমার দলের সদস্যসংখ্যা চল্লিশ। মূলদলের আগে দশজনের একটি অগ্রবর্তী দল। একটু পিছনে আরও পাঁচজন, এরপরে আমি। আমার একটু পিছনে দশ জন ও আরও পিছনে সর্বশেষ পনের জন। এমনিভাবে প্রায় আধমাইল লম্বা লাইনে আমরা এগুচ্ছিলাম। আমাদের দলের অগ্রবর্তী দশ জন বাইদের কোমর সমান পানিতে কাপড় ভিজিয়ে পার হয়ে গেছে। তাদের পেছনের পাঁচ জনও বাইদ পেরিয়ে কিছুটা চলে গেছে। এমন সময় হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে প্রচণ্ড জোরে চ্যালেঞ্জ ভেসে এল, 'হ্যান্ডস-আপ, পাস ওয়ার্ড।' সাবধান নাড়াচড়া কইরেন না, নড়লেই গুলি করমু, আপনারা

কেরা' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে কে যেন ছুঁড়ে মারলো। এদিকে কোমর সমান পানিতে আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। একি ব্যাপার? এ আবার কোন বিপদ? হঠাৎ করে কে আবার চ্যালেঞ্জ করছে? এমনতো হবার কথা ছিলনা!

সত্য কথা বলতে কি ঐ এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের পাস ওয়ার্ড আমাদের জানা ছিল না। আমি তখনো কোমড় সমান পানিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আমার দশ-বারো হাত সামনে তমছের, গোয়াইলবাড়ির আবুল কাশেম চ্যালেঞ্জকারীদের বারবার বলল, 'দেখুন আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক' আমরা পাসওয়ার্ড জানিনা। আমাদের যেতে দিন।' 'ঝোপের আড়াল থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের একই কথা, একই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ, 'নড়লেই গুলি করমু। আপনারা যে মুক্তিবাহিনী তার প্রমাণ কি?' তারা গর্বের সাথে আরও বললো, 'এই রাস্তা দিয়া আমাগো সি-ইন-সি সাব যাবেন। আমরা আপনাগোর না জাইনা, না পরীক্ষা কইরা যাইতে দিতে পারমু না।' একথা শুনে তমছের খুব মিনতি করে স্বেচ্ছাসেবকদের বলল, 'আপনারা দয়া করে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুন এবং ভালো করে আমাদের দেখুন। আমরা সি. ইন. সি. সাহেবের অগ্রবর্তী দল।' আকুতি অনুরোধ কোন কিছুই স্বেচ্ছাসেবকদের টলাতে পারল না। ঝোপের আড়ালে সদাসতর্ক স্বেচ্ছাসেবকদের সাফ জবাব, 'না, ঝোপের ভিতর থাইকা বাইরাইতে পারমু না।' এসময় অগ্রবর্তী দলের সেকশন কমান্ডার মকবুল হোসেন খোকা ও মোতালেব হোসেন গুর্খা পিছিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে যেতে চাইলে তাতেও তারা আপত্তি জানায়। কাছে যাবার চেষ্টা করলে তারা গুলি করার হুমকি দিল। আমরা তখনো কোমর সমান পানিতে। মকবুল হোসেন খোকা চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী স্বেচ্ছা-সেবকদের তাদের কমান্ডারকে ডেকে আনতে অনুরোধ করল। খোকার কথামত জনৈক স্বেচ্ছাসেবক তাদের কমান্ডারকে ডেকে আনতে ছুটে গেল।

চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রকৃত সংখ্যা কত, তা আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী দু একজন নয়, কম করে সাত-আট জন। জনৈক স্বেচ্ছাসেবক তার কমান্ডারকে ডেকে আনতে গেল। এদিকে আমরা চ্যালেঞ্জকারীদের পুনরায় অনুরোধ করলাম, 'আমাদের পানি থেকে উপরে উঠতে দিন। হয় আমরা এই পাড়ে উঠি; না হয় পিছিয়ে গিয়ে যে পাড় থেকে এসেছি, সেই পাড়ে গিয়ে উঠি।' আমাদের এ প্রস্তাবেও চ্যালেঞ্জকারী স্বেচ্ছাসেবকদের ঘোরতর আপত্তি, 'না, আপনারা নড়াচড়া করতে পারবেন না। নড়লেই গুলি করমু। সত্যিই যদি আপনারা মুক্তি-যোদ্ধা হন, তাইলে জোর করলে আপনাগোর অসুবিধা আছে। গুলিতে দু'চারজন তো মরবাইনই। হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করলে, বাকী যারা থাকবেইন, তাগোরও কঠোর শাস্তি হইবো। তাই নড়াচড়া কইরেন না।'

অগত্যা আর কি করা? কোমর পানিতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ওখানকার স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার আবুল হোসেনকে পাওয়া গেল না। তবে স্বেচ্ছাসেবকটি একজন সহকারী কমান্ডারকে নিয়ে এসেছে। তাতেও সমস্যার সমাধান হল না। সহকারী কমান্ডার আমাকে অথবা দলের কাউকে ভাল করে চিনে না। তাছাড়া তাকেও স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার আবুল কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছে :

'রাস্তাটির পুরো খোঁজ খবর নিতে হবে। এবং সব সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দুপুরের মধ্যে সর্বাধিনায়ক ঐ রাস্তা অতিক্রম করে যাবেন।' তাই সে তার কমাণ্ডারের কঠোর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। এর বেশী কিছু সে জানে না।

জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিচক্ষণ ও সফল মকবুল হোসেন খোকা সহকারী কমাণ্ডারের সাথে বেশ কয়েক মিনিট কথা বলে তাকে বুঝাতে ও বিশ্বাস করাতে সমর্থ হয় যে, আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক এবং সর্বাধিনায়কের অগ্রবর্তী দল। তবে কেবল কথা বলে তাদের বিশ্বাস করানো যায়নি। আমরা সর্বাধিনায়কের দলের লোক— একথার স্বপক্ষে আমার হাতের লেখা পুরানো দু-একটি ছোট কাগজ দেখাতে হলো। যা হোক, সহকারী কমাণ্ডারের নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের যেতে দিতে সম্মত হল। স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের দেখছিল কিন্তু আমরা স্বেচ্ছাসেবকদের দেখতে পাচ্ছিলাম না। এত বড় ঘটনার নায়করা কোন ক্রমেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের মুখ দেখাতে রাজী নয়। তারা তাদের মুখ দেখায়ও নি।

আক্কেল আলী সিকদার, আব্দুল বারেক ও কিতাব আলী মাস্টার নানা প্রসঙ্গে অসংখ্যবার আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। তাদের মতই আরেকজন সবল ও সার্থক স্বেচ্ছাসেবক কমাণ্ডার বৈলানপুরের ইব্রাহিম মেম্বরের ছেলে দুলাল। দুলালও যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ অবধি সাগরদীঘি, ধলাপাড়া, শেওড়াবাড়ী, বাঘের বাড়ী, দেওপাড়া ও মীরচা সহ অন্যান্য গ্রামে উল্কার বেগে ছুটে বেরিয়েছে। ওর নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাসেবকরা ওর মতই সদা প্রস্তুত, সদা তৎপর। এলাকার সকল খোঁজ খবর যেন ওদের হাতের মুঠোয়।

বহেরাতলীর স্বেচ্ছাসেবক কমাণ্ডার আব্দুল গফুর। খুব সাদাসিদে, শান্ত প্রকৃতির লোক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় সে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে হয়ে উঠে কঠোর, কঠিন ও নির্মম। সে নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে থাকে। একক প্রচেষ্টায় বহেরাতলী ইউনিয়নে একটি সুশৃংখল মরণজয়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে। বহেরাতলী ইউনিয়নের তদানীন্তন প্রতাপশালী চেয়ারম্যান আবু জাফর সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক অবস্থা ও প্রতিপত্তিতে করটিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আব্দুল গফুরের চাইতে অনেক গুণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে, তিনি আব্দুল গফুরের নেতৃত্ব সানন্দে মেনে নেন। এবং একজন সহকারী স্বেচ্ছাসেবক কমাণ্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ৪ঠা মে অবাঙ্গালী পাড়ায় ব্যবসায়ীদের ক্যাম্প অভিযানের আগে আমি এই আব্দুল গফুরের বাড়ীতেই দুপুরের খাবার খেতে উঠেছিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেদিন আমরা তার বাড়ীতে খেতে পারিনি। খাবারের সকল উপাদান বিশেষ যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে যোগাড় করা সত্ত্বেও আব্দুল গফুর আমাদের খাওয়াতে পারে নি। এই দুঃখ ও বেদনা সে কোন দিন ভুলতে পারেনি। পরবর্তীতে যতবারই সে আমার সাথে দেখা করেছে ততবারই সেদিনের খাওয়াতে না পারার দুঃখ ব্যক্ত করে নিজের ভারাক্রান্ত বুকটা হালকা করতে চেষ্টা করেছে।

সখীপুর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দুই মূল নেতা জনাব আলী আসগর ও জনাব আব্দুল আউয়াল সিদ্দিকী। আব্দুল আউয়াল সিদ্দিকী বাসাইল থাণ আওয়ামী

লীগের সভাপতি। আলী আসগর খুব সম্ভবতঃ বাসাইল থানা আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় সদস্য ও গজারীয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, এবং মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত ওসমান গনির বড় ভাই। এই দুইজন সখীপুর এলাকায় যেভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং প্রতি মুহূর্তে মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক সদর দফতরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, তা অনেকের স্মৃতির পাতায় আজও ভাস্বর।

আলী আসগর ও ওসমান গনির আর একভাই আলী পাগল। ইনি হলেন, মুক্তিবাহিনীর আপদ-বিপদের ত্রাণকর্তা। "মুস্কিল আসান"। কোন কিছুর খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আলী পাগলকে জিজ্ঞাসা করুন। সে ঠিক ঠিক বলে দেবে। মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার জন্য কোন অনুষ্ঠান করা দরকার। আলী পাগলকে বলা মাত্র দেখা যাবে সে আরোও দু-চার জনকে নিয়ে একটি সুন্দর দেশাত্মবোধক বাউল, কিংবা জারি গানের আসর বসিয়ে ফেলেছে। যুদ্ধ চলাকালে দেখা গেছে অনেক সময় আর. ও. সাহেব ও শওকত মোমেন শাজাহান আলী পাগলের কাছ থেকে আমার গতিবিধির খবর সংগ্রহ করছে। আমি কোথায় কখন অবস্থান করছি, আলী পাগল তা মোটামুটি নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারতো। আলী পাগল যাদু মন্ত্র জানে, এরকম বিশ্বাস আমার নেই। অবশ্য তার এলাকার অনেক লোকের ধারণা—আলী পাগল টোটকা যাদুমন্ত্র জানেন। তাকে দীর্ঘদিন দেখে আমার অন্য রকম মনে হয়েছে। আলী সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, দূর দূরান্তের লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলে, উঠাবসা করে, স্বাভাবিক কারণেই সে অন্যদের চাইতে অনেক বেশী খোঁজখবর রাখতে পারে। এবং নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা খাটিয়ে যে সব খবরাখবর দেয়, তা অনেকাংশে নির্ভুল হয়।

পশ্চিম এলাকা। পশ্চিম এলাকাধীন কেদারপুরের সামাদ, গোপালদাস ও নিকসন। নিকসনের আসল নাম খুব সম্ভবতঃ রঞ্জিৎ রাজবংশী। রঞ্জিৎ রাজবংশী বললে কেউ তাকে চিনতে পারবেন না। নিকসন বললে টাংগাইলে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবকই নয়—লক্ষ লক্ষ জনতা তাকে অনায়াসে চিনতে পারেন। সামাদ, গোপালদাস ও নিকসন—এদের অবদানের তুলনা হয় না। লাউহাটির স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার কামাল খান। কামাল খানের কৃতিত্ব মোটেই সামান্য নয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে তার অবদান বিশেষভাবে চিহ্নিত ; সবার চোখে সে মর্যাদা-সম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার, পশ্চিমে-দক্ষিণে নিকসন, সামাদ ও উত্তরে কামাল খান এরাই সমগ্র এলাকাটিতে মুক্তিবাহিনীর কাজ সহজ করে এনেছিল।

শশুয়া চরের বাহাজ উদ্দিন অর্জুনার বন্ধু, ফলদা ইউনিয়নের আবুল ও নয়ান খলিফার কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পটলের মোকাদ্দেছ ইকবাল আনসারী ও আব্দুস সাত্তারের ভূমিকা মোটেই অনুজ্জ্বল নয়। এছাড়াও শাহজানীর আব্দুলবারী ও ছাবেদ আলী স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার হিসেবে অনন্য অবদান রেখেছে।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাহাত্তর হাজার : কার কথা আলোচনা করবো ? কার কথা আলোচনার বাইরে রাখবো ? প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকই নিজ নিজ

যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছে। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকই ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আলোচনায় আসার দাবী করতে পারে। কিন্তু এত স্বল্প পরিসরে সকল স্বেচ্ছাসেবকদের ত্যাগ, কর্মকাণ্ড ও অবদানের কথা আলোচনা বা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না।

আর মাত্র দু'জনের কথা আলোচনা করেই স্বেচ্ছাসেবক অধ্যায়ের ইতি টানতে চাই। এদের একজন হলো ভরত-কন্দুস নগরের ভরত। অন্যজন হলেন আরফান ভাই। মুক্তিবাহিনীর কাছে যিনি কোম্পানি নামে পরিচিত। আরফান ভাই মুক্তি-বাহিনীকে সাহায্য করার সূচনা কিভাবে করেছিলেন সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কিছুটা আলোকপাত করেছি। সাক্ষাতের প্রথম দিনেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখুন আমার বয়স হয়েছে। যুদ্ধ করতে পারব না। কিন্তু যোদ্ধা ভাইদের সেবা করতে পারব। আমাকে সুযোগ দিন।' আমিও তার বয়স ও আন্তরিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে মুক্তিবাহিনীর সাথে মেলামেশা ও কাজকর্ম করার সুযোগ দিয়েছিলাম। এর পর থেকে তিনি নিজের সততা, নিরলস প্রয়াস ও প্রতিভার দ্বারা অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন। কন্দুছ নগরে এসেছে, অথচ আরফান ভাইয়ের হাতে খাবার খায়নি—এমন কোন মুক্তিযোদ্ধা হয়তো পাওয়া যাবেনা। রাত দু'টায় হয়তো কোন দিক থেকে কোন সিগন্যালম্যান এসেছে। সে হয়তো না খেয়ে আছে। আরফান ভাই এটা সহ্য করতে নারাজ। তার কথা, 'সিগন্যালম্যান কোথা থেকে এসেছে, কে জানে? আবার কখন তাকে কোথায় যেতে হবে—তারও ঠিক নেই। কন্দুছ নগরে এসে না খেয়ে থাকবে? এতে এলাকার বদনাম হবে। ব্যক্তিগত বদনাম তিনি সইতে পারেন কিন্তু এলাকার বদনাম কস্মিনকালেও না।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কন্দুছ নগর তিন তিনবার হানাদার কবলিত হয়েছে। কোন মুক্তিযোদ্ধাকে পিছনে ফেলে আরফান ভাই আগে ভাগেই পালিয়ে গেছেন—এরকম অপবাদ শত্রুরাও দিতে পারবে না। জুনমাসে আরফানভাই মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। আগস্ট মাসে হানাদার বাহিনী কন্দুছ নগর দখল করে নেয়। সে সময় কন্দুছ নগর বাজারে আরফান ভাইয়ের একটি ছোট্ট দোকান হানাদাররা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। এতে আরফান ভাইয়ের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি আগের মতই, স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে গেছেন। কোনদিন কোন মুক্তিবাহিনীকে কন্দুছ নগরে এসে না খেয়ে থাকতে হয়নি। যেখান থেকে হোক, যেভাবেই হোক, তিনি অবশ্যই খাবার সংগ্রহ করেছেন।

যুদ্ধের সময় আরফান ভাইয়ের কোন দুঃখ ছিল না। তিনি যেন সবকিছু উজাড় করে দিতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিবাহিনীর জন্য সবকিছু হারিয়েও তিনি স্বাধীন বাংলায় কিছুই পাননি। বলতে গেলে সামান্য মর্যাদাটুকুও না। মুক্তিযোদ্ধারা আরফান ভাইকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তা তিনি ভাল করেই জানেন। স্বাধীনতার পরও আরফান ভাইয়ের প্রতি মুক্তিযোদ্ধা বা স্বেচ্ছাসেবকদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং বহুগুণ বেড়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর তিনি সত্যিকার অর্থে সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছেন—এ কথা বলা কঠিন। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমি দু'একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না।

১৯৭২ সালের ৮ই অক্টোবর। সালাম ও কুদ্দুছের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। '৭১-র এই দিনটিতেই কুদ্দুছ নগরের বীর সন্তান কুদ্দুছ ও সালাম তাদের নিজের থানা হানাদার কবল থেকে মুক্ত করতে যেয়ে শাহাদৎ বরণ করে। প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ হিসাবে কুদ্দুছ নগরে গিয়েছি। স্বাধীনতার পর অবশ্য অসংখ্যবার কুদ্দুছ নগরে গেছি। কুদ্দুছ নগরে গেলে ভরত ও আরফান ভাইর সাথে দেখা করিনি বা আরফান ভাইর তৈরী খাবার খাইনি—এমন কখনও হয়নি।

৮ই অক্টোবর, কুদ্দুছ নগর যেন নতুন সাজে সেজেছে। সাজ খুশীর নয়, আনন্দের নয়। কুদ্দুছ নগরের সাজ দুঃখের ও বেদনার। কলেজ মাঠে অগণিত লোক সমবেত হয়েছেন, হাজার হাজার লোকের সমাবেশ অথচ কোথাও কোন কোলাহল নেই, জ্বালাময়ী বক্তৃতা নেই, উত্তেজক শ্লোগান নেই। সকলের চোখে মুখেই ব্যথা ও বেদনার ছাপ। সর্বত্র গভীর নিস্তব্ধতা। স্বজনহারা ব্যথা নিয়ে বক্তৃতা মঞ্চে উঠে দাঁড়ালাম। শত চেস্টা করেও কিছু বলতে পারলাম না। ব্যথা বেদনায় আমার মাথা অবনত হয়ে আসছিল। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল, আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না, মুখে কথা সরছিল না। শত্রুর গুলির মুখে বুক চিতিয়ে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে লোকদের মাতিয়ে তুলতে পেরেছি; বিন্দুমাত্র বুক কাঁপেনি। কিন্তু সালাম কুদ্দুছের স্মরণ সভায় ব্যথায় আমার বুক থরথর করে কাঁপছিল। শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে টলে পড়ে গেলাম। কিছুই বলা হলো না। আমার দু'চোখে অশ্রুর প্লাবন দেখে জনতা আমার অপারগতার অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন কিনা জানিনা। তবে আমি পারিনি।

সভাস্থল থেকে তিন-চার জন সহকর্মী আমাকে ধরাধরি করে নামিয়ে সোজা আরফান ভাইয়ের দোকানে নিয়ে গেল। একজন ডাক্তার তাড়াতাড়ি ইনজেক্শন দেয়। কিছু সময় পর আমি সুস্থ বোধ করলাম। স্বাধীনতার প্রায় এক বছর পরেও তার দোকানের কোন পরিবর্তন নেই, উন্নতি নেই, শ্রীবৃদ্ধি নেই। একবছর আগে হানাদাররা পুড়িয়ে দিলেও পোড়ার গন্ধ তখনও রয়ে গেছে। ক্ষত চিহ্নও রয়েছে যত্রতত্র। এর আগে আমি অনেক বার কুদ্দুছ নগরে এসেছি। কিন্তু আরফান ভাই কখনো কোন অনুযোগ বা অভিযোগ করেন নি। অল্প কিছুদিন আগে দু'বান টিন পাওয়া যায় কিনা, জানতে আমার কাছে টাংগাইলে গিয়েছিলেন। যে কোন ভাবেই হোক, আরফান ভাইকে টিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আরফান ভাই একটি মারাত্মক প্রশ্ন করে বসলেন। 'সি-ইন-সি সাব, দেশ স্বাধীন হইছে প্রায় এক বছর। এর মধ্যে দেশের মানুষের কোন উন্নতি হইল না। আমরা চাইরট্যা খাবারের নিশ্চয়তা পাইলাম না। হানাদাররা জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিল, তার কোন ক্ষতিপূরণ হইল না। অথচ যারা যুদ্ধের সময় দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছে তারাই আজ বহাল তবিয়তে আছে, আপনি কি এই জন্য যুদ্ধ করছিলেন? আপনার কাছে থাইকা আমরা কিছু চাই না। দেশের কাছে চাই। আপনি আর কতদিন এমনি চুপ কইর‍্যা বইসা থাকবাইন? যারা যুদ্ধের সময় সব হারাইছে-সব দিছে তারা না খাইয়া মরুক—এটা আপনি নিশ্চয় দেখতে চাননা।' এ প্রশ্নের

কি জবাব দেবো! একটি নয়, দু'টি নয়, এমনি হাজারো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের আরফান ভাই।

ভরত প্রসঙ্গে আসা যাক। ভরতের জাত ব্যবসা, জুতা সেলাই। সে কুন্দুছ নগর ডাক বাংলোর চৌকিদারের কাজও করে। অবসর সময় জুতা সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করে। সে কখন, কি ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত হয়েছে—তা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। ভরতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরছি। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস। হানাদার বাহিনী লঞ্চে প্রচুর কাপড় চোপড় নিয়ে যাচ্ছিল। লঞ্চটি সিরাজগঞ্জ বাড়াবাড়ীর মাঝে আসতেই মুক্তিবাহিনী তা দখল করে সমস্ত মালামাল কুন্দুছ নগর নিয়ে আসে। উদ্ধারকৃত বস্ত্র কুন্দুছ নগর ডাকবাংলোর সামনে বসে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করছিলাম। ভরত আমার থেকে সামান্য দূরে কি যেন একটা কাজ করছিল। দু' তিনটি লম্বা লাইন। অসংখ্য মানুষ কাপড় নিতে এসেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের হাতে একটা একটা করে কাপড় তুলে দেয়া হচ্ছে। কেউ বাদ পড়ছেন না। হঠাৎ এক সময় দেখা গেল, ভরত লাইনে দাঁড়নো জনৈকা মহিলাকে ধমকাচ্ছে, তিরস্কার করছে। ব্যাপারটা আমার নজরে পড়তেই ভরতকে ডেকে এনে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করে জিজ্ঞেসা করলাম কি ভরত! তুমি নিজে গরীব হয়ে গরীব মানুষদের প্রতি এই ভাবে অভদ্র আচরণ করছ? তোমার ঐ অভদ্র আচরণে তোমার একার ক্ষতি হবে না। আমাদেরও ক্ষতি হবে। তুমি কেন ঐ মহিলাকে গালিগালাজ করছ? তোমাকে এই জন্য শাস্তি পেতে হবে। ঐ ভদ্রমহিলার কাছে মাফ চাইতে হবে। হতবাক হয়ে ভরত বললো, 'হায়, হায়,! ও ভদ্রমহিলা না, স্যার, ও আমার বউ। ও লাইনে দাঁড়িয়েছে তাই গালাগালি করছি। মুক্তিবাহিনী নিজেরাই যদি সাহায্যের জিনিসপত্র নিয়ে নেয় তাহলে অন্য মানুষ কি নিবো? ওর কাপড়ের দরকার নেই স্যার। আমি তাই ওকে বারণ করছিলাম।'

ভরতের স্বার্থত্যাগের প্রবণতা ও প্রয়াসে খুব মুগ্ধ হ'লাম। নিজে ভরতের স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাকে লাইন থেকে বের করে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। পরে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম সত্যিই ভরতের স্ত্রীর কাপড়ের খুবই প্রয়োজন। আমি নিজে গিয়ে সুন্দর একখানা শাড়ী এবং বাচ্চার জন্যে সুন্দর দু'খানা জামা ও প্যান্ট ভরতের স্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। দেশ স্বাধীন হবার পর '৭২ সালের ৬-৭ই জানুয়ারী ভরত ঐ একই রকমের আরেকটা কান্ড ঘটিয়েছিল। সেদিন ভরত তার স্ত্রীকে রিলিফের গম-চাল কিছুতেই স্পর্শ করতে দেয়নি। জানি না, এখন ভরত তার যুদ্ধকালীন মনোভাব বজায় রাখতে পেরেছে কি না? নাকি চার পাশের কালনাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ও লোভ লালসার মধ্যে পড়ে ওর সেদিনের নিঃস্বার্থ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে?

মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন

ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দু'দিন হেডকোয়ার্টারে কাটিয়ে আবার ব্যাপক এলাকা সফরে বেরিয়ে পড়লাম। বেরোনোর সময় বহেরাতলীর ৩ নম্বর সেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্ণেল ফজলুর রহমানকে পরবর্তী নির্দেশের জন্য ১নম্বর সেক্টরের গোপালপুরের অর্জুনা ও নিকড়াইলের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে অপেক্ষা করতে বললাম। ১৯শে অক্টোবর দু'শ মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে কর্ণেল ফজলুর পশ্চিমাঞ্চলে চলে গেলেন। বহেরাতলীর মূল নেতৃত্বে থাকলো মেজর লোকমান হোসেন।

মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনে বেরিয়ে হেডকোয়ার্টার থেকে সোজা বাটাজোড় গেলাম। বাটাজোড় থেকে কালমেঘা ও হতেয়া, হতেয়া থেকে পাথর ঘাটা। এসব এলাকায় যেখানেই গেলাম সেখানেই হাজার হাজার মানুষ প্রাণ ঢালা সম্বর্ধনা জানালেন। তারা তাদের বিশ্বস্ত প্রাণপ্রিয় ভাই হিসাবে আমাকে বারবার প্রাণভরে দেখতে চাইলেন। যতই দেখছেন দেখার আগ্রহ যেন তাদের ততই বাড়ছে। এই দেখার যেন শেষ নেই। জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে লক্ষণীয় পরিবর্তন। আমি যেন এখন তাদের সকল বিশ্বাসের ভিত্তি, সকল সম্মানের উৎস, সকল গৌরবের উপাদানে পরিণত হয়েছি।

ভারত থেকে ফিরে জনসাধারণের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশে আমি এক নতুন শক্তি, নতুন সাহস ও নতুন প্রেরণা খুঁজে পেলাম। এর আগে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের মনোবল টিকিয়ে রাখার জন্য খেয়ে, না খেয়ে, সময়ে অসময়ে উল্কার মত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেরিয়েছি। এবার সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার। আমার জনগণকে ভীতিমুক্ত অথবা উৎসাহিত করার কিছুই নেই। জনগণের দৃঢ় মনোবল, মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি, সাহস, যুদ্ধনৈপুণ্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের অভুতপূর্ব শৃংখলা আমাকেই অপরিসীম সাহস জোগালো। সকল বাধা-বিঘ্ন পার হয়ে বীরদর্পে সামনে এগিয়ে যেতে সীমাহীন প্রেরণা দিল। সত্যিকার অর্থে বলতে কি আমি জনগণের কাছ থেকে অভুতপূর্ব সাড়া পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। পাহাড়ের বাসিন্দাদের আমার কাছে নতুন বলে মনে হলো। তিন-চার মাস আগেও এমন অটুট বিশ্বাস, শক্তি, সাহস ও মনোবলের মানুষ পাহাড়ী এলাকায় দেখতে পাইনি। পাহাড়ী এলাকার জনগণ যেন আর সাধারণ মানুষ নন। তারা ইতিমধ্যেই কর্মযোগীতে পরিণত হয়েছেন। এদের এক এক জন যেন খালিদ-বিন-ওলিদ, কামাল আতাতুর্ক, মহাবীর কর্ণ, ইশা খাঁ, মীর মদন, মোহনলাল, তীতুমীর দুদু মিয়া ও সূর্য সেন হয়ে উঠেছেন।

আমার এই সফরের সময় হতেয়াতে বিরল চরিত্রের একজন লোক মুক্তিবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট হলো। টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধে যার অবদান ভুলবার নয়। সেদিন ছিল হতেয়া হাট, আমি হতেয়া হাইস্কুলের উত্তরে একটি বাড়ির গাছের নীচে বসে বিশ্রাম

নিচ্ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধা আরিফ আহমেদ দুলাল, মকবুল হোসেন খোকা, ফজলুল

সামান ফকির

হক সামান্য কেনাকাটা করতে হত্তেয়া হাটে গেছে। হাট থেকে তারা তিন চারটি বড় বড় পেঁপে, মস্ত বড় একছড়ি সবুরী কলাই শুধু কিনে আনেনি, একটি লোককেও সাথে নিয়ে এসেছে। দুলাল, খোকা, ফজলু যখন হত্তেয়া হাটে পেঁপে, কলা ইত্যাদি কেনাকাটা করছিল তখন তারা একটি বিচিত্র ও বিরল ধরনের লোক দেখতে পায়। লোকটি নাভির নীচ থেকে হাঁটু অবধি গেরুয়া বসন পরিহিত। উদাম শরীর। নগ্ন পা। গোলগাল চেহারা।হাতে খমক্। তাতে টুং টাং শব্দ। এই অদ্ভুত অথচ আকর্ষণীয় লোকটিকে দেখে মুক্তিযোদ্ধারা কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই যে আপনি কি করছেন?' অস্ত্র হাতে দু' তিন জনকে দেখে লোকটি লাফিয়ে উঠল, ভীতি মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'এঁ্যা! হঠাৎ বাবুরা আমারে ধরছেন?' ব্যস এই কথাতেই মুক্তিযোদ্ধাদের কৌতুহল আরোও বেড়ে গেল। তারা তাকে বলে কয়ে আমার কাছে নিয়ে এলো। আমারও লোকটিকে দেখে বেশ কৌতূহল জাগলো।

লোকটির কথা বলার ঢং বিচিত্র। কণ্ঠস্বরও স্বতন্ত্র। আমার সামনে এসে কোন ভূমিকা না করে বললেন, 'এই যে রাইফেলওয়ালা, হঠাৎ বাবুরা আমারে এরেল্ট কইরা লইয়া আইছে। আমি কিছু করি নাই। আমি কয়টা চারাগাছ কিনছিলাম।'

—আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার নাম কি?

'আমার নাম সামান পাগল। মুংগলিরা (মেয়ে লোকেরা) আমারে সামান পাগল কইরা ডাহে।' আমার সাথে কথা বলার সময়ও তিনি তার খমকে মাঝে মাঝে ক্রুং ক্রুং করে ঠোকা দিচ্ছিলেন। দেখলাম স্থানীয় লোকেরা তাঁকে সমীহ করেন, ভালবাসেন। বাড়ির মালিক তাকে পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করে আমাকে বললেন, 'ইনি এই এলাকার খুব ভাল মানুষ। আমরা অনেকেই ইনার কাছে যাই।'

সামান ফকির! তাঁর বয়স কত? শিক্ষা কি? আদৌ লেখাপড়া জানেন কিনা —তা আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবো না। স্বাস্থ্য সুঠাম ও নিটোল। গৌর বর্ণের এই মানুষটিকে দেখলে পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়স্ক বলে মনে হবে। এলাকার অধিবাসীরা জানালেন, সামান ফকির কালমেঘা-কালিদাসের মাঝামাঝি গভীর জঙ্গলে একটি ছোট্ট গর্তে এক নাগাড়ে একযুগ অর্থাৎ বারো বছর তপস্যা করেছেন, ধ্যান মগ্ন ছিলেন। সুদীর্ঘ বারো বছরের এক দিনেও তাঁকে অন্য কোথাও দেখা যায়নি। লৌকিক হোক, অলৌকিক হোক লোকটির যে বিশেষ ক্ষমতা আছে—তা যে কেউ একবার তাঁর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই একই বসন, লোকটির ভিতর বাহির এক, নিষ্পাপ শিশুর মতই পবিত্র, প্রথম দর্শনেই তা বুঝতে পারলাম।

সামান পাগল কবি নন, সাহিত্যিক নন। স্কুল কলেজের লেখাপড়ার মানদণ্ডে তিনি হয়তো শিক্ষিতও নন। তবে তিনি স্বভাব কবি, প্রকৃতির কবি। বিশু প্রকৃতির ডাকে তিনি মুখে মুখে গান বাঁধেন, কবিতা রচনা করেন। তিনি প্রাণের আবেগে মনের আনন্দে বাংলার মাঠে মাঠে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়ান। বাংলার বুকে হানাদারদের অন্যায় অত্যাচারও এই আপন ভোলা একলা চলা সামান পাগলের দৃষ্টি

এড়ায়নি। একদিন হানাদারদের প্রতি বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে রচিত একটি গান সামান ফকির আমাকে গেয়ে শোনান। গানটির মধ্যে একদিকে যেমন জল্লাদ হানাদারবাহিনীর প্রকৃতি, চরিত্র নৃশংসতা ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে তেমনি বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের সাহস, সামর্থ্য, শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব গাঁথা ছবির মত জেগে উঠেছে। গানটি ঃ—

"আহা ! এবার এমন হারগিলায়ে কেরা দিল মাদবরী ॥
আহা ! সেই দুঃখে যে আমি মরি ॥ ঐ
এবার দেখি, কত খাটাশবাবু দারগা
শিয়াল পণ্ডিত দফাদার—
কত বিলাই পাইছে চকিদারী ॥ ঐ
আবার কত খড়ের কোণায় শুনি কানাকানি—
দল পাকাইয়া করে হানাহানি,
কত যে গুজব লইয়া করে টানাটানি।
ভুটুকানা বগে, মারে কুকানি……
আহা ! কেমন, আয়ুব রামশালীকের কেচরমেচর
টীকা পেচায় বসায় কাচারি ॥ ঐ
এবার এই বাংলাদেশের ঘরে ঘরে
এত হিংসার আগুন কেন ধরে ?
বাংলা লুইটা খাইল যত পশ্চিমা উচুঙ্গার দল বিহারী ॥ ঐ
তারা এই বাঙালীর ধইরা খাইয়া কত গরুখাসী, করলো সর্ব্বনাশী
আরও গুনে মানে কত ঝোপ জঙ্গলে রইলাম উপবাসী,
আজ বাঙালীর কি যে দিল মাথায় বারী ॥ ঐ
বাংলাদেশের টাকা নিয়া, উড়ছে ব্যাটারা আজ আকাশ দিয়া
আর আমরা কত ভাঙ্গা সড়কে পইড়া মরি ॥ ঐ
বাঙালীর ঘরে ধান চাল যত ছিল, সব ব্যাটারা লুইটা খাইল
আরো যে কত খাইল নাবরা চাবরা খীচুরী ॥ ঐ
কলেজ ঘরে যাইয়া দেখি, স্কুল কলেজে নাই বেশী লেখাপড়ি
শুধু বেনিফিটের টাকা নিয়া করছে সব কাড়াকাড়ি ॥ ঐ
চিয়ার বেঞ্চি আজ কোথায় গেল
কোথায় গেল তার আলমারী ॥ ঐ
এইবার কাদের সিদ্দিকী নামটি শুনি
কাদের বাংলার সোনার খনী
তার মুখে তরা সব শুনরে ধ্বনী
তার দ্বারা হবে মোদের সব ঘরবাড়ী ॥ ঐ"

হাড়গিলা বলতে বাংলাদেশে তাদেরকেই বুঝায়, যারা কিছুই বুঝেন না, অথচ সবকিছু জানার বা বুঝার ভান করে থাকে। অযোগ্য অপদার্থ জঘন্য ধরনের লোককে গ্রাম্য ভাষায় 'হাড়গিলা' বলে সম্বোধন করা হয়।

সামান ফকিরের আর একটি বিশেষ ঘটনা তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি

না। দেড় মাস হলো আমার সঙ্গে তাঁর দেখা, এরপূর্বেই তিনি মুক্তিবাহিনীর অগণিত সহযোদ্ধা ও কমান্ডারের কাছে বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আমার সাথে দেখা হবার পর তিনি যেন নিজেও মুক্তিবাহিনী হয়ে গেলেন।

২৭শে নভেম্বর হানাদারদের চাপের মুখে মুক্তিবাহিনীর পাথর ঘাটা ঘাঁটির পতন ঘটে। এ দুঃসংবাদ শুনে সামান ফকির সেখানে ছুটে যান। মুক্তিযোদ্ধাদের ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে তাদের উৎসাহিত ও উদ্বোধিত করার মানসে, সেখানে বসেই একটি গান বানিয়ে ফেললেন এবং সেই গান তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বারবার ঘুরে ফিরে গাইলেন। এ যেন গান নয় মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান—মরণকে জয় করে অমর, অক্ষয় হওয়ার আবেদন। তার সেদিনের গানের একটি কলি :

"আরে তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর—
মারো লাথি ভাংগো ছাতি, আছে যত রাজাকর
উদ্ধার কর শেখ মুজিবর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

সামান ফকির মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি শিবিরে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ভাবে উৎসাহিত করেছেন, সাহস শক্তি জুগিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তিনি শুধু সামান ফকির নন—সামান পীর। সবাই তাঁকে সামান পীর বলে ডাকতেন। আমিও বাদ যাইনি। সবাই যখন আমাকে 'বঙ্গবীর' বলে ডাকতেন, তখন একমাত্র সামান ফকিরই আমাকে বঙ্গপীর বলে সম্বোধন করতেন এবং এখনও করেন।

ঘুরতে ঘুরতে আবার ৩নম্বর সেক্টরের রতনগঞ্জে এলাম। রতনগঞ্জ থেকে মরিচা। সেখান থেকে পরদিন বাছেত সিদ্দিকীর শেওড়াবাড়ীতে। '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘুরে ফিরে এই শেওড়াবাড়িতে অনেকবার এসেছি। শেওড়াবাড়ি যেন একটি ট্রানজিস্ট ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে।

২৩শে অক্টোবর। দুপুর বারোটা। রাতে বা পরের দিন পশ্চিমাঞ্চলে চলে যাবো। হঠাৎ একটি মস্ত বড় অঘটন ঘটল। বাসেত সিদ্দিকীর বৈঠকখানায় বসে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের হাতিয়ার পরিস্কার করছিল। পাশের ঘরে বসে আমি ম্যাপ দেখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ গুলির শব্দ। দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পাহারারত মুক্তিযোদ্ধাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি ?' কেউ কোন সদুত্তর দিতে পারলোনা। অন্য এক সহকর্মী পাশের ঘরে কি ঘটেছে তা জানতে ছুটে গেল। ফিরে এসে এক মর্মান্তিক খবর জানাল। হাতিয়ার পরিস্কার করার সময় অসাবধানতায় গোয়াইল বাড়ির রফিকের হাতের অস্ত্র থেকে মিসফায়ার হয়েছে। রফিকের মিস্ ফায়ার দু'জনের গায়ে লেগেছে।

দুর্ঘটনা

খবর শুনে বিদ্যুৎগতিতে পাশের ঘরে ছুটে গেলাম। গুলিবিদ্ধ দু'জনের একজন নলুয়ার মোশারফ হোসেন, অন্যজন আনোয়ারুল আলমশহীদের চাচাতো ভাই ইছাপুরের করিম। দু'জনের আঘাতই গুরুতর একই গুলিতে দুজন আহত হয়েছে। গুলিটি প্রথম মোশারফের গলার নীচে লেগে কাঁধের নীচ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এতে

গলার নীচে দু'তিন ইঞ্চি পরিমাণ একটি গর্ত ও পিঠের দিকে প্রায় ছ'সাত ইঞ্চি বড় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মোশারফকে গুরুতর রূপে আহত করে একই গুলি করিমের পেটের ডান পাশ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ মোশারফের ক্ষতস্থান এত বড় ও গভীর যে ক্ষতস্থানের ছিদ্র দিয়ে এদিক থেকে ওদিক দেখা যাচ্ছিল। ক্ষতস্থানের রক্ত ও মাংস থপ্ থপ্ করছিল। শুশ্রূষাকারী দল এবং আমি নিজে খুবই দ্রুততার সাথে দু'জনের ক্ষতস্থান বেঁধে ফেললাম। দু'জনের কথাবার্তা তখনও স্বাভাবিক।

আহত মোশারফ বারবার পানি খেতে চাচ্ছিল। তাকে একটু একটু পানি দেয়া হচ্ছিল। মোশারফের ক্ষতের তুলনায় করিমের ক্ষতটা অতটা গুরুতর নয়। তবুও নিঃসন্দেহে খুবই মারাত্মক। আমি মোশারফের গায়ে হাত দিলে করিম চিল্লিয়ে উঠেছে 'স্যার, আমি মরে গেলাম। আমারে ধরেন, আমারে বাঁচান।' আবার করিমের দিকে ছুটে যাই। করিম করুণ সুরে মিনতি করে 'আমি আর বাঁচুম না। স্যার, আমারে ধরেন। আমি তালি যাচ্ছি।'

পরিদর্শনে বেরিয়েছি। আমাদের কাছে কোন অতিরিক্ত জিনিসপত্র ছিলনা, ঔষধও নয়। আহত দু'জনকে হেডকোয়ার্টারের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ দিলাম। আশপাশের সমস্ত এলাকা মুক্ত থাকায়, নৌকা পথে হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি যাওয়া খুব একটা অসুবিধা ছিল না। নৌকার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেয়ার সময় অন্য দু'জন স্বেচ্ছা-সেবকের মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারের সিগন্যাল পাঠালাম। গুলিতে আহতের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র নিয়ে একটি চিকিৎসক দল ইন্দ্রজানী শেওড়াবাড়ীর দিকে চলে আসতে থাকুক। ডাক্তারেরা যে মুক্তিবাহিনীর লোক তারা যেন হাতে অথবা মাথায় সাদা লাল কাপড় একত্রে জড়িয়ে রাখে। তারা যখন পানি পথে পাড়ি দেবে, তখন নৌকার উপর যেন লাল ও সাদা কাপড়ের নিশান উড়িয়ে রাখে। যাতে আহতদের বহনকারী দলটি তাদের সহজে চিনতে পারে।"

বিকেল চারটা। মোশারফ ও করিমকে দুটি আলাদা আলাদা নৌকায় হেড-কোয়ার্টারের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হল। সাথে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে নজরবন্দী হিসাবে রফিককে পাঠানো হলো। বিদায় জানিয়ে নৌকা দুটির দিকে এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। আমার আশংকা, আহত সহযোদ্ধা দুজন হয়তো বাঁচবে না। তবে গুলিবিদ্ধ হবার পর দু'ঘণ্টা পরও তাদের দু'জনের মনোবল যে ভাবে অটুট রেখেছে, সাহসও মনোবলের জোরে হয়ত বা তারা বেঁচেও উঠতে পারে এমন একটা ক্ষীণ আশা আমার মনে বারবার উঁকি দিচ্ছিল।

মোশারফের ক্ষত খুবই গভীর ও গুরুতর। মোশারফের কথা ভেবে আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। মোশারফ হোসেন ১৯৬৯ সালে জ্যামুকী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বারটিয়া সবদত কলেজে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হয়। কলেজ জীবন থেকেই মোশারফ আমার একজন সচেতন সহকর্মী হিসাব পরিচিত ছিল। সে অনেক বলে করে অনেক ধরাধরি করে আমার অনুমতি নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধে বেশ দক্ষতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

নৌকা দু'টি অনেক দূর চলে যাবার পর বাসেত সিদ্দিকীর বৈঠকখানায় এসে

বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই একজন সহযোদ্ধা এসে জানাল, নৌকা দু'টি বহুদূরে গিয়ে থেমে গেছে। নৌকা দু'টির কাছ থেকে একটি ছোট্ট ডিঙ্গি দ্রুত শেওড়াবাড়ীর দিকে আসছে। আমি আবার বেরিয়ে এলাম। সামনের সমস্ত জায়গাটাই খোলা 'বিলাঞ্চল।' চাপড়া বিলের এ মাথা থেকে ও মাথা পানি থই থই করছে। সত্যিই নৌকা দু'টি থেমে আছে। একটি ডিঙ্গি আমাদের দিকে আসছে। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো ঃ কেন ওরা আসছে? তবে কি আহতদের মধ্যে কেউ চিরবিদায় নিয়েছে? নাকি দু'জনের একজনও বেঁচে নেই? না অন্য কিছু?

ডিঙি এসে শেওড়াবাড়ীর ঘাটে ভিড়লো। নৌকা থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের নামার আগেই পানির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসা করলাম, 'কি হয়েছে?' ব্যাথাতুর স্বেচ্ছাসেবকদের কান্নাবিজরিত জবাব, 'ননুয়ার মোশারফ ভাই আর নেই।' মারা যাবার আশংকা আমিও করেছিলাম। তবুও স্বেচ্ছাসেবকদের জবাবে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। সহযোদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু আমাকে নির্বাক করে দিল। কিছু সময় নীরব থাকার পর সবুরকে ডেকে বললাম, 'সবুর, আমার সাথে আয়। শেষবারের মতো মোশারফকে দেখে আসি।' চারজন মুক্তিযোদ্ধা সহ চাপড়া বিলের মাঝে মোশারফকে শেষবারের মত দেখলাম। শত চেষ্টা করেও নিজেকে সামাল দিতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ পর স্বেচ্ছাসেবকদের বললাম, 'ভাইয়েরা, তোমরা ওকে আর হেডকোয়ার্টারে না নিয়ে সোজাসুজি কাউল জানি অথবা শুন্যায় নিয়ে যাও। সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে কাফন পৌঁছে দিযে তোমাদের একজন সেখানে থেকে, অন্য সবাই চলে এসো। সে একাই এই ভাইটির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তোমাদের পক্ষ থেকে তার আত্মার শান্তি কামনা করবে।'

অন্য নৌকায় তখনও আহত করিম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন 'স্যার, করিমকে দেখে যাবেন না?' স্বেচ্ছোসেবকদের বললাম, 'না, আমার সাথে আবার দেখা হলে হয়ত মনে করবে কার অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তোমরা ওকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে যাও। রফিককে যারা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের হাতে একটি চিঠি দিলাম, 'মুক্তিযোদ্ধা মোশারফকে কবর দেয়ার সময় হেডকোয়ার্টারের থেকে যেন ছয় জনের একটি প্রতিনিধি দল থাকে। এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সকল কমাণ্ডার পূর্ণ মর্যাদায় লাশ দাফন করে।'

•

২৩শে অক্টোবর রাতের শেষ প্রহরে পশ্চিমাঞ্চলের গোপালপুরের থানার গাবসারা চরে এলাম। পরদিন সকালে মেজর হাকিম এলাকার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট পেশ করল। ২৪, ২৫, ২৬শে অক্টোবর জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, নলিন, অর্জুনা, জগৎপুরার চর, কন্দুনগর ও গোপালপুরের বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকা ঘুরে দেখলাম। এই সময় আবদুল আশীষের নেতৃত্বাধীন জলপথ কর আদায়কারী দল, ক্যাপ্টেন রেজাউল করিম তরফদার ও মেজর মইনুদ্দীনের কোম্পানীর সহায়তায় হানাদারদের পঞ্চাশ হাজার মণ চাল ও গম বোঝাই সতের-আঠারটি বিরাট বিরাট নৌকা আটক করে। নৌকাগুলো ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে হানাদারদের চাল গম নিয়ে উত্তরে যাচ্ছিল। চাল-গম বোঝাই আটক নৌকার

ভর্তি নৌকা দখল

সংবাদ ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় আমাকে জানালো। আটক নৌকার মাল্লাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে বললাম। নাগরপুর থেকে উত্তরে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত নদীর পারের জনগণের মধ্যে ত্রিশ হাজার মন চাল ও গম বন্টনে তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিলাম। বাকি কুড়ি হাজার মন রাস্তার পুবপাশে পাঠাতে হবে। এত খাদ্যশষ্য পাঠাতে অসুবিধা হলে পূর্বাঞ্চলে অন্তত দশ হাজার মন চাল গম পাঠাতে হবে। আটক চাল ও গমের উপর সমস্ত দরিদ্র জনসাধারণের অধিকার রয়েছে। সময় যতই লাগুক, যতই পরিশ্রম হোক, দশ হাজার মন চাল ও গম পূর্বাঞ্চলে সমস্ত জনগণের মধে বিলি বণ্টন করতেই হবে। ২৬শে অক্টোবর অর্পনাচরে জনগণের মধ্যে আমি নিজে সারাদিন খাদ্যশষ্য বিতরণ করলাম। প্রথম সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সবার নাম লিখে প্রত্যেকের বাড়িতে পরিমাণ মত চাল ও গম পৌঁছে দেয়া হবে। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হলো যার যার মত এসে চাল ও গম নিয়ে যাবেন। এ বণ্টন ব্যবস্থাতেও দুটি অসুবিধা দেখা দিল। এক, শারীরিক দিক থেকে যারা দুর্বল এবং যাদের বাড়ি একটু দূরে—সাহায্য নিতে এসে তারা কিছুটা অসুবিধায় পড়ছেন। দুই, যাদের বাড়ি খাদ্য শষ্য বিতড়ন কেন্দ্রের খুব কাছে তাদের কেউ কেউ দু' তিনবার কেউ কেউ চার-পাঁচবার গম ও চাল নিচ্ছেন। ভাগ বাঁটোয়ারায় প্রথমদিকে এই ফাঁকি ধরা না পড়লেও দুপুরের দিকে তা ধরা পড়ে যায়।

খাদ্যশস্য বিতরণের পদ্ধতি ছিল এই রকম : কুড়ি সের মত খাদ্যশষ্য নেয়া যায় এ রকম একটি পাত্র নিয়ে যে কোন লোক পরিমাণ মত চাল ও গম (চাল ৮ সের ও গম ১২ সের) নিজেই তুলে নিতে পারবেন। এই পদ্ধতি মত বণ্টন চলতে থাকল। পাত্র হাতে পরিমাণ মত চাল ও গম (চাল ৮ সের ও গম ১২ সের) মিশিয়ে দিচ্ছিল। এই পরিমাণটা ছিল এক জনের জন্য। যিনি পাত্র হাতে আসবেন, তিনিই ঐ পরিমাণ খাদ্যশষ্য নিয়ে যেতে পারবেন। ধনী, নির্ধন, সবল দুর্বল, কোন বাদ বিচার নেই। সবার জন্যই একই ব্যবস্থা, তবে দুর্বল ও অক্ষমরা যাতে কোন ক্রমেই বঞ্চিত না হন—তা নিশ্চিত করতে মুক্তিবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করছিল। এমনকি তারা কাউকে কাউকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসছিল।

দুপুরের পর যখন একই ব্যক্তির বারবার চাল-গম নেওয়ার ঘটনা ধরা পড়লো তখন দশ-বারো বার খাদ্য নেয়া তিন-চার জনকে আটক করে আমার সামনে হাজির করলো। অর্জুনা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক কমাণ্ডার মণ্টুর ক্রোধ ও অভিযোগ সবচেয়ে বেশী। তার অভিযোগ, এই পাবলিকরা সুযোগ পেয়ে একেবারে ঘাড়ে চড়ে বসেছে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বারবার গম নিচ্ছে, এদের শায়েস্তা করা উচিত। মণ্টুকে বললাম, 'দেখ ভাই, এরা গরীব মানুষ। আমাদের ভ্রান্ত বণ্টন পদ্ধতির জন্য এরা একবারের জায়গায় দু'তিন অথবা সাত-আট বার চাল-গম নিয়েছে। চাল-গম আট-দশ বার নেয়ার জন্য আসতে যেতে তো এদের পরিশ্রম করতে হয়েছে। এবারের মত ছেড়ে দাও। আর যাতে আমরা ভুল না করি সে দিকে যত্নবান হওয়া উচিত।'

১৯৭১-রের ২৬শে অক্টোবর বিকেল। পাঁচ-ছ' দিন হল রোজা শুরু হয়েছে। '৭১ সালে এত কষ্ট, ক্লান্তি ও পরিশ্রমের মধ্যেও বেশির ভাগ মুসলিম মুক্তিযোদ্ধারা একটি রোজাও ভাঙেনি। ইফতারের সময় সমাগত। তাই চাল-গম বিতরণ পরদিনের জন্য স্থগিত রাখা হল।

২৬শে অক্টোবর দুপুরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, যা না বললেই নয়। টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জুন মাসের শুরু থেকে ১৬ই ডিসেম্বর হানাদারদের আত্মসমর্পণ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় দু'একটি ব্যাতিক্রম ছাড়া এলাকার কোথাও কোন লুটতরাজ, খুনখারাবি ও গুপ্তহত্যা হতে পারেনি। মুক্তাঞ্চলের জনগণের প্রতি আমার আহবানই ছিল, "আপনারা আমাদের খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন, আমরা যদি আপনাদের নিরাপত্তা দিতে না পারি, রাতে শান্তিতে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিতে না পারি, তাহলে আমাদের জন্য এত কিছু করার কোন মানে হয় না। কোথাও কোন চুরি ডাকাতি হলে আমাকে ধরুন। হানাদার ও তাদের সমর্থিত রাজাকার ছাড়া অন্য কেউ লুটতরাজ করলে আমাকে ধরুন, কোথাও কোন খুন হ'লে আমাকে কৈফিয়ৎ তলব করুন! আমি যদি উপযুক্ত জবাব দিতে না পারি—তাহলে মুক্তিবাহিনীর প্রতি আপনাদের আস্থা রাখার ও সাহায্য করার কোন কারণ থাকতে পারে না।'

এত আশ্বাস ও সাবধান বাণী সত্ত্বেও অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘাটাইলের বেয়াড়া নেয়ামতপুরের কাছে দুটি গুপ্তহত্যা সংগঠিত হয়। হত্যার কারণ কি এবং কারা হত্যা করেছে সে সম্পর্কে জনগণের পক্ষ থেকে প্রশ্ন এলে আমরা সদুত্তর দিতে পারিনি। ১৩ই অক্টোবর সর্ব প্রথম নেয়ামত পুরের এই গুপ্তহত্যার খবর পাই। তারপর দীর্ঘ সময়ে ঝটিকা সফরে ব্যস্ত থাকায় এই অনভিপ্রেত হত্যারহস্য উদঘাটন করতে পারিনি। হেডকোয়ার্টারে পেঁছেই, গোরাঙ্গী ইউনিয়নের দুর্দান্ত ও সফল শান্তি (গোয়েন্দা) আব্দুল লতিফ ও সুবেদার দেনোয়ারকে এক নির্দেশ পাঠাই, 'বেয়ারা নেয়ামত পুরের কাছে দুটি গুপ্তহত্যা সংগঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কে তোমরা সরজমিনে তদন্ত করে এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে রিপোর্ট দেবে।" ২০শে অক্টোবর গাবমারা থেকে আরও দুই জন খ্যাতনামা ও চৌকশ সংবাদ সংগ্রাহককে ঐ এলাকায় প্রেরণ করেছিলাম। ২৫শে অক্টোবর দেনোয়ার ও লতিফ তাদের রিপোর্ট পেশ করে। তাদের রিপোর্টে হত্যা কান্ডের যথাযথ কুলকিনারা পাওয়া না গেলেও হত্যা সম্বন্ধে সামান্য কিছু সূত্র পাওয়া যায়।

গুপ্ত হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন

হত্যাকান্ডটি যখন সংগঠিত হয়, মেজর হাকিম তখন ঐ এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার ছিল। হত্যা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে কোন সদুত্তর দিতে পারে নি। মেজর আংগুর, ক্যাপ্টিন আরজু ও ক্যাপ্টিন নুরুল ইসলাম এরাও ঐ হত্যারহস্য সম্পর্কে কিছু জানে না বলে রিপোর্ট করে। এমনকি কদ্দুছ নগরস্থ স্থায়ী ঘাঁটির আমীর ভোলা, মোয়াজ্জেম হোসেন দুদুমিয়া, স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার আব্দুলবারী, তাদের কারোও কাছ থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। ক্যাপ্টিন চাঁদ মিয়া, ক্যাপ্টেন বেনু ঐ এলাকারই লোক। হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারাও কোন সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হলো। বড় প্রশ্ন, খোঁজখবর ও অনুসন্ধানের পরও হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটিত হল না। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, ঐ হত্যা কারা করেছে? মুক্তিবাহিনী যদি ঐ দুজনকে হত্যা না করে থাকে, তাহলে তাদেরকে কারা গুলি করে হত্যা করেছে? মুক্তিবাহিনী বা হানাদাররা মারলে লুকাবার কোন কারণ

নেই, উপায়ও নেই। তবে কি কোন স্থানীয় লোক তার শত্রুতা চরিতার্থ করেছে? স্বার্থ উদ্ধার করেছে? পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছে। শত্রুতাসাধনের জন্য কেউ মেরে থাকলে এবং তা আবিষ্কৃত না হলে তা মুক্তিবাহিনীর জন্য মারাত্মক হ'তে পারে। হত্যারহস্য উদঘাটনের জন্য আমি উঠে পড়ে লাগলাম।

হানাদাররা যে ঐ দু'জনকে গুলি করেনি, এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার। কারণ ঐ এলাকায় হানাদারবাহিনী কোনদিনই যেতে পারেনি। বাকী থাকে শুধু দুই পক্ষর স্থানীয় শত্রু ও মুক্তিবাহিনী, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আমার আন্দাজ হচ্ছিল যে, জনসাধারণ মুক্তিসংগ্রামের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে অমন হত্যায় জড়িত হওয়ার সাহস করেনি। মুক্তিবাহিনীর কোন সদস্য ঐ হত্যায় জড়িত রয়েছে। এমন একটি সন্দেহ আমার মনে বারবার উঁকি মারছিল। আমার দলের অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও চৌকশ দু'জন শান্তি (গোয়েন্দা) এই হত্যাকাণ্ডের আরও কিছু তথ্য আবিষ্কার করলেন। তাদের সংগৃহীত তথ্য। কদ্দুছনগরের পাশে বামন আটায় রাত কাটানোর সময় ক্যাপ্টেন বেনু কোম্পানীর দু'জন মুক্তিযোদ্ধা এল. এম. জি কাঁধে শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারা প্রায় আট ঘণ্টা শিবিরে অনুপস্থিত ছিল। কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, এ সম্পর্কে তারা কোন রিপোর্ট করতে পারেনি।

২৫শে অক্টোবর। ক্যাপ্টেন বেনুর পুরো কোম্পানী অর্জুনার পাশে অবস্থান করছিল। অত্যন্ত কৌশলে তার কোম্পানীর মধ্যে দুই-তিন জন শান্তিকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তারা ২৫শে অক্টোবর সারাদিন সারারাত কাটিয়ে সুশিক্ষিত ও আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচরের মত বেয়াড়া-নেয়ামতপুরের হত্যা-রহস্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হলো। হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ রহস্য উম্মোচিত করে বুঝিয়ে দিল গোয়েন্দার কাজে তারা কতটা পারদর্শী।'

২রা অক্টোবর ক্যাপ্টেন বেনুর কোম্পানী বামনআটায় ঘাঁটি গেড়েছিল। দিনটি ছিল খুবই প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ। কমাণ্ডার বেনুর নির্দেশে দু'জন যোদ্ধা প্রাকৃতিক ঝড়ঝাপটা ও দুর্যোগ উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়ে। বামনআটা থেকে পনের-ষোল মাইল পায়ে হেঁটে বেয়াড়া-নেয়ামতপুরে পেঁছে ক্যাপ্টেন বেনু ও দুরমুজ খানের পুরানো শত্রুকে ঘর থেকে বের করে বাড়ির উঠানেই গুলি করে ফেলে রেখে চলে যায়। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে খুবই সন্তর্পণে তারা দু'জন শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আবার রাতের শেষ প্রহরে সবার চোখে ধুলো দিয়ে বিছানায় এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। কেউ জানে নাই, দেখে নাই, টের পায় নাই, ক্যাপ্টেন বেনু এই রকমই মনে করেছিল। আসলে দুরমুজ খাঁ এবং অন্য যোদ্ধাটির শিবির থেকে বেরিয়ে যাওয়া আবার শিবিরে ফিরে আসাটা তাদের অজান্তে চার-পাঁচ জন সাধারণ সহযোদ্ধা সহ শান্তি বিভাগের একজন সদস্য লক্ষ করেছিল।

২৫শে অক্টোবর রাতে বেয়াড়া—নেয়ামতপুরে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে হত্যা-সংক্রান্ত কিছু সূত্র আবিষ্কৃত হলো। নেয়ামতপুরের দু'জন স্বেচ্ছাসেবক হত্যার রাতে নেয়ামতপুর ও দীঘলকান্দির মাঝামাঝি স্থানে অন্য একজন সহ সশস্ত্র দুরমুজ খাঁকে দেখেছিল। এই বক্তব্যের সত্যতা মিললো পাঁচটিকরী কদ্দুছনগরের দু'জন

লোকের কাছে। তারাও দু'জন সশস্ত্র লোককে শেষরাতে ঐ গ্রামের মাঝ দিয়ে বামন-আটা অভিমুখে যেতে দেখেছেন। ২৫ তারিখ সারারাত নানাভাবে নানা সূত্র থেকে খবর সংগ্রহের পর ২৬শে অক্টোবর দুপুরে ক্যাপ্টেন বেনুকে নজরবন্দী ও দুরমুজ খাঁকে বন্দী করা হলো। দুরমুজ খাঁর অন্য সাথী তখন ক্যাপ্টেন বেনুর কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই তাকে ঐ সময় পাওয়া যায়নি। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক খোঁজখবর নেওয়ার পরও দেখা গেল হত্যাকাণ্ডে দুরমুজ খাঁয়ের অন্য সাথীর কোন ভূমিকা ছিল না। যেহেতু সে অন্য জেলার অধিবাসী এবং অপরিচিত; সেহেতু তাকে সাথী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

বন্দী হবার পর দুরমুজ খাঁ সব কথা অকপটে স্বীকার করে বলল, 'আমি কমাণ্ডারের নির্দেশেই একাজ করেছি। এর আগেও আমি দেখেছি দু'এক জন খারাপ প্রকৃতির লোককে মুক্তিবাহিনী শাস্তি দিয়েছে। এদের গুলি করে হত্যা করাটাও আমি শাস্তি মনে করেছিলাম। তবে চুপ করে রাতের অন্ধকারে কাজটা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হয়েছে, এজন্য যে কোন শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। ক্যাপ্টেন বেনুকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বারবার একই কথা বলল, আমি ঐ দুজনকে সত্যিকার অর্থেই দুষ্ট লোক বিবেচনা করে হত্যা করিয়েছি। কিন্তু প্রথম সে অস্বীকার করলো কেন এবং ঘটনাটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করেনি কেন? জিজ্ঞাসা করলে সে কোনও সদুত্তর দিতে পারলো না।

অক্টোবর মাস, এ সময় মুক্তিবাহিনীতে একটি সুন্দর ও পাকাপোক্ত প্রশাসন কাঠামো গড়ে উঠেছে। তখন আর সেই জুন জুলাইয়ের মত ছোটখাটো ঘটনা মুক্তি-বাহিনীর অস্তিত্বের উপর হুমকি স্বরূপ নয়। যতই দিন যাচ্ছিল, মুক্তিবাহিনী ততই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে, বিচার-আচার সমাধা করতে চেষ্টা করছিল। ভালভাবে নানা দিক বিচার-বিবেচনা করে, শাস্তির নিরূপন করা হচ্ছিল। আগস্টের পর থেকে বলতে গেলে মুক্তিবাহিনীর বিচার অভিধান থেকে মৃত্যুদণ্ড প্রায় উঠেই গিয়েছিল।

আমার সব সময় একটা মানসিকতা ছিল, মানুষ জন্মগতভাবে খারাপ নয়। অপরাধীও নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অথবা লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ অন্যায় পথে ধাবিত হয়। অথবা অন্যায় কাজ করে থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি বদলানো গেলে অন্যায়ের প্রবণতা বন্ধ হয়ে যাবে বা মানুষের চিন্তাধারা কর্মকাণ্ডেও পরিবর্তন সূচিত হবে। মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হয়েছিলও তাই। ৭১ সালের জুলাই থেকে ৭২ সালের মার্চ-এপ্রিল এই দীর্ঘ এগার-বার মাসে (শুধুমাত্র ৭১-এর আগস্টের ২৫ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের দশ-বারো তারিখ ছাড়া) টাংগাইল মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত মুক্তাঞ্চলের কোথাও কোন চুরি ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা হয়নি। মানুষ যেন কলিযুগ থেকে একেবারে সত্যযুগে ফিরে গিয়েছিল। এটা এমনিতেই হয়নি। এর মূল কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ অন্যায়কারী যত শক্তিশালীই হোন না কেন—শাস্তি তাকে পেতেই হবে। এরকম একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস এখন সর্বত্রই এবং সকলের মধ্যেই বিরাজ করছিল। দ্বিতীয়তঃ মানুষ সাধারণত অভাবে পড়ে অথবা চাপের মুখে অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়। মুক্তি-যুদ্ধের সময় সেই চাপ ও অন্নবস্ত্রের অভাব অনেকাংশে কমে গিয়েছিল।

এমনি একটি সময়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অর্জুনায় দুরমুজ খাঁ ও কোম্পানী কমান্ডার বেনুর অপরাধের বিচার করতে যেয়ে আমি খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে নানাদিক বিবেচনা করে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক একমাত্র গুপ্তহত্যায় জড়িত হওয়ার অপরাধে দুরমুজ খাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রোজার মাস মুসলমানদের জন্য খুবই পবিত্র। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুরমুজ খাঁও রোজা রেখেছিল। ধর্মীয় কারণে ইফতারের আগে মৃত্যু দণ্ডাদেশ কার্যকর করা সম্ভব নয়। অতএব সিদ্ধান্ত হল ইফতার শেষে আবদুল হাকিমের কোম্পানী দুরমুজ খাঁকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে।

দণ্ডাদেশ ঘোষণার পর দুরমুজ খাঁর মানসিকক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ করা যাচ্ছিল না, দুরমুজ খাঁর কোন ভাবান্তর নেই। আঠার-উনিশ বছরের যুবক দুরমুজ খাঁ। লেখাপড়া না জানা, সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী। আরব-বেদুইনদের মতই দুরন্ত-দুঃসাহসিক। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সে আমাকে বলে, 'স্যার, আমি যা করছি তাতে আগে হোক পরে হোক তখন শাস্তি আমার হইতই। তবে সবসময় আশা আছিল আমি শত্রুর গুলিতে মারা যামু। লোকে আমারে শহীদ কইব। কিন্তু তা ত হইল না। আমি অপরাধী হিসাবে মইরা গেলাম। আমার অনুরোধ আমি আজ আপনার সাথে ইফতার করমু।' আমি তার অনুরোধ রক্ষা করলাম। সারাদিন দুরমুজ খাঁকে খাদ্যশষ্য বিতরণ কেন্দ্র থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে কঠোর পাহারায় রাখা হলো। সারা দিনে তার মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার দণ্ডাদেশ সম্পর্কে বারবার ভাবছিলাম।

দণ্ডাদেশ দণ্ডাদেশই। তা নিয়ে বারবার ভাববার কোন কারণ নেই। তবুও আমি দুরমুজ খাঁয়ের মৃত্যু দণ্ডাদেশ নিয়ে ভাবছিলাম। দণ্ডাদেশ পুনর্বিবেচনার সুযোগ আছে কি না, তা খুঁটিয়ে দেখছিলাম। আমার পুনঃ পুনঃ ভাবনার একমাত্র কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে দুরমুজ দুঃসাহসিক কমান্ডের স্থান দু'চার জন মুক্তিযোদ্ধার পরেই। অনেক যুদ্ধক্ষেত্র তার শৌর্য-বীর্য-বীরত্ব যারপরনাই প্রশংসনীয়। এ ছাড়াও মানুষ হিসাবে দুরমুজ খাঁ আর দশ জনের মতই একটি সুন্দর মনের অধিকারী। শান্ত ও ভদ্র, আসল গুণ বৈশিষ্টের জন্য তাকে হারাতে আমার মন চাইছিল না। কিন্তু সে যে অন্যায় করেছে, তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক সাংঘাতিক ঘটনা। টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা স্বেচ্ছাসেবকরা গোপনে কাউকে হত্যা করেনি। টাংগাইল মুক্তিবাহিনী এই প্রকার কর্ম ও অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবং টাংগাইল মুক্তিবাহিনীকে সকল প্রকার সমালোচনার উর্ধ্বে রাখার মানসে বড়যুদ্ধে সাহস ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের পরেও দুরমুজ খাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

দুরমুজ খাঁ সারাদিন আমার রেকর্ডের গান শুনল। নানা ধরনের গান— রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, দেশাত্মবোধক বাউল, ভাটিয়ালী গানের সুর ও তালে তালে দুরমুজ খাঁ নিবিষ্ট চিত্তে মাথা নেড়ে, হেলেদুলে সুরের ঝংকার ও গানের মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করেছিল। এ ব্যাপারটা সারাদিন আমার চোখে এড়ায়নি। যে

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, ইফতার যায় প্রাণ পাখি উড়ে যাবে, সে কি করে অভভাবে গান উপভোগ করতে পারে ? সুরের ঝংকারে ঝংকৃত হতে পারে ? আমি বারবার বিস্মিত হচ্ছিলাম। ইফতারের কিছু আগে আমরা ইফতারের নিয়ে বসে পড়লাম। তখনও কিন্তু দুরমুজ খাঁ দেশাত্মবোধক গানে সারা বিশ্বের সব কিছু ভুলে তন্ময় হয়ে সুরের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছিল। আমার পাঁচ-সাত গজের মধ্যে ঐ ভাবে গান উপভোগ করা তখন অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। দুরমুজ খাঁ কিন্তু পেরেছিল।

ইফতার শেষে দুরমুজ খাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মৃত্যুর আগে তোর কিছু বলার আছে কি ?' তার জবাব, 'না তেমন কিছু বলার নেই। যা বলার আছে তা আপনার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব নয়।' আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ! 'পারা না পারা সেটা আমাদের ব্যাপার। তোর বলার কি আছে, তা তুই অকপটে বল।' এই সময়ে দুরমুজ খাঁ তখন দু'একটি কথা বললো—যা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। লেখাপড়া জানা নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বালাই নেই, তবুও তার কথা যুক্তি অকাট্য—খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। তার বক্তব্য, 'আমার কার্যকলাপের জন্য আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আমি নিজেও স্বীকার করছি আমাকে গুলি করাই যুক্তিসংগত। তবে আমি অনেক যুদ্ধে শত শত মুক্তিযোদ্ধার চাইতে অনেক বেশী ভাল কাজ করেছি। অনেক বেশী সাহসের সাথে লড়াই করেছি। আমি যে সাহসের সাথে লড়াই করেছি, তার জন্য আমার শাস্তির ব্যাপারে কিছু বিবেচনা করা যায় কিনা ? এর আগে শুনেছি বহু অপরাধীকে মুক্তিবাহিনী সংশোধনের সুযোগ দিয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ থেকে স্থগিত রেখেছে। এখনও দশ-বার জন লোকের উপর মুক্তিবাহিনীর মৃত্যু দণ্ডাদেশ ঝুলে আছে। তারা যদি আবার কোন অপরাধ করে তাহলেই শুধু তাদের মৃত্যু দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে। তাই আমি চাই আমার দণ্ডাদেশ বাতিল না করে স্থগিত রাখা হোক। এবং যুদ্ধে যেতে সুযোগ দেওয়া হোক। যুদ্ধে যদি গুলি খেয়ে মরে যাই, তখন যেমন মৃত্যুদণ্ডও কার্যকরী হবে, তেমনি আমিও একজন যোদ্ধা হিসাবে মরলাম এটাও মনে করতে পারবো।' মাথার উপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঝুলছে, এমন একজন লোকের ঐ ধরনের সহজ স্বাভাবিক আচরণ ও যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। সাথে সাথে পাশে বসা মেজর হাকিমকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। মেজর হাকিম বললো, হ্যাঁ ! ব্যাপারটা ভেবে দেখা যেতে পারে। হেড-কোয়ার্টার থেকে যখন শহীদ সাহেব সহ সবাই আসছেন। তখন এ ব্যাপারে তাদের মতামত জানা যেতে পারে। দুরমুজ খাঁর দণ্ডাদেশ স্থগিত রইল। তাকে আলাদা করে রাখা হল। ক্যাপ্টেন বেনুকে তার পদ থেকে অপসারিত করে পরবর্তীতে অন্যান্য কমাণ্ডারের ব্যাপক মতামত নিয়ে বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিচারের জন্য নজরবন্দী করে রাখা হল।

২৪শে অক্টোবর পশ্চিমাঞ্চলে পেঁাছেই হেড-কোয়ার্টারে নির্দেশ পাঠিয়ে দিলাম, হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত সব কাগজপত্র নিয়ে আনোয়ারুল আলম শহীদ, নরুন্নবী, ডাঃ শাহজাদ চৌধুরী, সৈয়দ নুরুল ইসলাম ও ফারুক আহম্মেদ যেন অনতিবিলম্বে আমার সাথে দেখা করে। আনোয়ারুল আলম শহীদ হেড-কোয়ার্টার ত্যাগের প্রাক্কালে বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব লিখিতভাবে হামিদুল হককে হস্তান্তর করে আসবেন।

২৫শে অক্টোবর শহীদ সাহেব তার দল নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। হেড-কোয়ার্টার থেকে বেরোবার সময় তাদের বুঝতে বাকী থাকে না যে, কেন সকল বিভাগের কাগজপত্র নিয়ে আমার কাছে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছি।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করে আমি তখন যমুনার পারে ছোট্ট একটি শনের ঘরের পাশে অপেক্ষা করছিলাম। এর আগে শহীদ সাহেব একবার ভারত সীমান্তের নক্সী ক্যাম্প পর্যন্ত গিয়েছিলেন, নক্সী ক্যাম্প পর্যন্ত পেঁছতে তাদের কত কষ্ট কত পরিশ্রম করতে হয়েছিল, দুর্ভোগ এবং যাতনা ভোগ করতে হয়েছিল— তা বলে-লিখে শেষ করবার নয়। পূর্বের কষ্টকর ও ভীতিপ্রদ স্মৃতি বহন করে এবার হেড-কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন একি ব্যাপার! এবার পথে কোন কষ্ট নেই, অসুবিধা নেই। কোন কিছুর অভাবও নেই। যখন যা প্রয়োজন, তা অনায়াসেই পাওয়া যাচ্ছে। হেড-কোয়ার্টার থেকে নবী নেওয়াজের কোম্পানীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল। যেখানে যখন যা প্রয়োজন—নৌকা ব্যবস্থা, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, সবকিছুই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এ যেন এক অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার! কখন তারা হেড-কোয়ার্টার থেকে বেরুলেন আর কখনই বা আমার কাছে পেঁছলেন—কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। অলৌকিক ব্যবস্থা কে বা কারা করেছিল? এই কৃতিত্ব কার বা কাদের?

একটু বিচার ও পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে এটা কোন অলৌকিক ব্যবস্থা নয়। এর মূলে আছে আমাদের সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত সাংগঠনিক-কাঠামো এবং স্বেচ্ছাসেবক ও মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় কার্যকলাপ। আমি এতে তেমন কিছুই করিনি। নির্দেশ দিয়েছিলাম মাত্র। তখন সংগঠন গড়ে উঠায়, সংগঠনের ভিত্তি মজবুত হওয়ায় নির্দেশ দিলেই কাজ হতো। অবস্থাটা এমন যে যতটুকু চাই তার চাইতে অনেক বেশী পাই।

২৭শে অক্টোবর ভোরে আনোয়ারুল আলম শহীদ তার দল নিয়ে আমার সাথে মিলিত হলেন, আগে থেকেই সবকিছু প্রস্তুত। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র, প্রতিনিধি দলের করণীয় কি কি এবং ভারত গমনের দিনক্ষণ ইত্যাদি সবকিছুই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। প্রতিনিধি দলকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছ'টি দ্রুত গতির নৌকাও প্রস্তুত রাখা ছিল।

প্রতিনিধি দলের ভারত গমন

আনোয়ারুল আলম শহীদ নুরুন্নবী, সৈয়দ নুরুল ইসলাম, ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী সৈয়দ নুরু ও ফারুক আহমেদদের কাছে দুরমুজ খাঁর সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলাম। অনেক কথাবার্তার পর দুরমুজ খাঁর ইচ্ছামতই দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখা হলো। আলোচনার ভিত্তিতে নিহত দু'জনের আত্মীয়স্বজনের কাছে তাদের মতামত চেয়ে লোক পাঠানো হলে তারাও অনুকূল মত দিলেন। তাই আর ঐ সময় দুরমুজ খাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো না। দেশ স্বাধীন হবার ৪ দিন পর নিহতদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে পুনরায় মতামত জানতে চাওয়া হয়। তারা সম্ভবতঃ সেই সময় স্বাধীনতার মহানন্দে মাতোয়ারা ছিলেন— তাই প্রিয়জন হত্যার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দুরমুজ খানের উপর থেকে

মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নিতে মুক্তিবাহিনীকে অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধে মুক্তিবাহিনী দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।

২৭শে অক্টোবর। শহীদ সাহেব ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। টাংগাইল মুক্তিবাহিনী ছিন্নমূল শরণার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা উদ্বাস্তু শিবিরে সাহায্য দেবার জন্য শহীদ সাহেবের হাতে তুলে দেয়া হলো। প্রতিনিধি দলের কার কি দায়িত্ব তাও ভাগ করে দেয়া হল। আনোয়ারুল আলম শহীদ টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর যাবতীয় হিসাব-কিতাব, প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি জনগণের মানসিকতা, এক কথায় দেশের আভ্যন্তরীণ পুরো পরিস্থিতির একটি সুন্দর চিত্র বাংলাদেশ সরকারের কাছে তুলে ধরবেন এবং বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও গণপ্রতিনিধিদের সাথে যথাসম্ভব যোগাযোগ করে অভ্যন্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা পেঁছে দেবেন। নুরুন্নবী সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরবর্তী যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলাপ আলোচনা করবে এবং আমার দেয়া পরিকল্পনা তাদের সামনে তুলে ধরবে, উপরন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে অভ্যন্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের আরও সুদৃঢ় ও কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবে। ডাঃ শাহাজাদা চৌধুরী বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে দেশের অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয় আলোচনা করে একটি প্ল্যান তৈরি করবে। সৈয়দ নুরু ও ফারুক আহমেদ মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে ঘুরে টাংগাইল মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাবে এবং দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা সংক্রান্ত প্রচার ব্যবস্থা কিভাবে আরও জোরদার ও ব্যাপক করা যায়, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা ফিরে এসে কাজে লাগাবে।

প্রতিনিধি দলকে এই মর্মে লিখিত নির্দেশ দেয়া হল যে, টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকারী নেতা গণপরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী দেশে ফিরতে চাইলে, তাকে যেন সসম্মানে নিয়ে আসা হয়। আমি ও বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকীর কাছে টেপে আমার মতামত জানালাম। তাছাড়া প্রতিনিধি দলের ভারত সফর সফল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার জন্যে ব্রিগেডিয়ার সানসিং ও আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিমকে আলাদা আলাদা দু'খানা পত্র দিলাম। শরণার্থীদের জন্য সাড়ে পাঁচ লাখ ও প্রতিনিধি দলের পথ খরচা বাবদ ত্রিশ হাজার টাকা সহ আনোয়ারুল আলম শহীদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ৩০শে অক্টোবর মানকার চরে পেঁছিল।

২৭শে অক্টোবর দুপুরে নদীপথে দক্ষিণে যাত্রা শুরু করলাম। আবার সেই শাহজানী তারপর শুটাইনের চর সেখান থেকে চর পাকুল্যা। এই তিনটি স্থানে দু'দিন কাটিয়ে ফাজিলহাটীতে এসে উপস্থিত হলাম।

দক্ষিণাঞ্চল সফর

অন্যদিকে পূর্ব নির্দেশ মত কর্নেল ফজলু ৩রা নভেম্বর কেদারপুরে ঘাঁটি স্থাপন করেন। রোজার মাঝে যুদ্ধের তুলনামূলক সংখ্যা ও তীব্রতা কমিয়ে দিয়েছিলাম। মূল মূল ঘাঁটি ছাড়া প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন পথে ঘাটে তেমন কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি। তবে এ সময়টাতে ভিন্ন প্রকৃতির দু'চারটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল।

প্রথম ঘটনাটি এই রকম ঃ আমি শাহজাহানতে আর আনোয়ারুল আলম শহীদ ভারতের পথে, এমান সময়ে ২৭শে অক্টোবর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের জনৈক পাঞ্জাবী মেজর বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল মাঠে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে একপর্যায়ে খুব হাম্পি দাম্পি করে বলল, 'আমি এইবার পাহাড়ে যাচ্ছি। কাদের সিদ্দিকীর একটা লোককেও থাকতে দিব না। কাদের সিদ্দিকীকে তো ধরবই, ধরব। তার সব চেলাদেরও আমি গ্রেফতার করে আনব।'

দাম্ভিক প্রকৃতির এই মেজর ২৮শে অক্টোবর বিকেলে মুক্তিবাহিনীর পাথরঘাটা ঘাঁটি আক্রমণ করলো। মেজর ভদ্রলোক ১৬ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ২টি কোম্পানী নিয়ে মুক্তিবাহিনীর পাথরঘাটার অগ্রবর্তী ঘাঁটি ঘিরে ফেলল। অপ্রস্তুত মুক্তিবাহিনী ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। মেজরের নেতৃত্বে ছ'সাত জন হানাদার তিনজন পাহারারত মুক্তিযোদ্ধাদের একেবারে মাঝে এসে অকস্মাৎ হ্যান্ডস্-আপ বলে গর্জে উঠলো। মুক্তিযোদ্ধারা হ্যান্ডস্-আপ করতে নারাজ। হতচকিত হয়ে গেলেও তারা তড়িৎ গুলিবর্ষণ শুরু করে দেয়। অত কাছাকাছি থেকে ঘেরাও হয়ে পড়া কোন লোক গুলি চালাতে পারে—এটা হয়ত মেজরটির জানা ছিল না। মুক্তিবাহিনীর প্রথম একঝাঁক গুলি দু'তিন জন খান সেনাসহ মেজরটির বুক ঝাঁঝরা করে বেরিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা না করে চিৎবাক খেয়ে, উল্টে পাল্টে কোন রকমে ঘেরাও থেকে বেরুতে সক্ষম হয়। এই সময় হানাদারদের একজন চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ইমান জখম হো গিয়া, ইমান জখম হো গিয়া।' চিৎকার শুনে অন্য দু'জন খান সেনা এগিয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ইমান শেষ।

পাথরঘাটায় হানাদারদের ব্যর্থ হামলা

ঘেরাও থেকে বেরিয়ে এসে, সুবিধা মত অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা মৃত্যুবাণ বর্ষণ করে চলেছে। ইমান খতম হওয়ায় হানাদার বাহিনীর টিকে থাকা আর সম্ভব হলো না। প্রচুর গোলাবারুদ ও সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তারা রণে ভঙ্গ দেয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর দু'জন নিহত ও চারজন আহত হয়। হানাদারদের চারজন নিহত, তিনজন আহত ও দশজন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী হয়। পরে অবশ্য শোনা গেছে ঐদিন পাথরঘাটায় রাজাকাররা ইচ্ছা করে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা দিয়েছিল।

৫ই নভেম্বর টাংগাইল শহরে নিষ্প্রদীপ মহড়া পালিত হলো। এই রাতটি মুক্তিবাহিনীকে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। করটিয়ার আশেপাশে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত বায়েজিদ আলমের নেতৃত্বে বজ্র কোম্পানী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কমান্ডার আনোয়ার দলের 'সুইসাইড স্কোয়াড পুরোটা রাত হাত বোমা নিক্ষেপের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। সারারাত টাংগাইল শহরের উপর নানাদিক থেকে প্রায় তিন'শ হাত বোমা ছোড়া হল। কাগামারী ওয়ারলেস স্টেশনের কাছে রাজাকার ঘাঁটি, নগরজলপাই পুলের কাছে, টাংগাইল পাওয়ার স্টেশন, টাংগাইল ডি. পি. ও-র পিছনে ও শিবনাথ স্কুলে রাজাকার ঘাঁটিতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে ছ'সাত জন রাজাকার নিহত ও চল্লিশ জন আহত হয়।

টাংগাইল শহরে গ্রেনেড নিক্ষেপ

৩রা নভেম্বর আছিম—পোড়াবাড়ীতে এক খণ্ডযুদ্ধে ইদ্রিস কোম্পানীর হাতে তিন-জন খান সেনা পাঁচ জন রাজাকার নিহত এবং এক জন বন্দী হয়। এখানে একজন মুক্তি যোদ্ধা সামান্য আহত হয়েছিল। ৫ই নভেম্বর থেকে ২৮শে নভেম্বর এই বাইশ-তেইশ দিনে আছিম, লহরের বাইদ, ও রাঙ্গামাটির ঘাঁটিতে গোলাবারুদ সহ পর্যায়ক্রমে দুই'শ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে।

পোড়াবাড়ীতে খণ্ডযুদ্ধ

৭ই নভেম্বর পাক হানাদারদের বাহিনী আরেক বার ধলাপাড়ায় হামলা চালাতে আসে। ষোল ঘণ্টা ধরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চললে এতে দশজন রাজাকার নিহত ও চারজন রাজাকার ও দু'জন খান সেনা মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী হয়। কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা ধলাপাড়া ঘাঁটি আগলে রাখতে না পেরে, সামান্য একটু পিছিয়ে যায়। অন্যদিকে কুয়াশার কারণে আশেপাশের অবস্থা ভাল দেখতে না পেয়ে মুক্তিযোদ্ধা হারুন বাংকারে বসে গুলি চালাতেছিল। এক সময়ে সে দু'তিনজন লোককে তার দিকে আসতে দেখে। সে প্রথম প্রথম তাদের গ্রামবাসী বলে মনে করেছিল। কিন্তু কাছে আসতেই হারুন বুঝতে পারে—এগিয়ে আসা দু'তিনজন গ্রামবাসী নয়, হানাদার। তাদের লক্ষ্য করে সে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আর এই সময় দু'জন হানাদার পিছন থেকে মুক্তিযোদ্ধাটিকে জাপটে ধরে। হারুন হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। কিন্তু মরিচা থেকে এগিয়ে এসে মেজর নবী নেওয়াজের কোম্পানী হানাদারদের পিছন থেকে আক্রমণ করলে, হানাদাররা বেশীক্ষণ ধলাপাড়ায় থাকা সমীচীন মনে করে না। তারা প্রথমে দেওপাড়া থেকে কালিহাতিতে ফিরে যায়। ৭ই নভেম্বর দুপুরে হানাদাররা বন্দী মুক্তিযোদ্ধাটিকে দু'জন হানাদার ও দু'জন রাজাকারের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। ৭ই নভেম্বর হলো হানাদারদের সাথে মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় বার বন্দী বিনিময়।

বন্দী বিনিময়

১০ই নভেম্বর মুক্তাগাছার বটতলায় মুক্তিবাহিনীর সাথে অনুরূপ আরেকটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এখানে তিনজন পাক সেনা ও পাঁচজন রাজাকার নিহত হয়। মুক্তিবাহিনী বেশ কয়েকটি হাতিয়ার এবং সাতজন রাজাকার বন্দী করতে সমর্থ হয়।

২৮শে অক্টোবর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দাম্ভিক মেজর পাথরঘাটায় নিহত হলে হানাদার বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেফতার করার সুখস্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে আমাকে গ্রেফতার করার একটা প্রচণ্ড প্রবণতা হানাদার বাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পাথরঘাটা অভিযান ব্যর্থ হলে তারা নতুনভাবে পরিকল্পনা করতে থাকে। মূল উদ্দেশ্য যে কোনভাবে আমাকে আটক করা। কিন্তু সে সময় আমার অবস্থা ছিল খুবই সুবিধাজনক। তখন আর আমাকে আগের মত ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক ও জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হতো না। বরং জনগণই আমাকে বারংবার উৎসাহিত ও শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছিলেন। মুক্তিবাহিনীর সংগঠনও এমন একটা সুদৃঢ় কাঠামোর মধ্যে এসে গিয়েছিল যে, আমি না থাকলে, বা আমার উপস্থিতির চেয়ে নির্দেশেই তখন বেশী কাজ হচ্ছিল। তাই সংগঠনের কাজে সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতে পারছিলাম।

২৭শে অক্টোবর আমার নাগরপুর ও কেদারপুরের দিকে রওনার খবরটি হানাদারদের হেড-কোয়ার্টারে পেঁছে যায়। হানাদার বাহিনী আমাকে গ্রেফতার করতে নাগরপুর অভিযানের প্রস্তুতি চালাতে থাকে। তাদের অভিযান প্রস্তুতির খবর আবার মুক্তিবাহিনীও জেনে ফেলে।

ফাজিল ডাক্তার

হানাদারদের মুক্তিবাহিনী বিরোধী অভিযান পরিচালনার সকল প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত ঠিক তখন অর্থাৎ ৬ই নভেম্বর হঠাৎ কর্নেল ফজলুর রহমানকে সাথে নিয়ে একরাতে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে চলে এলাম। হানাদাররা তো অবাক! তারা কোন্ দিকে অভিযান পরিচালনা করবে? হতেয়া-পাথরঘাটায় আমার উপস্থিতির খবরের উপর ভিত্তি করে অভিযান চালিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। আবার খবর সংগ্রহ করে চারিদিক থেকে নাগরপুর এলাকা ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা যখন পাকা, তখন সেখানেও ফাঁকা। হানাদারদের মনে প্রশ্ন জাগে, লোকটা আসলে কি? কখন কোথায় থাকে, কোথায় যায়—সঠিক খবরই জানা যায় না। 'কভি ইধার কভি উধার। শালা দানব হ্যায়, ইয়া মানব। শালা জরুর ভুত হোগা।'

৭ই নভেম্বর রাতে গোপালপুর-মির্জাপুরের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় কর্নেল ফজলুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দেখুন, আপনি এর আশেপাশে আগেও থেকেছেন। রাতটা এখানেই কোথাও কাটিয়ে দিতে চাই। আপনার কোন পরিচিত জায়গা থাকলে নৌকা সেখানে ভিড়ান।' না, কর্নেল ফজলুর রহমানের তেমন কোন জানাশোনা জায়গা নেই। তবুও আমরা যে কোন স্থানে উঠে পড়বো। তবে কোন অবস্থাতেই খালের পূর্বপাড়ে উঠা চলবে না, অবশ্যই খালের পশ্চিম পারে উঠতে হবে।

তিনটি নৌকায় আমরা খালের পশ্চিম পার লক্ষ্য করে খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। থাকার স্থান অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে নৌকার ছইয়ের থেকে বেরিয়ে এসে বেশ কিছুক্ষণ ডান দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে একটি বাড়ীর ঘাটে মাল্লাদের নৌকা ভিড়াতে বললাম। বাইরে থেকে বাড়ীটি গাছপালায় ঢাকা। আমার ধারণা যদি ছোট্ট একটা ঘরও পাওয়া যায়, তাতেই অথবা তারই বাইরে কোন রকমে বাকী রাতটা কাটিয়ে দেবো। না, বাড়ী নির্বাচনে আমাদের কোন ভুল হয়নি। বাড়ীর ঘাট দেখতে খারাপ হলেও, আসলে বাড়ীর অবস্থা মোটেই খারাপ নয়। নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে উপরে উঠে বাড়ীর স্বাচ্ছল্য ও শান-শওকত দেখে মুক্তিযোদ্ধারা বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গেল। যাক, তা হলে রাতটা নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে ও নিরাপদেই কেটে যাবে।

অখ্যাত, অজ্ঞাত অজ পাড়াগাঁয়ে এ এক মস্ত বড় বাড়ী। বাড়ী তো নয়, যেন রাজ-রাজাদের বাসস্থান। চার-পাঁচশ বর্গগজের উপর বিশাল বাড়ীটি চারদিকে নয়-দশ ফুট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। বাড়ীর দুটি অংশ—একটি বাইরের অন্যটি প্রাচীরের ভেতরে। বাইরের অংশে বিশাল তিনটি টিনের ঘর। প্রত্যেকটি ঘরই প্রায় পঞ্চাশ হাতের মত লম্বা। একটিতে থাকেন কাজের লোকজন, অন্যটিতে আছে কিছু ধান-চাল, পাট ও অন্যান্য জিনিসপত্র। সব শেষটি হচ্ছে বাড়ীর মালিকের বসবার ঘর ও দাওয়াখানা।

বাড়ীতে উঠেই কর্নেল ফজলুকে নির্দেশ দিলাম, 'আধমাইলের মধ্যে আশ-পাশের তিনটি বাড়ীতে তিনটি অবস্থান নিতে বলুন। আমাদের সাথে বড় জোর পনের-কুড়ি জন থাকবে।' নির্দেশমত, কর্নেল ফজলু সব ব্যবস্থা করলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কর্নেল ফজলু এই প্রথম (এবং শেষ বারের মত) দু'তিন দিন আমার সাথে থাকতে পারছেন। সত্যি কথা বলতে কি, কর্নেল যে কোন কাজকর্ম কর্তব্য-দায়িত্ব ত্বরিৎ সম্পন্ন করতে ওস্তাদ। যতটা সময় কর্নেল ফজলু সাথে ছিলেন, তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছি।

বাড়ীর মালিক এমদাদ হোসেন, পেশায় একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। আমরা যখন শরিফপুরের এই বাড়ীটিতে উঠলাম, তখন বাড়ীর কাজের লোকেরা মোটামুটি সমাদর করেন। কিন্তু বিভ্রাট ও বিপত্তি বাঁধে খাবারের প্রশ্ন নিয়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা যেখানেই যে বাড়ীতেই উঠেছে, বাড়ীর মালিক দুষ্ট বা বজ্জাত চরিত্রের হলে তাড়াহুড়া করে গা ঢাকা দিয়েছে। আবার স্বাভাবিক সৎ ও দেশপ্রেমিক হলে, মুক্তিযোদ্ধাদের যথাসম্ভব সমাদর করেছেন। এই বাড়ীতেই প্রথম ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো।

আমি মালিকের বৈঠকখানায় চুপচাপ বসে আছি। কর্নেল ফজলুই সব ব্যবস্থা দেখছেন, তদারকি করছেন। ফজলুর রহমান যেখানে উপস্থিত আছেন, সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য আমার বলার কিছু ছিল না, দরকারও পড়েনি। প্রায় আধঘণ্টা বৈঠকখানায় চুপচাপ বসে থাকার পরও যখন দেখলাম, কর্নেল ফজলুর কোন পাত্তা নেই, তখন উঠে পাশের ঘরে গেলাম। সেখানে কোন লোকজন নেই। পাশে আর একটি ঘর, সেটাও ফাঁকা। ব্যাপার কি? এরা গেল কোথায়? এই সময় আমার কানে সামান্য কিছু কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এলো। সেদিকে এগিয়ে গেলাম, কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম, ফজলু সেখানেই। বাড়ীর মালিককে ডেকে বের করার চেষ্টা করছেন। কর্নেল ফজলুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' আমাকে দেখেই কর্নেল ফজলু স্যালুট করে বললেন, 'স্যার, কি বলব, এমন বেকুব ধরনের লোক আমি জীবনে দেখি নাই। থাকার জায়গা হল, খাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে? কাজের লোকদের যখন খাওয়ার কথা বললাম, তাঁরা বললেন, খাবার জিনিসপত্র বাড়ীর ভিতরে। সেখান থেকে বের করা না গেলে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করব কিভাবে? তাই বাড়ীর মালিককে ডাকছি। কিন্তু ভিতর থেকে সে বের হবে না। মস্তবড় এক বেকুব। এই বেকুবের কথা হল আপনারা রাতটা কোন রকমে থাকেন। সকালে আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেব। তাই স্যার, ব্যাটাকে বুঝাচ্ছিলাম।' বাড়ীর মালিকের ব্যবহারে অতিশয় অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ কর্নেল ফজলু আবার বাড়ীর মালিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেখুন, আমরা চোর ডাকাত না, আমরা মুক্তিবাহিনী। বাড়ী থেকে বের হোন এবং আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করুন।' বেয়াড়া ও উদ্ভট প্রকৃতির মালিকের সেই পুরানো কথা, 'আমি ভয় পাইছি। আপনারা রাইতটা কষ্ট করে কাটান। সকালেই আপনাদের জন্য ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থা করমু।'

এই সময় একজন মহিলা পাশের জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললেন, 'বাবারা,

আমার পোলা সত্যিই ভয় পাইয়া গেছে। আপনারা রাইতে এই ভাবেই থাকেন। আমরা রাইতে গেট খুলতে পারমু না।' এইবার আমি মুখ খুললাম। অত্যন্ত শান্তভাবে বললাম, 'দেখুন, আমরা আপনাদেরই সন্তান-সন্ততি। আমাদের ভাল করে দেখে যদি আপনাদের মনে হয়, আমাদের দ্বারা কোন ক্ষতি হতে পারে, তাহলে দরজা না হয় নাই খুললেন। জবাবে বৃদ্ধা মহিলা বললেন, 'না বাবা, আপনারা ভাল মানুষ। আমরা আপনাদের ভালবাসি। রাইতের মত আমার পোলারে মাফ করেন। সে বাইর হতে পারব না।'

কর্নেল ফজলু হুংকার ছেড়ে বাড়ীর মালিককে বললেন, 'বেটা বদমাইশ, তুমি ভেবেছ, তোমার এই দেওয়াল আমি ভাঙতে পারব না? গেট ভাঙতে কি আমার সময় লাগবে? আমি যদি গেট ভাঙি, তাইলে তোর কপালে বেটা দুঃখ আছে।' এই সময় গোয়াইল বাড়ীর আবদুস সবুর ও কাউলজানির তমছের, ফজলুর চেয়ে আরও একধাপ এগিয়ে চিৎকার করে বললো, 'এতদিন যুদ্ধ করলাম, এমন বদমাইশ মানুষ তো আগে দেখি নাই। শালার বেটা শালা, শালার এত বড় বাড়ী। আমাদের চাইরটা খাবার দিব, তা শালায় পারব না।' ফজলু, তমছের ও সবুরকে শান্ত করে আমি আরেকবার বাড়ীর বৃদ্ধা মহিলাকে মা সম্বোধন করে বললাম, 'আপনার ছেলে ভাল মানুষ হলে, তার বাড়ীর বাইরে না বেরুনোর তো কোন কারণ দেখছি না। আর এটাতো সাধারণ চিরাচরিত ভদ্রতা। কোন মানুষ বাড়ীতে এলে বাড়ীর লোকেরাই তাদের যত্ন করে থাকেন। আপনার গোলাভরা ধান-চাল, খাবার-দাবার সব কিছু মজুত রয়েছে। শুধু ঘর থেকে বের করে দিতে পারবেন না, এই জন্য একদল লোককে না খেয়ে রাত কাটাতে হবে—এটা কোন ধরনের কথা?'

হাঁকডাক চলার সময় আশ-পাশের বাড়ী থেকে বেশ কয়েকজন লোক এসে পড়েন। তাঁদের একজন বললেন, 'এই ডাক্তার গোপালপুর শান্তি কমিটির মেম্বার। সে দু'দিন আগে আমার ছেলেকে হানাদার বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। আপনারা এখানে এসেছেন, আপনাদের এর বিচার করে যেতে হবে।' কথাবার্তা চলার দশ মিনিটের মধ্যেই আরও দু'তিন জন লোক এসে অনুরূপ অভিযোগ করলেন। এবং তাঁরাও বলেন, 'খাওয়ার জন্য একে ডাকাডাকি দরকার নাই। আমরা আপনাদের জন্য খাবার তৈরী করে এনে দিচ্ছি।' তাঁদের একজন আবার গর্ব করে এও বলেন, 'আমরা এই ডাক্তারের মত ধনী হইতে না পারি, কিন্তু আমাদের আত্মা বড় আছে।'

ডাক্তারের ব্যবহারে কর্নেল ফজলুর মাথায় আগুন ধরে গেছে। তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ করতে থাকেন, 'স্যার, আপনি এখান থেকে সরে গিয়ে বৈঠকখানায় বসুন। আমি ঐ কুত্তার বাচ্চারে কি করে বার করতে হয়, তা করছি।' কর্নেল ফজলু কথাবার্তার ব্যাপারে একটু স্বতন্ত্র। তার মুখে ঐ ধরনের বিশেষণ প্রায়ই শোনা যেত। অনেক সময় তিনি আমার সামনে এই ধরনের দু'একটি কথা বলে, পরে লজ্জিত হতেন।

বাড়ীর মালিকের ব্যবহারে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীদের অভিযোগ শুনে আমিও কিছুটা বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। মনে মনে চাচ্ছিলাম, বাড়ীর মালিকের উপযুক্ত শিক্ষা হোক। তাই ঐ স্থান থেকে সরে যাবার সময় কর্নেল ফজলুকে বললাম,

দেখুন, মা-বোন ও অন্যদের প্রতি অশালীন বাক্য প্রয়োগ বা অশোভন আচরণ করবেন না।'

আমি সরে এলে কর্নেল ফজলু আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন। বাংলা অভিধানে যত রকম অশ্রাব্য বিশেষণ আছে, বেছে বেছে একটার পর একটা প্রয়োগ করে উদ্ভট প্রকৃতির বাড়ীর মালিককে বেরিয়ে আসতে আদেশ দিতে লাগলেন। অন্যদিকে দলের রকেট লাঞ্চারকে গেটে গোলা বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। রকেট ছুঁড়তে মুক্তিযোদ্ধারাও প্রস্তুত। এমনি অবস্থায় কেন যেন বাড়ীর মালিকের শুভবুদ্ধির উদয় হলো। সে কাকুতি-মিনতি করতে করতে, গেট খুলে বাইরে এসে কর্নেল ফজলুর পা জড়িয়ে ধরলো। তাকে তখন মনে হচ্ছিল, হাডিডসার, লোম উঠা একটি কুকুর। প্রভুকে দেখে লেজ নাড়তে নাড়তে সারা গা হেলিয়ে দুলিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পায়ের সামনে এসে পড়েছে।

অনুনয়-বিনয়, ডাকাডাকি, ধমক-হুংকার দিয়ে বাড়ীর মালিককে বের করতে এমনিতেই চল্লিশ মিনিট লেগে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কারও মেজাজ ঠিক নেই। বিশেষ করে কর্নেল ফজলুর মেজাজ তখন সপ্তমে। তাঁর মাথা তখন গরম। চোখ লাল। মুখে বিশেষ বিশেষ বিশেষণ, হাতে বেত। ক্রোধে ও উত্তেজনায় তিনি টগবগ করছিলেন। এ অবস্থায় বাড়ীর মালিককে সামনে দেখে কর্নেল ফজলু ভূত দেখার মত লাফিয়ে গর্জন করে উঠলেন, 'এ্যাঁ, তুই শালা এই বাড়ীর মালিক? শালা তুই যে বজ্জাত, তা আমার আগেই বুঝা উচিত ছিল। তুই তিন মাস আগে যতবার ফলদায় মুক্তিবাহিনীকে চিকিৎসা করতে গেছিস ততবার আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা করে নিয়েছিস। আমি ভাবছি, শালা তুই ভাল ডাক্তার। সেই সময় ছেঁড়া লুঙ্গি আর একটা ছেঁড়া ছাতা নিয়ে গেছিস। গরীব মানুষ। তাই টাকা দিছি। আরে শালা ছদ্মবেশী, তুই আমারে তখনই বোকা বানিয়েছিস?'

মুক্তিযোদ্ধাদের সোজা আদেশ দিলেন, 'বাঁধ বেটারে।' মুক্তিযোদ্ধারা বাঁধবার জন্য প্রস্তুতই ছিল। আমার কাছে রিপোর্ট করতে এসে কর্নেল ফজলু বললেন, 'স্যার, বেটারে আমি চিনি। বেটা পাক্কা বদমাইশ। এত বড় বাড়ী ওর। খেতে দিতে অসুবিধা, বাড়ী থেকে বের হতে অসুবিধা, এখন বুঝতে পারছি স্যার, ও কেন বের হয় নাই। ও তো স্যার প্রথমেই আমার সাথে জালিয়াতি করেছে।'

কর্নেলের রিপোর্টের পর তাঁকে বললাম, 'লোকটাকে পাশের ঘরে রাখুন, বাড়ীর মহিলারা যেন বাইরে না আসেন, তাঁদের আপনারাও যেন কিছু না বলেন।' একটু পরেই পাশের বাড়ীর লোকেরা খাবার নিয়ে এলেন। খাবার শেষে ডাক্তারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের অভিযোগ একের পর এক বেড়েই চললো। আনীত অগণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ডাক্তার সম্পর্কে কি করা উচিত, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হলো। এবারেও কর্নেল ফজলুর দাবী—স্যার, এর বিচারের ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। বিচারের ভার আপনাকে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে পূর্বেকার ক্রোধ অসন্তোষ নিয়ে বিচার করবেন, তা চলবে না। বিচারের সময় সামান্যতম ক্রোধ-আক্রোশ প্রকাশিত হলে আপনার বিচার হবে। শান্তভাবে, নিরুত্তাপ চিত্তে যদি কিছু করতে পারেন তা হলে যান, আপনি এর বিচার করুন। আমার কিছু বলার নেই।

কর্নেল ফজলুর রহমান বিচারের ভার নিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত প্রতিবেশীদের কথাবার্তা, নালিশ ও অভিযোগ শুনলেন। তারপর আত্মপক্ষ সমর্থন করে, অভিযোগসমূহের উত্তরে ডাক্তারকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা হলো। ডাক্তার ও বাদী পক্ষের বক্তব্য গভীর মনযোগের সাথে শুনে কর্নেল ফজলু অবশেষে রায় ঘোষণা করলেন, 'এই ডাক্তার মানুষের মত চার হাত-পা বিশিষ্ট হলেও, আসলে একটি শয়তান। এর শরীরের প্রতিটি লোমকূপে একটি করে শয়তান বিদ্যমান। তার চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপ ইবলিশকেও হার মানায়। অতএব, শাস্তিস্বরূপ এই শয়তান ডাক্তারকে পঁচিশ ঘা বেত ও একলক্ষ টাকা জরিমানা করা হল। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক'শ ঘা বেত। জরিমানার টাকা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শোধ করতে হবে। টাকা পরিশোধে বিলম্ব হলে আরও পঞ্চাশ ঘা বেত।'

বিচারের রায়দানকালে কর্নেল ফজলু একটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন তিনি রায়ে বলেন, 'যাঁদের ছেলে, ভাই বা আত্মীয়-স্বজন এই ডাক্তারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁরা পঁচিশ ঘা বেত মারবেন। আর অভিযোগ আনয়নকারীগণ দয়া করে বেত্রাঘাত না করলে মওকুফ করা প্রতি বেত্রাঘাতের জন্য তাদেরকে হাজার টাকা করে জরিমানা দিয়ে ডাক্তার বেত্রাঘাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।' তবে যাঁদের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে অভিযুক্তকে এক ঘা বেত মারতেই হবে। কর্নেল ফজলুর রহমানের এই অভিনব রায় শুনে ডাক্তারের সে কি অবস্থা। তার মাথা নত, চক্ষু অশ্রুসজল। তার হাত-পা ও শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। অবশেষে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে ডাক্তার বললো, 'স্যার, আমারে মাফ করেন। জরিমানা দরকার পড়লে আরও এক লাখ বাড়াইয়া দেন। তবু বেত মাইরেন না।' বিচারের রায় আমাকে জানানো হলো। ফজলুর রহমানকে বললাম, আপনার জানা উচিত, মুক্তিবাহিনী অর্থের জন্য লালায়িত নয়। আপনি যে বিচার করেছেন তা নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব ভিত্তিক। কিন্তু দাম্ভিক ডাক্তার তার জরিমানার টাকা আরও বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বেত্রাঘাত থেকে অব্যাহতি দেয়ার যে আবেদন করেছে, তার প্রেক্ষিতে আপনি কি করছেন? আমার প্রশ্নের মুখে কর্নেল যেন কিছুটা নড়ে-চড়ে উঠলেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, এটা আমার ভুল হয়ে গেছে, ডাক্তারের আবেদন সম্পর্কে আমার কিছু একটা করা উচিত ছিল। আমাকে আরেকবার সুযোগ দিন।'

কর্নেল ফজলু আবার বিচার সভা বসালেন। ডাক্তারের আবেদনক্রমে নতুন বিচার। অভিযোগকারীরা সবাই উপস্থিত। ডাক্তারকে তার আবেদন নতুন করে পেশ করতে বলা হল। ডাক্তারের আবেদন, 'আমি পঁচিশ বেত খেয়ে বাঁচুম না। বেত খেলে আমার মান-সম্মান কিছুই থাকবে না। আমি বুঝতে পারছি, আমার অন্যায় হয়েছে। বেত মাফ করে দিয়ে ইচ্ছা করলে, জরিমানার পরিমাণ আরও একলক্ষ টাকা বাড়িয়ে দিন।' বিচক্ষণ কর্নেল ফজলু আরও বিজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। ডাক্তারের মন-মানসিকতা, উদ্দেশ্য ও সমাজের উপর বিচারের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনা করে অপরাধীর আবেদনের প্রেক্ষিতে রায় ঘোষণা করলেন, 'যাদের অর্থ আছে, তারা চিরকাল অন্যায় করে, অর্থ দিয়ে পার পেয়ে যাবে এটা মুক্তিবাহিনী মেনে

নিতে পারে না। অপরাধীর অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত ও গুরুতর। তাই উভয় শাস্তি বলবৎ থাকলো। উপরন্তু সরকারী জরিমানার পরিমাণ হল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার এবং বাধ্যতামূলক পঁচিশ ঘা বেতের জায়গায় ত্রিশ ঘা বেত মারা হবে এবং তা মারবেন অভিযোগকারীরাই। তারা যদি একটি বেত্রাঘাতও কম মারেন, তাহলে প্রতি বেত্রাঘাতের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে তাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে। তবে কোন অভিযোগকারীই এক বেতের কম মারতে পারবেন না।'

ডাক্তারের বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছেন, তাদের সংখ্যা ছয়। ডাক্তার বুঝে যায়, তার যতই অর্থ থাকুক, ছ'টি বেত তাকে খেতেই হবে। ডাক্তারও সহজ লোক নয়, রীতিমত ধুরন্ধর। সে তার বুদ্ধির খেলা শুরু করে দেয়, একটু চালাকির আশ্রয় নেয়। বেত্রাঘাত মওকুবের আবেদন বাতিল হয়ে যাওয়ায় রাতেই বেত মারার অনুরোধ জানায়। তার ধারণা, রাতের অন্ধকারে বেত্রাঘাত করলে তা খুব কম লোকেই দেখতে পাবে এবং এতে করে তার মান-সম্মান অতি অল্পই নষ্ট হবে। চতুর ও ধুরন্ধর ডাক্তারের এই বজ্জাতি কর্নেলের কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। ন্যায় বিচারের মৌলিক উদ্দেশ্য ও সমাজের সর্বত্র শাস্তির শুভ প্রভাব নস্যাৎ করে দিতে অপরাধী ডাক্তার ভিতরে ভিতরে তৎপর। এটা বুঝতে পেরে কর্নেল ফজলু তার সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলে বলেন, 'বেটা ডাক্তার, তোর মত হারামজাদা নচ্ছার আমি কখনও দেখিনি। তুই আমাকে বিভ্রান্ত করতে চাস্? আমার চোখে ধুলো দিতে চাস্? তুই চালাকের বাবা এখনও দেখিস নাই। তোকে তো রাতে বেত মারা হবেই না, ঢোল পিটিয়ে লোক জড়ো করে তিন-চার জায়গায় নিয়ে, প্রকাশ্যে বেতমারা হবে। এমন কি, তোর মাথার চুল কামিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে, গলায় ছেঁড়া জুতা ঝুলিয়ে, দিগম্বর সাজিয়ে সমগ্র এলাকায় ঘোরান হবে।'

পরদিন বেলা বারোটায় বিচারের রায় কার্যকরী করা হলো। ডাক্তারকে মোট বাইশ-খানা বেত খেতে হলো। বেত্রাঘাতের সময় ডাক্তার ছয়জন অভিযোগকারীর হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে, ভাই, বাবা, মা, চাচা বলে কাকুতিমিনতি করে, কিন্তু লাভ হয়নি। চার জন আপোষহীনভাবে ইচ্ছামত পাঁচটি করে বেত্রাঘাত করেন। ব্যতিক্রম মাত্র দু'জন। তাও খুব সম্ভবতঃ টাকার লোভে নয়। ডাক্তারের কান্নাকাটি, হাতে-পায়ে ধরা ও বাপ-চাচা ডাকার কারণে চক্ষুলজ্জাহেতু অথবা দয়াপরবশ হয়ে দু'জন আটটি বেত কম মারেন। এ হেতু ডাক্তার প্রত্যেককে কুড়ি হাজার টাকা দিলে, তাঁরা প্রথম তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু মুক্তিবাহিনী যখন দু'জন অভিযোগকারীকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে, বেত্রাঘাত না করার জন্য টাকা তাঁদের নিতেই হবে, টাকা গ্রহণ না করলে তাঁরা ডাক্তারের মতই অপরাধী বলে গণ্য হবেন। তখন তাঁরা টাকা গ্রহণে সম্মত হন। বেত্রাঘাত শেষে জরিমানার পুরো টাকা দিয়ে ধুরন্ধর নরপিশাচ-সফল সামাজিক অভিনেতা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মুক্তিলাভ করে।

মো সেভেনটিন

১৯৭১ সাল। ৮ই নভেম্বর। বিকেল চারটায় গোপালপুর, কন্দুসনগর, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও সরিষাবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি সম্মেলনে বসলাম। অনেক আলাপআলোচনার পর প্রত্যেক কমান্ডারকে অল্প সময়ের নোটিশে ব্যাপক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেয়া হলো। এমনকি ছোট ছোট আক্রমণ পরিচালনার পরিবর্তে যখন সম্মিলিতভাবে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করা হবে, তখন মুক্তিবাহিনীর পরিচালনা পদ্ধতি কি হবে, কোন্ কমান্ডার কতজন মুক্তিযোদ্ধা পরিচালনা করবে, কোন্ কোন্ কমান্ডার কোন্ কোন্ কমান্ডারের নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেবে এবং চূড়ান্তভাবে কার আদেশ মেনে এগিয়ে যেতে হবে, তা সবাইকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হলো। এই সভায় মেজর আবদুল হাকিমকে গোপালপুর, কন্দুসনগর, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও সরিষাবাড়ীর মূল দায়িত্ব হয়। তার নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত কমান্ডাররা হলো—গোপালপুরের আঙ্গুর ও আরজু, ধনবাড়ীর নুরুল ইসলাম, সরিষাবাড়ীর আনিস, রেজাউল করিম তরফদার, আবদুল মান্নান, মোজাম্মেল এবং ক্যাপ্টেন তারা।

কমান্ডারদের সাথে আলোচনা শেষে কর্নেল ফজলুকে নিয়ে পাবনার বেলকুচির সিংগুলি গ্রামে গেলাম। দু'দিন আগে বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ওয়াপদা বাঁধের উপর মুক্তিবাহিনী ও হানাদারদের মধ্যে এক তুমুল লড়াই হয়। যুদ্ধশেষে হানাদার বাহিনী পিছু হটে গেলেও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত বরণ করে। সিংগুলির চরেই তার দাফন সম্পন্ন হয়। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাটির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানানোই ছিল সেখানে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ সাহসিকতা ও বিক্রমের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ওখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করা। সিংগুলিতে চিরনিদ্রায় শায়িত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমানের কবর জিয়ারত করে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে উৎসাহিত করে তাদের সাথে সন্ধ্যার খাবার খেয়ে নৌকাপথে আবার দক্ষিণদিকে যাত্রা করলাম।

৯ই নভেম্বর। প্রত্যুষে মুক্তিবাহিনীর নৌকা কেদারপুর ঘাটে ভিড়লো। কেদারপুর থেকে লাউহাটি হয়ে বিকেলে কর্নেল ফজলুসহ তিন'শ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে নাগরপুর থানার ফতেপুর গ্রামে ঘাঁটি গাড়লাম। এখানে আমি একটানা দশদিন অবস্থান করি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আর কোথাও এক নাগাড়ে এতোদিন থাকিনি।

মুক্তিবাহিনী ফতেপুর আসার দিনতিনেক পরেও এলাকার সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি, কে বা কারা এসেছে। তাঁরা আগে শুধু কর্নেল ফজলুকে দেখেছেন। এবার ফতেপুর এসে কর্নেল ফজলু খুব নড়াচড়া করতে পারেন নি। কারণ তখন তিনি অসুস্থ। ৮ই নভেম্বর তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বর নিয়ে সারাদিন কোন রকমে কাটালেও ৯ই নভেম্বর থেকে তার চলাফেরা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ফতেপুর

এসে তিনি মাঝে মধ্যে বেরিয়েছেন। তবে বেশী সময়টাই দলাই মলাইয়ে কেটেছে। তিনি শুধু জ্বরেই আক্রান্ত নন, বাতেও আক্রান্ত হয়েছেন। বাতের উপশমে নানারকম তেল নিয়মিত মালিশ করা হচ্ছে। সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও দু'জন ভাল ডাক্তারের চেষ্টায় তের-চৌদ্দ দিন পর কর্নেল ফজলু মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেন।

ফতেপুর আসার পর থেকে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করলাম। জুলাই মাসের শেষ থেকে বারবার ভাবছিলাম—সম্ভব হলে একবার টাংগাইল দখল করার চেষ্টা করবো। ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমার সেই ইচ্ছা যেমন প্রবলভাবে বেড়ে যায়, তেমনি সহকর্মীরাও বারবার বলতে থাকে, হানাদাররা বাংলার মানসম্ভ্রম নষ্ট করছে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মা-বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার করছে। আমাদের তো এখন যথেষ্ট শক্তি আছে। আমরা চেষ্টা করলে ওদের ঘাঁটি দখল করে নিতে পারি। এই ধরনের কথা-বার্তা সহযোদ্ধারা দিনের পর দিন বলে চলছিলো। তাই আমিও টাংগাইলের দখল নিতে চাইছিলাম। এর জন্য চললো পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। কিন্তু বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। সব কিছুই স্বাভাবিক চলছিল। শুধু মাঝে মধ্যে নানা দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার, স্থানীয় জনসাধারণ ও বার্তাবাহকেরা আসছে আর যাচ্ছে।

প্রস্তুতি

১১ই নভেম্বর টাংগাইল মুক্তিবাহিনীতে আর একবার কোম্পানী পুনর্বিন্যাস করা হল। ৯ই ও ১০ই নভেম্বর নানা স্থান থেকে ডেকে আনা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে নতুন পাঁচটি কোম্পানী গঠন করা হলো। এই পাঁচটি কোম্পানীর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল আমার নিজের দলের ছয় জন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধার উপর। আবদুস সবুর খান, সাইদুর রহমান, মকবুল হোসেন খোকা, ফেরদাউস আলম রঞ্জু, আবদুল হালিম ও তামছের আলী কোম্পানী কমান্ডার ও সহকারী কমান্ডার পদে উন্নীত হলো। এদের সাহস যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে চারটি কোম্পানীর দায়িত্ব দেয়া হল। আমার দল থেকে সবুর, সাইদুর খোকা, রঞ্জু, হালিম, মালেক ও তমছের বেরিয়ে গেল। দলভুক্ত হলো তামাইটের আবদুল্লাহ, কামুটিয়ার বজলু, লতিফ (ওরফে ভোম্বল) ছানোয়ার, বল্লির বাবুল, জাহাঙ্গীর, আজাহার, পাকুল্লার ফজলু, দাপনজোরের আবদুল মান্নান, শাখাওয়াত হোসেন, ময়থার বেনু ও গোরাঙ্গীর সেই দুমুজ খাঁ এবং আরও কয়েকজন। এরা ছাড়া দুলাল, মকবুল, কুমাইয়া বাড়ীর আমজাদ, আবুল কাশেম, পিন্টু ত্রিশালের আবুল কালাম, কস্তুরী পাড়ার শামসুসহ আরও অনেকেই ছিল।

কোম্পানী পুনর্বিন্যাস

সবুর, সাইদুর, খোকা, রঞ্জু, হালিম, তমছের কোম্পানী কমান্ডার পদে উন্নীত হয়ে যার যার দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলে আমার নিজের দলের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিছুটা শূন্যতা দেখা দেয়। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হচ্ছে না। পাহারারও ঠিক নেই। লোকজন আসলে দেখাশোনা হচ্ছে না, তারা ঠিকভাবে সম্মান পাচ্ছেন না। এমনি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ১২ই নভেম্বর দুপুরে আমার সহচর দলের সবাইকে

ডেকে বললাম, 'সবুর, সাইদুর, খোকা, রঞ্জু, হালিম, তমছের—এরা চলে গেছে। এখন থেকে তোমাদেরই ওদের কাজ দেখতে হবে। আমাকে যদি তোমাদের সব কাজ দেখাশোনা করতে হয়, তাহলে বাইরের কাজে দৃষ্টি দেয়া আমার পক্ষে অসুবিধা হবে। তোমাদের সকলের সহযোগিতা না পেলে দ্রুততালে কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে না। আমার কথা শুনে সহযোদ্ধারা সমস্বরে বলে উঠে, 'আপনি আমাদের একজনকে কমাণ্ডার ঠিক করে দিন।' না, আমি কাউকে কমাণ্ডার বানিয়ে দিলে হয়তো কাজ চলবে। তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের কমাণ্ডার ঠিক করে নাও। তোমাদের মনোনীত কমাণ্ডারকে পনের দিন সব কিছু দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়া হবে। পনের দিন তাঁর কোন ভুলত্রুটি ধরা হবে না। কিন্তু পনের দিন পর প্রতিটি কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

নির্দেশ মত সহযোদ্ধারা আলাদাভাবে বসে। দীর্ঘ সময় কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করে কমাণ্ডার নির্বাচন করে সন্ধ্যায় আবার তাঁরা হাজির হয়। মুক্তি-যোদ্ধাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে যে আমাকে রিপোর্ট করতে এলো সে আর কেউ নয়, আমাদের পূর্ব পরিচিত ও বহুল আলোচিত উপলদীয়ার ছোট ফজলু। ফজলুকে কমাণ্ডার হিসাবে দেখে প্রথম অবস্থায় কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। দলের প্রায় সকল সদস্যই দেখতে, শুনতে ও বয়সের দিক থেকে ফজলুর চাইতে বড়। ফজলু আমার দেহরক্ষী দলের নেতা নির্বাচিত হতে পারে এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বিস্ময়ভরা চোখে ফজলুকে জিজ্ঞাসা করলাম,

কি ব্যাপার! তোকে ওরা নেতা নির্বাচন করলো? ফজলু, তুই কি পারবি?

আমি ঘর থেকে যখন বেরিয়েছি তখন কিছুই শিখে আসিনি। সবাই যখন আমাকে তাঁদের নেতা নির্বাচন করলো, তখনও আমি জানতাম না যে আমি তাদের আস্থার যোগ্য। আপ্রাণ চেষ্টা করব। যদি দায়িত্বপালন করতে না পারি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কাজ করার সুযোগ তো রইলই।

তোকে ওরা নেতা নির্বাচন করেছে, সহযোদ্ধারা যে দায়িত্ব দিয়েছে, সে দায়িত্বের বোঝা কি তুই বুঝতে পারছিস? আজ থেকে তোর পরিশ্রম বহুগুণ বেড়ে গেল। ঠিক আছে, চেষ্টা কর। পনের দিন তোকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হবে। এরপর পুরো দায়িত্বটা তোর। না পারলে কঠিন জবাবদিহি।

কর্নেল ফজলুর রহমান আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। অসুস্থ শরীর। তবুও তিনি সন্ধ্যাবেলায় একবার এসেছেন। এর আগের দিনও এ সময় এসেছিলেন। তিনিও আমাদের কথায় যোগ দিয়ে বললেন, 'স্যার, সবাই মিলে ওকে যখন কমাণ্ডার বানিয়েছে তখন নিশ্চয়ই পারবে। আমার শরীর ভাল হলেই ওকে সব বুঝিয়ে দেব।'

আমার দেহরক্ষী দলের কমাণ্ডার ও সহকারী কমাণ্ডার নির্বাচিত হলো যথাক্রমে উপলদীয়ার ফজলুল হক ও বারো নাসিয়ার বাবলু। যুদ্ধের শুরু থেকে ফতেপুরে কমাণ্ডার নির্বাচন পর্যন্ত—এই দীর্ঘ সময় আমার দেহরক্ষী দলে কোন নির্বাচিত কমাণ্ডার ছিল না। যুদ্ধের শুরু থেকে আপন আপন দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার বলে আবদুস সবুর খান, সাইদুর রহমান, খোকা, তমছের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলো। সবুর যখন থাকতো, তখন সে নিজেই আমার টুকিটাকি কাজকর্ম করতো। পাহারা, খাওয়া

যাওয়া ও খবরা-খবর আদান-প্রদানের দায়িত্ব তার হাতেই ন্যস্ত থাকতো। শুধু তাই নয়, সবুর ছোটখাট নির্দেশও দিতো। সবুরের অবর্তমানে মকবুল হোসেন খোকা সবুরের স্থান দখল করতো অথবা সাইদুর রহমান সবুরের কাজ চালিয়ে নিতো। সত্যিকার অর্থে সহচর দলের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে এক মুহূর্তও ভাবতে হয়নি।

ফতেপুরে অবস্থান করছি। নানা পরিকল্পনা চলছে। সদর দফতর থেকে বার বার নানা সংবাদ আসছে। তার উত্তর দিচ্ছি। কন্দুসনগর আঞ্চলিক উপদপ্তর থেকেও প্রতিদিন চার-পাঁচটি 'মেসেজ' আসছে। উপরন্তু প্রত্যেক কোম্পানী থেকে একজন করে দূত সবসময় আসছে আর যাচ্ছে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য ১৪ই নভেম্বর ফতেপুর থেকে চার মাইল দূরে ফাজিলহাটিতে ওয়ারলেস বসানো হল। তিনটি ওয়ারলেস সেট, প্রথমটি সিভিল, দ্বিতীয়টি সামরিক ও তৃতীয়টি সাংকেতিক। তিনটি সেটই দিবারাত্র কাজ করে চলেছে। এতে সুবিধা হল অনেক, খবর দ্রুত আদানপ্রদান সম্ভব হলো। তবে অসুবিধা যে মোটেই হলো না, তাও নয়। বেতারে কোন বার্তা পাঠানোর অর্থই হল শত্রুকে কিছুটা সুযোগ করে দেওয়া। মুক্তিবাহিনী কোনক্রমেই শত্রুকে সে সুযোগ দিতে চায় না। তাই দূত মারফত আসল খবর পাঠিয়ে শত শত উল্টাপাল্টা মিথ্যা শব্দ প্রয়োগ করে বেতারে 'মেসেজ' পাঠানো শুরু হলো। এরপরও শত্রুরা কিছু কিছু সারবস্তু এ থেকেও উদ্ধারে সক্ষম হতো। জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ 'মেসেজ' সব সময় দূত মারফতই পাঠানো হতো। ষাট-সত্তর মাইল দূরে কোন খবর পাঠানোও তখন খুব একটা অসম্ভব কাজ বলে গণ্য হতো না। মুক্তিবাহিনীর দূতেরা রীলে সিস্টেমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে খবর বহন করে নিয়ে যেত। এই বিশেষ দায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছাসেবকরা সব চাইতে বেশী সক্রিয় ছিল। যুদ্ধের সময় আঁকাবাঁকা বিপদ সংকুল পথে দূতেরা কম করে হলেও পনের-কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করতে পারতো। কখনও দৌড়ে কখনও সাইকেলে আবার কখনও বা ঘোড়ায় চড়ে তারা খবর বহন করতো। কোন দূতকেই অবশ্য একটানা ছয়-সাত মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করতে হতো না। ক্লান্ত হয়ে পড়ার আগেই একজন দূত আরেকজন দূতের হাতে বার্তা পৌঁছে দিত। নতুন বার্তাবাহক নতুন উদ্যম ও উৎসাহে ছুটতো পরবর্তী সংবাদবাহকের কাছে। এইভাবে মুক্তিযুদ্ধের সারাটা সময় আমাদের খবরাখবর আদানপ্রদান হতো।

১৪ই নভেম্বর। সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলের সকল কোম্পানী কমান্ডার ফতেপুরে একত্রিত হলো। তাদের সবাইকে জরুরী তলব করা হয়েছিল। উপস্থিত ত্রিশ জন কোম্পানী কমান্ডারের মধ্যে অসুস্থ কর্নেল ফজলু, জাহাজমারা কমান্ডার মেজর হাবিবুর রহমান, ক্যাপ্টেন রবিউল আলম, ক্যাপ্টেন শাহ আলম, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সুলতান, বজ্র কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপ্টেন বায়েজিদ আলম, সহকারী কমান্ডার ক্যাপ্টেন শামসুল হক। ক্যাপ্টেন হুমায়ুন, কমান্ডার মঈনুদ্দিন, ভারত থেকে সদ্যাগত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ধনবাড়ীর আবদুল রাজ্জাক, সরিষাবাড়ীর ক্যাপ্টেন আবদুল মান্নান, ক্যাপ্টেন মোজাম্মেল হক,

পাবনার ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন, পাহাড়ী মেজর মনিরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন লায়েক আলম, ক্যাপ্টেন সবুর, ক্যাপ্টেন রঞ্জু, ক্যাপ্টেন সাইদুর, ক্যাপ্টেন তমছের, ক্যাপ্টেন সোলেমান আনন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। কেউ জানে না, তাদেরকে কেন ডাকা হয়েছে। রোজার দিন। ইফতারের আগে কমান্ডারদের সঙ্গে বসতে বা কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করতে চাইলাম না। ইফতার এবং খাওয়া-দাওয়ার শেষে কমান্ডারদের নিয়ে আলোচনায় বসলাম। উপস্থিত সব কমান্ডারদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেয়া হলো।

তাদের বর্তমান অবস্থা কি? শক্তি-সামর্থ্য কি? শত্রুদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারনাই বা কি? এ সব বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা হলো। তিন-চার মাইল দূরত্ব বজায় রেখে ঢাকা-টাংগাইল সড়ক বরাবর অবস্থান গ্রহণ ও রাস্তার নিখুঁত খোঁজখবর নিতে সকল কমান্ডারদের নির্দেশ দেয়া হলো। তাঁদের জানিয়ে দেয়া হলো, কারও কাছে কোন ভারি জিনিসপত্র থাকতে পারবে না। তাদের জিনিসপত্র ও গোলা-বারুদ অন্যভাবে সরবরাহ করার ব্যবস্থা হবে। ঝটিকা আক্রমণের জন্য তারা যেন সর্বদা অতিরিক্ত ভারমুক্ত থাকেন এবং প্রত্যেক কোম্পানী কমান্ডার যেন সব সময় দশজনের একটি দল নিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত থাকে। কমান্ডারদের আরও নির্দেশ দেয়া হলো, 'তোমাদের আবার যখন ডাকা হবে তখন এক ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে হাজির হতে হবে। তবে যারা দশ মাইলের বেশী দূরে অবস্থান করবে, তাদের বেলায় সামান্য সময়ের হেরফের করা যেতে পারে।' সভা শেষে কমান্ডাররা যার যার ঘাঁটির দিকে ছুটলো। তারা তখনও পরিষ্কার বুঝতে পারলো না পরবর্তী অভিযান কি এবং কোথায়।

১৫ই নভেম্বর। সকাল হতে না হতেই দেখা গেল, নানা দিক থেকে প্রায় আশি-নব্বই জন লোক ফতেপুরে এসে উপস্থিত। এদের পরিচয় কি, তারা কোথা থেকে এসেছেন, উদ্দেশ্যই বা কি তা অনেকেই জানেন না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা জানে: আগন্তুকরা সবাই স্বেচ্ছাসেবক। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারদের মধ্যে কালিয়াকৈর, গোড়াই, মির্জাপুর, বরাটি, ইচাইল, কাটরা, বানাইল, বাঁশি, দেলদুয়ার, পাথরাইল, নলসন্ধা, বাজিতপুর, ভাতকুরা, করটিয়া ও ময়থার কমান্ডাররা রয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা-টাংগাইল সড়কের পূবের হাবলা, টেংগুরাপাড়া, মহেরা, ডুবাইল ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদেরও ডাকা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার ও সহকারী কমান্ডারদের নিয়ে আলোচনা সভা শুরু হলো। এই সভায় হেড-কোয়ার্টার থেকে খোরশেদ আলম আর. ও. এসেছেন। আলোচনার মূল উদ্দেশ্য কোথায়, কোন ধরনের ও কি পরিমাণ রসদ আছে এবং তা কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সুষ্ঠভাবে পৌঁছে দেয়া যায়—সে সম্পর্কে জানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারগণ তাদের কাছে রাখা গোলা-বারুদ বিস্ফোরকের নিখুঁত হিসাব পেশ করলো। তারা যে কোন স্থানে, যে কোন সময়, যে কোন পরিমাণ রসদ ত্বরিৎ পৌঁছাতে সক্ষম এবং মুক্তি-যোদ্ধাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এটা প্রতিটি স্বেচ্ছা-সেবক কমান্ডার খুবই দৃঢ়তার সাথে জানালো। স্বেচ্ছাসেবকদের দৃঢ় আস্থা, অটুট মনোবল ও সীমাহীন আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে আমি খুবই অভিভূত হলাম

সরবরাহ ব্যবস্থা আরও সংহত ও শক্তিশালী করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড গঠন করা হলো। এ কেন্দ্রীয় কমান্ডে দশ জন স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

ঢাকা-টাংগাইল পাকা রাস্তার দশ মাইল থেকে কুড়ি মাইল উত্তর-দক্ষিণের এক বিশাল এলাকার মূল নেতৃত্ব অর্পিত হল কেদারপুরের আবদুল ছামাদ, লাউহাটি ইউনিয়নের কামাল খাঁ, এলাচীপুরের হজরত আলী ও দৌলতপুর ইউনিয়নের সবুরের উপর। দ্রুতগতিসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবকও মুক্তিযোদ্ধা লাউহাটির ফজলুকে দেয়া হলো যোগাযোগের দায়িত্ব। ঢাকা-টাংগাইল পাকা রাস্তা সংলগ্ন উত্তর দক্ষিণের এলাকা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পেল ভাতকুরার মোহর খাঁ, বাঁন্ন ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার দেলোয়ার, পাকুল্লার লতিফ ও সুলতান, শুবুল্লার আলী আকবর ও ইচাইলের শান্তিপদ রায়। টাংগাইলের কাছাকাছি এলাকার মূল দায়িত্বে রইলো মোহাম্মদ সোহরোয়াদী। এক সপ্তাহ আগে মোঃ সোহরোয়াদীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ঢাকা-টাংগাইল-ময়মনসিংহ পাকা সড়কের সেতুগুলির অবস্থা কি? কোন সেতুতে কত জন রাজাকার ম্যালিশিয়া আছে? তার তথ্য সংগ্রহ করতে। সে সময় বোর্কা পরা কোন মহিলা সাথে থাকলে রাজাকাররা তেমন সন্দেহ করত না। তাই সোহরোয়াদী নার দীমুলীয়ার আবদুস ছালামের বোন জয়নব বজীকে সাথে নিয়ে ঢাকা সড়কের কালিয়াকৈর থেকে ময়মনসিংহ সড়কের মধুপুর পর্যন্ত প্রত্যেকটি পুলের নিখুঁত মানচিত্রসহ কোন্ পুলে কটি ব্যাংকার, গান পজিশন কোন্ দিকে এবং কোথা কত জন রাজাকার ম্যালিশিয়া আছে তার একটা নির্ভুল রিপোর্ট তৈরী আমাকে দেয়। যে রিপোর্ট সেতু দখল অভিযানে খুবই কাজে লেগেছিল। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারদের জানিয়ে দেয়া হল, প্রতি ইউনিয়নে সব সময়ের জন্য অন্ততঃ পক্ষে দু'হাজার মুক্তিযোদ্ধার দুই বেলার খাবারের সংস্থান রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে তাদের থাকার ব্যবস্থাও করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকগণ সানন্দচিত্তে আমার নির্দেশ মেনে নিয়ে নিজ নিজ এলাকার দিকে যাত্রা করলো।

স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে পশ্চিম-উত্তর এলাকার অধিনায়ক মেজর আবদুল হাকিমের কাছে একটি জরুরী বার্তা পাঠান হলো। বার্তার বিষয়বস্তু, '১৮ই নভেম্বর থেকে ১৯ শে নভেম্বর—দু'দিনের মধ্যে টাংগাইল ময়মনসিংহ পাকা রাস্তায় কালিহাতী থেকে মধুপুরের মধ্যে কমপক্ষে চারটি পাকা সেতু উড়িয়ে দিতে হবে যাতে ময়মনসিংহের দিক থেকে টাংগাইলে হানাদারদের আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।' ১৫ই নভেম্বর গভীর রাতেই দূত মেজর আবদুল হাকিমের হাতে জরুরী বার্তাটি পেঁছে দেয়। সাথে সাথে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও একটা জোর তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।

১৬ই নভেম্বর। কয়েকজন আমার সাথে দেখা করতে এলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আমার মামা, করটিয়ার ইদ্রিছ আলী। তিনি আমার মা ও ভাইবোনদের খবর নিয়ে ঢাকা থেকে এসেছেন। মা, ভাই ও বোনেরা ভাল আছে। ইদ্রিছ মামা মার একখানা পত্র আমাকে দিলেন। মা লিখেছেন, 'বাবা বজ্র, আমাদের জন্য কোন চিন্তা করিস না। তোর কাজ তুই চালিয়ে যা। মাঝে মধ্যে খবর দিস্।' ছোট

ভাই ও বোনেরাও চিঠি ও ছবি পাঠিয়েছে। মামার সাথে কথা বলে খুব আনন্দিত হলাম। রমজান মাস। দিনে খাবার-দাবারের কোন ব্যাপার নেই। মা, ভাইবোন, শারাহ খালা, খালাতো বোন মার্সকিন, ছোট ভাই মন্নুর কুশলাদি জেনে হাত খরচ বাবদ দেড় হাজার টাকা মামার হাতে তুলে দিয়ে বিদায় জানালাম।

অন্য সাক্ষাৎপ্রার্থী করটিয়া কলেজের ছাত্র। আমার খালাতো ভাই বানিয়ারা গ্রামের ওয়াদুদ। ওয়াদুদকে কলেজে ভর্তির আগে কোনদিন দেখিনি। বানিয়ারায় আমার নানার বাড়ী এটা জানতাম, কিন্তু ওয়াদুদের সাথে পরিচিত হবার আগে কোনদিন বানিয়ারা যাইনি। ওর সাথে পরিচয়টাও হঠাৎ করেই হয়। আমি তিন বছর লেখাপড়ার ক্ষতি করে '৬৮ তে সবেমাত্র করটিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছি। তখন জোর ছাত্র আন্দোলন চলছে। বড় ভাই রাজবন্দী হিসাবে ময়মনসিংহের জেলে। লতিফ সিদ্দিকীর ভাই হিসাবে চট করে আমার উপর অনেকেই কিছু আশা করেছিলেন। কিন্তু তখন আমি একেবারেই আনাড়ি। কেউ দাঁত দেখতে পাবে ভয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখতাম। এমন অবস্থায়ও কিছু কিছু শ্লোগান দেবার মোটামুটি সাহস সঞ্চয় করেছিলাম। একদিন এক ছাত্রমিছিল করটিয়া থেকে ছ'সাতটি বাসে টাংগাইল যাচ্ছিল। মিছিলে আমিও ছিলাম। আমাদের বাসের সামনের দিকে ছোটখাটো খুব সুন্দর একটি ছেলে, তার চাইতেও সুন্দর শ্লোগান দিচ্ছে। ওয়াদুদকে আমি সেই প্রথম দেখি। ও পড়তো বিজ্ঞান বিভাগে, আমি কলা বিভাগে। আমরা দুজন একই বর্ষের ছাত্র হলেও ও আমার চেয়ে সম্ভবতঃ আট'ন বৎসরের ছোট। আর আকারে অর্ধেকের একটু বেশী। মিছিল মিটিংয়ে ওর সাথে আস্তে আস্তে পরিচয় হলো। ওদের গ্রামে গেলাম। জানলাম ও আমাদের খালাতো ভাই : ওর মাধ্যমেই বানিয়ারা চিনলাম। বানিয়ারার অনেকেই আমাকে চিনলো। ওয়াদুদ শেষ পর্যন্ত শিষ্যে পরিণত হয়ে গেল। এই ধরনের ভাই এবং সহকর্মীকে দেখে কে না খুশী হয় ? আমিও খুব খুশী হলাম। অনেক কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করে ওয়াদুদকে ওর চাহিদা মত তিনশত টাকা এবং পরবর্তীতে ওদের এলাকায় গেলে ওর বাবা-মার সাথে দেখা করবো প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্তরিকভাবে বিদায় জানালাম।

শিবিরে লাবিব-জাহাঙ্গীর হত্যাকারী

এরপর এলো দু'জন। এরা অন্য কেউ নয়, পূর্ব আলোচিত খন্দকার আবদুল বাতেনের দলের দুই নেতা—শাহজাদা ও শাহজাহান। এদের বিরুদ্ধে লাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীর হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। আগস্ট মাসে, কর্নেল ফজলুর রহমান যখন লাউহাটি-কেদারপুরে ঘাঁটি গাড়েন, তখন তারা আরও দক্ষিণে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ভারত থেকে ফিরে আসার পর ওদের ব্যাপারটি আমার কাছে কর্নেল ফজলুই প্রথম তুলে ধরেন। আমিও কর্নেল ফজলুকে এই মর্মে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, ওদের সাথে একবার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে পারলে খুব খুশী হবো। আমার ইচ্ছা অনুযায় কর্নেল ফজলু নানা প্রচেষ্টা ও কৌশল করে অবশেষে শাহজাহান ও শাহজাদাকে আমার সামনে আনতে সক্ষম হলেন। তবে বন্দী করে নয়, কথা বলার জন্য। কথা বলার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে বাতেনের দলের দুই দুষ্ট নক্ষত্র আমার সাথে দেখা করতে

আসছে—এ খবর শোনার পর সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১৬ই নভেম্বর আমার সাথে দেখা করতে আসার পথে কেদারপুরের কাছে এই দু জনকে ধনবাড়ীর আবদুল রাজ্জাক ও ক্যাপ্টেন হুমায়ুনের দল আটক করে। কর্নেল ফজলু পথ প্রদর্শকের অনুরোধে তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে তাঁরাও সাথে সাথে ফতেপুরে লোক পাঠিয়ে তাদের মনোভাব জানিয়ে দেয়। তাদের একমাত্র দাবী, কমাণ্ডার লাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীরের হত্যাকারীকে হাতে পেয়ে তারা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—ছেড়ে দিতে পারে না। কিন্তু তারা যখন জানতে পারলো, আমি দু'জনকে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছি, তখন মনে মনে সন্তুষ্ট না হলেও তাদের আর কিছু করার থাকলো না।

বাতেনের দুই সহচর শাহজাদা ও শাহজাহানকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আমার সামনে হাজির করা হলো। অত্যন্ত যত্নসহকারে স্বাগত জানিয়ে আমার সামনেই ওদের বসতে দেয়া হলো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাল করে ওদের দেখলাম। তারপর চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছেন? আমি আপনাদের শুধু দেখার ও দু'চারটা কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলাম। আপনারা আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করায় আমি খুবই খুশী হয়েছি। আপনারা যেখান থেকে এসেছেন ঠিক সেখানে নিরাপদে পৌঁছে দেয়া আমার পবিত্র দায়িত্ব। এখন আপনারা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে কিছু বলার থাকলে বলুন।'

আমার আশ্বাস পাওয়ার পরও ওরা কতটুকু আশ্বস্ত হতে পেরেছিল কিনা বলা কঠিন। কর্নেল ফজলুর লোকজনের যোগাযোগ ও পরামর্শের ফলেই শাহজাহান ও শাহজাদা আমার সাথে দেখা করতে রাজী হয়। কিন্তু কেদারপুরে যখন মুক্তিযোদ্ধারা ওদের চ্যালেঞ্জ করে এবং হত্যার অভিযোগে কিছুক্ষণ আটকে রাখে, তখন ওরা বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। ফিরে যাবার বা পালাবার কোন পথ তখন ছিল না। কেদারপুর থেকে ফতেপুর এসে আমার কাছে আশ্বাস পাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা দারুণ অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠায় ছিল। আমার কথা শুনে অস্বস্তি ও ভীতি পুরোপুরি না হলেও কিছুটা সম্ভবতঃ কেটে যায়।

লাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীরের শহিদ হয়েছে সেই জুন মাসে। তারপর পদ্মা, মেঘনা ও যমুনায় অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঘটনার পর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সুসংহত ও শক্তিশালী হয়েছি, বিশাল মুক্তিবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে উঠেছে। নভেম্বর মাসে আমার নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা সতের হাজার ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা সত্তর হাজার। এমনি একটি বিশাল বাহিনী যেহেতু আমি পরিচালনা করছি তাই আমি যে একেবারে বিবেকহীন হবো না—এরকম একটা অনুমান করে শাহজাহান ও শাহজাদা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হয়েছিল। তারা ঐ আশ্বাস পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও, খুব একটা যে অবিশ্বাস করেছিল তা নয়। আশা-নিরাশা ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে তারা দোল খাচ্ছিল। আমার কথা শেষে সামান্য আশ্বস্ত হয়ে শাহজাহান ও শাহজাদা বললো, 'স্যার, আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে কমাণ্ডার লাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীরের হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে কিছুই

জানি না। আমরা জুন-জুলাই মাস থেকে আপনার নেতৃত্বে কাজ করতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু মাঝখানের এই ঘটনাটি আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। আমরা আপনার সাথে যোগ দিতে পারছি না। আমাদের বিপদ দেখুন; একদিকে হানাদার বাহিনী থেকে আমাদের পালিয়ে বেড়াতে হয়, অন্যদিকে আগস্ট মাসে ফজলু সাহেব যখন প্রথম এলেন, সেই তখন থেকেই আমরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমরা নিজেরাই চাইছিলাম, বাঁচা-মরা ত্যাগ করে একবার আপনার সাথে কথা বলি। তাই যখন ফজলু সাহেবের লোকেরা আপনার সাথে সাক্ষাতের পরামর্শ দিলেন এবং আপনিও দেখা করতে চান বলে জানালেন,—তখন সাথে সাথে আমরা রাজী হয়ে গেছি। স্যার, দেখুন, আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আপনার এখন যা ইচ্ছা তাই করুন।"

কথাগুলি শুনে বললাম, 'আপনারা আমাকে স্যার সম্বোধন করছেন কেন? কেন করছেন জানি না। আপনাদেরকে কি কেউ এই সম্বোধন করতে শিখিয়ে দিয়েছে?' সমস্বরে তারা দুজন বলে উঠলো, 'না না, আপনি আমাদের সকলের স্যার। শিখিয়ে দিতে হবে কেন? আমরা নিজেরা আন্তরিকভাবে আপনাকে স্যার বলে সম্বোধন করছি।' 'আপনারা আমায় কি বলে সম্বোধন করলেন, না করলেন, সেটা মোটেই দেখবার বিষয় নয়। লাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীরের মৃত্যুতে আমি খুবই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। তবে আজ আপনাদেরকে লাবিব-জাহাঙ্গীর হত্যার অভিযোগে এখানে আনা হয়নি। আপনাদেরকে দেখার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। তাই আপনাদেরকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। আপনারা আমার আমন্ত্রিত অতিথি। যতক্ষণ এখানে আছেন, ততক্ষণ সেই মর্যাদা আপনারা পাবেন। জুন মাসে যে পরিস্থিতিতে লাবিব-জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়েছে, সে পরিস্থিতি বিচার করে দেখতে হবে। আপনারা কি করবেন না করবেন, সে সিদ্ধান্ত এখান থেকে নিরাপদে চলে গিয়ে নিজেরাই নেবেন। এখানে লাবিব-জাহাঙ্গীর বা অন্য কোন ব্যাপারে আপনাদেরকে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হবে না। এলাকা ছেড়ে দূরে গিয়ে থাকতে যত কষ্টই হোক, আমাদের নিয়মনীতির বাইরে কাউকে এলাকার মধ্যে থাকতে দেয়া হবে না। মনে রাখবেন, যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মত মুক্তিবাহিনীর নামে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন বিশৃংখল দল গজিয়ে উঠুক —এটা যেমন শুরুতেও চাইনি। এখনতো একেবারেই চাই না। তবে এজন্য আমরা স্বাধীনতার সমর্থক বাঙ্গালীদের রক্তে হাত রঞ্জিত করতে চাই না, করবোও না। যে কোন ভাবেই হোক, অমন পরিস্থিতি হলে তা আমরা এড়িয়ে যাবো। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, যার খুশী, যেখানে খুশী, আলাদা আলাদা ভাবে দল গঠন করবেন।'

ততদিনে লাবিব-জাহাঙ্গীর হত্যা রহস্য দিবালোকের মত স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আমরা জানতাম, শাহজাদা ও শাহজাহানই লাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীরকে হত্যা করেছে। তবুও নিজেদের শিবিরে আমন্ত্রিতদের প্রতি কোন রূঢ় আচরণ করতে পারলাম না।

অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে আমার নেতৃত্বে লক্ষাধিক স্বাধীনতাকামী মানুষ কাজ করছেন, অথচ তখন শাহজাদা ও শাহজাহানদের লোকসংখ্যা ছিল চল্লিশ কি পঞ্চাশ

জন। ইচ্ছে করলে অথবা হুকুম দিলে ওদেরকে মুহূর্তের মধ্যেই আমার সহযোদ্ধারা নির্মূল করে দিতো। আমরা তা করিনি। এ ব্যাপারে স্বাধীনতার পর সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করলে আমি জোরের সাথে বলেছিলাম, 'বাতেন সাহেব যে ছোট একটি দল গঠন করেছিলেন, তার সকল যোদ্ধাই আমার বিরোধী ছিল না। স্বাধীনতার বিরোধী তো নয়। তারা সবাই সরল প্রাণ, সহজ মানুষ। বাতেন সাহেবকে বিশ্বাস করে তার দলে ভিড়েছে। তাই আমরা শাহজাহান-শাহজাদা কিংবা অন্য কোন লোকের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের জন্য অন্যদের উপর খড়্গ হস্ত হতে পারিনি।

১৭ই নভেম্বর। বাংলাদেশ সময় বেলা দুটো। আকাশবাণী থেকে প্রথম খবর প্রচারিত হলো, 'ঢাকার সাথে টাংগাইলের সড়ক যোগাযোগ মুক্তিবাহিনী বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। গত রাতে এক তুমুল যুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর হাতে ছ'শ পাক-সৈন্য নিহত ও বন্দী হয়েছে। টাংগাইল জেলা শহর এখন মুক্তি বাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।' খবর শুনে আমরা তো অবাক! কে এই খবর দিল? এটা যদি প্রোপাগাণ্ডা হয়, তা হলে সত্যিকারের আক্রমণ পরিচালনার যে প্রস্তুতি চলেছে—সেটা মাঠে মারা গেল! খবর শুনে আমি বেশ কিছুক্ষণ ছটফট করে পায়চারী করলাম। মনে মনে স্থির করেছিলাম, ১৮ই নভেম্বর ঢাকা-টাংগাইল সড়কের বেশ কয়েকটি সেতু উড়িয়ে দেবো। ১৭ই নভেম্বর দুপুরে আকাশবাণী এবং রাতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে পুনঃ পুনঃ এই খবর প্রচারিত হওয়ায় আমাদের পরিকল্পনা কিছুটা রদবদল করতে হলো।

১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় আবার কমাণ্ডারদের ডেকে যুদ্ধ পরিস্থিতির সকল দিক তাদের সামনে তুলে ধরলাম। অনেক বিচার-বিবেচনা করে ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় আক্রমণের সময় স্থির করা হল। ১৯শে নভেম্বরের সন্ধ্যাবেলা অভিযানের সময় নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

সেতু দখল পরিকল্পনা

ঐদিন মাহে রমজানের শেষ। পরদিন ঈদ। স্বাভাবিক কারণেই, রোজার শেষে ঈদের আনন্দ উপভোগের জন্য পাঞ্জাবী সৈনিকেরা ছোটখাট ঘাঁটিতে থাকবে না। মূল ঘাঁটিতে ফিরে যাবে। বারবার খবর প্রচারে হানাদাররা সক্রিয় হলেও, এটা একটা হাওয়াই খবর অনুমান করে ১৯শে নভেম্বর নাগাদ তাদের দৃষ্টি ও সতর্কতা অনেকটা শিথিল হয়ে আসবে।

দিনক্ষণ ঠিক হলো! কোন কোন লক্ষ্যে আঘাত হানা হবে, সকল কমাণ্ডারদের তা বুঝিয়ে বললাম, আমাদের মূল আক্রমণের লক্ষ্য শত্রু ঘাঁটি নয়, মূল লক্ষ্য ঢাকা-টাংগাইলের পাকা সড়কের বড় বড় সেতুগুলো। টাংগাইলের দিক থেকে ভাতকুরা সেতু হলো এক নম্বর। আর ঢাকার দিক থেকে কালিয়াকৈরের মহিষবাথান সেতু এক নম্বর। টাংগাইলের দিক থেকে এক নম্বর ভাতকুরা, দুই নম্বর করটিয়া, তিন নম্বর করাতিপাড়া, চার নম্বর মটরা, পাঁচ নম্বর বাঘির, ছয় নম্বর ইসলামপুর, সাত নম্বর জামুর্কী, আট নম্বর পাকুল্লা, নয় নম্বর শুবুল্লা, দশ নম্বর কুমির, এগারো নম্বর মির্জাপুর, বারো নম্বর দেওপাড়া, তের নম্বর কোদালিয়া, চৌদ্দ নম্বর সূত্রাপুর, পনের নম্বর কালিয়াকৈর (এক), ষোল নম্বর কালিয়াকৈর (দুই), সতের নম্বর মহিষ বাথান সেতু।

কোন্ কোন্ পুল ভাঙা হবে তা' ঠিক হয়ে গেলে কে কোন্ পুলে অভিযান চালাবে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। অনেক আলাপ আলোচনা শেষে ঘুরে ফিরে সকলের একই কথা, 'স্যার, আপনি বলুন, আমাদের কার কোন্ পুলে আঘাত হানা ঠিক হবে।' আমি সাতদিন খেটে পরিকল্পনা তৈরী করেছিলাম। কাকে কোথায় মোতায়েন করা হবে। কাকে কোন্ সেতু ভাঙার দায়িত্ব দেওয়া হবে—এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা খসড়া চূড়ান্ত করে রেখেছিলাম। সেটাই কমাণ্ডারদের সামনে উপস্থাপন করলাম ঃ—

এক। আমি নিজে ভাতকুরা পুলে অভিযান পরিচালনা করবো,

দুই। করটিয়া পুল ঃ ক্যাপ্টেন বায়েজিদ,

তিন। করাতিপাড়া-মটরা পুল ঃ ক্যাপ্টেন সোলেমান, ক্যাপ্টেন সামছুল হক,

চার। বল্লি ও ইসলামপুর ঃ ক্যাপ্টেন গাজী লুৎফর রহমান,

পাঁচ। জামুর্কী ও পাকুল্লা ঃ জাহাজমারা মেজর হাবিবুর রহমান,

ছয়। শুবুল্লা ও কুল্লি ঃ বাদশা, ক্যাপ্টেন এন. এ. খান আজাদ, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন ও ক্যাপ্টেন লায়েক আলম।

সাত। মির্জাপুর পুল ঃ ক্যাপ্টেন আজাদ কামাল,

আট। দেওহাটা ঃ ক্যাপ্টেন রবিউল ও ক্যাপ্টেন রঞ্জু,

নয়। কোদালিয়া ঃ ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর, ক্যাপ্টেন সাইদুর, ক্যাপ্টেন তমছের আলী,

দশ। সুত্রাপুর ও কালিয়াকৈর (১) ঃ ক্যাপ্টেন সুলতান, ক্যাপ্টেন নাসির,

এগারো। কালিয়াকৈর (২) ও মহিষ বাথান ঃ মেজর আফসার কোম্পানীর সহকারী ক্যাপ্টেন আব্দুল হাকিম।

পরিকল্পনা পেশ করার সময় কমাণ্ডারদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জরন উঠলো। গুঞ্জরন অবশ্য আর কিছু নিয়ে নয়, সকল কমাণ্ডারের মুখে একই কথা,—'আমার আর সরাসরি যুদ্ধে যাওয়া চলে না।' মেজর হাবিবুর রহমান ও ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললো, আমাদের যে যে টার্গেট দেওয়া হয়েছে—তা যদি ধ্বংস করতে না পারি—তা হলে সি. এন. সি স্যারের নিজের যুদ্ধে যাওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা এখন এত দুর্বল নই যে, সব যুদ্ধেই স্যারকে অংশ নিতে হবে।' মেজর হাবিব বললো, 'আপনি যে প্ল্যান দিয়েছেন, সেই প্ল্যান মত আপনার টার্গেটটি অন্য কাউকে দিয়ে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। আমরা যদি কোন সেতুতে অভিযান চালিয়ে বিফল হই, তা হলে যে শাস্তি দেবেন, তা আমরা মাথা পেতে নেব।' মেজর সমবেত কমাণ্ডাররাও একই অনুরোধ জানিয়ে বললো, 'এখন আর আপনার যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা চিহ্নিত সকল টার্গেটে সফল হব।' সবুর এই সময় বললো, 'সি. এন. সি স্যার যদি নিজেই এখনও যুদ্ধ করতে যান, তাইলে আমি আর কমাণ্ডার হইলাম ক্যান ? আমারে গুলি কইরা মাইরা ফেলাইলেও সি. এন. সি স্যারকে যুদ্ধে যাইতে দিমু না। কমাণ্ডার হিসাবে আমি পাইটে যামু না। আমারে আবার সিপাহী বানাইয়া দেই। তখন দেখমু আমি যাইতে পারমু কি না ?'

অভিযান পরিচালনার সকল ব্যবস্থা ঠিকঠাক হওয়ার পরেও প্রায় ঘণ্টাখানেক নানা কথাবার্তা ও আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমার যুদ্ধে যাওয়ার প্রশ্নটির ফয়সালা হচ্ছিল না। অগত্যা কিছু সময়ের জন্য সভার কাজ মুলতবী রাখা হলো। আলোচনা মুলতবী হলে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কমাণ্ডার অভিযানে অংশ না নিতে অনুরোধ জানালো। আমি ততক্ষণে বুঝে নিয়েছিলাম কোম্পানী কমাণ্ডারদের ইচ্ছা অনুযায়ী যুদ্ধে অংশ নেয়া একেবারে অসম্ভব। আমিও কোম্পানী কমাণ্ডারদের ঐ অনুরোধ, আপত্তি মেনে নিতে রাজী ছিলাম না। কারণ তাদের ঐ ধরনের আবদার একবার মেনে নিলে পরবর্তীতে একই ধরনের বহু অনুরোধ তারা করবে বা করার সুযোগ পাবে। আর যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমি দূরে সরে থাকি, তাহলে কোন এক সময় আমারও হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া সম্পর্কে মনের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ কিংবা ভীতি জাগতে পারে। আমি খুব ভালো করেই জানতাম আমার প্রতি সহযোদ্ধাদের যে অটুট আস্থা, বিশ্বাস, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসা—তা কেবল সততা, সাহস ও কর্মক্ষমতার কারণে, আমাকে দেখে নয় বা কথা শুনেও নয়। তাই যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন কর্মকাণ্ড থেকে পিছিয়ে পড়লে মুক্তিযোদ্ধাদের আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় চিড় ধরা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক। অতীতে বহু সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের নিরাপদে সরিয়ে রেখে অথবা অহংকার ও গৌরব প্রকাশ করে সহযোদ্ধাদের আস্থা ও সমর্থন হারিয়েছেন এবং নিজেদের বিপর্যয় ও অধঃপতন ডেকে এনেছেন। আমি সেই মারাত্মক ভুলটি করতে কিছুতেই রাজী নই। অতএব যুদ্ধে আমাকে যেতেই হবে এবং সফলতাও অর্জন করতে হবে। অন্যথায় নেতৃত্বের কোন যোগ্যতা আমার থাকবে না। বিশেষতঃ চলমান জটিল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে হেড-কোয়ার্টারে বসে নেতৃত্ব দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এক ঘণ্টা পরে আবার সভা শুরু হলো। দ্বিতীয়বার আলোচনার শুরুতে কমাণ্ডারগণ তাদের পূর্বের অভিমত জানালো, 'পরিকল্পনা নিখুঁত হয়েছে। আমাদের শক্তি সামর্থ যা, তাতে আমরা প্রতিটি অভিযানে সফল হব, এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। শুধু আপনি অভিযানে যাওয়া বাতিল করুন।' কমাণ্ডাররা আরও বললো, 'আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত করলাম, কিন্তু আপনি যে ধরনের নির্দেশ দেবেন, আমরা নির্দ্বিধায় তা মেনে নেবো।' বিরতির সময় আমি চিন্তাভাবনা করে স্থির করে ফেলেছিলাম যে, ভাতকুরা সেতু অভিযানের সিদ্ধান্ত তখনকার মত বাতিল করে দেবো। এই সিদ্ধান্তের কথা সবাইকে অবহিত করার সাথে সাথে দু'একজন কমাণ্ডার আনন্দ প্রকাশ করে বললো, 'স্যার, ঢাকা-টাংগাইল রাস্তা দখলের লক্ষ্যে ভাতকুরা সেতুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা চাইছিলাম ঐ পুল অভিযানের দায়িত্ব অন্য কাউকে দিন।' 'না, ভাইয়েরা, আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছি, ভাতকুরা সেতুটি না উড়ালেও চলবে। করটিয়া সেতুতে যারা আক্রমণ চালাবে, তারা যদি সেটা ভালভাবে ধ্বংস করতে পারে তা হলে করটিয়ার দক্ষিণের সমগ্র এলাকাটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। ভাতকুরার চেয়ে করটিয়ার সেতুটির দখল নেয়া সুবিধাজনক। এছাড়া সেতুটি ভাতকুরার চেয়ে অনেক বড়। তাই এটাকে টাংগাইলের দিক থেকে

পরিচালিত আক্রমণের পয়লা নম্বর সেতুরূপে চিহ্নিত করা হলো।' কয়টি সেতুতে আক্রমণ চালানো হবে, কে কোন্ সেতুতে আঘাত হানবে, কিভাবে তারা সরবরাহ পাবে, অভিযান পরিচালনার সব যখন ঠিক তখন আর অতিরিক্ত আলোচনা করে সময় নষ্ট করার কোন হেতু নাই। ১৭ই নভেম্বর রাত সাড়ে দশটা কি এগারোটায় কমাণ্ডাররা নতুন অভিযানের ছবি ও ফলাফল কল্পনা করতে করতে যার যার ঘাঁটির দিকে রওয়ানা হলো।

মির্জাপুর থেকে কালিয়াকৈর সড়কের মধ্যেকার সেতুগুলো ধ্বংস করার দায়িত্ব পেল—ক্যাপ্টিন সবুর, ক্যাপ্টিন সাইদুর, ক্যাপ্টিন সুলতান, ক্যাপ্টিন রবিউল ও ক্যাপ্টিন আজাদ কামাল। মির্জাপুর থেকে করটিয়া পর্যন্ত তের-চৌদ্দ মাইল রাস্তা দখল দায়িত্ব অর্পিত হলো—মেজর হাবিব, ক্যাপ্টিন হুমায়ুন, ক্যাপ্টিন শাহ আলম, ক্যাপ্টিন বায়োজিদ, ক্যাপ্টিন শামসুল হক, ক্যাপ্টিন সোলেমান, ক্যাপ্টিন লায়েক আলম ও কুদ্দির বাদশার কোম্পানীর উপর। অভিযানে অংশ নেয়া কোম্পানীসমূহ কিভাবে আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হলো। আমার অস্থায়ী হেড-কোয়ার্টার ফতেপুর থেকে দেলদুয়ার স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। অভিযানের সার্বিক খোঁজ খবর দেলদুয়ার থেকে নেয়া খুবই সহজ।

সেতুসমূহে বজ্রাঘাত হানাতে দারুন তোড়জোড় চলছে। সর্বত্রই সাজ সাজ ভাব। যদিও পরিকল্পনা ও তা বাস্তবে রূপায়িত করতে যাওয়ার খবর সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা তখনও জানে না। তবু তারা তাদের অতীত অভিজ্ঞতায় এটা ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারছে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোনও বড় রকমের অভিযান হতে চলেছে। তাদের আন্দাজ-অনুমানের অবশ্য আরও কারণ ছিল। ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৭ই নভেম্বর মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে দু'বার কমাণ্ডারদের ডেকে পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছি, এটা খুবই বিরল ঘটনা। তাই সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা নতুন ও ব্যাপক এক অভিযানের জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত হচ্ছিল।

১৭ই নভেম্বর দুপুরে বেতারে খবর প্রচারিত হবার পর হানাদার বাহিনী ঢাকা-টাংগাইল ও টাংগাইল-ময়মনসিংহ পাকা সড়কের উপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি এবং পাহারা বাড়িয়ে দেয়। এমনিতেই রাস্তার সেতুগুলিতে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা ছিল। ঢাকা-টাংগাইল যে কোন পাকা সেতুতে পঞ্চাশ থেকে এক'শ জন হানাদার সর্বদা পাহারা দিত। এরপরও দু' কোম্পানীর একটি টহলদারী দল রাস্তার সর্বত্র টহল দিয়ে ফিরছিল। ১৭ই নভেম্বর থেকে ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'কোম্পানী পাক হানাদার প্রায় পনেরটি সামরিক গাড়ীতে একবার ঢাকার দিক থেকে টাংগাইল, আবার টাংগাইলের দিক থেকে ঢাকা—দু'দিকে যাওয়া আসা করে রাস্তার উপর কড়া নজর রেখে চলছিল। টাংগাইল-ময়মনসিংহ রাস্তায়ও অনুরূপ কড়া পাহাড়া চলছিল ১৮ই নভেম্বর রাস্তার পাশে যেয়ে এই ধরনের পাহারা ও রাস্তার উপর পনের-কুড়িখানা হানাদারদের গাড়ীর নিয়মিত ও ঘন ঘন আনাগোনা (একবার একদিকে চলে যাওয়া গাড়ীগুলোর আবার ফিরে আসার মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক ঘণ্টা) দেখে কমাণ্ডাররা

কিছুটা বিচলিত হয়ে পরে। প্রায় সব কমান্ডার আমার কাছে বার্তা পাঠালো, রাস্তায় কঠোর পাহারার মাঝখানের ঐ টহলহীন এক ঘণ্টার মধ্যে সেতু দখল ও ধ্বংস করা না গেলে, হানাদারদের সাথে যুদ্ধ করে সেতু দখল ও বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব নাও হতে পারে। লড়াই করে অবশ্য সেতু দখল করা সম্ভব, তবে অত তাড়াহুড়ার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাঞ্ছিত ফলাফল কতটা পাওয়া যাবে, তা বলা যায় না। এই অবস্থায় তাদের কতব্য কি তা তারা জানতে চায়।

দক্ষিণ দিকের পুল উড়িয়ে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ক্যাপ্টিন আবদুস সবুর, ক্যাপ্টিন তমছের আলী, ক্যাপ্টিন সাইদুর রহমান ছাড়া আর সব কমাণ্ডারের কাছ থেকে একই বার্তা এসেছিল। আমিও তাদের কাছে একই ধরনের বার্তা পাঠালাম, 'তোমরা পরিকল্পনা মত কাজ কর, আগামীকাল দুপুরে তোমাদের সর্বশেষ নির্দেশ পাঠাচ্ছি। আক্রমণ প্রস্তুতি অব্যাহত রাখ।'

আস্তে আস্তে সময় কেটে গেল। এলো বহু আকাঙ্ক্ষিত ১৯শে নভেম্বর। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে ২০শে নভেম্বর দুপুর ঢাকা-টাংগাইল রাস্তার ত্রিশ মাইল মুক্তিবাহিনী দখল করে নিয়ে সতেরটি সেতু বিস্ফোরকের আঘাতে উড়িয়ে দিতে সক্ষম হলো। এই ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছিল সেটাই এখন বলছি।

১৯শে নভেম্বর দুপুর পেরোতে না পেরোতেই প্রত্যেক কোম্পানীর কাছে একজন করে দূত গিয়ে হাজির হলো। সবার কাছে একই আদেশ। ব্যতিক্রম শুধু সবুর তমছের ও সাইদুরের। সকলের কাছে পাঠানো নির্দেশ, 'তোমরা সেতু দখল করবে। রাস্তার উপরে টহলদারী সৈন্য ঠেকানো তোমাদের কাজ নয়। তাদেরকে অন্যভাবে ঠেকানো হবে। আজ সন্ধ্যায় আজানের পর ইফতার শেষে হানাদাররা যখনই উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢাকার দিকে যাবে তখনই তোমরা পুলে আঘাত হানবে। প্রথম আঘাত হানবে ক্যাপ্টিন আবদুস সবুর। দক্ষিণ দিক থেকে সবুরের সংকেতের পরই উত্তরে এক এক করে অপারেশন শুরু করবে।' অন্যদিকে ক্যাপ্টিন সবুর, ক্যাপ্টিন সাইদুর ও ক্যাপ্টিন তমছেরকে নির্দেশ দেয়া হলো, 'তোমরা কোদালিয়া, সুত্রাপুর, কালিয়াকৈর, মহিষ বাথানের পুলতো ধ্বংস করবেই, উপরন্তু ঢাকার দিক থেকে হানাদার বাহিনী যাতে কোনক্রমেই সারারাতে টাংগাইলের দিকে আসতে না পারে— সেই ব্যবস্থাও তোমাদের করতেই হবে। ইফতারের পর, হানাদার টহলদারীদল মহিষ বাথান পুল পেরিয়ে ঢাকার দিকে চলে যাবার পরই যেন আঘাত হানা হয়। আমি তোমাদের সফলতা কামনা করছি।'

১৯শে নভেম্বর সকালে ফতেপুর ত্যাগ করে ফাজিলহাটিতে এলাম। ফাজিলহাটি থেকে একশ জনের খাবার ও ইফতারী তৈরী রাখতে দেলদুয়ারের স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ পাঠালাম। কারা ইফতার করবে খাবার খাবে—তার কোন ইঙ্গিত দেয়া হলো না। ফাজিলহাটিতে আমরা প্রায় দুই ঘণ্টা কাটালাম। ফাজিলহাটিতে যে বেতার স্টেশন বসানো হয়েছিল তা গুটিয়ে ফেলা হলো। দেখেশুনে বেছে বেছে তিনজন সুদক্ষ বেতার অপারেটরকে দলে নিলাম। আমার দেহরক্ষী দলের নেতৃত্ব করছিল ছোট ফজলু। এই ক'দিনে সে

ফজলুর বিচক্ষণতা

ধাতস্থ হয়ে গেছে। দায়িত্ব পাবার পর তার বুদ্ধি বিবেচনা, দায়িত্ববোধ ও কর্মকাণ্ডের সে কি উন্নতি! যা ছিল অনেকের কল্পনার অতীত। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, সবুর, সাইদুর ও তমছেরের মত চৌকশ সহযোদ্ধা থাকা সত্ত্বেও দেহরক্ষী দলের কাজকর্মে কখনো-সখনো যে সামান্য ভুলত্রুটি দেখা দিত, ফজলু দায়িত্ব নেয়ার পর সে সকল ত্রুটি বিচ্যুতিও কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি কি খাবো, আমার সাথে কে কে দেখা করতে এসেছেন, পরের দিন কে কে দেখা করতে পারেন, কোথায় যাবো সেখানকার রাস্তাঘাট ও পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন ইত্যাদি খবরাখবর সে আগেই সফলতার সাথে সংগ্রহ করতে সক্ষম হতো। বিশেষতঃ বাতেন-দলের শাহজাহান ও শাহজাদা যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে, তখন সে যে কঠোর ও সময়োচিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তা রীতিমত প্রশংসনীয়। কোন সাক্ষাৎ প্রার্থীর দেহ তল্লাসী করা হোক এটা আমি চাইতাম না। আবার চোখে ধুলো দিয়ে অস্ত্রসহ কোনও আগন্তুক আমার সামনে উপস্থিত হউন—তাও নিরাপত্তার খাতিরে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। দেহরক্ষী দলের কমাণ্ডার হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্তির তিন-চার দিন পর জনৈক আগন্তুকের দেহ তল্লাশীর নির্দেশ দিয়ে ফজলু বেশ বিপদে পড়েছিল। তল্লাশীর কথা শুনে আমি তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলাম, 'যারা আমার সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে আসেন তাদের সাথে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। কেউ অস্ত্র নিয়ে আসুক—তা আমি চাই না। এর অর্থ এই নয় যে, কারও দেহ তল্লাশী করতে হবে। মুক্তিবাহিনীর চোখ একটু তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার। মুখ দেখে যে কোন লোক সম্পর্কে ভালোমন্দের আঁচ পাওয়া দরকার। অস্ত্র নেই, অথচ তাকে তল্লাশী করা হলো, এটাও যেমন আমি সহজভাবে নেব না, আবার তোমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ আমার সামনে অস্ত্র নিয়ে হাজির হলো, সেটাও ভালোভাবে নেব না। এই দুঃসাধ্য কাজটা অত্যন্ত যত্ন সহকারে করতে হবে। কাউকে লক্ষ্য করার সময় তিনি যেন বুঝতে না পারেন যে, তাকে নজরে রাখা হয়েছে।'

কঠোর শাসানি ও উপদেশের পর ফজলুর মাধ্যমে শাহজাহান ও শাহজাদা আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে কমাণ্ডার ফজলু তার দূরদর্শিতা ও দক্ষতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। কেদারপুর থেকে ফতেপুর পুরো রাস্তাতেই তার লোক রেখে দীর্ঘ সময় ধরে আগন্তুকদের নানাভাবে লক্ষ্য করে। এমনকি দু'তিন জায়গায় শাহজাহান ও শাহজাদাকে ফুলের মালা ও তোড়া দিয়ে অভিনন্দিত করে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে। আগন্তুকদের কাছে কোন অস্ত্র লুকানো আছে কিনা আলিঙ্গনের সময় তা তারা মোটামুটি আন্দাজ করে নেয়। শিবিরের সামনে কমাণ্ডার ফজলু আরও দশ-বারো জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গভীর উৎসাহ দেখিয়ে আগন্তুকদের সাথে একের পর এক আলিঙ্গন করে তাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়।

ইফতারের একটু আগে কমাণ্ডার খোকার কোম্পানীসহ দেলদুয়ারে হাজির হলাম। দু'দলের সদস্য সংখ্যা মোট একশ পঁচিশ জন। নির্দেশ মত দেলদুয়ারের স্বেচ্ছাসেবকরা জমিদার গজনবী সাহেবের বাড়ীর পূবপাশে খোলা মাঠে মুক্তিবাহিনীর

ইফতারের ব্যবস্থা করেছে। স্কুলের সামনে কয়েকটি আম গাছের নীচে আমরা ইফতার করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পেটভরে খেয়ে নিলাম। রোজা শেষ। রোজা রাখার জন্য আর শেষ রাতে "শেহ্‌রী" খেতে হবে না, প্রতিদিন সন্ধ্যায় "ইফতারীরও" প্রয়োজন হবে না। একমাস রোজা রাখার পর যে কোন রোজাদারের কাছে শেষ ইফতার এক পবিত্র অনুভূতি, পরদিনই তো বহু আকাঙ্ক্ষিত পবিত্র ঈদ।

যুদ্ধের সময় প্রতিটি মুসলিম মুক্তিযোদ্ধা পুরো মাস রোজা রেখেছে। আমিও বাদ পড়িনি। পনের-ষোল বছর বয়স থেকে রোজা রেখে আসছি। প্রতিবারই রমজান মাসের শেষ দিনে খুশীর ঈদের মধুর আনন্দ উপভোগ করেছি। এবার কিন্তু সেরকম খুশীর কোন অনুভূতি নেই। আনন্দের কোন প্রকাশ নেই। শেষ রোজার ইফতারী করতে যেয়ে আমার চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমার মত হয়ত আরও শত শত রোজাদার মুক্তিযোদ্ধার চক্ষু এমনিভাবে অশ্রুতে ভরে উঠেছিল। কত লাখো লাখো ছিন্নমূল, শত্রু কবলিত ও উদ্বাস্তু মুসলমান '৭১-এর খুশীর ঈদের মধুর স্বাদ থেকে বঞ্চিত রইলেন। আমার মনে হাজারো প্রশ্ন তোলপাড় করছে, হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধারা কি ভাবছে? কে কোন্ অবস্থায় রয়েছে? মা কোথায়? বাবা কোথায়? ভাই-বোনেরা কোথায়? পরবর্তী দিনগুলোতে কি ঘটতে যাচ্ছে? হাজারো ভাবনা- হাজারো জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে ইফতার ও আধা ঘণ্টা পরে রাতের খাবার শেষে সেতু অভিযানে বেড়িয়ে পড়লাম। সত্তেবই নভেম্বর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, সেতু দখল অভিযানে আমি অংশ নেব না। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত শুধু সহকর্মীদের খুশী করার জন্যই নিয়েছিলাম।

ভাতকুরা সেতু অভিযান। দেলদুয়ার থেকে সোজা দক্ষিণে পাথরাইল-চণ্ডী। চণ্ডী থেকে কুমুল্লীর মাঝ দিয়ে দেড়'শ জনের একটি দল নিয়ে ভাতকুরা ও কুমুল্লীর মাঝামাঝি একটি নিরাপদ এবং সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলাম। এখান থেকে দলটিকে তিনটি ছোট দলে বিভক্ত করা হলো। ক্যাপ্টেন মকবুল হোসেন খোকার নেতৃত্বে প্রথম দল ভাতকুরা সেতু দখল করবে।

ভাতকুরা সেতু অভিযান

ক্যাপ্টেন ফজলুর নেতৃত্বে ত্রিশ জনের দ্বিতীয় দল ভাতকুরা সেতুর দেড়-দু' মাইল উত্তরে টাংগাইলের দিকে সড়ক আগলে থাকবে। পনের জনের তৃতীয় ও সর্বশেষ দলটি কোপাখির বাবুলের নেতৃত্বে ভাতকুরার মাইলখানেক দক্ষিণে ক্ষুদিরামপুর রাস্তার উপর অবরোধ সৃষ্টি করবে। উভয় দলের দায়িত্ব সেতু ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত রাস্তা আগলে রেখে কোনো দিক থেকে যাতে সেতুতে সাহায্য আসতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। এছাড়া আরও প্রায় চল্লিশ জন সহযোদ্ধা নিয়ে আমি মর্টার প্লাটুনের দায়িত্ব নিলাম। নির্ভুল নিশানায় গোলাবর্ষণে অব্যর্থ ছামাদ গামাও আমার সহযোগী।

ভাতকুরা লৌহজং নদীর পারে কর্নেল জিয়ার কাছ থেকে নেয়া সেই চায়নীজ ৩ ইঞ্চি মর্টারটি বসানো হলো। এই মর্টার ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা এই যে, এটা দিয়ে এক মাইল থেকে তিন-চার মাইলের মধ্যে লক্ষ্যবস্তুর উপর নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে আঘাত হানা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ ৩ ইঞ্চি মর্টার দিয়ে এক মাইলের মধ্যে গোলা নিক্ষেপ খুবই বিপজ্জনক। অথচ আরমা চাচ্ছিলাম মর্টারটি ভাতকুরা সেতুর

-কাছাকাছি কোথাও বসাতে, যাতে লক্ষ্যবস্তুর দেখে দেখে সঠিক নিশানায় গোলা নিক্ষেপ করা যায়।

ব্রিটিশ ও চায়নীজ ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা নিক্ষেপে ছামাদ গামা ইতিমধ্যেই খুব পারদর্শী হয়ে উঠেছে। আমার ২ ইঞ্চি মর্টারের নিশানা ছিল অব্যর্থ। ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা নিক্ষেপের আরও কিছু বাড়তি সুবিধা থাকায় আমার ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা ছুঁড়তে আরও সুবিধা হত। দলের সাথে মর্টার আছে আর আমি মর্টার থেকে গোলা ছুঁড়েছি বা কিভাবে ছুঁড়তে হবে—তা মর্টার প্লাটুনকে বুঝিয়ে দিয়েছি, এমনি অবস্থায় কোন অভিযান ব্যর্থ হয়েছে বা শত্রু ঘাঁটির পতন ঘটেনি, এমনটা কোন অভিযানেই হয়নি। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ছিল হিমালয়ের মতো উঁচু। পুল থেকে ১ মাইল দূরে মর্টার বসানোর কাজ শেষ হলে ছামাদ গামাকে মর্টারের কাছে থাকতে নির্দেশ দিয়ে ভাতকুরা গোরস্থানের পূবে পাকা রাস্তায় উঠে সরজমিনে দেখে ফিরে এসে গোলা ছুঁড়বো অথবা ছামাদকে গোলা ছুঁড়তে নির্দেশ দেব। দুলাল, শামসুল হক, আবদুল লতিফ, শামসু, ভোম্বল। ছানোয়ার, মুর্জ খান, আজাহার, বেনু মীর্জা, আবদুল্লাহ আব্দুল মান্নান, পিন্টু ও মাসুদসহ কুড়ি জনকে নিয়ে আস্তে আস্তে লোহজং নদী অতিক্রম করে ভাতকুরা গোরস্থানের পশ্চিম পাশে গেলাম। ঢাকা-টাংগাইল পাকা রাস্তার দিকে কিছুদূর এগিয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ভাল করে দেখেশুনে রাস্তা নিরাপদ বলে জানালে সড়কের উপর যাবার জন্য এগুতে শুরু করেছি, এমনি সময় ঘটলো এক চমকপ্রদ এবং অচিন্তনীয় ঘটনা। ভাতকুরা পাকা রাস্তার মাত্র কুড়ি-পঁচিশ গজ পশ্চিমে গোরস্থানের কাছে এসেছি, এমনি সময় ভাতকুরার স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার দু'তিনজন মুক্তিযোদ্ধাসহ উত্তেজিতভাবে আমার সামনে এসে হাজির। তারা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'স্যার, কাজ হইয়া গেছে। পুল দখল হইয়া গেছে। রাজাকাররা সারেন্ডার করছে।' কাজ হয়ে গেছে, পুল দখল হয়ে গেছে, রাজাকাররা সারেন্ডার করেছে, কথাগুলো একত্রে, এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললেন। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার মোহর খাঁকে কাছে টেনে নিচু গলায় বললাম, একটাও গুলি হলো না অথচ এত সব হয়ে গেল কি করে? যে দলের সেতুতে আঘাত হানার কথা, তারা তো ঐ দোকান ঘরের কাছে। কি করে পুল দখল হলো? এর জবাবে মোহর খাঁ দুঃসাধ্য সাধনের ঘটনা বললেন, 'স্যার, সোহরোয়ার্দী ভাই একদিন আগে আমারে এই পুলের সমস্ত খোঁজ খবর নিতে বলেছিলেন। আমি তো সব সময়ই করটিয়া, ভাতকুরা, নগরজলপাই, আশিকপুর এই সমস্ত জায়গার খোঁজখবর এমনিতেই রাখতাম। ভাতকুরা পুলে রাজাকারদের একটি নতুন দল আইছে। আসার ঠিক পরেই তাদের দুইজনের আমার সাথে যোগাযোগ হয়। এদের বেশীরভাগ গোপালপুর, কস্তুছনগরের লোক। আমার সাথে একটু পরিচিত হওয়ার পরই তারা আমার কাছে জানতে চায় কিভাবে এখান থেকে পালাইয়া গিয়া মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করতে পারবে। আমি তাদের তিন-চার দিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে বলি। এই পুলে খারাপ প্রকৃতির পাকিস্তান সমর্থক রাজাকার ছিল মাত্র একজন। সে ঈদ করার জন্য দুপুরে বাড়ী চইল্যা গেছে।'

মোহর খাঁর কেরামতি

মোহর খাঁ আরও জানালেন, 'অভিযান যে আসন্ন তাতো আমাগো যেদিন ডাকা হইছিল, সেইদিনই বুঝতে পারছিলাম। তবে আজ হবে সেটা জানতাম না। কিছু জরুরী খবর পৌঁছাইয়া দিতে আজ বিকালে দেলদুয়ার গেছিলাম। তখন জানলাম, আজ পুল দখল হইব। আমি আইস্যাই এদের সাথে যোগাযোগ করছি। তারা সারেন্ডার করতে প্রস্তুত। শুধু প্রস্তুত নয় স্যার, তারা পুল ছাইড়্যা দিয়া পুব পাড়ে ঐ বাড়ীগুলাতে বইস্যা রইছে। এখন বলেন স্যার, রাজাকারদের কোথায় নিয়া যামু?'

মোহর খাঁর একটানা প্রায় মিনিট খানেক শ্বাসরুদ্ধকর কথা শোনে বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি প্রথমে রাজাকারদের রাইফেলের ম্যাগাজিন বোল্ট খুলে নিয়ে আসুন।' বলা শেষ হতে না হতেই মোহর খাঁ ছুটলো রাজাকার লুকিয়ে থাকা বাড়ীর দিকে। আর সড়কে উঠা হলো না। একশ' গজ পশ্চিমে, নদীর ধারে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। পিন্টুসহ আরেকজনকে মর্টার সেকশনের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় বার নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সামাদ গামা যেন মর্টার ব্যবহার না করে।

মোহর খাঁ যেন মোহর খাঁ নয়, "হাওয়া খাঁ"। চার-পাঁচ মিনিটও লাগেনি। যেমনি মোহর খাঁ ছুটে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি হাওয়ার বেগে ফিরে এলেন। তাঁর সাথে মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া আরও তিনজন। এরা কারা? অন্য কেউ নয়—আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক রাজাকারদেরই তিন জন। উৎসাহী মোহর খাঁ আমার অনুমতির অপেক্ষা করতে পারেনি। সতের জন রাজাকারের মধ্যে তিনজনকে তিনি সাথে নিয়ে এসেছেন। এ যেন হুকুম দেয়ার আগেই হুকুম তামিল। তাঁর হাতে একখানা গামছায় বাঁধা ষোলটি ম্যাগাজিন ও ষোল খানা বোল্ট। দু'জন মুক্তিযোদ্ধার কাছে অতিরিক্ত দু'টা স্টেনগান, এ সবই রাজাকারদের অস্ত্র। মোহর খাঁর কান্ড দেখে আমি তো অবাক! রাজাকারদের সাথে তার যে একটা ভাল যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে, এ সব থেকেই তা আন্দাজ করা গেল। আবার পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধাসহ মোহর খাঁকে অবশিষ্ট রাজাকারদের আনতে পাঠালাম। এ রকম ঘটনা যখন ঘটছিল, তখন সেতু-অভিযান পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মকবুল হোসেন খোকা সর্বশেষ নির্দেশ নিতে আমার কাছে এলো। তাকে বললাম, 'তুমি পুলে গিয়ে উঠ। পুল সম্পূর্ণ মুক্ত। দু'জন দূত টাংগাইলের দিকে রাস্তা আগলে-থাকা ক্যাপ্টেন ফজলুর কাছে পাঠিয়ে দাও।'

নির্দেশ পেয়ে খোকা চলে গেল। আমাদের থেকে প্রায় তিন'শ গজ উত্তরে দোকানঘরের পাশে গাছের আড়ালে অপেক্ষমান দলের সবাইকে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে পুলে উঠলো। সত্যিই পুলটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেউ নেই একেবারে ফাঁকা। সেতুটি শত্রুমুক্ত কেন তা কিন্তু খোকা তখনও জানতো না। পুল দখলের সংবাদ দূত মারফত ফজলুর কাছে পাঠিয়ে দিল। খোকা চলে যেতে না যেতেই মোহর খাঁর তৃতীয় বার আবির্ভাব ঘটলো। সকল রাজাকারদেরই তিনি সাথে নিয়ে এসেছেন। সাধারণভাবে নয়, কোমরে রশি বেঁধে। রশি বাঁধা অবস্থাতেও তিনজন রাজাকার ষোলটি রাইফেল পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসেছে। রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করেছে তবু কোমরে ও হাতে রশি বাঁধা কেন? তাদেরকে কি সাধারণভাবে

পাহারা দিয়ে আনা যেতো না ? রাজাকারদের সাথে মোহর খাঁর শর্তই ছিল, 'আমি তোমাদের বন্দী অবস্থায় মুক্তিবাহিনীর হাতে দেব। মুক্তিবাহিনী তোমাদের বিচার করে পরে মুক্তি দেবেন।' তবে মোহর খাঁ রাজাকারদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আত্মসমর্পণকারীদের কোন বিচার হবে না। এবং তিনি চেষ্টা করবে পরবর্তীতে যাতে তারা সবাই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে পারে। মোহর খাঁর শর্তেই রাজাকাররা আত্মসমর্পণে সম্মত হয়েছে।

আমাদের হাতে সময় খুবই কম। তাই যা কিছু করার ঝটপট্ করতে হবে। আট-দশ জন মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে রাজাকারদের কুমুল্লী প্রাইমারী স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা ভাতকুরা সেতুর দিকে অগ্রসর হলাম। মোহর খাঁও আমার সাথে। গোলাগুলি, যুদ্ধ ছাড়াই পুল দখলে মুক্তিবাহিনীর কোন কৃতিত্ব নেই। পুল দখলের শতকরা নিরানব্বই ভাগ কৃতিত্ব ও গৌরব ভাতকুরা ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবক কমান্ডার মোহর খাঁ ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবক দলের। মোহর খাঁকে পুলে রেখে টাংগাইলের দিকে এগুতে লাগলাম। টাইটটা বটগাছের কাছে এসে ফজলুকে দেখতে পেলাম। সে খুব শক্তভাবে টাংগাইল রাস্তা অবরোধ করে আছে। এখানে সামাদ গামা মর্টার নিয়ে আমার সাথে মিলিত হলো, তাকে বট গাছের আশপাশে কোন নিরাপদ স্থানে মর্টার বসাতে বললাম। ফজলুর দলকে নির্দেশ দেয়া হলো আরও সামনে এগিয়ে যেতে। ফজলু, দুলাল, মান্নান, মকবুল, আজাহার,জাহাঙ্গীর, ভোম্বল—সবাই রাস্তার দুই পাশ দিয়ে সতর্ক হয়ে টাংগাইলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা বটগাছ আর নগরজলপাই সেতুর মাঝামাঝি এলে হানাদারদের বাংকারে জীবন্ত কিছুর নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। কমান্ডার ফজলু বাসে দুলাল, মান্নান রাস্তার ডানপাশ দিয়ে এগুচ্ছিল। ফজলুর পেছনে মুক্তাগাদার দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মকবুল, দুর্মুজ খাঁ, আজাহার, ভোম্বল ও জাহাঙ্গীর এগিয়ে যাচ্ছিল। এমনি অবস্থায় ফজলুর একেবারে সামনের বাংকার থেকে কে একজন রাইফেল উঁচিয়ে ধরে। চোখ কান খোলা সদা সতর্ক ফজলু উঁচিয়ে ধরা রাইফেলটি পা দিয়ে চেপে ধরে। সাথে সাথে রাইফেল থেকে একটি গুলি বেরিয়ে যায়। এদিকে দশ-বারো গজ পিছনের মকবুল উল্কাবেগে ছুটে গিয়ে দ্রুমদ্রাম বাংকারের ভেতর তিন রাউন্ড গুলি করে বসে। তিন তিনটি গুলির প্রচন্ড রাতের গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল। আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। শহরের দিক থেকে হানাদার বাহিনীর মেশিনগানগুলোও মুহূর্তে গর্জে উঠলো। সামনে কি ঘটছে তা জানতে আবদুল্লাহকে পাঠালাম। আবদুল্লাহ ফিরে এসে জানালো—তেমন কিছু হয়নি। বাংকারে কয়েকজন রাজাকার ধরা পড়েছে।

আমাদের অগ্রবর্তী দল নগর-জলপাই সেতু অতিক্রম করে গেল। খবর পাঠানো হলো অগ্রবর্তী দল যেন কিছুতেই আশিকপুরের প্রখ্যাত যাদুকর পি. সি. সরকারের বাড়ী পেরিয়ে না যায়। প্রয়োজনবোধে পরে এগুবার অনুমতি দেয়া হবে। এর পরে শুরু হল সামাদ গামার বিরামহীন গোলাবর্ষণ। তার গোলার লক্ষ্য—টাংগাইল নতুন জেলা শহর। সামাদ দশ-পনের খানা গোলা নিক্ষেপ করছে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'স্যার, গোলা কি ঠিক জায়গায় পড়তাছে ?' তুমি যত দূরে পার, গোলা নিক্ষেপ কর।

এরপর যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের বাড়ীর দিকে ছুটলাম। বটগাছ থেকে মাত্র কয়েক'শ গজ টাংগাইলের দিকে এগুতেই এক প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে এল, 'হল্ট, হ্যাণ্ডস্ আপ!' এই বিকট চিৎকার শত্রুপক্ষের নয়, আমাদের অগ্রবর্তী দল শহর থেকে এগিয়ে আসা কুড়ি-পঁচিশ লোককে চ্যালেঞ্জ করেছে। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে তারা যন্ত্রের মত দাঁড়িয়ে যায় এবং আগত দলের একজন উচ্চস্বরে বলে উঠে, 'আমরা পাসওয়ার্ড জানি না, বট গাছের নীচে মুক্তিবাহিনী আছে আমরা সেখানে যাব। আমরা রাজাকার, সারেণ্ডার করছি।' কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সোহরোয়াদী ভাই?' 'হ্যাঁ, আমি সোহরোয়াদী।' 'আপনি একা এগিয়ে আসুন।' এগিয়ে এলে তাকে দেখে মুক্তিযোদ্ধাটি মহা খুশী। সোহরোয়াদী টাংগাইল থেকে উনত্রিশ জন রাজাকারকে সারেণ্ডার করাতে নিয়ে এসেছে। তাকে আমার কাছে আনা হলো। সোহরোয়াদী'র কাজে খুশী হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'তুমি যাদের সাথে করে এনেছ, তাদের নিয়ে তোমাদের গ্রামের স্কুল ঘরের সামনে চলে যাও।'

আমি আস্তে আস্তে টাংগাইলের দিকে এগুতে থাকলাম। যেতে যেতে টাংগাইল সি. ও. অফিসের সামনে পি. সি. সরকারের বাড়ীর কাছাকাছি ফজলুর অবস্থানে পৌঁছে গেলাম। ফজলু তার দলের একটি ব্লাণ্ডার সাইট, দু'টি রকেট লাঞ্চার পাকা রাস্তার দু'পাশে ও মীরের বেতকার কাঁচা রাস্তায় একটি সুন্দর অনুকূল স্থানে এম. এম. জিটি বসিয়েছে। ঘুরে ঘুরে ওর সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখলাম। ফজলুর অবস্থান থেকে টাংগাইল বাস স্ট্যাণ্ড তথ্য সে আমাকে অবহিত করল। পর্যন্ত এক মাইল রাস্তার কোথাও কোন হানাদার ঘাঁটি নেই, এই জরুরী ও নির্ভুল টাংগাইল শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে কেন—সে এটা জানতে চাইলে ক্যাপ্টেন ফজলুকে আশ্বস্ত করলাম, 'আমাদের দলের পশ্চিম দিক থেকে টাংগাইল শহর আক্রমণের কথা আছে, গোলাগুলির যে শব্দ শোনা যাচ্ছে, তা আমাদের দলেরই। প্ল্যান অনুযায়ীই কাজ হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো সঠিক খবর জানতে পারবো।'

ক্যাপ্টেন ফজলুর সাথে কথাবার্তা চলাকালে দু'টি ওয়ারলেস সেটে অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগের আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছিল কিন্তু কিছুতেই রাত ন'টা পর্যন্ত অন্যান্য দলের সাথে বেতার যোগাযোগ করা গেল না। এতে কিন্তু মুক্তিবাহিনীর খবর আদান-প্রদানে বিঘ্ন ঘটেনি বা বন্ধ থাকেনি। ফজলুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখে উপলব্ধি করলাম ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নিয়মিত হানাদারবাহিনী সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করলে হাল্কা অস্ত্রে ক্যাপ্টেন ফজলু তাদের ঠেকিয়ে রাখতে বা প্রতিহত করতে পারবে না। আশিকপুর থেকে কিছুটা পিছিয়ে এসে নগর জলপাই পুলের দক্ষিণ পাশে ফজলুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা নিরাপদ। থাকতেই সে দলের অর্ধেক অংশকে পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে পাঠালো। বাকী অংশ নিয়ে সে আমার পেছনে আসতে লাগলো।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, ঠিক এমন সময় মীরের বেতকা গ্রামের ভেতর দিয়ে ছুটে এসে দু'তিন জন স্বেচ্ছাসেবক ও একজন মুক্তিযোদ্ধা টাংগাইল শহরের পশ্চিমাঞ্চলের

খবর দিল, ক্যাপ্টেন মইনুদ্দিন তিন'শ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে টাংগাইল শহরের উপর প্রচণ্ড হামলা চালিয়েছে। টাংগাইল থানা ও বাজিতপুর বিসিক ঘাঁটি থেকে হানাদাররা বাধা দিলেও তা কাটিয়ে উঠতে মুক্তিবাহিনীর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। পুরানো শহরের অধিকাংশ মিলিটারী, রাজাকার ও পুলিশ জিলা শহরের দিকে সরে গিয়েছে। যারা নতুন জেলা শহরের দিকে যেতে পারেনি, তারা যে যেদিকে পেরেছে প্রাণভয়ে পালিয়েছে। দেড়'শর বেশী রাজাকার ও পুলিশ আত্মসমর্পণ করেছে অথবা ধরা পড়েছে, মুক্তিবাহিনীর কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পরবর্তী নির্দেশ কি? তাই তারা জানতে এসেছে।

সংবাদবাহকরা এত দ্রুত আমাকে পাওয়ার কারণ হল মইনুদ্দিন কোম্পানীর যোদ্ধারা পরিস্থিতি ও সর্বশেষ খবর নিয়ে বাজিতপুর হয়ে দেলদুয়ারের দিকে যাচ্ছিল। পুটিয়াজানি খেয়াঘাটে কয়জন সেচ্ছাসেবক তাদের খবর দেয়, সর্বাধিনায়ক ঐ দিকে নেই, তিনি ভাতকুরার দিকে আছেন। ফলে তারা দেলদুয়ার না গিয়ে মীরের চেতকা হয়ে ভাতকুরার দিকে ছুটে। মীরের চেতকা পার হতে না হতেই আমার সাথে দেখা হয়ে যায়। ভাতকুরায় তাদের আর যেতে হল না। মইনুদ্দিন কোম্পানীর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানিয়ে নির্দেশ দিলাম, তাদের আর উত্তরে এগুনোর দরকার নেই। সামনাসামনি যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন হবে না। সকাল ছ'টার মধ্যেই তারা যেন বিন্নাফৈর পর্যন্ত পিছিয়ে অবস্থান নেয়। প্রয়োজন হলে বিন্নাফৈর থেকে মইনুদ্দিনকে আবার ডেকে আনা হবে। সংবাদবাহক দু'জন আনন্দে নাচতে নাচতে পশ্চিমে ছুটলো।

আমরা ভাতকুরার দিকে এগিয়ে চললাম। ভাতকুরা সেতুতে বিস্ফোরক লাগানোর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করে সহযোদ্ধারা অপেক্ষায় ছিল। কারণ বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজটি আমি সমাধা করতে চেয়েছিলাম। বিস্ফোরক বিশারদ মুক্তাগাছার হাবিব খুবই যত্নের সাথে ভাতকুরা সেতুতে চক্রাকারে বিস্ফোরক লাগিয়ে কর্টেক্স ডেটোনেটার সংযোগ করে রেখেছিল। শুধুমাত্র সেফ্‌টি ফিউজে আগুন লাগানো বাকী। ভাতকুরা পুলে ফিরে এসে মাত্র দু'জনকে রেখে সবাইকে দক্ষিণে সরে যেতে বললাম। রাত আনুমানিক দশটা দশ মিনিটে ভাতকুরা সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত এলাকা থর থর করে কেঁপে উঠলো। চারদিক ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আশেপাশের গরু বাছুরগুলো ভ্যাঁ ভ্যাঁ চিৎকার শুরু করে দিল। কিন্তু এত প্রচণ্ড ও শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানোর পরও ভাতকুরা সেতুটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো না। পুলটিকে একেবারে নীচে ফেলে না দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে রেখে দিতে চেয়েছিলাম। পুলটি নীচে পড়ে গেলে তার উপর হানাদাররা সহজেই অস্থায়ী পুল তৈরী করতে পারবে। দুমড়ে-মুচড়ে রেখে দিতে পারলে তার উপর বেলী ব্রিজ তৈরী করতে অনেক সময় ও পরিশ্রম লাগবে। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হাবিবকে সাথে নিয়ে বিধ্বস্ত পুলটি আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। না, প্রথম বিস্ফোরণে আমাদের আশা পূরণ হয়নি। তাড়াহুড়ো করে দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। এবার পুলটির বেশীরভাগ

সেতু ধ্বংস

অংশ ভেঙে নীচে পড়ে গেল এবং বাকী অংশ পূর্বদিকে হেলে পড়লো। হাবিব আরেকবার বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইলো, কিন্তু করলাম, 'না, কোন দরকার নেই। আরও অসংখ্য পুল আছে, সেগুলো উড়ানো দরকার। এখানে অতিরিক্ত এক্সপ্লোসিভ খরচ করে চল, আমরা করটিয়ার দিকে এগুই।'

ভাতকুরা গোরস্থান পেরিয়ে এসে ফজলুর দলের জন্য অল্পক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। ফজলুর দল এসে মিলিত হলে আবার চলতে লাগলাম। ঢাকা-টাংগাইল পাকা রাস্তা ধরে করটিয়ার দিকে এগুবার সময় আমার মনে যেমন আনন্দের শিহরন জেগেছিল, তেমনি প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার মনেও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল। এতদিন পাক হানাদার বাহিনী পাকা রাস্তাটি একচেটিয়া ব্যবহার করে এসেছে। বহুদিন পর অল্প সময়ের জন্য হলেও হানাদার মুক্ত রাস্তাটি মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করছে, যুদ্ধ পরিস্থিতির দিক দিয়ে এটা কম গৌরবের কথা নয়। আমরা যখন করটিয়ার দিকে এগুচ্ছি, তখন পাঁচ-ছ'টি বিস্ফোরণের গগন বিদারী শব্দ শোনা গেল। এতে মনে হ'ল, ভাতকুরা থেকে ক্ষুদিরামপুর হয়ে করটিয়া পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই আমাদের দখলে এসে গেছে।

ছোট্ট একটি কালভার্ট। সাত-আট হাতের বেশী লম্বা হবে না। কালভার্ট থেকে একের পর এক গুলি আসছে। সামান্য এগিয়ে লৌহজং নদী পার হয়ে, পশ্চিম পারে গিয়ে খুব ভালভাবে ক্ষুদিরামপুর কালভার্টের অবস্থা লক্ষ্য করলাম। অন্যদিকে ফজলু, জাহাঙ্গীর, আজাহার, খোকা, দুমুজ খাঁ, আবদুল্লাহ, দুলাল সহ আরও পঁচিশ-ত্রিশ জন পশ্চিম দিক থেকে কালভার্টের একেবারে কুড়ি-পঁচিশ গজ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তারা কালভার্টের বাংকারে প্রচণ্ড গুলি ছোঁড়া শুরু করেছে। আমি সামাদ গামাকে ডেকে এনে বললাম, 'সামাদ, ভাতকুরা পুলেতো মর্টার ব্যবহার করতে পারলে না, এই ছারপোকা পুলটার কি করা যায়?' সামাদ জায়গাটা দেখে একেবারে হতাশ হয়ে বললো, 'না স্যার, গ্রেম বাঁচাইয়া পুলে গোলা ফেলান যাব না।' আমার ধারনাও তাই ছিল। বড়ই প্রতিকূল অবস্থা, কোন অস্ত্রই ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ৩ ইঞ্চি মর্টার অচল, ২ ইঞ্চি মর্টার থেকেও দু'শ গজের মধ্যে গোলা ফেলা খুব একটা সহজসাধ্য নয়। দুইটি রকেট লান্সার আছে—তাও ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কারণ কালভার্টের উত্তর পাশে গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিমে রাস্তা, দক্ষিণে খোলা প্রান্তর। এদিকে রাজাকার দল চিৎকার করে বলছে,

আমরা কোন ক্ষতি করি নাই; আপনারা যান গিয়া।

সারেন্ডার কর, নাইলে তোদের কপালে দুঃখ আছে।

আপনারা আমাগোর ভাই। আমরা কোন ক্ষতি করি নাই। আপনেরা যান গিয়া।

এক'শ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে নিজে নানাভাবে দু'ঘণ্টা চেষ্টা করেও আট-নয় জনের ক্ষুদ্র রাজাকার দলটির পতন ঘটাতে বা আত্মসমর্পণ করাতে পারলাম না। অগত্যা পঁচিশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে কালভার্টের চারপাশে রেখে বাকীদের করটিয়া যেতে নির্দেশ দিলাম। আমরা কুমুল্লী মাঝিপাড়া প্রাইমারী স্কুল থেকে রওয়ানা হয়ে করটিয়া হাটের দিকে সামান্য একটু যেতেই কমান্ডার শামসুল হকের সাথে দেখা।

শামসুল হক তাদের অভিযানের খবর দিতে এসেছে। তারা ডেলি-করটিয়া সেতু দখল করেছে, কিছুটা অংশ ইতিমধ্যে উড়িয়েও দিয়েছে। পুরো পুলটাই উড়িয়ে দেয়া হবে কিনা—তা জানতেই তার আসা। শামসুল ও সোলেমানের কোম্পানীতে তখন প্রায় দু'শ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। শামসুলকে বললাম, 'পুলের বাকী অংশ উড়াতে হবে না। তোমরা করটিয়ার সমস্ত খবরাখবর নাও। সকাল আট টার মধ্যে সেতুসহ সম্পূর্ণ করটিয়া দখল করতে হবে। সকাল ন'টা পেরিয়ে গেলে, তোমরা আর করটিয়ার উত্তরে থেকো না। পশ্চিম দিক থেকে আঘাত হেনো। যদি রাতের মধ্যেই করটিয়া দখল হয়ে যায় তাহলে পাথরাইলের দিকে লোক পাঠিয়ে আমাকে খবর দিও।' শামসুলকে নির্দেশ দেয়ার ঘণ্টাখানেক আগে থেকে আমি একটু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম। আমার শরীর থর থর করে কাঁপছিল। বুক সমান পানি ভেঙ্গে লৌহজং নদী দু' দু'বার এপার ওপার হয়েছি। তাতে আমার শরীর ও জামাকাপড় ভিজে গেছে। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদেরও অনুরূপ অবস্থা। তবে তাদের কারও জ্বর আসেনি।

শামসুলকে নির্দেশ দিলাম, 'তুমি ঘাঁটিতে গিয়ে একজন সুদক্ষ কমান্ডারের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনের একটি দল দিয়ে ক্ষুদিরামপুরের কালভার্ট ঘেরাও করবে। ওখানকার সব ক'টা রাজাকারকে যেমন করেই হোক, আমার কাছে পাঠাবে। তোমার দল ওখানে যাওয়ার পর মকবুল হোসেন খোকা তার দল উঠিয়ে নিয়ে আমার সাথে মিলিত হবে।'

অসুস্থ অবস্থায় কুমুল্লীর মাঝিপাড়ায় এলাম। শরীরের তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলছিল। পথচলা দূরে থাক্, আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব হয়ে পরছিল। একটি ভাঙা ঘরের বারান্দায় টাল মাতাল অবস্থায় বসে পড়লাম। আমার অবস্থা দেখে কস্তুরিপাড়ার সামচু, আবদুল্লাহ ও আজাহার—তিনজনে একসাথে ঝাপটে ধরলো। সামচুই সর্বপ্রথম বললো, স্যারের জ্বর এসেছে, স্যারের জ্বর উঠেছে। শুনে ক্যাপ্টেন ফজলুল হক দৌড়ে এলো। চারজনে মিলে পাঁজাকোলা করে একটু দূরে নিয়ে একটি চৌকির উপর শুইয়ে দিল। এই সময় মোহর খাঁ ও সোহরাওয়ার্দী ছুটে এলো। আমার গায়ে হাত দিয়ে বিস্মিত হয়ে সোহরাওয়ার্দী বললো, 'একটু আগেও স্যারকে সুস্থ দেখলাম। হঠাৎ করে এত জ্বর এলো কি করে?'

প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়েও সহযোদ্ধাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দেখে বললাম, 'একটু পরেই হয়ত জ্বর ছেড়ে যাবে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। মোহর ভাই, শরীর প্রচণ্ড ব্যথা করছে, দেখুন কয়েকটা এসপ্রো অথবা ঐ জাতীয় কোন ট্যাবলেট পাওয়া যায় কিনা?' সাথে সাথে মোহর খাঁ ঔষধ সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই এক গ্লাস গরম দুধ এনে আমাকে পান করান। গরম দুধ খেয়ে জ্বর কিছুটা কমে এলো।

কুমুল্লী মাঝিপাড়া থেকে মাইল দেড়েক দূরে চণ্ডীর একটি বাড়ীতে রাত কাটানোর জন্য মোহর খাঁ ও সোহরাওয়ার্দী আমাদেরে পৌঁছে দিল। এ সময় সোহরাওয়ার্দীকে নির্দেশ দিলাম, 'তোমার ও মোহর খাঁর কাছে আত্মসমর্পিত রাজাকারদের আগামীকাল ফতেপুরে কর্নেল ফজলুর কাছে পাঠিয়ে দিও। যদি

রাজাকাররা বিশ্বস্ত হয়, তাহলে তাদের সাথে ছ'সাত জন মুক্তিযোদ্ধা দিলেই চলবে। শরীরে জ্বর ও ব্যথা নিয়ে চণ্ডীর একটি বাড়ীতে বাকী রাতটা কোনরকমে কাটালাম। রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে ঘুম এলো।

১৯৭১ সাল। ২০শে নভেম্বর। খুশীর দিন, ঈদ। বুকটা হু হু করে কেঁদে উঠলো। জ্ঞান হবার পর একটি ঈদেও মিষ্টি না খেয়ে কাটাইনি। ঈদের দিনে মিষ্টি খাওয়া হলো না বলে মনটা পীড়িত হচ্ছিল, ব্যথায় গুমড়ে মরছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন দেবদূতের মতো পাথরাইলের বিখ্যাত মিষ্টি নিয়ে হাজির হলো। যে মিষ্টি নিয়ে এসেছে, সে আমার চেনা। কলেজ জীবনের সহপাঠী। মিষ্টি হাতে অতি সাধারণভাবে বললো, 'আমি মাঝরাতে খবর পেয়েছি মুক্তিবাহিনী এই গ্রামে এসেছে। আর তাদের সঙ্গে তুইও আছিস্। মা রাতেই বারবার বলছিলো, ঈদের দিন কাদেরের জন্য মিষ্টি নিয়ে যা। মায়ের কথাতেই ছুটে এলাম, তুই আমার সামনে একটা মিষ্টি খা,' বলেই একটি মিষ্টি আমার মুখে তুলে দিল।

আমদের ঈদ

সকালে রওনা হবো, ঠিক এমন সময় বাড়ীর চার-পাঁচজন মহিলা বড় বড় পাত্রে পায়েস এনে দিলেন। তারা আন্দাজ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই মুসলমান। ঈদের দিনটি প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য কত পবিত্র, কত আনন্দের, বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল মা-বোনেরাই তা জানেন। তাই চণ্ডীর বসাক মা-বোনেরা মুক্তিযোদ্ধা ভাই ও সন্তানদের ঈদের শুভ সকালে মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়তে রাজী নন

আমি ভাবতেই পারিনি, ঈদের সুপ্রভাতে কপালে মিষ্টি জুটবে। প্রিয় বন্ধু ও স্বেচ্ছাসেবকের আনা মিষ্টি খেয়ে এমনিতেই আমি মহাখুশী হয়েছিলাম। তার উপর বাড়ীর মা-বোনরা নিজ হাতে রান্না করা পায়েস বড় বড় পাত্রে যখন আমার সামনে এনে রাখলেন, তখন সদ্য রান্না করা ধুমায়িত পায়েসের পাত্রগুলোর দিকে তাকাতেই আমার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। এ অশ্রু দুঃখের নয়, শ্রদ্ধা ও আনন্দের! বাংলার মা-বোনদের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো। পায়েস খেয়ে বাড়ীর মা-বোনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানিয়ে চণ্ডী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

১৯শে নভেম্বর চারটের পর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীর অন্য কোম্পানীগুলো ঢাকা-টাংগাইল রাস্তার দিকে এগুতে থাকে। পাঁচটার মধ্যে তারা পাকা সড়কের পশ্চিমে যার যার সুবিধামত অবস্থান নিয়ে নেয়। পূর্বের দু'দিনের মত ঐ দিনও সড়ক পাহারায় নিয়োজিত দু'কোম্পানী হানাদার 'কনভয়' ঢাকা-টাংগাইল এবং টাংগাইল-ঢাকা যাতায়াত করে টহল দিচ্ছিল। দু'বার টহলদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, মুক্তিযোদ্ধারা তা বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করলো। টহলদার বাহিনীর মধ্যে কোন সংশয় নেই, উত্তেজনা নেই। গাড়ীর মধ্যে তারা নিশ্চিন্তে, ঢিলেঢালা ভাবেই রয়েছে। ইফতারের কিছু আগে টহলদার বাহিনী পাকুল্লা থেকে ঢাকার দিকে এগুতে থাকে। এ সময় ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর খান কোদালিয়া পুলের খুব কাছাকাছি থেকে হানাদারদের ঢাকার

দিকে এগিয়ে যাওয়ার লোভনীয় দৃশ্য দেখছিল। ইফতারের মিনিট কুড়ি পর হানাদার দলটি কোদালিয়া সেতু পার হয়ে গেলে, ক্যাপ্টেন সবুর খান তার নেতৃত্বাধীন দলকে আরেকবার সতর্ক করে দিল। হানাদাররা সুত্রাপুর, গজারিয়াপাড়া ও কালিয়াকৈর পেরিয়ে গেল।

কোদালিয়া সেতু পার হয়ে যাওয়ার প্রায় দু'ঘণ্টা পরেও যখন 'মহিষবাথান' পুল পেরিয়ে যাওয়ার সংকেত এলো না, তখন ক্যাপ্টেন সবুর খান কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না কেন অনিবার্য সংকেতটি আসছে না? তবে কি শত্রুরা মহিষবাথান পুল পার হয়নি? ঢাকার দিক থেকে কোনও সংকেত ছাড়াই তারা পুলে আঘাত হানবে কিনা তা নিয়ে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল। দু'ঘণ্টা কুড়ি মিনিট পরও যখন কোন সংকেত এলো না, তখন ক্যাপ্টেন সাইদুর রহমানের সাথে পরামর্শ করে সবুর মুক্তিযোদ্ধাদের কোদালিয়া সেতু আক্রমণে নির্দেশ দিল। মুক্তিযোদ্ধারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়ে গিয়ে পুলের উপর উঠলো। বিস্মিত ও হতচকিত শত্রুপক্ষ থেকে প্রথম অবস্থায় মৃদু বাধা আসলেও তা কাটিয়ে উঠতে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ বেগ পেতে হলো না। কিন্তু পশ্চিম-দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে আসা মুক্তিবাহিনীর প্রতি সেতু থেকে ম্যালেশিয়া ও রাজাকাররা দারুণভাবে গুলি ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু একদিক থেকে সবুর খান ও অন্যদিক থেকে সাইদুর রহমান পনের জন করে দু'টি দল নিয়ে পেছন দিক থেকে ম্যালেশিয়া ও রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে হানাদারদের সব প্রতিরোধ ভেঙ্গেপড়ে। ফলে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই চারজন ম্যালেশিয়াসহ প্রায় পঞ্চান্ন জন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। কোদালিয়া পুল দখলে মুক্তিযোদ্ধা ও হানাদার বাহিনীর কেউই হতাহত হয়নি।

কোদালিয়া সেতু দখল

ক্যাপ্টেন সবুর খান কোদালিয়া সেতুতে আঘাত হানার চার-পাঁচ মিনিট পরেই দেড়-দু'মাইল উত্তর-পশ্চিমে দেওহাটা পুলে ক্যাপ্টেন রবিউল তার দল নিয়ে আঘাত হানে। দেওহাটা সেতুর পতন ঘটাতে তেমন গোলাগুলি বা সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়নি। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলের অধিকাংশ ম্যালেশিয়া ও রাজাকার রাস্তা আড়াল করে উত্তর-পূর্ব দিকে পালিয়ে যায়। দেওহাটাতেও সাত-আট জন ম্যালেশিয়া রাজাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে।

দেওহাটা সেতু

ক্যাপ্টেন সবুর খান ও ক্যাপ্টেন রবিউল যখন কোদালিয়া ও দেওহাটা পুল দখল করে নেয়, তখন টহলদার হানাদার বাহিনী কালিয়াকৈর বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিল। পেছনে গোলাগুলির শব্দে তারা একটু হকচকিয়ে যায়। এই আকস্মিক বিপদের সময়ে তারা পিছনে যাবে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাবে, উদ্বিগ্ন খান সেনারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এদিকে বাসস্ট্যাণ্ড থেকে মাত্র মাইল দু'য়েক পেছনে গজারিয়া পাড়ার সেতুটি ক্যাপ্টেন সুলতান ও ক্যাপ্টেন রঞ্জুর নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেয়। নাকের ডগায় বিস্ফোরণ ঘটায় হানাদার বাহিনী আর টাংগাইলের দিকে

গজারিয়াপাড়া সেতু ধ্বংস

না ফিরে ঢাকার পথে দ্রুত গা ঢাকা দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে।

টহলদার দলটি মহিষবাথান সেতু অতিক্রম করার সাথে সাথে ৬নং আফসার কোম্পানীর অত্যন্ত সফল কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন আবদুল হাকিমের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা কালিয়াকৈর থানা উন্নয়ন অফিসের দক্ষিণে মহিষবাথান সেতুর উপর উঠে পড়ে। এ সেতুটি তখন ছিল হানাদার নিয়ন্ত্রণমুক্ত। পাহাড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত রাজাকাররা ঈদের আনন্দ উপভোগের জন্য কালিয়াকৈর বাজারে চলে গিয়েছিল। হাকিমের দল ঝটপট তিনবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মহিষবাথান সেতুটি নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আধ মাইল পিছিয়ে এসে কালিয়াকৈর থানা উন্নয়ন কেন্দ্র আড়াল করে রাস্তা আগলে বসে থাকে।

মহিষবাথান সেতু

সুলতান ও রঞ্জুর দল গজারিয়া পাড়ার সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওখান থেকে আরও আধ মাইল টাংগাইলের দিকে এসে সুত্রাপুর সেতু দখল নেয়। এখানে রাজাকাররা সামান্য গুলি ছুঁড়লেও পার্শ্ববর্তী পুলে বিস্ফোরণ ঘটায়, তারা এমনিতেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার চিন্তায় অস্থির ছিল। মুক্তিবাহিনীর খুব বেশী গোলাগুলি ছুঁড়তে হোল না। অতি সহজেই ৩০ জন রাজাকারকে বন্দী করে মুক্তিবাহিনী পুলটি দখল করে নেয়। উল্লেখ্য যে, ২৯শে জুন মেজর আবদুল গফুর ও ক্যাপ্টেন খোরশেদ আলমের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা এই পুলটিতে সর্বপ্রথম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। সেটাই ছিল আমার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর প্রথম সেতু ধ্বংস। এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল জগন্নাথগঞ্জের বারী মাষ্টার ও রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্র হাজরা বাড়ীর আবদুল হাই। সেবার পুলটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি। আগের চেয়ে আরও অধিক সুসংহত ও শক্তিশালী মুক্তিযোদ্ধারা এবার সেতুটির চিহ্ন রাখতে চায়নি। শত্রুপক্ষের ব্যাপক আক্রমণের তেমন আশংকা ছিল না। তাই মুক্তিবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানী ধীরস্থিরভাবে সেতুতে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে পুলের দু'দিকে পাঁচ-ছয় ফুট খুঁড়ে বিরাট গর্ত করে তাতে বিস্ফোরক ঢুকিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আঘাতে পুলটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে নীচে পড়ে যায়।

সুত্রাপুর সেতু

অন্যান্য সেতুর মত মির্জাপুর সেতু দখল করা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অতটা সহজ হয়নি। সেতু থেকে মাত্র চার-পাঁচ'শ গজ দূরে মির্জাপুর থানায় হানাদার বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। সেতুতে মুক্তিবাহিনী আঘাত হানার সাথে সাথে থানা থেকে প্রচণ্ড গুলি আসতে থাকে। ক্যাপ্টেন আজাদ কামাল এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের পর মির্জাপুর সেতুটি দখল করে নেয়। কোদালিয়া সেতু দখলের ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সবুর খান ইঞ্জিনিয়ার দলের সহায়তায় সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটায়। সবুর খানকে যে পরিমাণ বিস্ফোরক দেয়া হয়েছিল, কোদালিয়া সেতু উড়িয়ে দিতে তার এক চতুর্থাংশও ব্যবহার করতে হয়নি। ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যা—এই চব্বিশ ঘণ্টায় মুক্তিবাহিনী ঢাকা-টাংগাইল সড়কের ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের সতেরটি সেতু ধ্বংস করে দেয়। এর মধ্যে কমাণ্ডার সবুর খানের ধ্বংস করা কোদালিয়া ব্রিজটির কোন নাম-নিশানা

মির্জাপুর সেতু

ছিল না। ১৯ ও ২০শে নভেম্বরের এই সফল, সার্থক ও সময়োচিত সেতু ধ্বংস অভিযান শুধু টাংগাইলের মুক্তিযুদ্ধেই নয়, সমগ্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। নির্ভুল ও নিখুঁত সেতু ধ্বংস অভিযানের পর থেকেই দাম্ভিক পাক হানাদার বাহিনীর আস্ফালন ও গৌরবে ক্রমাগত ফাটল ধরতে শুরু করে। এই সময় থেকেই জল্লাদ বাহিনী আক্রমণাত্মক মনোভাব ত্যাগ করে। আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে শুরু করে।

মির্জাপুর রাজাকারদের আত্মসমর্পণ ও কোদালিয়া সেতু ধ্বংস—এই দুটি বিরাট সাফল্যের প্রেক্ষিতে সবুর খানের আনন্দে ফেটে পড়ার অবস্থা। ইতিমধ্যে সুলতান ও রঞ্জু কোম্পানীর সিগনাল দু'তিন বার ঢাকার দিকের খবরা-খবর জানিয়ে গেছে। সুত্রাপুর, গড়াগিয়াপাড়া, মহিষবাথান, এ সেতুগুলো মুক্তিবাহিনী দখল করে নিয়েছে। তাই ক্যাপ্টেন সবুর খান পাকা সড়ক ধরে টাংগাইলের দিকে বীরবিক্রমে এগুতে থাকে। দেওহাটা সেতু থেকে প্রায় এক মাইল দূরে থাকতে রবিউল কোম্পানীর দু'জন সিগন্যালম্যান সবুরের কাছে দৌড়ে এসে বলল, 'স্যার, সর্বনাশ হইছে। সব বিস্ফোরক ফুরাইয়া গেছে। কিন্তু সেতুর কিছু হয় নাই। কমান্ডার সাহেব একেবারে বেহুঁস হইয়া গেছে। তিনি পাগলের মত ছটফট করছেন। পুল ভাঙ্গতে না পারলে কমান্ডার সাবরে সি, এন, সি স্যার আর আস্ত রাখবো না। আপনে স্যার চলেন।' ক্যাপ্টেন সবুর দ্রুত দেওহাটা সেতুতে চলে যায়। তাকে দেখেই ক্যাপ্টেন রবিউল তাঁর পা জড়িয়ে ধরে, 'সবুর ভাই আমারে বাঁচান, পুলতো একটুও ভাঙ্গলো না, কিন্তু চার্জ সব শেষ। এখন উপায় কি? স্যার আমারে নির্ঘাৎ গুলি করবেন।' রবিউলের কথা শুনে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করে অভিযোগের সুরেই সবুর বললো, 'তুই তাইলে খালি কতারই মাতবর। মিটিংয়ের সোমতো ফট্ ফট্ করলি, সব পারবি। এত বড় বড় আওয়াজ করলি, তাইলে কি খালি পাখী মারলি? তর চাইতে আমার পুল অনেক বড় আছিল। আমারে বারুদ দেওয়া হইছে অনেক কোম। তোর পুল ছোট, তেমু তরে বারুদ দিছে অনেক বেশী। তারপরও সব শেষ করছস্? এহন আর কি উপায়? বারুদ নিয়ে আয়। পুল ফেলাইয়া দিই।' রবিউলের তখন মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। আবার তার কাতর অশ্রুসজল অনুরোধ, 'সবুর ভাই, আপনি এবার না বাঁচাইলে আমার রক্ষা নাই। বিস্ফোরক কোথায় পাব? আমাকে মেজর হাবিব সাহেবের সামনে তিনটি পুল ভাঙ্গার মত বিস্ফোরক দেয়া হয়েছে। এর পরেও বিস্ফোরক চাইলে কে আমারে দিবে? আপনার কাছে যদি কিছু থাকে, তা দিয়ে আমাকে বাঁচান! রক্ষা করেন!' ক্যাপ্টেন সবুর রবিউলকে খুবই তাচ্ছিল্যের সাথে ক্রোধ মিশ্রিত সুরে বলল, "বেটা খালি ফট ফট করোস্? যা, এহন দূরে যাইয়া মুক্তিযোদ্ধাগোর নিয়া অপেক্ষা কর, আমি পুল ফেলাইয়া দিয়া আহি।' সবুর কথার লোক নয়, কাজের লোক। সত্যিই সে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পুলের দুটি স্থানে আশি পাউন্ড চার্জ বসিয়ে তাতে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রায় এক'শ পঁচিশ ফুট লম্বা সেতুটির আশি ভাগ দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে যায়। অথচ এখানে রবিউল প্রায় সাত'শ পাউন্ড চার্জ বসিয়ে পর পর তেইশ বার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

ব্যর্থ রবিউল

কোদালিয়া ও দেওহাটা সেতু দুটি ঢাকা-টাংগাইল পাকা সড়কের বড় সেতু গুলোর মধ্যে অন্যতম। দুটিই ধ্বংস হয়ে গেছে। ঢাকার দিক থেকে সড়কপথে টাংগাইল আসা হানাদার বাহিনীর পক্ষে আপাততঃ সম্ভব নয়। তাই সবুর, রবিউল, আজাদ কামাল সহ সকল কমান্ডারগণ যেমন স্বস্তিবোধ করছিল, তেমনি প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাও ক্রমাগত বিজয় লাভের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পরম তৃপ্তিবোধ করছিল।

আজাদ কামাল মির্জাপুর সেতুর দখল নিয়েও তাতে বিস্ফোরণ ঘটায়নি। সে শুধু মির্জাপুর থানা উন্নয়ন অফিস ও দেওহাটা বাজারের মাঝামাঝি বাইমাইলের ছোট্ট সেতুটি উড়িয়ে দিয়েছে। সেতুর নীচে তখনও পানি ছিল তাই লোক পারাপারের জন্য লম্বা লম্বা ক'টা বাঁশ ফেলে সাঁকো তৈরী করা হয়েছে। সবুর, রবিউল ও সাইদুর নিজ নিজ দল নিয়ে মির্জাপুর এসে আজাদ কামালের সাথে মিলিত হলে মির্জাপুর যুদ্ধ পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান কেবল সেতুদখলে সীমাবদ্ধ না থেকে থানা দখলের লড়াইয়ে পরিণত হয়। সেতু দখলের পরেই আজাদ কামাল মির্জাপুর থানা দখলের জন্য এগিয়ে যায়। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা নানা দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েও সে কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। বরং থানা আক্রমণের সময় মুক্তিবাহিনীর একজন বীরযোদ্ধা শাহাদাৎ বরণ করে। বড় লোকের পাড়ার জাহাঙ্গীর নামের এই তরুণ ও সুদর্শন মুক্তিযোদ্ধাটি খুবই সাহসী ও আমার খুবই প্রিয়পাত্র ছিল। ধর্মীয় ও সামরিক মর্যাদায় জাহাঙ্গীরকে সেখানেই দাফন করা হয়।

থানা আক্রমণে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদানের জন্য অমিত তেজ কমান্ডার ক্যাপ্টেন সবুর এসে উপস্থিত হয়। তার উপস্থিতিতে থানা দখলের লড়াই একেবারে ভিন্ন রূপ নেয়। মির্জাপুরে তখন আট'শ মুক্তিযোদ্ধা, আর তাদের পেছনে পাঁচ-ছ' হাজার বীর জনতা। জনতা শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, নানা ভাবে অবস্থান নিয়ে শুধু শ্লোগানের পর শ্লোগান দিচ্ছেন, 'জয় বাংলা, জয় মুক্তিবাহিনী, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় কাদের সিদ্দিকী'—একটানা বিরামহীন শ্লোগান। শ্লোগান তো নয়, যেন অভিশপ্ত হানাদার বাহিনীর প্রতি শ্লোগানের শেল নিক্ষেপ। শ্লোগানে শ্লোগানে কানফাটা গগনবিদারী হুংকারে সমগ্র মির্জাপুর এলাকা টাইফুনে আক্রান্ত সামুদ্রিক জাহাজের মত থর থর করে কেঁপে উঠছিল। অথচ কি আশ্চর্য! হানাদার শিবিরে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। মির্জাপুর থানা দখলের যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি অভিনব ঘটনা। তাই এ-সম্পর্কে একটু পরে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

মির্জাপুরের পরেই মুক্তিযোদ্ধারা কুমির কালভার্ট ধ্বংস করে। প্রায় বিনা বাধায় আজাদ ও বাদশাহর কোম্পানী কালভার্টটি উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

কুমির কালভার্ট ও শুভুল্লা সেতু ধ্বংস

ক্যাপ্টেন হুমায়ুন ও ক্যাপ্টেন লায়েক আলমের কোম্পানী সন্ধ্যা সাতটায় শুভুল্লা ব্রিজে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে তাদের দীর্ঘ দু'ঘণ্টা প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবার বড় কারণ হ'ল, তখন ঢাকা-টাংগাইল সড়কের উভয়দিকে অনবরত বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছিল। এতে শুভুল্লা ব্রিজে রাজাকার ও মিলেশিয়ারা দিশেহারা হয়ে কোন দিকে পালাবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। ঠিক এ-সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা আক্রমণে তারা আরও দিশেহারা হয়ে পড়ে। বাংকার ছেড়ে

উঠলে মৃত্যু অবধারিত এটা ধরে নিয়ে প্রায় দু' থেকে সোয়া দু' ঘণ্টা যুদ্ধ চালায়। শুভুল্লা সেতুর মজবুত পাকা বাংকারে বসে হানাদারদের গুলি ছোঁড়া যত সুবিধা ছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের মোটেই তেমনটি ছিল না। তবুও মুক্তিযোদ্ধাদের পর্বত প্রমাণ উঁচু মনোবল ও অসীম সাহসিকতার কাছে হানাদারদের অবশেষে নতি স্বীকার করতে হল। শুভুল্লা ব্রিজ দখলের যুদ্ধে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হয়।

অপরদিকে হানাদার বাহিনীর ছ'জনের দেহ গ্রেনেডের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ছ'জন নিহত ও ষোল জন রাজাকার মিলেশিয়া গুরুতর আহত হবার পর শুভুল্লা পুলের অবশিষ্ট মিলেশিয়া ও রাজাকার অস্ত্র ফেলে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকারী মিলেশিয়া ও রাজাকারের সংখ্যা যথাক্রমে আট ও চল্লিশ।

পাকুল্লাসেতু। এ সেতু দখল অভিযানে মেজর হাবিবুর রহমান হানাদারদের সাথে চার ঘণ্টাব্যাপী রক্তক্ষয়ী লড়াই চালিয়েও প্রথমে ব্যর্থ হয়। অবশেষে রাত এগারোটায় অবরোধ উঠিয়ে একমাইল উত্তরে জামুর্কী সেতু আক্রমণ করে। সুদীর্ঘ চারঘণ্টার এক প্রচণ্ড যুদ্ধে পাকুল্লাসেতুর কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারলেও, মাত্র দশ মিনিটের ঝটিকা আক্রমণে জামুর্কী সেতুর প্রতিরোধ পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে। সেতুতে পাহারারত ত্রিশ-চল্লিশ জন রাজাকার জামুর্কীর সুলতান ও পাকুল্লার লতিফের সাথে যোগাযোগ করে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। মেজর হাবিব যখন সেতুতে আঘাত হানে তখনই আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক চল্লিশ-বিয়াল্লিশ জন রাজাকার আস্তে আস্তে তাদের বাংকার ছেড়ে রাস্তার পশ্চিম পাশের পাড়ার দিকে সরে যায়। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত হানাদার-পরিত্যক্ত বাংকারে অবস্থান নেয়। অন্য একটি দল বুকে হেঁটে পুলের অপর পারে গিয়ে হানাদারদের বাংকারে হাতবোমা ছুঁড়তে থাকে। অন্যদিকে দশ জন সহযোদ্ধাসহ মেজর হাবিব জামুর্কী স্কুলের পাশ থেকে হানাদারদের বাংকারে প্রায় পাঁচ মিনিট অবিশ্রান্তভাবে এম. এম. জি'-র গুলি চালায়। মেশিনগান থেকে গুলি না চালালেও হানাদার বাহিনী পুলটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো। তবে মেজর হাবিবের গুলি বৃষ্টির মুখে সেতুর উত্তর-পূর্বের বাংকার থেকে পাক বাহিনীর গুলি ছোঁড়া একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তারা মাথা তুলতে পারছিল না। আক্রমণের তীব্রতা সইতে না পেরে বাকী রাজাকার ও মিলিশিয়ারা সড়কের পশ্চিম পাশ ঘেঁসে উত্তর দিকে পালাতে শুরু করে। কিন্তু পালাবার সুযোগ কোথায়? তাদের পেছনেও ফাঁদ। নাটিয়াপাড়া ও জামুর্কীর মাঝামাঝি যেতেই পাখীর খাঁচায় ঢোকার মত, মুক্তিবাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যায়। তবে এখানে রাজাকাররা কোনও প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি, বরং তাদের সঙ্গের বারো জন মিলেশিয়াকে নিজেরাই পাকড়াও করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হস্তান্তর করে এবং পঁয়ত্রিশ জন রাজাকার নিজেরাও আত্মসমর্পণ করে।

পাকুল্লা সেতু আক্রমণ ও জামুর্কী সেতু দখল

একঘণ্টা দু'ঘণ্টা নয়, সুদীর্ঘ চার ঘণ্টা যুদ্ধ চালিয়েও পাকুল্লা সেতুর পতন ঘটাতে না পেরে স্বভাবতই মেজর হাবিব কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ছিল। এই ব্যর্থতার বেদনা সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। জামুর্কী সেতু দখলের পর সেখানে অপেক্ষা না করে ত্রিশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সেতু পাহারায় রেখে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার

সেকশনের (ঝনঝনিয়ার ছোট্ট ছেলে) ফারুককে সেতুতে দ্রুত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাকুল্লায় চলে আসতে নির্দেশ দিয়ে সে এগোতে যাবে ঠিক তখন টাংগাইলের দিক থেকে কোম্পানী কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন গাজী লুৎফর রহমান এগিয়ে আসে। জামুর্কী সেতু থেকে পালিয়ে যাওয়া মিলিশিয়া রাজাকার যারা তার হাতে ধরা পড়েছে। তাদের কি করা হবে এবং কোন্ দিকে কোথায় পাঠানো হবে, তা জানতে চায়। মেজর হাবিব ক্যাপ্টেন গাজী লুৎফরকে বলে, 'রাজাকার ও মিলিশিয়াদের শক্ত করে বেঁধে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার পাহারায় বন্দি অথবা দেলদুয়ারের দিকে পাঠিয়ে দিন। আপনি দ্রুত পাকুল্লাতে এসে আমার সাথে মিলিত হন।' ব্যর্থতার জ্বালা, ক্রোধ ও উত্তেজনায় মেজর হাবিবের শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্ করছে, তার মাথায় খুন চেপে গেছে। পাকুল্লা সেতু তার দখল করা চাই-ই চাই। এ যেন তার মরণ-শপথ।

প্রথম অভিযানের সময় তার দল পাকুল্লা সেতুর তিনদিক থেকে আঘাত হেনেছিল। এবার সে পূর্ব-পরিকল্পনা পাল্টিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিল—তিন দিক থেকে নয়, মাত্র একদিক থেকে আঘাত হানা হবে। দূর থেকে গুলি ছোঁড়া নয়, যেভাবেই হোক ঝুঁকি যতই থাকুক, হানাদারদের বাংকারে পেঁছতে হবে। করলও ঠিক তাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন কোন কমাণ্ডার যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে সামান্য একটু এগিয়ে গেছে, তখনই সাধারণ যোদ্ধাদের মধ্যে আরও এগিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সাধারণ যোদ্ধারা কখনও কমাণ্ডারদের পেছনে পড়ে থাকতে রাজী নয়।

পাকুল্লা সেতু পতন

এখানেও সাধারণ যোদ্ধারা পেছনে পড়ে থাকতে রাজী হলো না। মেজর হাবিবের কোম্পানীর বাছা বাছা কুড়ি জন মুক্তিযোদ্ধা শুধু হাতবোমা সম্বল করে বুকে হেঁটে পুলের উপর উঠে পড়ে। ভারী অস্ত্র নিয়ে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা পুলটির উত্তর ও পশ্চিম দিক আগলে রয়েছে। কিন্তু তারা একেবারেই নীরব। কুড়ি জন মুক্তিযোদ্ধা চরম ঝুঁকি নিয়ে, এক ঘণ্টা ধরে বাংকারে বাংকারে প্রায় দু'শ গ্রেনেড নিক্ষেপ করলো। সেতু পাহারায় ত্রিশ জন মিলিশিয়া ও পঞ্চাশ জন রাজাকারের মধ্যে কুড়ি জন মিলিশিয়ার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করলো। অধিকাংশই আহত। কারও হাত নেই, পা নেই, কারও আবার নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! এই যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হয়।

রাতের শেষ প্রহর। পাকুল্লা সেতু হানাদার মুক্ত হলো। মেজর হাবিব পাকুল্লা সেতুতে চাপ চাপ রক্ত দেখে খুবই মর্মাহত হলো। বেদনার তীব্র অনুভূতি তাকে যেন মুহূর্তকাল পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলে। এত রক্তঝরানোর বা রক্তের হোলি খেলায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না। শত্রু হলেও তারাও যে মানুষ! সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ! এটা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো। সব ক'টি যুদ্ধক্ষেত্রেই আহত-নিহতদের প্রতি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ থেকে বার বার তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে ২৭শে জুলাই হাবিব যখন কালিদাসপাড়া সেতু আক্রমণ করেছিল, তখন সেখানে পরিচিত দু'জন রাজাকারের লাশ দেখে সে খুবই বেদনাভিভূত হয়ে পড়েছিল। এমনকি নিহত রাজাকারদের বাড়ীতে খবরও সে পাঠিয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকে মেজর হাবিবকে শত্রুর প্রতি

খুবই সহানুভূতিশীল দেখা গেছে। সে কখনও যুদ্ধশেষে রাজাকার বা হানাদার বাহিনীর কোন সদস্যের সাথে রূঢ় ভাষায় কথা পর্যন্ত বলতো না। সেই কোমল হৃদয় মেজর হাবিব কুড়ি জন মিলিশিয়াসহ ছ'জন রাজাকারের লাশ ও আরও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন শত্রুর রক্তাক্ত দেহ দেখে একেবারে শোকাচ্ছন্ন, মুহ্যমান হয়ে পরে। সেতু দখল নিতে পারার তার যে আনন্দ তা নিমেষেই উবে যায়।

সফল ইঞ্জিনিয়ার ছোট্ট ফারুক পাকুল্লা সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটানোর আয়োজন করে ফেলে। অন্যদিকে আহত-নিহতদেরও সেতু থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। এরপর ইঞ্জিনিয়ার ফারুক বেশ দক্ষতার সাথে দু'দুবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেতুটি অকেজো করে দেয়।

পাকুল্লা সেতুর পর আরও দু'টি সেতু ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মেজর হাবিব মির্জাপুরের দিকে ছুটলো। অবশ্য তাকে বেশী দূর অগ্রসর হতে হল না। মাত্র দু'মাইল দক্ষিণ-পূবে আছিমতলা সেতু পর্যন্ত যেতেই হুমায়ুন কোম্পানীর সিগন্যালম্যান এসে জানালো, তারা শুভুল্লা সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। মেজর হাবিব আবার পেছনে ফিরে আসল। ১৯শে নভেম্বর। বাতের সেতু ধ্বংস অভিযান আপাততঃ শেষ হলেও থানা দখলের অভিযান বেশ তখনও জোরে-জোরেই চলছিল।

সে এক অভিনব যুদ্ধ! বাংলার আর কোথাও '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে এমন অভিনব কৌশলে হানাদারদের নাস্তানাবুদ করা হয়েছে কিনা, আমি জানি না? মির্জাপুর সেতু দখল করে প্রায় তিন ঘন্টা মির্জাপুর থানার উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে আজাদ কামাল যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, তখন প্রায় তিন'শ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সবুর সেখানে এসে হাজির। ক্যাপ্টেন সবুর খান কমান্ডার হিসাবে আজাদ কামালের চেয়ে অনেক বেশী সুদক্ষ। উপরন্তু মুক্তিবাহিনী গঠনের শুরু থেকে সে আমার সাথে সাথে থাকায় সকল মুক্তিযোদ্ধা ও কমান্ডারের উপর তার একটা আলাদা প্রভাব পড়েছিল। সবুর খান মির্জাপুরে এলে আপনা থেকেই যুদ্ধের নেতৃত্ব তার হাতে চলে যায়। সে নানাভাবে থানার উপর ঘন্টা দুয়েক আক্রমণ চালায়। দু, চার, পাঁচ'শ নয়, আট'শ মুক্তিযোদ্ধা আর তাদের পেছনে পাঁচ-সাত হাজার স্বতঃস্ফূর্ত জনতা। তাদের শ্লোগানে-শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত, চতুর্দিক প্রকম্পিত শয়তানও বুঝি ভীত সন্ত্রস্ত। অথচ হানাদার শিবিরে কোন সাড়াশব্দ নেই, প্রতিক্রিয়া নেই। এমনকি নড়াচড়ার কোন আভাস-ইঙ্গিতও নেই। এমনি অস্বস্তিকর ও জটিল মুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধারা যখন অধৈর্য হয়ে পড়ছিল, তখন সবুর খানের মাথায় এক অভিনব বুদ্ধি খেলে যায়। সে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারদের ডেকে বলে, 'যেহান থেইকা পারেন কয়ডা পাওয়ার পাম্প ও পাইপ জোগাড় কইরা আনেন।' স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডাররা তো সবুরের কথা শুনে অবাক। তুমুল যুদ্ধ চলছে, এখানে পাওয়ার পাম্প দিয়ে কি হবে? কিন্তু নির্দেশ নির্দেশই। প্রশ্ন করা ঠিক নয়, মেনে চলাই নিয়ম। কিছুটা সংশয়-সন্দেহ নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা পাওয়ার পাম্প সংগ্রহে ছুটলো। ১৯শে নভেম্বর রাত তিনটা সাড়ে তিনটা নাগাদ স্বেচ্ছাসেবকরা পাঁচটি পাওয়ার পাম্প ও পাইপ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলো। রাতের অন্ধকারের আড়ালে, খালের পারে পাওয়ার পাম্পগুলো বসানো

অভিনব যুদ্ধে থানা দখল

হলো। এদিকে পূব আকাশে রক্তিম আভা ছড়িয়ে সূর্য উঠছে; অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা পাম্পগুলো চালু করছে। পাঁচটি শক্তিচালিত পাম্প একতালে, পুরো গতিতে পানি তুলে চলেছে। হকচকিত ও বিভ্রান্ত হানাদাররা পাম্প লক্ষ্য করে মাঝে-মধ্যে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। কিন্তু তাতে কি হবে? পাঁচটি পাম্পের মিলিত বিপুল জলধারা থানার পেছনে ছোট ডোবাগুলোতে গিয়ে পড়ছে। এভাবে পাম্পগুলো এক নাগারে ছ'ঘন্টা চলার পর দেখা গেল, শুধু থানা নয়, থানার পশ্চিম পাশে মির্জাপুর হাইস্কুল এবং কলেজের মাঠ পুরোটা বর্ষার মত পানিতে সয়লাব হয়ে গেছে। থানার বাংকারগুলো একটিও খালি নেই, পানিতে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। নভেম্বর মাসের শেষ। একে তো প্রচন্ড শীত, তার উপর হিমশীতল খালের পানি। পানির মধ্যে থাকা হানাদারদের পক্ষে একেবারেই দুঃকর হয়ে উঠলো। যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, পানির মধ্যে বসে থাকাও কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। ছ'সাত ঘন্টা অবিশ্রান্ত গুলি চালিয়ে যুদ্ধ করে যা সম্ভব হয়নি, পাঁচটি পাওয়ার পাম্প সাত ঘন্টা অনবরত পানি বর্ষণ করে অনায়াসে তা সম্ভব করেছে।

মির্জাপুর থানা অভিযানে বারোজন নিয়মিত খান সেনা, চারজন মিলিশিয়া ও সত্তর জন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়লো। উল্লেখযোগ্য যে, মির্জাপুর থানা ঘাঁটির পাক-সেনারা সেদিন সত্যই অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। থানা ছেড়ে দেয়ার পরও বত্রিশ জন নিয়মিত খান-সেনা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। অসীম দুঃসাহসের সাথে লড়াই করে, মুক্তিবাহিনীর ঘেরাও ভেদ করে তারা ঢাকার দিকে সরে যেতে সক্ষম হয়। থানা দখলের একটু পরেই মির্জাপুর সেতুর একটি অংশ উৎফুল্ল মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেয়।

২০শে নভেম্বর। সকাল সাড়ে আটটায় বল্লি-মটরা গ্রামে এলাম। আমরা শুধু ক্লান্ত নই, ক্ষুধার্তও। তাই অভিযানে অংশগ্রহণের আগে খেয়ে নিতে চাই। লোহজং নদীর পশ্চিম পারে কুমুল্লা গ্রামের একটি বাড়ীতে খাবার চাওয়া হলো। ঈদের দিন। সকল মুসলমান বাড়ীতেই কিছু না কিছু অতিরিক্ত খাবার তৈরী হয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা খাবার চেয়ে নিরাশ হলো। পর পর দুটি বাড়ী থেকে বলা হলো, তাদের বাড়ীতে কোন খাবার নেই। মুক্তিযোদ্ধারা সাধারণত ধনী বাড়ী দেখেই খাবারের অনুরোধ জানায়। দুটি বাড়ীতেই 'না' সূচক জবাব পেয়ে আমি কিছুটা বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হলাম। তৃতীয় বাড়ীতে খাবার চাইলেও একই জবাব এলো, 'খাবার নেই'। এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। 'খাবার নেই' বলা লোকটির পিঠে ত্রিশালের কালাম সপাং সপাং তিন-চারটি বেত বসিয়ে দিল। মন্নথার বেনু তো রাগে ফেটে পড়ে আর কী! সে চিৎকার করে উঠলো, 'ঈদের দিন। সকাল বেলা। বাড়ীতে সাট-আটটা টিনের ঘর। বেটা, শালারা কয় কী, খাবার নাই। শালারা, একটা ভঙ্গি পাইছ?'

আমাদের আর বেশীদূর এগুতে হয়নি। তিন-চার বেত আর একটু ধমকেই কাজ হয়ে যায়। তৃতীয় বাড়ীর মালিক মুহূর্তের মধ্যে বড় বড় ডিশে করে খিচুরী ও মাংস নিয়ে এলো। শুধু তৃতীয় বাড়ীর মালিক নয়, প্রথম ও দ্বিতীয় বাড়ীর লোকজনও অনুরূপ খাবার নিয়ে হাজির হলো। দু'একটি বাড়ী থেকে কিছু মিষ্টান্নও

এলো। কেন এমন হলো ? ঐ গ্রামের লোকেরা প্রথমদিকে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিল। বিশেষতঃ খাবার চাওয়া তিনটি বাড়ীর সবাই ছিল পাকিস্তান-সমর্থক, রাজাকারদের আত্মীয়স্বজন, গোড়া মুসলীম লীগ পন্থী। মুক্তি বাহিনীর বেত খেয়ে তাদের চৈতন্যোদয় হলো এবং প্রচণ্ড ধমকের মুখে পন্থী-টন্থী সব গুলিয়ে গেল। এর পরেই শুরু হয় শুধু অতিথি সেবাই নয়, জামাই আদর। মুক্তিযোদ্ধারা কিন্তু তিন বাড়ীর কোন খাবারই স্পর্শ করলো না। পাশের ক'টি বাড়ী থেকে দেয়া কিছু খাবার খেয়ে লোহজং নদীর পূব পারে চলে এলাম।

নদীর পার ঘেঁষে মটরা জুম্মা ঘর। সকাল সাড়ে ন'টা। দু'চার জন করে লোক ঈদের নামাজে সামিল হতে জুম্মা ঘরে আসছেন। তখনও তেমন লোক সমাগম হয়নি। আগত লোকের সংখ্যা কুড়ি-পঁচিশ জনের বেশী হবে না। আমার ইচ্ছা হলো, এখানেই গ্রামের লোকের সাথে ঈদের নামাজ পড়বো। নামাজ শুরু হতে আরও দেরী হবে মনে করে মটরা সেতুটি দেখতে গেলাম। দূরবীন দিয়ে সেতুটি পরিস্কার দেখতে পেলাম, উপরে বেঞ্চিতে বসে তখনও বেশ ক'জন রাজাকার গাল-গল্প করছে। এদের সংখ্যা সতের-আঠার জন হবে বলে মনে হলো।

পুল দেখা শেষ, আবার জুম্মা ঘরের সামনে ফিরে এলাম। কিন্তু এ কি ! জামাত শেষ করে সবাই চলে যাচ্ছেন ? পুল দেখে ফিরে আসতে আমার দশ মিনিটও লাগেনি, এর মধ্যেই জামাত শেষ ? নামাজ দাঁড়াতে এবং জামাতের লাইন সোজা করতেই তো ছ'সাত মিনিট লেগে যায়। ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করতে না পারায় আমার মন ব্যথায় ভরে উঠলো। অভিমান ও ক্ষোভে আহত হয়ে একবার ভাবলাম মৌলবীটাকে ডেকে আচ্ছা করে একটা ধমক লাগাই। আবার ভাবলাম না, কোন দরকার নেই। ঈদের জামাতে শরিক হওয়ার নসীব যদি না থাকে তো মৌলবীকে বকাঝকা করে লাভ কি ?

মসজিদের সামনের তিন-চার হাত লম্বা একটি চারা গাছে হেলান দিয়ে বসে পরলাম। চারা গাছটিতে যত হেলান দিচ্ছি গাছটিও আস্তে আস্তে বেঁচে যাচ্ছে। অনেকটা বেঁকে গেলে হঠাৎ খেয়াল হলো, চারা গাছটা আমার দেহের ভার সইতে পারছে না। আমার অন্তরে মমতার এক তড়িৎ প্রবাহ বয়ে গেল। আপনা থেকেই চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো, আমার মধ্যে এক নতুন অনুভূতি নতুন উপলব্ধি জেগে উঠলো ! এমনি করেই তো সবলের চাপ দুর্বলেরা সইতে পারে না। আস্তে আস্তে হেলে পড়ে, তারপর একদিন ঝরাপাতার মত নিঃশেষ হয়ে যায়। চট করে ঘুরে চারা গাছটিকে আলতোভাবে ধরে শপথ নিলাম, 'আমরা যেমন সবল হয়ে দুর্বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই না, ঠিক তেমনি দুর্বল হয়ে সবলের কাছে যেন কোনদিন নুইয়ে না পড়ি।'

এর পর আর পায় কে ? আমি লাফিয়ে উঠলাম। আর সহযোদ্ধারা তো সব সময় প্রস্তুতই ছিল। ইতিমধ্যে সামাদ গামা বাসি থেকে তার মর্টার প্লাটুন নিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা মটরার রাস্তা ধরে পুবেও পাকা সড়কের দিকে দৌড়ে চললো। এই সময় দক্ষিণ দিক থেকে চার-পাঁচটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এলো। বায়েজিদ আলম

মটরা পুলে ঝড়

গত রাতে বাউইখোলা সেতু দখল করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরদিন সকালে সেতুটি আক্রমণ করে দখল করে নেয়। এটা তারই সেতু উড়িয়ে দেওয়ার বিস্ফোরণের বিকট শব্দ।

মুক্তিযোদ্ধারা পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে, ওদের ছুটে চলার বিরাম নেই। আমি দু'বার কিছুটা আগে যেতে পারলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু আবদুল্লাহ, আজাহার, বজলু, মকবুল, ফজলু, মান্নান ও দুলালের আগে সেতুতে পৌঁছুতে পারলাম না। আবদুল্লাহ, ফজলু ও মান্নান দৌড়ে পুলে উঠেই বেঞ্চিতে বসে-থাকা গল্পে মশগুল রাজাকারদের উপর এক ঝাঁক গুলি ছোড়ে। পাশের একটি বাংকারে রাইফেল উদ্যত এক রাজাকারকে দেখে আবদুল্লাহ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবদুল্লাহর এক লাথিতে তার উদ্যত রাইফেলটি ছিটকে পড়ে যায়। সে তখন স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে রাজাকারটির উপর ছ'সাত রাউন্ড গুলি ছোড়ে। অন্য এক রাজাকার যখন দুলালকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে উদ্যত তখন মান্নান তাকে জাপটে ধরে এবং ফজলুর দ্রুত বিক্ষিপ্ত গুলিতে রাজাকারটি লুটিয়ে পড়ে। আমি তখনও সেতুর উপর উঠতে পারিনি। পুলের চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ পশ্চিমে একটু উঁচু জায়গার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফজলু, দুলাল, আবদুল্লাহ, মান্নান, আজাহার ও বজলুর বিস্ময়কর ও দুঃসাহসিক অভিযান লক্ষ্য করছিলাম। সহযোদ্ধাদের শিয়ালের ধূর্ততা নেকড়ের ক্ষিপ্রতা ও সিংহের অসীম শক্তি দেখে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলাম। বছরের পর বছর সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত সৈন্যরাও এই সাধারণ যোদ্ধাদের মত ধীর-স্থির এবং পর্বতের মত অটল থেকে এত ধূর্ত, ক্ষিপ্র ও তেজী হতে পারে কিনা সন্দেহ।

মটরা পুল। এখানে উনিশ জন রাজাকার ছিল। চার জন মুক্তিবাহিনীর গুলিতে মারা যায় বাকী সবাই অস্ত্রসহ ধরা পড়ে। এদের মধ্যে দু'একজন স্বেচ্ছায়ও ধরা দেয়। সব মুক্তিযোদ্ধাই তখন সেতুর উপর উঠে গেছে এবং উত্তর ও দক্ষিণে দশ-বারো জন করে অবস্থান নিয়েছে। রাজাকারদের ফতেপুর পাঠানো স্থির হল।

কোদালের এক ঘায়ে রাজাকার খতম

মাত্র তিন জন মুক্তিযোদ্ধা পনের জন রাজাকারকে কোমরে রশি বেঁধে ফতেপুরের দিকে নিয়ে যাবে, এমন সময় ভিড়ের মাঝ থেকে একজন লোক কোদাল হাতে লাফিয়ে এসে একটি রাজাকারের মাথায় সজোরে আঘাত হেনে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এই হারামজাদা আমার খাসী খাইছে, মুরগী খাইছে। সাত দিন আগেও আমার বাড়ীতে যাইয়া একটা ঘর জ্বালাইয়া দিয়া আইছে।' চিৎকার আর কোদালের উপর্যুপরি আঘাতে রাজাকারটির মাথার খুলি ফেটে ঘিলু বেরিয়ে ছিটকে পড়ে গেল। তাকে বিরত করার সুযোগ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা পেল না। আকস্মিক ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় আমি একেবারে হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম!

হাজার খানেক জনতা তখন পুলের চারদিকে। বার বার সাবধান করে দেয়া সত্বেও তারা স্থান পরিত্যাগ করতে নারাজ। রাজাকারদের প্রতি স্থানীয় জনগণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখে তিনজনের পরিবর্তে সাতজন মুক্তিযোদ্ধাকে চৌদ্দ জন রাজাকারকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হলো। এত সতর্ক ও সাবধানতা সত্বেও, আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল। সেতু থেকে মাত্র দু'শ গজের মত যাওয়ার পরেই আবার

একদল জনতা একটি রাজাকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে না যেতে সে রাজাকারটিও খতম। এবার আমি ভীষণ রেগে গেলাম। উত্তেজিত মারমুখী জনতাকে উদ্দেশ্য করে জোরের সাথে বললাম, 'এভাবে কোন রাজাকারকে পিটিয়ে হত্যা করা মুক্তিবাহিনী বরদাস্ত করবে না। আপনাদের অভিযোগ নিশ্চয়ই শোনা হবে। তার অর্থ এই নয় যে, আপনারা ইচ্ছামত রাজাকারদের পিটিয়ে হত্যা করবেন।' আমার এই কঠিন ও রূঢ় কথা শুনে 'রাজাকার পিটাও' অভিযানে ভাটা পড়লো। রাজাকাররাও কিছুটা স্বস্তি পেল। এরপর রাজাকারদের ফতেপুরে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে বললাম, 'রাস্তায় কোন রাজাকার আক্রান্ত হলে প্রয়োজনে তোমরা গুলি ছুঁড়তেও দ্বিধা করবে না। তবে তোমাদের গুলি ছোঁড়ার উদ্দেশ্য কাউকে হত্যা করা নয়, শুধুমাত্র উত্তেজিত জনতাকে দূরে রেখে রাজাকারদের রক্ষা করাই হবে গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য।' এরপর আবার ফিরে এসে বিস্ফোরক দিয়ে মটরা সেতু উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। এই সময় দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে বায়েজিদ আলম তার কোম্পানী নিয়ে এসে হাজির হলো।

এরপর শুরু হলো করটিয়া দখলের অভিযান। করটিয়াতে তখনও তিন-চার'শ রাজাকার, শতাধিক খান-সেনা ও মিলিশিয়া অবস্থান করছিল। প্রায় চল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধা রাস্তার উভয়দিকে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সমান্তরালভাবে একই গতিতে এগিয়ে চলেছে। ছ'সাত জন সহযোদ্ধাসহ আমি রাস্তার উপর দিয়ে আস্তে আস্তে করটিয়ার দিকে এগুচ্ছি। মর্টার প্লাটুন নিয়ে সামাদ গামাও আমাকে অনুসরণ করছে। সামাদ গামা মাঝে মাঝে তার ৩ ইঞ্চি মর্টার রাস্তার উপর বসাচ্ছে আর করটিয়াকে লক্ষ্য করে কুড়ি-পঁচিশ-রাউন্ড গোলা ছুঁড়ছে, আবার মূল দলকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। একটা ভারী মর্টার নিয়ে এত ক্ষিপ্রতার সাথে এগিয়ে গিয়ে বার বার একই লক্ষ্যে নিখুঁতভাবে গোলা নিক্ষেপ এক অভাবনীয় ও অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু সামাদ গামা মর্টার চালনায় এই অসাধ্য ও অভাবনীয় কাজটি অনায়াসেই করে চলেছে।

আমার ডান পাশে চকের মাঝে বেনু, ভোম্বল, দুমুর্জ খাঁ, জাহাঙ্গীর, তাজাহার; বাম পাশে মান্নান, আবদুল্লাহ, মালেক, মকবুল, কাশেম, আবদুল কালাম, তমছের আলী, রাস্তার উপর দিয়ে ফজলুল হক, দুলাল, শামসু, বজলু, পিন্টু ও জাহাঙ্গীরের ভাই বাবলু। মুক্তিযোদ্ধারা করটিয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। হিপ্‌পজিশনে গুলি ছুঁড়ছে আর এগুচ্ছে। ৩রা এপ্রিল ঠিক এমনিভাবে হানাদার বাহিনী অবিশ্রান্ত ধারায় গোলাগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাকা রাস্তার উপর দিয়ে টাংগাইল দখল করেছিল। আজ মুক্তিযোদ্ধারা ঠিক তেমনি-ভাবে হানাদারদের পিছু ধাওয়া করে চলেছে। মটরা থেকে করাতিপাড়া পর্যন্ত নির্বিঘ্নে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও, করাতিপাড়া গ্রাম নিয়ে আমরা একটু অসুবিধায় পড়লাম। হানাদারদের পক্ষে গ্রামটিতে অবস্থান নেয়া যেমন সুবিধাজনক, তেমনি আমাদের পক্ষে গ্রামটির দখল নেয়া বিপদজনক ও কষ্টকর। আমরা নির্বিচারে গ্রামের উপর গুলি চালাতে পারছিলাম না। তাই করাতিপাড়াকে সামনে রেখে অল্প সময়ের জন্য বিরতি দিতে হলো। এই সময় পুনরায় স্বেচ্ছাসেবকদের

করটিয়ার যুদ্ধ

সহযোগিতা ও সাহায্য নিতে হলো। আট-দশজন স্বেচ্ছাসেবক অনেকটা ডাইনে ঘুরে গ্রামের পিছন দিয়ে ঢুকে খবর সংগ্রহ করতে গেল। তবে সামাদ গামা একইভাবে করটিয়ার উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। সে ইতিমধ্যেই কম করে তিনশ' গোলা নিক্ষেপ করে ফেলেছে। তার মর্টারের ব্যারেল আগুনের মত লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। দু'তিন জন মুক্তিযোদ্ধা বার বার ছেঁড়া চট পানিতে ভিজিয়ে ব্যারেল ঠাণ্ডা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সামাদ গামার সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কাছে আগের চারশ' গোলা ছিল। উপরন্তু মটরা সেতু দখলের পর গোলা চেয়ে পাঠানোয় স্বেচ্ছাসেবকরা দেলদুয়ার থেকে আরও তিনশ' গোলা নিয়ে এসেছে। নতুন চালান আসায় সামাদ গামার উৎসাহ বহুগুণ বেড়ে গেছে। এত গোলা বর্ষণের পরও সামাদ গামার কোন ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। বাধ্য হয়ে সামাদ গামাকে নির্দেশ পাঠালাম, 'মিনিটে চার থেকে ছ'টির বেশী গোলা নিক্ষেপ করা চলবে না।' নির্দেশ সমাদ গামার কাছে পৌঁছার আগেই স্বেচ্ছাসেবকরা খবর নিয়ে এলো, করাতিপাড়ার হানাদাররা করটিয়া পর্যন্ত পিছিয়ে গেছে। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মুক্তিবাহিনী, জয় কাদের সিদ্দিকী, ইয়া আলী ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে রাস্তার পূবের করাতিপাড়া, পশ্চিমের নাদানখোলের ভিতর দিয়ে করটিয়ার উপকণ্ঠে এলো। মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে করটিয়া হাইস্কুল, মাদ্রাসা সাবেক জমিদার পন্নীদের বাড়ী এবং ঐতিহাসিক সাদৎ কলেজ। মাঝখানের আধ মাইল ফাঁকা জায়গা। খালি জায়গাটা অতিক্রম করা নিয়ে আবার বিপদ দেখা দিল।

হানাদার বাহিনী করটিয়া বাজার ও জমিদার বাড়ীর আশে-পাশে অবস্থান নিয়ে আছে। ফাঁকা জায়গা অতিক্রমের জন্য কোনও ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী ছিলাম না। সামাদ গামার মর্টার প্লাটুন ডেকে আনা হলো। করাতিপাড়ার সামান্য পশ্চিমে মর্টার বসিয়ে করটিয়ার শত্রুর লক্ষ্যস্থল দেখে দেখে সামাদ গামা পঞ্চাশ রাউন্ড ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং আমি ও তমছের দুটি ২ ইঞ্চি মর্টার থেকে প্রায় চারশ' গোলা নিক্ষেপ করলাম। এতে আশাতীত ফল ফললো। ২ ও ৩ ইঞ্চি মর্টারের প্রচণ্ড গোলার আঘাতের মুখে হানাদারদের পক্ষে করটিয়ায় টিকে থাকা সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে ফজলু, মান্নান, বেনু, আজাহার, দুলাল ও দুমুজ খান পাকা রাস্তার কোল ঘেঁষে বুকে হেঁটে করটিয়া কলেজের প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমরাও কলেজের আঙিনায় গিয়ে উঠলাম। আমাদের এগুতে দেখে ফজলু তার দল নিয়ে আরও একশ' গজ এগিয়ে করটিয়া পুলের উপর থেকে বাজার এবং পন্নীদের বাড়ী লক্ষ্য করে এম. এম. জি., এল. এম. জি. ও রাইফেল থেকে প্রচণ্ডভাবে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। পূর্বদিকের দলটিও দ্রুত করটিয়া হাইস্কুল ও মাদ্রাসা পর্যন্ত এগিয়ে পাকিস্তান সমর্থক জমিদার বাড়ী লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া শুরু করল। আমি আস্তে আস্তে কলেজের প্রধান ফটকে গিয়ে ফজলুকে ডেকে নির্দেশ দিলাম, 'আপাতত গুলি বন্ধ করে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে কয়েক মিনিট অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। প্রয়োজনে লোক পাঠিয়ে সামনের সঠিক খবর জেনে নাও। ওভাবে গুলি খরচ করলে সরবরাহে টান পড়বে।'

গুলি ছোড়া বন্ধ করে খোঁজ-খবর নেয়া শুরু হলো। গত রাতের আক্রমণে

করটিয়ার হানাদাররা বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। করটিয়া-টাংগাইলের মাঝামাঝি ভাতকুরা এবং ডেলি করটিয়া পুল ধ্বংসের খবর তারা আগেই পেয়েছিল। উপরন্তু রাতে বায়েজিদ কোম্পানী-দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে মূল ঘাঁটি টাংগাইল থেকে কোন সাহায্যই পায়নি। এই জটিল ও ভয়াবহ অবস্থায় মুক্তিবাহিনী যখন মটরা সেতু দখল করে করটিয়ার দিকে এগুতে থাকে তখন হানাদাররা মুক্তিবাহিনীর গতি রোধ করতে বা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে ভরসা পায়নি। মুক্তিবাহিনীর চাপের মুখে টিকতে না পেরে তারা করাতিপাড়া থেকে করটিয়া এবং করটিয়া থেকে কিছুটা পূবে সরে গিয়ে বাংড়া ও পৌলির কাছাকাছি আশ্রয় নেয়। খান-সেনারা এতই ভীতি, আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল যে, করটিয়া ঘাঁটি থেকে পিছিয়ে টাংগাইলের দিকে যেতেও সাহস পায়নি। টাংগাইল-করটিয়ার মাঝখানে ভাতকুরা ও ক্ষুদিরাম-পুরের পাকা রাস্তায় দু'তিনশ' যোদ্ধা নিয়ে ক্যাপ্টেন শামসুল হক ও ক্যাপ্টেন সোলেমান অভিজ্ঞ পাকা শিকারীর মত সংগীন উঁচিয়ে ওৎ পেতে বসেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের এই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে টাংগাইলে পিছিয়ে যাওয়া অসম্ভব ভেবে খানসেনারা পূবদিকে সরে গিয়ে সাময়িক আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মুক্তিযোদ্ধারা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলো করটিয়া বাজার, দালাল জমিদার বাড়ী ও করটিয়ার আশে-পাশে কোনও হানাদার নেই। ভাল মানুষের মত তারা পূবদিকে সরে পড়েছে। তবে কিছু রাজাকার, আলবদর এখনও করটিয়ার এখানে-সেখানে পালিয়ে রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা নয়, পালিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করা।

এই সময় বায়েজিদ আলম শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আবার আমাদের সাথে মিলিত হলো। মান্নান, বজলু, ভোম্বল, বেনুসহ পনের জনের একটি দল সারাদিন পৌলি ও বাংড়ার রাস্তা আগলে বসে থাকলো। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে করটিয়া বাজারসহ সমগ্র এলাকা তন্ন তন্ন করে রাজাকার খুঁজতে লাগলো। ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজি করে একশ'কুড়িটি অস্ত্রসহ একশ'চল্লিশ জন রাজাকার আটক করতে সক্ষম হলো। রাজাকার অনুসন্ধানে তারা এতই উৎসাহিত হয়ে পড়লো যে, মাঝে মাঝে আমাকে প্রায় একা ফেলে তল্লাসী চালাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ দল থেকে আলাদা হয়ে দূরদূরান্ত থেকে রাজাকার ধরে আনছিল। এই অবস্থা দেখে সহযোদ্ধাদের কঠিন তিরস্কার করে কড়া নির্দেশ দিলাম, 'কোনক্রমেই তিনজনের চেয়ে ছোট দলে এদিক-ওদিক যাওয়া যাবে না।'

দুপুর বারোটার মধ্যে ঢাকা-টাংগাইল পাকা সড়ক অভিযানের পুরো রিপোর্ট এসে গেল। নিজে একবার করটিয়া থেকে কোদালিয়া পর্যন্ত সরজমিনে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। বায়েজিদ আলম ও অন্যদের উপর করটিয়ার দায়িত্ব দিয়ে ক্যাপ্টেন ফজলুকে নিয়ে দুটি সাইকেলে কাঁধে স্টেনগান ঝুলিয়ে কোদালিয়া সেতু অব্দি যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পুরো রাস্তাটাই নিরাপদ। করটিয়া থেকে করাতিপাড়ায় সামাদ গামার দল। সামান্য এগিয়ে মটরা পুলে আমার দলের একটি অংশ ও বায়েজিদের কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। তারপর বাউইখোলা ও নাটিয়াপাড়ার মাঝামাঝি পুলে বায়েজিদের অসংখ্য উৎসাহী মুক্তিযোদ্ধা। সারাটা রাস্তা সুসজ্জিত মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা

মুক্ত সড়কে

পরিবেষ্টিত থাকায় মাত্র একজন সাথী নিয়ে মির্জাপুরের দিকে যাওয়া আমার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক ও গুরুতর ছিলনা। আমাদের দু'জনকে সাইকেলে মির্জাপুরের দিকে এগুতে দেখে রাস্তার উপরে শত শত মুক্তিযোদ্ধা আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে উৎসাহ যুগিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তার উপরে মানুষ আর মানুষ। যেন মানুষের বান ডেকেছে। তারা পোড়া আলু, চিড়া-মুড়ি, কলা, পেঁপে, দুধ যে যা পেরেছেন, তা নিয়েই রাস্তায় এসে হাজির হয়েছেন।

নাটিয়াপাড়া মোড় ঘুরতেই বহুদিন পর রহিম মাষ্টারের সাথে দেখা। এই রহিম মাষ্টার ৩রা এপ্রিল নাটিয়াপাড়া যুদ্ধের সময় টেলিফোনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। রহিম মাষ্টারকে বুকে জড়িয়ে ধরে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। জেনে নিলাম, নাটিয়াপাড়া যুদ্ধের পরে কোথায়, কিভাবে ছুটে গিয়েছিলেন। তারপর আরও এগিয়ে চললাম। সামনেই জামুর্কী পুল। পুলটি বেশ বড়। পুলটির হাড়-গোড় ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। নীচে অথই পানি। ওপারে যাবো কি করে? রাস্তার পুবে জামুর্কী হাইস্কুলে ভিতর দিয়ে কাঠের পুল পার হয়েই শুধু ওপারে যাওয়া সম্ভব। পাকা রাস্তার ঢাল বেয়ে নীচে নেমে জামুর্কী স্কুলের পেছনে পৌঁছতেই ঐ স্কুলের মাষ্টার আজাদ সাহেব দৌড়ে এসে আমার সাইকেল ধরলেন। তার চোখের সামনে আমি সাইকেলের বোঝা বহন করব, এটা মেনে নিতে তিনি রাজী নন। স্কুলের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় মুসলিম লীগ সদস্য প্রধান শিক্ষক জিয়ারত আলী সাহেবের সাথে দেখা হলো। তিনি আমাকে দেখে দ্বিধা ও অস্বস্তিবোধ করছিলেন। কিন্তু আমি যখন তাকে সালাম জানিয়ে বললাম,

—স্যার, কেমন আছেন?

তখন তাঁর মুসলিম লীগের লোক হওয়ার ভয়, ভীতি ও শঙ্কা কেটে গেল। তিনি ভাঙা ও কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন,

—বাবা কাদের, কতদিন পর তোমাকে দেখলাম। তুমি বেঁচে থাক।

আমরা পাকা রাস্তার দিকে এগুলাম। পাকুল্লা বাজারের সামনে সুলতান, লতিফ ও কাটোরার নাসির সহ অন্যান্য সহযোদ্ধারা স্বাগত জানাল। এখানে করটিয়া থেকে আনা সাইকেল বদল করে, দু'টি নতুন সাইকেল নিলাম। আমার অসাবধানতায় করটিয়ার ও পাকুল্লার চারটি সাইকেলই হারিয়ে যাওয়ার পরে মুক্তিবাহিনী সাইকেল মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল।

পাকুল্লা থেকে মির্জাপুরের দিকে এগিয়ে ধল্লা পৌঁছতেই, রাস্তার পাশে ঢাকা-ক ২৫৫ নম্বর বাসটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। গাড়িটি দেখে স্থানীয় কয়েকজন লোক ডেকে ধাক্কা দিতে চললাম। ডিজেল গাড়ী চালু করতে কোন চাবির দরকার পড়ে না, এটা আমার জানা ছিল। আমি গাড়ীতে উঠে ষ্টিয়ারিং ধরলে পাঁচ-ছ'জন লোক একটু ধাক্কা দিতেই ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। বাস চালিয়ে শুভুল্লা সেতু অতিক্রম করে যেতে পারলাম না। শুভুল্লা পুলটি মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দিয়েছে। শুভুল্লা পুলে ক্যাপ্টেন হুমায়ুনের সহযোদ্ধারা খবর দিল, নির্দেশমত ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর খান মির্জাপুর থেকে করটিয়ার দিকে রওনা হয়েছে। তাই আবার করটিয়ার দিকে ফিরলাম।

শুভুল্লা থেকে পাকুল্লা এই সাড়ে চার মাইল রাস্তা তখনও অক্ষত ছিল। পাকুল্লা ফিরে গাড়ী থেকে নামতেই মেজর হাবিব এসে তার অভিযানের বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করতে শুরু করলো। নাসিরকে ডেকে বললাম, 'একজন ড্রাইভার দিয়ে তোমরা ক'জন শুভুল্লা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সবুরের দলটিকে এ পর্যন্ত গাড়ীতে এনে দাও এবং জামুর্কীতে সবুরের দলের খাবার ব্যবস্থা কোরো।'

আমি আবার সাইকেলে চাপলাম। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারলাম না। পাকুল্লা বাজারের সামনে রাস্তায় মানুষ আর মানুষ। অসংখ্য মানুষের ভিড়। ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনন্দ ও শ্লোগান দিয়ে তারা আমাকে স্বাগত জানালেন। শুরু হয়ে গেল ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। সবাই এগিয়ে আসতে চান, কথা বলতে চান। মেজর হাবিব বহু চেষ্টা করেও বিশৃঙ্খল অবস্থাটাকে সামাল দিতে রীতিমত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। অনেক কথাবার্তার পর আবার সাইকেলে উঠবো, এমন সময় একটি অল্প বয়স্ক ছেলে এসে বললো,

—স্যার, আমার নাম ফারুক। আমি জামুর্কী ও পাকুল্লা সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি। আমার বিস্ফোরণ কেমন হয়েছে, স্যার ?

ফারুকের কথা শুনে একেবারে থ মেরে গেলাম। এত ছোট ছেলে এত বড় কাজ করেছে ? মেজর হাবিবও ছেলেটির কথায় সায় দিয়ে বললো,

—হ্যাঁ স্যার, এই ফারুকই আমার দলের মূল বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। ও খুব সাহস এবং বুদ্ধি রাখে।

হাল্কা-পাতলা ও সুদর্শন ছেলেটিকে প্রশংসার সুরে বললাম,

—দেখ ভাই, জামুর্কী সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটানোর কোন তুলনা হয়না, তবে পাকুল্লা সেতু ধ্বংস অতটা ভাল হয়নি। আমি নিজেও গত রাতে ভাতকুরা পুলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি। এ পর্যন্ত যতগুলো ধ্বংস সেতু দেখলাম, তার মধ্যে জামুর্কী সেতুই এক নম্বর। তবে মির্জাপুরের কাছাকাছি সেতুগুলোর অবস্থা এখনও দেখিনি, তাই নিশ্চিত করে তোমাকে শ্রেষ্ঠ বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ বলে ঘোষণা করতে পারছিনা। এখান থেকে ফিরে আমি করটিয়া সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটাবো। সেটা যদি তোমার চেয়ে ভাল না হয়, তা হলে অবশ্যই তুমি এক নম্বর হবে।' আমার একথা শুনে ফারুক আশ্চর্য হলো। তখন পর্যন্ত যে ক'টি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তার (ফারুকের) বিস্ফোরণই সবচেয়ে ভালো হয়েছে, আমার এ'কথা শুনে কিশোর মুক্তিযোদ্ধাটির খুশী ও আনন্দ যেন আর ধরেনা। অন্যদিকে আমি ভাতকুরা সেতু ধ্বংস করেছি, কথাটা শুনে মেজর হাবিব যেন আকাশ থেকে পড়লো। সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,

—স্যার, আপনার তো ভাতকুরা যাওয়ার কথা ছিল না ?

—ছিল না, তবুও গেলাম।

ভাতকুরা সেতু ধ্বংস করতে না পারলে আমরা কিছুতেই করটিয়া দখল নিতে পারতাম না। অন্য কোন কোম্পানী যে ভাতকুরা সেতু দখল নিতে পারে, এমন ভরসা পাইনি বলে আমাকেই যেতে হয়েছে। তবে তোমাকে অথবা সবুরকে যদি ভাতকুরা সেতুর দায়িত্ব দিতে পারতাম, দিব্যি করে বলছি, তা হলে তোমাদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি কিছুতেই খেলাপ করতামনা।

—স্যার, এখনও আপনি আমাদের ওপর পুরো ভরসা করতে পরছেন না, এই রকম বলতে যেয়ে সে থেমে গেল। আমি মেজর হাবিবকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

—না কমাণ্ডার, ঠিক তা নয়। এই দেখ ভাই, আমার তো কোন ক্ষতি হয়নি, তোমার মত অত যুদ্ধও করতে হয়নি। মোহর খাঁর সহায়তায় বিনা যুদ্ধে রাজাকার সহ সেতু দখল করেছি।

মেজর হাবিবকে সমস্ত এলাকার উপর তীক্ষ্ন নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে করটিয়া ফিরে এলাম। ফেরার পথেও সেই একই দৃশ্য। রাস্তার উপর যেন জনতার ঢল নেমেছে। করটিয়া এসে প্রথমে বাজার ও পরে কুখ্যাত দালাল জমিদার বাড়ী 'দাউদমঞ্জিল' তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। আমি মির্জাপুরের দিকে রওনা হওয়ার আগেই করটিয়া ছোট তরফের দালাল জমিদার মেহেদী খান পন্নী, তার ছেলে সেলিম খান পন্নী এবং বাবুল খান পন্নীকে কোমরে দড়ি বেঁধে করটিয়া হাইস্কুল মাঠে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি ফিরে আসার পর তাদের অধ্যাপক মুশফিকুর রহমান আবুর নেতৃত্বে বায়েজিদ কোম্পানীর ছয়-সাত জন মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে দেলদুয়ারের এলাচীপুরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। বাবুল খান পন্নীর টাংগাইল ক-৯ টয়োটা গাড়ীটিও মুক্তিবাহিনীরা নিয়ে নিল। ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ বিকেলে হানাদার সেনাপতি নিয়াজী যখন যৌথ বাহিনীর লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে, তখন এই গাড়ী চালিয়েই আমি ঢাকা বিমান বন্দর ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়েছিলাম। ঢাকা বিমান বন্দর থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাবার সময় ভারতীয় বংশোদ্ভূত পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত সাংবাদিক 'জয়োলাল' গাড়ীতে লাফিয়ে উঠেছিলেন। জয়োলাল যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের উপর বস্তুনিষ্ঠ দুর্লভ ও চাঞ্চল্যকর তথ্যবহুল সংবাদ সরবরাহের জন্য ১৯৭২ সালে পশ্চিম জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন।

২০শে নভেম্বর সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর খান সত্তর-আশি জন মুক্তিযোদ্ধাসহ বিজয় গর্বে করটিয়ায় আমার সাথে মিলিত হলো। সেতু ধ্বংস অভিযানে সবুরই সবচেয়ে বেশী সফলতা ও কৃতিত্বের দাবীদার। বেঁটে-খাটো এই অসীম সাহসী যোদ্ধাটি গর্বে ও আনন্দে যেন অনেক উঁচু ও লম্বা হয়ে গেছে। তবে তার কোন অহঙ্কার নেই, আস্ফালন নেই, উদ্ধত ও অস্বাভাবিক আচরণের লেশমাত্র নেই। সে ভিতরে দৃঢ়চেতা কিন্তু বাইরে শান্ত ও মধুর প্রকৃতির।

আলাপ-আলোচনা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সবুরকে নিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করলাম। সংগৃহীত তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, করটিয়ার হানাদাররা টাংগাইল সরে না গিয়ে পৌলি-বাংড়ার কাছে দু'তিনটি বাড়ীতে লুকিয়ে রয়েছে, তাদের কিভাবে পাকড়াও করা যায়। স্থির হলো, রাতের মত আমরা করটিয়া ও করাতিপাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবো। ভোর চারটায় একদল সোনালিয়া খালের ভিতর দিয়ে এবং অন্যদল করটিয়া-বাংড়ার রাস্তা ধরে হানাদারদের উপর ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

২০ শে নভেম্বর ঢাকা-টাংগাইল সড়কের কালিয়াকৈর থেকে ভাতকুড়া পর্যন্ত পুরো এলাকাটা মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে এলো। ঢাকার দিক থেকে সেতু ধ্বংসের বিবরণ—

এক নম্বর । মহিষ বাথান সেতু—ক্যাপ্টেন আবদুল হাকিমের কোম্পানী।
দুই নম্বর । গজারিয়াপাড়া সেতু—ক্যাপ্টেন সুলতান ও ক্যাপ্টেন রঞ্জু কোম্পানী।
তিন নম্বর । সুত্রাপুর সেতু—ক্যাপ্টেন সুলতান ও ক্যাপ্টেন রঞ্জু কোম্পানী।
চার নম্বর । কোদালিয়া সেতু—ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর খান ও ক্যাপ্টেন সাইদুর কোম্পানী।
পাঁচ নম্বর । দেওহাটা সেতু—ক্যাপ্টেন রবিউল আলম ব্যর্থ, পরে সবুর খান ধ্বংস করে।
ছয় নম্বর । বাইমাইল সেতু—ক্যাপ্টেন আজাদ কামাল আজাদ কোম্পানী।
সাত নম্বর । মির্জাপুর সেতু—ক্যাপ্টেন আজাদ কামাল আজাদ কোম্পানী।
আট নম্বর । কুম্নি সেতু—বাদশাহ ও ক্যাপ্টেন এন. এ. খান আজাদ কোম্পানী।
নয় নম্বর । শুভুল্লা সেতু—ক্যাপ্টেন লায়েক আলম ও ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কোম্পানী।
দশ নম্বর । পাকুল্লা সেতু—মেজর হাবিব কোম্পানী।
এগারো নম্বর । জামুর্কী সেতু—মেজর হাবিব কোম্পানী।
বারো নম্বর । নাটিয়াপাড়া সেতু—ক্যাপ্টেন বায়েজিদ আলম কোম্পানী।
তের নম্বর । নাটিয়াপাড়া বাউইখোলা সেতু—ক্যাপ্টেন বায়েজিদ আলম কোম্পানী।
চৌদ্দ নম্বর । মটরা সেতু—ক্যাপ্টেন ফজলুল হক কোম্পানী (ফজলুল হক আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কোম্পানী কমাণ্ডার)
পনের নম্বর । করাতিপাড়া সেতু—ক্যাপ্টেন বায়েজিদ আলম কোম্পানী।
ষোল নম্বর । করটিয়া সেতু—ক্যাপ্টেন ফজলুল হক কোম্পানী। (আমার নিজের দল)
সতের নম্বর । ডেলি করটিয়া সেতু—ক্যাপ্টেন শামসুল হক ও ক্যাপ্টেন সোলেমান কোম্পানী।
আঠার নম্বর । ভাতকুরা সেতু—ক্যাপ্টেন ফজলুল হক কোম্পানী। (আমি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলাম)

করটিয়া কলেজের ভি. পি. করাতিপাড়ায় আব্দুল মনসুর ও সুজাদের বাড়ীর পাশে জিন্নাহদের বাড়ীতে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হলো। সবুর রাত কাটাবে করটিয়া কলেজের আবাসিক এলাকায়। যথারীতি কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। পূব, পশ্চিম ও দক্ষিণ—তিন দিকই নিরাপদ। উত্তর দিকে কঠোর পাহারা বসানো হলো। করটিয়া স্কুল ও মাদ্রাসা সহ দালাল জমিদারদের বাড়ীর আশেপাশে কঠোর নজর রাখা হলো। ঢাকা-টাংগাইল পাকা রাস্তা ও করটিয়া বাজারেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলো। আমাদের জানা ছিল, করটিয়ার পূবে ক'টি বাড়ীতে পাক-সেনারা আশ্রয় নিয়েছে। তারা যাতে কোনক্রমেই পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য কঠোর দৃষ্টি রাখা হচ্ছিল।

গত রাতের মত আজকেও আমি কিছুটা জ্বর জ্বর অনুভব করছিলাম। রাত প্রায় দেড়টা। দালাল জমিদার বাড়ীর দিক থেকে কোলাহলের শব্দে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু তবুও উর্দু জবানে কথাবার্তা, হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ একটু একটু কানে ভেসে আসছিল। পাহারারত এক মুক্তিযোদ্ধাকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। সে কিছুই বলতে পারলোনা। ক্যাপ্টেন ফজলু নিজে অগ্রবর্তী ঘাটিতে ছুটে গেল। সে ফিরে এসে জানালো, 'এখান থেকে যে ধরনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, এগিয়ে একেবারে মাদ্রাসা ও স্কুলের কাছে গিয়েও সেই একই শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।' ঘটনাটি কিছুতেই পরিষ্কার হলোনা। এমন সময় অগ্রবর্তী দলের চারজন—আবদুল্লাহ, বেনু, ভোম্বল ও দুলাল ছুটে এলো। তারা কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে, কোলাহলটা দালাল জমিদার বাড়ী থেকেই আসছে। কথাবার্তা যা শোনা যাচ্ছে, তা পরিষ্কার উর্দু জবান। আমি আর ভরসা না পেয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। আগত চারজনসহ আরও পনের-ষোল জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে করটিয়া খালের পাড়ে স্কুল পর্যন্ত এলাম। ততক্ষণে কথাবার্তার আওয়াজ একদম থেমে গেছে। ফলে কোন কিছু আন্দাজ করতে না পারলেও বার বার সন্দেহ হচ্ছিল, কিছু একটা হয়েছে। হানাদারদের কণ্ঠ শুনেছি, তাই কিছুটা পিছিয়ে এসে সাদৎ কলেজে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন সবুরের খোঁজ করলাম। তাকে পাওয়া গেল। সে খুবই চঞ্চল ও উত্তেজিত। তাঁর দলও কিছুটা বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল। সবুরকে দেখে বিস্মিত হলাম।

মুক্তাঞ্চলে বিভ্রান্ত হানাদার

—কি ব্যাপার? কোন গোলা-গুলি নেই, তোমার চোখ-মুখের এই অবস্থা কেন? তোমাকে এত উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে কেন?

ক্যাপ্টেন সবুর প্রকৃত ঘটনা জানালো। হানাদাররা সত্যিই করটিয়া এসেছিল। তবে এখন তারা টাংগাইলের দিকে পালিয়ে গেছে। সবুরের কথা শুনে একেবারে

তাজ্জব বনে গেলাম! কিভাবে সম্ভব? পৌলি থেকে হানাদাররা কিভাবে করটিয়া পর্যন্ত এলো? আর করটিয়া থেকেই বা কিভাবে একটি গুলি খরচ না করে টাংগাইলের দিকে পালিয়ে গেল? সর্বত্রই মুক্তিবাহিনী ওৎ পেতে বসে আছে, সব পথই যে বন্ধ!

কিন্তু সে রাতে পাক-হানাদার বাহিনী অত্যন্ত দ্রুততা ও সফলতার সাথে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল। মুক্তিবাহিনীর চাপ ও আক্রমণের মুখে তারা করটিয়া থেকে পিছিয়ে গিয়ে পৌলি ও বাংড়ার কাছাকাছি ক'টি বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে বুঝতে পারে যে, স্থানটি মোটেই নিরাপদ নয়। মাইল আড়াই পূবে বাসাইল থানা, সেখানেও আশ্রয় নেয়া সম্ভব নয়। দু'দিন ধরে বাসাইল থানার ওপর জোর আক্রমণ চলেছে। পশ্চিমে মুক্তিবাহিনী সক্রিয়। দক্ষিণের সমগ্র এলাকাটাই বিল। উত্তরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধানক্ষেত ও জলাভূমি। এমনি ঘেরাও অবস্থায় সারাদিন অপেক্ষা করে, রাত দশটায় মরিয়া হয়ে তারা পশ্চিম দিকে এগুতে থাকে। পশ্চিমে বাংড়া সড়কের উপর কঠোর পাহারা থাকলেও, দক্ষিণ-পশ্চিমে সোনালিয়া খালের ওপর মুক্তিবাহিনীর পাহারায় কিছুটা শিথিলতা ছিল। হানাদাররা বাংড়ার কঠিন ও বিপদজনক পথে না গিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে শুকনো সোনালিয়া খালের মধ্য দিয়ে খুব সন্তর্পণে নিরাপদে করটিয়া স্কুল মাঠ পর্যন্ত পেঁছে। করটিয়া স্কুল মাঠে পাহারারত সবুর কোম্পানীর মুক্তিযোদ্ধা যখন তাদের প্রচন্ড চিৎকারে 'হল্ট হ্যান্ডস আপ' বলে চ্যালেঞ্জ করে, তখন বিভ্রান্ত ও বিস্মিত হানাদার দলের জনৈক সদস্য বলে ওঠে,

—কেয়া রাজাকার ভাইয়ো: হাম লোগ ভি রাজাকার হ্যাঁয়। তোম রাজাকার হ্যাঁয় না? তোমহারা কমান্ডার কাঁহা হ্যাঁয়? জবাবে পাহারারত মুক্তিযোদ্ধাটি হানাদার দলের উপর গুলি না চালিয়ে শুধু বলে,

—হ্যাঁয়, হাম রাজাকার হৈতা হ্যাঁয়। হামারা কমান্ডার সাবকো হাম লে আইতা হ্যাঁয়, বলেই দে ছুট। সে দৌড়ে গিয়ে কমান্ডার সবুরকে তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি জানায়। পলায়ন পর মিলিটারী রাজাকারদেরসংখ্যা পাঁচ-ছ শ'র বেশী। তাই মুক্তিযোদ্ধাটি গুলি চালাতে সাহস করেনি। তাছাড়া রক্ষা যে, সে আচমকা হানাদারদের হাতে ধরা পড়েনি। হানাদার বাহিনী যদি আগে থেকেই পরিচয় না দিত তাহলে হয়তো মুক্তিযোদ্ধাটি ধরা পড়ে যেতে পারতো। হানাদারদের ভুলে ও মুক্তিযোদ্ধাটির কৌশলে সবুরের পুরো দলটি বেঁচে গেল। মুক্তিবাহিনীর ভীতি ও চাপের মুখে সারাদিন কাটিয়ে হানাদাররা ভেবেছিল মুক্তিবাহিনী রাতে করটিয়ায় ঘাঁটি গেড়ে নাও থাকতে পারে। বিকেলে হানাদার দলটিকে 'ওয়ারলেসে' জানানো হয়েছিল যে, করটিয়ায় সামরিক সাহায্য পাঠানো হচ্ছে। সন্ধ্যার মধ্যে করটিয়া দুষ্কৃতিকারী মুক্ত হয়ে যাবে। এই খবরটাই হয়তো হানাদারদের কিছুটা বিভ্রান্ত করেছিল।

মুক্তিযোদ্ধাটির কাছ থেকে এই সাংঘাতিক খবর শোনামাত্র কমান্ডার সবুর বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে ওঠে। সব মুক্তিযোদ্ধাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে সরিয়ে দেয়। সে নিজে পাঁচ-ছ'জন নিয়ে আস্তে আস্তে করটিয়া কলেজ গেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে হানাদারদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে। স্কুলের মাঠে একত্রিত হওয়ার

সময় হানাদার বাহিনীর ছোট একটি দল পাশের দালাল জমিদার মেহেদী খান পন্নীর বাড়ীতে যায়। বাড়ীর পাকিস্তান সমর্থক মহিলাদের কাছ থেকে হানাদাররা জানতে পারে মুক্তিবাহিনী করটিয়া থেকে চলে যায়নি। তারা সমগ্র এলাকা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এমন কি তাদের এটাও জানায় যে, দুষ্কৃতিকারীদের প্রধান নেতা কাদের সিদ্দিকী ও আশেপাশে কোথাও আছে। ফলে হানদার বাহিনী আর করটিয়ায় অপেক্ষা করতে সাহস পায়নি। স্কুলের মাঠের পাশ থেকে রাজাকার কমাণ্ডারকে যে ডেকে আনতে গেছে, সে যে মোটেই রাজাকার নয়, এটাও তারা পুরোপুরি বুঝে যায়। খান সেনারা আবার করটিয়ার খাল ধরে সোজা পশ্চিমে করটিয়া হাট বাঁয়ে রেখে লৌহজং নদীর পার দিয়ে আস্তে আস্তে আশিকপুর পুলে গিয়ে ওঠে।

সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। সোনালিয়া খালে মুক্তিবাহিনীর প্রহরা দুর্বল ও শিথিল হওয়ার ফলে ঐ খাল দিয়ে করটিয়া হাট, ডোলি করটিয়া হয়ে ক্ষুদিরাম পুরের ভিতর দিয়ে ভাতকুরাকে সামান্য ডানে রেখে খাল ও নদীর পারের যে স্থান দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তার দু'একশ' গজের মধ্যে অনেক জায়গাতেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সম্বর্ধনা জানানোর অপেক্ষায় ছিল। করটিয়া হাটে ক্যাপ্টেন এন. এ. খান আজাদের দল, ডোলি করটিয়া ক্যাপ্টেন সোলেমান, ক্ষুদিরামপুরে ক্যাপ্টেন শামসুল হকের (ছাত্রলীগের) দল, মাঝিপাড়া কুমুল্লীর পাশে খোকার দল সর্বদা ওৎ পেতে বসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য কোন মুক্তিযোদ্ধাই হানাদারদের পালিয়ে যাবার খবর জানতে বা বুঝতে পারেনি। ১৯৪৫ সালে জাপানী সেনাবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে বৃটিশ সেনাদল যেভাবে বার্মা থেকে সাফল্যজনকভাবে পশ্চাদপসরন করেছিল, ঠিক সেইভাবে পাক-হানাদার বাহিনীও মুক্তিবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে, বিভ্রান্ত করে বিশেষ সফলতার সাথে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

এতবড় একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা আর সে রাতে ঘুমাতে পারলোনা। ব্যাপারটি তাদের রাতের ঘুম হারাম করে দিল। রাত চারটা থেকে তারা বাজার, দালাল জামদার বাড়ী ও অন্যান্য স্থানগুলো তন্ন তন্ন করে তল্লাসী শুরু করলো। দালাল মেহেদী খান পন্নীর বাড়ীর মহিলারা গত রাতের ঘটনা অস্বীকার করে বসলো। মিথ্যাকে যেহেতু সব সময় সত্য বলে চালানো সম্ভব নয়, মহিলারাও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখতে পারলোনা। হানাদাররা খালের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে এবং গড়িয়ে গড়িয়ে এই দালাল জমিদার বাড়ীতে এসেছিল। তাদের সমস্ত শরীরে কাদামাটি লেপটে ছিল, শুধু বাড়ীর আশেপাশেই নয়, বৈঠকখানাতেও কাদামাখা বুটের ছাপ স্পষ্ট। এমনকি কাদামাখা শরীর নিয়ে দু'এক জন হানাদার যে তাদের সুন্দর দামী সোফাগুলিতে বসেছিল তার চিহ্নও রয়ে গেছে। এসব দেখে শুনে, মুক্তিযোদ্ধারা দালাল বাড়ীর মহিলাদের গালিগালাজ করতে উদ্যত হয়। আমি তাদের থামিয়ে দিলাম। দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে মহিলাদের বললাম,

—আপনারা মায়ের জাতি হয়ে এত মিথ্যা ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে ভাল করছেননা। এজন্য অবশ্য আপনাদের কিছু বলার নেই। বাড়ীর কর্তারা যে মানসিকতায় লালিতপালিত, স্বাভাবিক কারণেই আপনারাও তার কিছুটা পেয়েছেন। আমরা কিন্তু এতটা আশা করিনি।

সকাল সাড়ে ন'টায় খবর পেলাম গতকাল সন্ধ্যায় বাসাইল থানা মুক্ত হয়েছে। আমি বাসাইল থানার উদ্দেশে যাত্রা করলাম। যাবার সময় মেজর হাবিবকে করটিয়া ঘাঁটি আগলে থাকার দায়িত্ব দিলাম। নদী পেরিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা করটিয়া-বাসাইলের কাঁচা রাস্তা ধরলো। আমার আগে দুমুজ খাঁ, ভোম্বল, বজলু, মান্নান, দুলাল ও কালাম সহ বারো-তের জনের একটি স্কট পার্টি। রাস্তায় বহুদিনের স্মৃতিবিজড়িত একটি প্রাচীন বটগাছ। বহুযুগের বহু ঘটনা, কাহিনী ও কিংবদন্তীর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর বয়স কত কে জানে? কেউ বলেন, দেড়শ' কেউ বলেন দু'শ বছর। আবার কারও কারও মতে আড়াইশ বছরের কম নয়। বয়স যাই হোক, বটগাছটি বাসাইল-করটিয়া রাস্তায় কত পথিককে ছায়া দিয়েছে তার হিসেব নেই। আমাদের থেকে বটগাছের দূরত্ব পাঁচশ' গজের মত। সামনে আট-দশ হাত প্রশস্ত ও চার-পাঁচ হাত উঁচু ছোট্ট একটি কালভার্ট। স্কট পার্টি কালভার্ট পেরিয়ে প্রায় ১০০ গজ এগিয়ে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, বটগাছের নীচে কাশিল-বেয়ালা-বাথুলী সড়ক সামনে রেখে কিছু লোক মাথা উঁচিয়ে অবস্থান নিয়ে আছে। আমার সন্দেহ হলো। যদিও আমাদের কাছে খবর ছিল রাস্তা নিরাপদ, বাসাইল থানা মুক্ত। তবুও স্কট পার্টিকে ইশারা দিলাম, সাথে সাথে সবাই শুয়ে পড়ে অবস্থান নিল। দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু আমি।

শত্রুর মুখোমুখি

এই সময় বাথুলী বটগাছের নীচে অবস্থানরত একজন চিৎকার করে বলে উঠলো,

'ঘাবরাও মাত রাজাকার ভাইয়ো, আ যাও।'

কথাগুলো শুনে বুঝতে পারলাম হানাদারদের গলার আওয়াজ। যদিও এর আগে অনেক জায়গায় রাজাকারদের বিভ্রান্ত ও বিপদে ফেলার জন্যে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের কণ্ঠস্বর নকল করে উর্দু জবানে কথা বলেছে। কিন্তু সামনে যে লোকটি রাজাকারদের ডাকছে, সে যে মোটেই নকল করে ডাকছেনা, তা আমাদের বুঝতে বাকী থাকলোনা।

আমি অনেকবার পশ্চিম পাকিস্তানে ঘুরেছি, বহু উর্দুভাষীর সাথে কথা বলেছি। সত্যিকার উর্দুভাষীর কণ্ঠস্বর আলাদা ধরনের। আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে হানাদারটির চাইতেও গলার আওয়াজ চড়িয়ে বললাম,

—গুলি মাত করনা। হাম লোক রাজাকার হ্যায়, হেড-কোয়ার্টারসে হাম লোক কো ভেজা।

একথা শুনে রাস্তার অপর পারে দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করা লোকটি বোধহয় কিছুটা সাহস পেল। সে আবার চিৎকার করে বললো,

—তোম লোগ রাজাকার হ্যায় তো ফের রোখা কেঁউ? আগে আ যাও। এই দুই চিৎকারেই কাজ হয়ে গেল। আমরা প্রায় সবাই অনুকূল অবস্থানে ছিলাম। শুধু সামনের স্কট পার্টি একেবারে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছিল। গুলি চালালে তাদের বেঁচে থাকার বা রক্ষা পাওয়ার মোটেই সম্ভাবনা ছিলনা। তাই আমি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে ঐভাবে চিৎকার করে হানাদারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছি। চিৎকার শুনে কর্তব্য কী, অগ্রগামী মুক্তিযোদ্ধারা তা মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে ফেলে। রাস্তার ডান পাশে গড়িয়ে পড়ে তারা আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসতে থাকে। প্রায় সত্তর-আশি গজ পিছিয়ে

এসে একটা নিরাপদ অনুকূল অবস্থানও পেয়ে গেল। আমিও রাস্তার আড়াল নিয়ে বসে পড়লাম। হানাদার বাহিনী ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে, সামনের দল মোটেই রাজাকার নয়, মুক্তিবাহিনী। তাদের একজন চিৎকার করে বললো,

—উসনে ঝুট্ বলা হ্যায়। ও লোগ রাজাকার নেহি। ওহি কাদের সিদ্দিকী। উসকো মার ডালো।

সাথে সাথে হানাদাররা বৃষ্টির মত গুলি ছোঁড়া শুরু করে দিল। ততক্ষণে মুক্তিযোদ্ধাদের সকলেই সেতুর আড়ালে নিরাপদ অবস্থান পেয়ে গেছে। রাইফেলের গুলি তো দূরের কথা, ট্যাংক থেকে গোলা ছুঁড়লেও আমাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এদিন আমার কণ্ঠের উর্দু জবানই হানাদারদের বিভ্রান্তির একমাত্র কারণ ছিল না। আমার পরনে ছিল খাকী সামরিক পোষাক। অন্যদিকে প্রায় সকল মুক্তিযোদ্ধার গায়ে ছিল কালো, খাকী, নীল ও নানা রং-বেরংয়ের পোষাক, একটি সাধারণ রাজাকারের দলও এ ধরনের পোষাকই পড়ে থাকে। এসব কারণে হানাদাররা অতি সহজেই বিভ্রান্ত হয়েছিল। হানাদারদের মুহূর্তের বিভ্রান্তির জন্যেই দশ-বারো জন মুক্তিযোদ্ধার অমূল্য জীবন বেঁচে যায়।

হানাদাররা মুষলধারে গুলি ছুঁড়ছে। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। অগ্রবর্তী দল পুলের আড়ালে থাকতে বললাম। একটি দলকে করটিয়া-বাশাইল সড়কের আড়াল নিয়ে কামুটিয়ার কাছ দিয়ে উত্তরে বাথুলী বাজার ও প্রাইমারী স্কুলের কাছে অবস্থান নিতে নির্দেশ দিলাম। সামাদ গামাকে তার মর্টার বাথুলী বাজারের উত্তর-পশ্চিমে বসাতে আদেশ দিলাম। অবস্থান নেয়ার জন্য সবাই উল্কার মত ছুটে চললো। বারোজনের একটি দল নিয়ে আমি মূল রাস্তার উপরে অপেক্ষা করতে থাকলাম। সবুর, ফজলু, সামাদ গামা—ছ'সাত মিনিটের মধ্যেই নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিল। আরও দু'শ গজ পশ্চিমে গিয়ে হানাদারদের দিকে মুখ করে স্কট পার্টিতে অবস্থান নিতে নির্দেশ দিলাম। আমিও ওদের থেকে তিনশ' গজ পশ্চিমে গিয়ে অবস্থান নিলাম। আমার অবস্থান নেবার পর স্কট পার্টি কামুটিয়ার রাস্তা ধরে বাথুলী প্রাইমারী স্কুলের দিকে ছুটলো। আলাদা আলাদা অবস্থান নেয়ার কারণ, যদি সবাই একসাথে পিছিয়ে আসতে থাকি, তাহলে হানাদাররা পেছন দিক থেকে আঘাত হানার সুযোগ পেতে পারে। স্কট পার্টি আমাদের সামনে দিয়ে পশ্চিমে চলে যাবার পর আমরাও তাদের পিছু পিছু বাথুলী বাজারের দিকে ছুটলাম।

সবুর, ফজলু ইতিমধ্যে চল্লিশ জন বাছা বাছা মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কাশিম-বেয়ালা-বাথুলী রাস্তার পাশে হানাদারদের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। আমি দৌড়ে মর্টার প্লাটুনের কাছে গিয়ে হানাদারদের পেছনে দিকে মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দিলাম। সামাদ প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গেল। কারণ মর্টার থেকে হানাদারদের দূরত্ব বড় জোর এক মাইল। উপরন্তু মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের পঞ্চাশ গজের মধ্যে অবস্থান নিয়েছে। এই বিপদজনক অবস্থায় সে কি করে গোলা নিক্ষেপ করবে? এক মাইল দূরত্বের কমে ব্রিটিশ ৩ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা নিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। গোলা নিক্ষেপে সামান্য হেরফের হলে, হানাদারদের কাছাকাছি

অবস্থান নেয়া মুক্তিযোদ্ধাদেরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন সামাদ গামা গোলা নিক্ষেপে বিরত থাকল। প্রায় দু'মিনিট তাকে চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার? গোলা ছুঁড়ছো না কেন? এখন প্রতিটি সেকেন্ড অত্যন্ত মূল্যবান।' সামাদ কেঁদে বললো, 'স্যার, ফজলু-সবুর ভাইয়েরা হানাদারগোর একেবারে কাছাকাছি চইলা গেছে। ঐ দেহেন, দেহা যায়। অহন আমি কি কইরা গোলা ছুঁড়মু।' সত্যিই মর্টার প্লাটুনের অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও হানাদারদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সামাদ গামাকে বললাম, 'আজ মর্টার ফায়ারিং-এ শত্রুদের দেখতে পাওয়াটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধার। তুমি সরে দাঁড়াও। গোলা আমাকে দাও। আমিই প্রথম গোলা ছুঁড়ছি।' আমার কথা শুনে সামাদ গামা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে বললো, 'স্যার, এহেবারে সর্বনাশ হইয়া যাইবো। আমাগো গোলায় মুক্তিরা মারা পড়বো।' ধমক দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, 'দেখ, যুদ্ধে তোমার কাছে শিখতে হবেনা। মুক্তিযোদ্ধারা যতখানি এগিয়ে গেছে, তাতে মর্টার থেকে গোলা ছুঁড়তে আর এক মিনিট বিলম্ব হলে হানাদারদের হাতে ওরা নিশ্চিত ধরা পড়ে যাবে। আমি তোমাকে হানাদারদের উপর গোলা ছুঁড়তে বলিনি। গোলা ছুঁড়তে বলেছি হানাদারদের পেছনে। ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলার আঘাতে হানাদারদের ক্ষতির চেয়ে গোলার আওয়াজ বেশী দরকার।' সামাদ বোধকরি আমার কৌশল বুঝতে পারলো। সে এগিয়ে আসার আগেই হানাদারদের পাঁচ-ছশ' গজ পেছনে আমি সাত-আটটি গোলা নিক্ষেপ করে ফেলেছি। গোলাগুলো হানাদারদের পেছনে ও সামান্য ডানে পড়তে থাকায়, ব্যারেল উঠিয়ে আরও একটু বামে সরিয়ে গোলাগুলো আরও কাছাকাছি নিক্ষেপের চেষ্টা করলাম।

দ্বিতীয় বার নিশানা বরাবর পরপর চারটি গোলা ছুঁড়লে দেখা গেল, হ্যাঁ, এবার অনেকটা এগিয়ে এসেছে। হানাদারদের দেড়শ' থেকে দু'শ গজ পেছনে গোলা পড়ছে। আমার নিশানা দেখে সামাদ গামা থ মেরে গেল। সামাদ আমার পা জড়িয়ে ধরে বললো, 'স্যার, আপনি এত নিরিখ কইর‍্যা গোলা ছুঁড়তে পারেন?' এ ধরনের কথা শোনার বা জবাব দেবার সময় এবং সুযোগ তখন ছিলনা। সামাদের পিঠ জোরে চাপড়িয়ে বললাম, 'আজ নিশানার প্রশ্ন নয়, পরে কোনদিন যদি সুযোগ হয়, দেখা যাবে। আমি সবুরের কাছে চললাম। তুমি সব সময় আমাকে লক্ষ্য করবে। আমি হাতের সাদা কাপড় উঁচু করলেই গোলা ছুঁড়বে, নামালেই গোলা ছোঁড়া বন্ধ করে দেবে। উঁচু নীচু নয়, আমার হাতের সাদা কাপড় দেখতে পেলেই তুমি গোলা ছুঁড়বে। তবে সাবধান, গোলা যেন আর এগিয়ে না আসে। হানাদাররা যদি জায়গা ছেড়ে না দেয়, তা'হলে সবুর ফজলুর দলকে পিছিয়ে নিয়ে আসবো। তখন তুমি নিশানা করে গোলা ছুঁড়বে। আমি চললাম। আমার যাওয়া পর্যন্ত তুমি পঁচিশ-ত্রিশটি গোলা ছোঁড়। তবে একবার গোলা ছুঁড়তে এক মিনিট বিলম্ব হলে, দ্বিতীয়বার আমার হাতে সাদা কাপড় না দেখে আর গোলা ছুঁড়বেনা।'

আমি হানাদারদের কাছাকাছি অবস্থান নেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে ছুটলাম। আমার সাথে ষোল-সতের জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আমরা দৌড়ে চলেছি। সামাদ গামা একের পর এক ৩ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা নিক্ষেপ করে চলেছে। ওদের

কাছাকাছি পেঁছবার আগেই সবুর, ফজলু ও সামাদ গামার গোলাগুলির চাপে হানাদাররা বাথুলী রাস্তা ছেড়ে বাশাইলের রাস্তা ধরে বিশৃংখল অবস্থায় পশ্চাদাপসরন করতে শুরু করে। তখন হাতে সাদা কাপড় অপ্রয়োজনে বাহির থেকে দেখা যেতে পারে এই আশংকায় কাপড়ের টুকরো পকেটে ভরে রাখলাম। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা বটগাছ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। কিন্তু তারপর সম্পূর্ণ জায়গা ফাঁকা, কোনও আড়াল নেই। মুক্তিযোদ্ধারা আরও এগুচ্ছে। আমি ওদের সাথে মিলতে উর্ধশ্বাসে ছুটছি, কিন্তু পেরে উঠছি না। আমি পেঁছবার আগেই বটগাছের নীচে থেকে বাশাইলের দিকে আরও একশ' গজ এগিয়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের 'হ্যাণ্ডস আপ' 'হ্যাণ্ডস আপ' বলে চিৎকার করে উঠছে। হানাদার ও মুক্তিবাহিনী উভয় দলই তখন ফাঁকা জায়গায়। আবদুল্লাহ সবার আগে, তার এক পাশে আজাহার ও ময়থার বেনু। অন্য পাশে দুলাল, বজলু ও ভোম্বল। তার পনের-কুড়ি গজ পেছনে ডাইনে সবুর, বামে ফজলু ও রাস্তার উপর সাইদুর রহমান। হানাদারদের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ 'হ্যাণ্ডস আপ! হ্যাণ্ডস আপ!' বলে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করছে। অবস্থার বিপাকে বেশ ক'জন খান-সেনার হাতও উপরে উঠে গেছে, কিন্তু পেছনের দু'একজন হানাদার সামনের সেনাদের হাত নীচে নামিয়ে নেয়ার জন্য ধমকাচ্ছে, গালি-গালাজ করছে। আবদুল্লাহ, আজাহার, ভোম্বল, বেনুরা হানাদারদের থেকে বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে। পাক-সেনারা আরও পঞ্চাশ গজ পিছিয়ে যেতে পারলে একটি বাড়ীর আড়াল পেয়ে যাবে। মুক্তিযোদ্ধারা ফাঁকা মাঠে বিপদে পড়বে, এটা আশংকা, করে আমি জোরে সামনে ছুটলাম। 'হ্যাণ্ডস আপ' এর ঐ দৃশ্য দেখে আমার মনে হচ্ছিল আমি নিজে যেখানে উপস্থিত সেখানে একজন সাধারণ সহযোদ্ধা পুরো দলকে আত্মসমর্পণ করিয়ে ফেলছে, এ কেমন কথা? কোনও যুদ্ধেই সহযোদ্ধারা আমাকে একশ'-দেড়শ' গজ পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারেনি। আমি তখনও দেড়শ' গজ পেছনে পড়ে আছি। এতটা পেছনে পড়ে থাকা প্রচণ্ডভাবে আমার পৌরুষে আঘাত করছিল।

দুঃসাহসি আবদুল্লাহ

আমি জোরে আরও জোরে আবদুল্লাহ্‌র দিকে ছুটলাম। একনাগারে ছুটে আমি আবদুল্লাহ্‌র থেকে তিন-চার গজ সামনেও এগিয়ে গেলাম। এসময় হানাদারদের দিক থেকে প্রচণ্ড গুলি আসতে থাকলো। আবদুল্লাহ যখন 'হ্যাণ্ডস আপ' বলে চিৎকার করে এগুচ্ছিল, তখন কোন পক্ষ থেকেই মিনিট দুই গুলি চলেনি। মুক্তিযোদ্ধারা মনে করেছিল শত্রুরা হাত তুলে ফেলেছে তাদের উপর আর গুলি চালানো ঠিক হবে না। অন্যদিকে, অনেকক্ষণ গুলি ছোড়ার কারণে হানাদারদের নতুন করে ম্যাগজিন ভরার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আমি যখন এগিয়ে যাই, তখন হানাদাররা কিছুটা আড়াল পেয়ে যায় এবং মুষলধারে গুলি ছোড়া শুরু করে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা ভয়ানক অসুবিধায় পড়ে গেল। আমি আবদুল্লাহ ও অন্যান্যরা বলতে গেলে ফাঁকা জায়গায় হানাদারদের সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি।

মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে হানাদারদের উপর তেমন গুলির চাপ নেই। আমাদের প্রায় সব বন্দুকই ফাঁকা, সবাই গুলি ভরতে ব্যস্ত। এই অপ্রস্তুত অবস্থায় খান সেনারা

আমাদের দেখে ধীর-স্থিরভাবে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। আমার অবস্থান খুবই প্রতিকুল। আমাদের চারপাশে শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এসে পড়ছিল। কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনে, চিৎবাঁক খেয়ে মুহূর্তে রাস্তার উপরে উঠে পড়লাম। আমার কাছে তখন রাস্তার উপরটাই বেশী নিরাপদ মনে হচ্ছিল। কারণ হানাদাররা রাস্তার দু'পাশ থেকে রাস্তার কোল ঘেঁষে গুলি ছুঁড়ছিল। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত আমাকে অনুসরণ করে রাস্তার উপরে উঠে পড়ল। অন্যদিকে সবুর, সাইদুর, ফজলুদের দলের প্রায় পনের-কুড়ি জন স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ারে নতুন করে গুলি ভরে হানাদারদের উপর গুলি বৃষ্টি শুরু করে দেয়। এতে আমাদের উপর হানাদারদের চাপ শিথিল হয়ে পড়ে। আমরা পঞ্চাশ গজ পিছিয়ে এসে একটা অনুকূল ও নিরাপদ অবস্থান পেয়ে গেলাম। আমি আরিফ আহমেদ দুলালের চাইনীজ রাইফেল এক ঝটকায় নিয়ে ছ'সাত জন মুক্তিযোদ্ধা দক্ষিণ চকের মাঝ দিয়ে দু'তিন শ' গজ কাশিল গ্রামের দিকে ছুটলাম। আমার উদ্দেশ্য, পাশের গ্রাম থেকে হানাদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু দক্ষিণ দিকে একশ' গজ যাওয়ার পর আবার বিপদে পড়ে গেলাম। সামনে পানি, এগুনো সম্ভব নয়—পিছানোরও উপায় নেই। বামে হানাদার, ডানে পানা বোঝাই জলাভূমি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আবার সেই পেছনেই আসতে লাগলাম। দু'তিন জন নিরাপদে পিছিয়ে গেছে। ফাঁকা জায়গার মাঝামাঝি আমি একা, আর মাত্র পঞ্চাশ গজ উত্তরে যেতে পারলেই আড়াল পেয়ে যাবো। এমনি ছুটন্ত অবস্থায় জনৈক হানাদার আমাকে নিশানা করে গুলি ছুঁড়তে উদ্যত, চট করে বসে পড়ে তাকে লক্ষ্য করে চাইনীজ রাইফেল থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লাম। হানাদারটি সাথে সাথে লুটিয়ে পড়লো। সেদিন যদি খান সেনাটি আগে গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেত, তাহলে আমার বিপদ ঘটতে পারতো।

গুলি ছোঁড়ে এক মুহূর্তও দেরী না করে আবার ছুটলাম নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে, পেয়েও গেলাম। বিশৃঙ্খলভাবে দৌড়া-দৌড়িতে সকল মুক্তিযোদ্ধাই ক্লান্ত, শ্রান্ত। অনেক সময় ধরে, এক নাগাড়ে গুলি ছোঁড়ায় গ্যাস রেগুলেটর সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ার দরুন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সব স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ারগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। ভরসা কেবল ৩০৩ রাইফেল। সবাই তাড়াতাড়ি গ্যাস রেগুলেটর ঘুরিয়ে সক্রিয় করে নিচ্ছিল। এই যুদ্ধের মধ্যেও কাশিল, বিয়ালা, বাথুলী, ডাপনাজোর, ফুলাকি, ভুক্তা কামুটিয়া ও পৌলি প্রভৃতি এলাকায় লোকজন ছাতু, চিড়া-মুড়ি, দুধ-কলা ও কলস ভর্তি পানি এনে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াতে শুরু করেছেন। আমি কিছু ছাতু, দুধ ও পানি খেয়ে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে নিলাম। এত উত্তেজনার মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধাদের রসবোধ কমেনি। সবুর মুখ খুললো, 'কোদালিয়া, মির্জাপুর, দেওহাটা কত যুদ্ধ কইরা আইলাম বন্দুক তুই থামলি না। মিলিটারী গো কেনা বন্দুক বইল্যা তুই তাগোর উপর চলতে চাস্না।' সাইদুর সবুরকে সমর্থন করে বললো, 'সবুর ভাই, আমারও ঐ রকম মনে হইতাছে। কতদিন ধইরা যুদ্ধ করছি। কোনদিন গ্যাসের জন্য আমার অস্ত্র খাড়াইল না। আজ নলের মুখে হানাদারদের পাইয়াও বারবার বন্দুক খাড়াইয়া যাইতাছে। আমারও ঐরকম একটা সন্দেহ

হইছিল।' আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম, 'হ্যাঁ, আজ কিন্তু আমারও ঐ রকম সন্দেহ হচ্ছে। আমাদের শত্রুরা আশিটা অস্ত্রই হানাদারদের কাছ থেকে দখল করা। তাই ওদের অস্ত্র বোধহয় ওদের উপর চলতে চাইছেনা। আমাদের উপরও কিন্তু তাদের অস্ত্র তেমন কোন কাজ করতে পারে নাই। তা না হলে এই এলোমেলো অবস্থায় ক'জন যে আজ মারা পড়ত, তা আল্লাহই জানেন। তোরা দেখ্ আমাদের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি।' এই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের রসবোধের জোয়ারে যেন একটু ভাটা পড়ে। না, আঁচড় লেগেছে। তবে মুক্তিযোদ্ধারা তখনও তা বুঝতে পারেনি। ছোট্ট পুলের নীচে বসে আমরা যখন এই রসিকতা করছিলাম, তখন বেনুমির্জার পা থেকে জলের ধারায় রক্ত ঝরছিল। বেনু মির্জার পায়ের কাছে চাপ চাপ রক্ত। ফজলু ও ভোম্বল তা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করে। তারপর সবাই। ক্যাপ্টেন ফজলু বেনুকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এই বেনু, তোর পায়ের কাছে এত রক্ত কেন? তোর কি গুলি লেগেছে?' বেনু আশ্চর্য হয়ে বললো, 'না ত! কই? কিসের রক্ত? নিজের পায়ের দিকে তাকাতেই বেনু অবাক! সত্যিই তো! রক্ত! রক্তে একেবারে ভেসে গেছে। এখনও কিন্তু বেনু জানেনা যে, তার পায়ে গুলি লেগেছে। সে ব্যথা অনুভব করছেনা। জমাট রক্ত সরিয়ে দেখা গেল, বেনুর পায়ের পাতা গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। পা থেকে তখনও রক্ত চুইয়ে পড়ছে।

বেনুকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা কিছু সময়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হলো। দীর্ঘ সময়ের যুদ্ধ ক্লান্তিতে কিছুটা নুইয়ে পড়া মুক্তিযোদ্ধারা জনতার নিয়ে আসা খাবার খেয়ে, নতুন মনোবল ও শক্তি নিয়ে হানাদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবার পরিবর্তিত যুদ্ধ পরিকল্পনা। হানাদারদের উপর ঝটিকা আক্রমণের নেতৃত্বে থাকল—সবুর, সাইদুর ও ফজলু। তারা পঞ্চাশ জন সহযোদ্ধা নিয়ে 'ভি' আকারে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি কুড়ি-পঁচিশ জন নিয়ে পেছন থেকে কয়েকটি এল. এম. জি. দুটি মর্টার থেকে হানাদারদের উপর অবিরাম গুলি ও সেলবর্ষণ করতে লাগলাম।

খাবার ও বিশ্রাম শেষে নববলে বলীয়ান মুক্তিযোদ্ধারা সামনের গ্রামে হানাদারদের অবস্থান তিন-চার মিনিটের মধ্যে বিস্ময়করভাবে তছনছ করে ফেলতে সক্ষম হলো। অবস্থান ছেড়ে, আবার আগের মত বিশৃংখল অবস্থায় বাশাইলের দিকে পিছুতে লাগলো। নাঙ্গুলিয়ার খাল পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়ে হানাদাররা আবার সুদৃঢ় অবস্থান নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মুক্তিবাহিনীর প্রবল চাপে তাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। এইখানে আমি অবিস্মরণীয় গোলা নিক্ষেপ করলাম। একটি সেল হানাদারদের ত্রিশ-চল্লিশ গজ সোজাসুজি সামনে রাস্তার উপর পড়লো। দূরত্ব সামান্য একটু বাড়িয়ে দ্বিতীয় গোলা নিক্ষেপ করলাম। এটি একেবারে নিখুঁত-ও নির্ভুল নিশানায় গিয়ে আঘাত হানলো। এ যেন দেখেশুনে শান্ত পানিতে ঢিল ছোঁড়ার মত অবস্থা। হানাদারদের অনেকেই এদিক-সেদিক ছিটকে পড়লো। অনেকে আবার আরও গুটি-শুটি হয়ে গেল। আমি আরও একটি গোলা নিক্ষেপ করলাম। এটার নিশানাও আঘাতও প্রচণ্ড! পর পর দুটি গোলার প্রচণ্ড ও ভয়াবহ আঘাতে

হানাদারদের মাঝে মহামারি লেগে যায়। এর আগে দু'শ গোলায় হানাদারদের যে ক্ষতি করতে পারেনি, এই দুটি গোলায় তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী ক্ষতি হলো। মাত্র ঐ দুটি গোলাতেই ষোল জন হানাদার নিহত ও ছ'সাত জন গুরুতরভাবে আহত হয়। এরপর হানাদাররা সেখানে আর বেশী অপেক্ষা করা বা পাল্টা আঘাত হানা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেনি। এছাড়া তাদের বেশীদূর পশ্চাদাপসরনের সুযোগও ছিলনা। মাইল খানেক পেছনে বাশাইল থানা। সেখান থেকে তাড়া খেয়েই এরা টাংগাইলের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। ভাগ্য মন্দ, আচমকা মুক্তিবাহিনীর সামনে পড়ে গিয়ে তাদের নিরাপদে পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। সামনে মুক্তিবাহিনী, পেছনে মুক্তিবাহিনী, এমনি অবস্থায় যা হয়—তাই হলো। মুক্তিবাহিনীর ফাঁদে আটকা পড়ে এবং প্রচন্ড চাপের মুখে, তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে দক্ষিণে কাশিল-বিয়ালার দিকে সরে যেতে থাকে। আমরা আর এ সময়ে ওদের উপর বেশী চাপ সৃষ্টি করতে এগিয়ে গেলামনা। নাঙ্গুলিয়া খাল পার পর্যন্ত এগিয়ে অগ্রাভিযানে বিরত দিলাম। এখানে হানাদার পরিত্যক্ত একটি এল. এম. জি., তিনটি চাইনীজ রাইফেলসহ ছ'হাজার গুলি আমাদের হস্তগত হয়। হানাদারদের তিনটি লাশ ও তিনজন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এলো। নাঙ্গুলিয়া খালের পাড়ে পরে থাকা হানাদারদের লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য বাশাইল থানার মুক্তি-যোদ্ধাদের কাছে এক বার্তা পাঠালাম, আহত তিনজন রাজাকারকে বাথুলী বাজার পর্যন্ত নিয়ে এলাম।

এর পর ঘটলো আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বাশাইল-করটিয়ার রাস্তা ছেড়ে সামান্য উত্তরে বাথুলী বাজারে পৌঁছা মাত্র করটিয়ার দিক থেকে প্রায় তিনশ' নিয়মিত হানাদার বাহিনী বাশাইলে আটকে পড়া খান সেনাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসে। আমরা আর পাঁচ মিনিট রাস্তার উপর অপেক্ষা করলে, হানাদারদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতাম।

পেছন দিকটা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় জেনে, নাঙ্গুলিয়া খালের পার পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ফিরে আসতে নির্দেশ দিই। নির্দেশ পেয়ে প্রথম অবস্থায় খুবই বেদনাহত হয়েছিল। তারা দু'তিন বার আমাকে অনুরোধও করেছিল যে, দক্ষিণে সরে যাওয়া হানাদারদের বেশীদূর যাওয়ার রাস্তা নেই। আর একটু চাপ সৃষ্টি করতে পারলে সবাই অস্ত্রসহ ধরা পড়বে। অগ্রবর্তী দলের কথায় কর্ণপাত করিনি। না করে আমাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিই। বাধ্য হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগ্রবর্তী দল আমাকে অনুসরণ করে বাথুলী বাজার পর্যন্ত আসে। এখানে এসে পেছন দিক থেকে দীর্ঘ সারিতে প্রায় ৩শ' নিয়মিত খানসেনাকে আসতে দেখে মুক্তিযোদ্ধারা বিস্মিত হয়ে যায়। আমিও যুগপৎ বিস্মিত হই এবং এদের আগমনের হাত থেকে সময়মতো সরে আসতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। হানাদার দলটি অবশ্য বেশীক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করেনি। নাঙ্গুলিয়া খাল পারে পড়ে থাকা ৮টি খানসেনার লাশসহ বাইশ-তেইশটি মৃতদেহ ও প্রায় চল্লিশ জন আহতকে নিয়ে আবার করটিয়ায় ফিরে যায়।

বাথুলীতে যখন যুদ্ধ চলছিল, ফতেপুরে তখন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আমি ফতেপুর থেকে ফাজলহাটি, দেলদুয়ার হয়ে ১৯শে নভেম্বর রাতে ঢাকা-টাংগাইল পাকা সড়কে আঘাত হানতে যাই। অসুস্থতার কারণে কর্নেল ফজলুর রহমান ফতেপুরেই থেকে যান। তার সাথে তখন পনের-ষোল জন মুক্তিযোদ্ধা। এর মধ্যে আবার ক'জন অসুস্থ। ২০শে নভেম্বর দুপুরের মধ্যে তার কাছে প্রায় দু'শ রাজাকার পাঠানো হয়। সন্ধ্যার দিকে রাজাকারের সংখ্যা ছয়শ'তে গিয়ে ঠেকে।

কর্নেল ফজলুর অভিনব বিচার

কর্নেল এমনিতেই অসুস্থ ও দুর্বল। সাথে মাত্র পনের-ষোল বন্দী রাজাকারের সংখ্যা যখন শ'চারেকে দাঁড়ায়, তখন তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সংখ্যা যখন ছ'শতে দাঁড়ালো, তখন তিনি শুধুমাত্র উদ্বিগ্ন নন, রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড উদ্বেগ আর উত্তেজনার মধ্যে তার ২০শে নভেম্বর রাত কাটে। সত্যিকার অর্থেই উদ্বিগ্ন হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ ছিল। তারা মাত্র পনের-ষোল জন। রাজাকারদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাও ছিল খুবই কম। সব মিলিয়ে পঞ্চাশের বেশী হবেনা। আর এরা অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় চতুর, সাহসী ও চৌকশ, এমন ভরসা করা যায় না। এমনি অবস্থায় ২১শে নভেম্বর সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই আরও দু'শ জন রাজাকার নিয়ে কুড়ি জন মুক্তিযোদ্ধা ফতেপুরে কর্নেলের কাছে হাজির হল। এই সময় তার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল, শরীরের তাপমাত্রাও কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেল। জ্বরের তীব্রতায় তিনি কোমর সোজা করে, মাথা ঠিক রেখে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বন্দী আটশো রাজাকার মোটামুটিভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা মাত্র সত্তর-আশি জন। এ সময় কর্নেল, হানাদারদের ফতেপুরের দিকে এগিয়ে আসার সংবাদও বার বার পাচ্ছিলেন। এতে তার উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। হানাদাররা এসে পড়লে, তিনি তা মোকাবিলা করতে পারবেন না। রাজাকাররাও যদি তাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে বিদ্রোহী হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের সামাল দেয়া বা দমন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। তাই শুধু উদ্বেগ নয়, ঘাবরেও যান। অসুস্থতা ও জ্বরের ঘোর বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে নাড়ীর স্পন্দনও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন বা ঘাবড়ে গিয়েছেন, এটা কোন অবস্থাতেই বুঝতে দেয়া যাবে না। এটা প্রকাশ পেলে শত্রু তো উৎসাহিত হবেই, বিপদও বহুগুণ বেড়ে যাবে। শুধু বেড়ে যাবেনা, আটশ' ট্রেনিংপ্রাপ্ত রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, ইচ্ছামত প্রতিশোধ নেবে।

বাইরে শান্ত থেকো যথাসম্ভব স্বাভাবিকতা বজায় রাখা ছাড়া কর্নেলের আর কোন বিকল্প পথ নেই। বেলা স্যাড়ে বারো কি একটা পর্যন্ত অনেক কষ্টে কোনক্রমে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে চললেন। কিন্তু এরপর তিনি বাহ্যিক কৃত্রিম স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেন, তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। হাজারো আশংকা নিয়ে কর্নেল ফজলু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তার পা চলছে না! চোখ লাল! মাথা ঘুরছে! শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। তবুও উপায় নেই, কোন বিকল্প নেই। বিপদ হাঁটুর নীচে নয়, হাঁটুর উপর উঠে পড়েছে। তিনি পোষাক পরে নিলেন। বহুদিনের ব্যবহৃত বেতখানা ভালভাবে দেখে নিয়ে, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে, কোন রকমে রাজাকারদের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। ফতেপুর বাজারের

পাশের মাঠে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো আটশ' রাজাকার বিচার ও শাস্তির অপেক্ষায়। কয়েকজনকে তিনি ভালভাবে নিরক্ষণ করলেন। তার চোখের চাহনি, হাবভাব ও নিরক্ষণের কায়দা-কৌশলই ছিল রাজাকারদের জন্য ভীতি ও আতংকের ব্যাপার। তালিকা দেখে দেখে যাকেই তার সন্দেহজনক ও মারাত্মক বলে মনে হচ্ছে, তাকেই লাইন থেকে বের করে আনছেন, সাথে সাথে ইশারায় নির্দেশ দিচ্ছেন, 'গুলি' পাশে সদা প্রস্তুত দুই-তিন জন মুক্তিযোদ্ধা নেকড়ের ক্ষিপ্রতার সাথে সাথে গুলি করে আদেশ পালন করেছে।

এমনিভাবে ফতেপুর মাঠে আট জন রাজাকারকে গুলি করে শাস্তি দেবার পর কর্নেল ফজলু চিৎকার করে বলে উঠলেন, তরা শালারা বাংলাদেশ চাস? বাকী রাজাকাররা আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সম্মিলিত কণ্ঠে জবাব দিল,

'হ্যাঁ, আমরা বাংলাদেশ চাই।'

তাহলে বল্ বেটারা—জয় বাংলা, জয় মুক্তিবাহিনী, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় কাদের সিদ্দিকী। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার এমন দুর্লভ ও অপ্রত্যাশিত সুযোগ! রাজাকারদের সেকি ভীষণ গগনবিদারী শ্লোগান! দেহের সমস্ত শক্তি, সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তারা শ্লোগানের পর শ্লোগান দিয়ে চলেছে। শ্লোগান দিতেই যেন তাদের জন্ম হয়েছে। শ্লোগান ছাড়া তারা যেন আর কিছু জানেনা, বুঝেনা! জয় মুক্তিবাহিনী ও জয় কাদের সিদ্দিকী শ্লোগান দু'টির দিকেই তাদের ঝোঁক সবচেয়ে বেশী। এক সময় কর্নেল হাত তুলে থামতে বলেন। এ যেন আধুনিক বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র। সুইচ টিপলে চলে, আবার টিপলেই বন্ধ হয়। হাত তোলার সাথে সাথে শ্লোগান বন্ধ, সব নীরব। যেন কবরের নীরবতা, সুঁই পড়লেও শব্দ শোনা যায়।

কর্নেল ফজলু দু'মিনিট তিন আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করলেন। মুক্তিবাহিনীর সহানুভবতার কথা উল্লেখ করে সকল রাজাকারদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোদের মুক্তি দিলাম।' কর্নেলের মুখ থেকে 'মুক্তি' কথাটি বের হতে না হতেই আবার ফতেপুর শ্লোগানে শ্লোগানে থর থর করে কেঁপে উঠলো। 'দশ মিনিটের মধ্যে তাদের স্থান ত্যাগ করতে হবে এবং দশজনের বেশী একত্র হতে পারবেনা'—এমন কঠোর নির্দেশ দিয়ে কর্নেল ফজলু তার ঘরে গিয়ে প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে পড়েন। ক'জন রাজাকারের সহায়তায় আটটি লাশ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন করা হলো।

কর্নেল ফজলু এমনটি করলেন কেন? তার উদ্বেগের কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। আলাপ আলোচনা করে আমি পরে জানতে পেরেছি, কর্নেল ফজলুর রহমান রাজাকারদের বিনা দণ্ডে মুক্তি দিতে চাননি। এতটুকু মাত্র বলা যেতে পারে, জ্বর ও উত্তেজনার কারণেই রাজাকারদের দোষত্রুটি সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে বিচার বিবেচনা করা হয়নি। তবে এটা ঠিক, ৭১-এর বাংলাদেশে যারা রাজাকার হয়েছিল, তারা দু'একটি হত্যা, লুটতরাজ, নারীধর্ষন ও অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িত নয়, এমন ধোয়া তুলসীপাতা রাজাকার একটিও খুঁজে পাওয়া যেতনা। তিনি তাই সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ঐ দিনের দণ্ড নিরূপণ করেছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, হানাদাররা এসে রাজাকারদের যদি উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারতো, তাহলে

যেমন হানাদারদের মনোবল বেড়ে যেত, ঠিক তেমনি মুক্তিবাহিনীর মনোবল স্বাভাবিক কারণেই কমতে যেতে বাধ্য। অন্যদিকে রাজাকাররাও যদি বেঁকে বসতো, তাহলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলাতে পারতো কিনা, এ ব্যাপারেও তার গুরুতর সংশয় ও সন্দেহ ছিল। তাই ঐভাবে নিজের উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বিচার করে তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন—

এক। এরপর যারা রাজাকার হবে, তাদের শাস্তি পেতে হবে,

দুই। হানাদার বাহিনীর বন্দী রাজাকারদের উদ্ধার করে নেয়ায় অথবা রাজাকারদের বেঁকে বসার আর কোন সম্ভাবনা রইল না,

তিন। মুক্তিবাহিনী রাজাকারদের হাতে পেয়েও ক্ষমা করে দিয়ে পরম মহানুভবতার পরিচয় দিল।

নিহত ও আহতদের নিয়ে হানাদার দল টাংগাইলের দিকে চলে গেলে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ময়থা গ্রামে গিয়ে দ্বিতীয়বার বাশাইল থানায় দূত পাঠালাম। দূত ফিরে এসে বাশাইল থানা দখলের নিশ্চিত খবর দিল। সন্ধ্যায় নৌকাযোগে নাঙ্গুলিয়া খালের পাড়ে নেমে পায়ে হেঁটে বাশাইল থানায় গেলাম। বাশাইল

বাশাইল থানার পতন

থানা তখন মেজর লোকমান হোসেন ও মেজর গোলাম মোস্তাফার দখলে। বিজয়োল্লাসে তারা আমাকে স্বাগত জানালো। কিন্তু তাদের আনন্দ-উল্লাস বেশীক্ষণ স্থায়ী হলোনা। বাশাইল থানা দখলের সঠিক সংবাদ প্রেরণে ব্যর্থতা ও লক্ষ্যভ্রষ্ট গোলা নিক্ষেপের কারণে আমার মৃদু তিরস্কারে তারা কিছুটা অস্বস্তি ও লজ্জায় পড়ে। মেজর লোকমানের পাঠানো সংবাদ পেয়ে করটিয়ার দিক থেকে বাশাইলে আসার পথে বাথুলীতে আমাদের যে মারাত্মক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে, তার জন্য যারপর নাই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। মেজর লোকমান করটিয়ায় আমার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিল যে বাশাইল সহ সমস্ত এলাকাটাই মুক্ত। অথচ তার খবর মোটেই সঠিক ছিল না। তিরস্কারের দ্বিতীয় কারণ—বাশাইল থানা দখলের যুদ্ধে প্রায় দু'শ ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যার মাত্র দশ-পনেরটা গোলা থানার আশেপাশে পড়ে। এর মধ্যে আবার মাত্র দুটি গোলা বাশাইল থানা উন্নয়ন ভবনের হানাদার ঘাঁটির কেন্দ্রবিন্দুতে পড়েছিল। বাকী গোলা সব থানা থেকে এক-দেড় মাইল দূরে গ্রামের আশেপাশে গিয়ে পড়েছিল। থানায় গোলা না পড়ার কারণে যত না ক্ষুব্ধ, তার চাইতে বেশী ক্ষুব্ধ হই হানাদার ঘাঁটির বাইরে লোকালয়ের আশেপাশে যত্রতত্র গোলা পড়ে বিস্ফোরিত হওয়ায় আমি কমান্ডারদ্বয়কে কঠোরভাবে বললাম, 'তোমাদের কাউকেই, নিরস্ত্র, নিরীহ জনসাধারণের উপর মর্টারের গোলা নিক্ষেপে অধিকার দেয়া হয়নি।' রক্ষার্থে তাদের নিয়ন্ত্রণহীন গোলা নিক্ষেপে আশেপাশের গ্রামের কোন লোক বা পশুপক্ষী হতাহত হয়নি। হতাহত হলে কমান্ডার দু'জনকে সত্যি খুব অসুবিধায় পড়তে হতো। বাশাইল থানা দখলের যুদ্ধে দশ-পনের জন মুক্তিযোদ্ধা দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় দেয়। হানাদারদের বাংকারের একদম কাছে গিয়ে বারবার হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে থানা উন্নয়ন ভবনের পূর্ব-দক্ষিণ দিকের বাংকারগুলো মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে আসে। থানা উন্নয়ন ভবনের সামনে একটি

বাংকারের দখল নিতে গিয়ে ফাউলজানির তোফাজ্জল শহীদ হয়। অন্যদিকে থানা ও উন্নয়ন ভবনের সামনে রাস্তার পাশে আর একটি বাংকার দখল নেয়ার সময় শত্রুর গুলিতে কাশিলের সোহরাব মিয়ার ছেলে দুলাল মিঞাও টাংগাইল জুগি গ্রামের মোহাম্মদ সোহরাব বাশাইল থানায় বিজয়ের পতাকা উড্ডীন দেখে যেতে না পারলেও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে থানা দখলের পথ সুগম করে সহযোদ্ধাদের কপালে জয়টিকা এঁকে শাহাদাৎ বরণ করে।

কমান্ডার মোস্তাফাকে তার দলসহ ফতেপুরে গিয়ে কর্নেল ফজলুর রহমানকে সাহায্য করতে নির্দেশ দিয়ে একমাস কয়েকদিন পর ২২শে নভেম্বর আবার হেড-কোয়ার্টারে পেঁছিলাম। ইতিমধ্যে বগারচালা থেকে ধুমখালী ছালাম ফকিরের বাড়ীতে তৃতীয় বার হেড-কোয়ার্টার বদল করা হয়েছে। আনোয়ার উল আলম শহীদ হেড-কোয়ার্টারে ছিলেন না। তার জায়গায় সব বিভাগের সমন্বয় সাধনের কাজ হামিদুল হক দক্ষতা ও অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল বাসেত সিদ্দিকী, শওকত মোমেন শাজাহান, অধ্যাপক মাহবুব সাদিক, অধ্যাপক কাজী আতোয়ার, আলী আসগর খান দাউদ, সোহরাব আলী খান আরজু, মোহাম্মদ আলী হোসেন, টাংগাইল বাস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী হাবিবুর রহমান, হবি মিঞা, আওয়াল সিদ্দিকী ও বিখ্যাত আর. ও. সাহেব দারুণভাবে হামিদুল হককে সহযোগিতা করেছিলেন। সখিপুর বাজারের মাইল দুই পুবে ছালাম ফকিরের ধুমখালির বাড়ীতে মুক্তি বাহিনীর সদর দপ্তরে পেঁছে সেখানকার কাজকর্ম দেখে অবাক ও বিস্মিত হলাম। পাহাড়ের মানুষদের কর্মতৎপরতায় আমি আগেও বহুবার বিস্মিত হয়েছি। এখানকার মানুষের অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা আছে। তারা নির্ভরশীল ও আস্থাশীল কাউকে পেলে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত অসাধ্য সাধন করতে যে পারেন, তা বারবার দেখেছি এবং প্রমাণ পেয়েছি।

হেড-কোয়ার্টারে

ছালাম ফকিরের বাড়ী ঘিরে দিনরাত কর্ম ব্যস্ততার সাজ সাজ রব। চতুর্দিক থেকে লোকজন আসছে আর যাচ্ছে। এদের কেউ মুক্তিযোদ্ধা, কেউ বা স্বেচ্ছাসেবক। কেউ খবর বয়ে আনছে, কেউ খবর নিয়ে যাচ্ছে। এখানেই তাদের কৃতিত্বের শেষ নয়। বেসামরিক দপ্তরের কাজকর্মের পুরো বিভাগটাই সখিপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বেসামরিক দপ্তরের অধিকাংশ কর্মকর্তারাই সখিপুর কমিউনিটি সেণ্টারে নিয়মিত সারাদিনের জন্যে বসেন। দিনের বেলায় হামিদুল হকের মূল দপ্তর সখিপুরে, রাতে ছালাম ফকিরের বাড়ীতে। প্রচার দপ্তরও ছালাম ফকিরের বাড়ীতে বেতার বিভাগ ঐ বাড়ী থেকে চার-পাঁচ মাইল পশ্চিমে বগার চালাতেই রয়েছে। সদর দপ্তর ও বেতার বিভাগের দূরত্ব চার-পাঁচ মাইল হলেও, টেলিফোন ও দূতের মাধ্যমে এই দুই দপ্তরের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে। এমনি একটি সময়ে আমি সদর দপ্তরে এসেছি। আমার যেন আর কিছু করার নেই। সব কিছু নিয়ম-মাফিক, নিখুঁত, ত্রুটিহীন ও স্বচ্ছন্দ-স্বাভাবিক গতিতে চলছে।

আমি হেড-কোয়ার্টারে এসেছি। স্বাভাবিক কারণেই হেড-কোয়ার্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মতৎপরতা কিছুটা বেড়ে গেছে। হেড-কোয়ার্টারের সার্বিক

দায়িত্বে যেমন হামিদুল হক ছিলেন, তেমনি নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন যুদ্ধে আহত ক্যাপ্টেন খোরশেদ আলম। খোরশেদ আলম মাস খানেক হল অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। যদিও তখনও তার ক্ষত পুরো শুকোয়নি। তা সত্ত্বেও সে অসামান্য তৎপর, এক কথায় অতুলনীয়। হেড-কোয়ার্টারে আমার বহুদিনের ব্যবহৃত নির্দিষ্ট চেয়ার-টেবিলে বসে ২৩শে নভেম্বর সারাদিন বকেয়া কাজকর্ম সারলাম। তেমন কোন জটিল কাজ ছিল না। বিভাগীয় সব নথিপত্রের উপর শুধু চোখ বুলানো আর কিছু কিছু পরামর্শ দেয়া। ধলাপাড়া হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও গণপরিষদ সদস্য আবদুল বাসেত সিদ্দিকী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার বিভাগের কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তিনি এমন সুস্থ ও সুন্দর জনসংযোগের ব্যবস্থা করেছেন, যা অকল্পনীয়। অন্যান্য বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্তরাও সমানতালে যোগ্যতার ছাপ রেখে যাচ্ছে।

হেড-কোয়ার্টারে দুটি নূতন বিভাগের কাজ দেখলাম। এক 'সাংস্কৃতিক' অন্যটি 'স্থির চিত্র'। আলী হোসেন, কবিয়াল শাহানশাহ্‌, ছালাম ফকীর ও ছামান ফকীরকে কেন্দ্র করে একটি সাংস্কৃতিক তৎপরতা গোড়া থেকেই চলছিল, কিন্তু তা তেমন সুসংহতরূপে ছিল না। এবার হেড-কোয়ার্টারে এসে দেখলাম তা দুটি সুসংহত বিভাগে রূপ নিয়েছে। যদিও সাংস্কৃতিক বিভাগ ডিসেম্বরের আগে তমন প্রসার লাভ করতে পারেনি। কিন্তু স্থির চিত্র' বিভাগটি যুদ্ধের চরম মুহূর্তে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়।

এই বিভাগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, টাংগাইল থানা পাড়ার ফজলুর রহমান কুতুব, এছাড়া ছবি তোলে এবং ছবি তোলার সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করে সাহায্য করছিল বাবুল হক, কোণাখীর বাবলু, ঢাকার সেলিম, লাউহাটীর ফজলু, পাঠানপাড়ার ব্যবসায়ী মোমতাজ খান, ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী ও টাংগাইলের আমজাদ মিয়ার ছেলে রতন। আমাদের অনেকগুলো দলে ক্যামেরা ছিল কিন্তু শুধু ক্যামেরা হলেই তো ছবি হয় না? আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। চরম অনিশ্চিত অবস্থায় ফটোর ব্যাপারে সকল দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুতুব তার কাঁধে তুলে নেয়। সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে নিয়মিত কাঁচা ফিল্ম সরবরাহ এবং ছবি তোলা হলে হানাদারদের নাকের ডগা দিয়ে টাংগাইল শহরে নিয়ে গিয়ে ছবি করে আনা শুরু করে। টাংগাইল আদালত রোডে কুতুবদের একটি বহু পুরানো পাঁউরুটির দোকান আছে। সেখানে সে মাঝে মাঝে বসতো। একদিন কয়েকটি পাঁউরুটির মধ্যে আমাদের তোলা ১২টি ফিল্ম নিয়ে হঠাৎ টাংগাইলের বিখ্যাত ফটোগ্রাফার জি. সাহার থানাপাড়ার বাড়ীতে কুতুব গিয়ে হাজির। জি. সাহার ছেলে মনোজ সাহার সাথে কুতুবের আগে থেকেই ভাবছিল। সে মনোজ সাহার কাছে তার উদ্দেশ্য খুলে বললো। ফজলুর রহমান কুতুবের কথা শুনে প্রথম অবস্থায় মনোজ সাহা ও তার দাদার কাঁপন ধরে যায়। লোকটা বলে কি? দেখতে সাদাসিদা হলেও তলে তলে এসব কি করছে? করুণ কণ্ঠে মনোজ সাহা বললো,

—কুতুব ভাই, এমনিতেই জাত-ধর্ম সব গেছে। মুসলমান হয়ে কোনরকমে জীবনটা বাঁচিয়েছে। আপনি কি শেষ পর্যন্ত পৈতৃক জীবনটাও শেষ করবেন?

খালেক ত সবসময় পেছনে লেগে আছে।

—না মনোজ, যত অসুবিধাই হউক একাজ তোমাকে করতেই হবে। স্যারও আশা করেন তোমরা এ কাজ করবে। এই···এই যে স্যার তোমাকে চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিটা নিয়ে মনোজ সাহা মনযোগের সাথে পড়ে বললো,

—কুতুব ভাই, ঠিক আছে, আমরা যেভাবে পারি কাজ করে দেব। কিন্তু আর কেউ এলে চলবে না। আপনি যে দিন ফিল্ম দেবেন সেই দিনই আবার ফিল্ম এবং ছবি নিয়ে যেতে হবে।

কুতুব তাতেই রাজী, কারণ তার কাজ চাই। এরপর সে নিয়মিত ফিল্ম দেয়া-নেয়া শুরু করে দেয়। মনোজ সাহারা প্রথম প্রথম সামান্য ভয় এবং দ্বিধাবোধ করলেও পরে দারুণ সাহসের পরিচয় দিয়েছে। যদিও তাড়াহুড়ার জন্য সব কাজ সব সময় নিয়ম মত করতে পারেনি, যার কারণে ছবির স্থায়িত্ব কখনো কখনো কম হয়েছে। তবে কাজ চলে গেছে।

২৩শে নভেম্বরের সারাদিনের কাজ শেষ। পরদিন আবার পশ্চিমাঞ্চলের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চলে যাবো। বহুদিনের নিত্যসঙ্গী ও অনেক যুদ্ধে সফল মর্টার প্লাটুনকে হেড্‌-কোয়ার্টারে রেখে যাবো। মর্টার প্লাটুন কমান্ডার সামাদ গামাকে কাছে ডেকে

অদ্বিতীয় সামাদ গামা

বললাম, সামাদ অনেকদিন তুমি আমার সাথে থাকলে, তোমার কাজে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট। তোমার ওপর আমার আস্থা জন্মেছে, তাই হেড্‌-কোয়ার্টারে রেখে যাচ্ছি। আশা করি, তুমি এখান থেকে তোমার মর্টার প্লাটুন নিয়ে নানা প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত সাহায্য করতে পারবে। আমার সংগে তোমার আবার দেখা হতে হয়ত সময় লাগবে। তাই আমার কাছে কিছু চাইবার থাকলে নির্দ্বিধায় চাইতে পারো। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই।

—স্যার, পুরস্কার কি! আমার কিছু চাইবার নাই। তয় আপনি যহন চইল্যা যাইতাছেন, আপনার সামনে আমার একবার আপিত্তি মিটাইয়া খাইবার আশ আছিল। আমার আর কিছু চাইবার নাই।

—তুমি শুধু একবার আপিত্তি মিটায়ে খেতে চাও, আর কিছু চাইবার নেই?

—না স্যার, যদি অসুবিধা থাহে তাইলে পরে ব্যবস্থা কইরেন।

—না, কোন অসুবিধা নেই। কাল যাওয়ার আগে তুমি আমার সামনে পেটভরে মন যত চাইবে, ততই খেতে পাবে। এখন যাও। তবে তোমার মর্টার নিয়ে সর্ব আগের মত সফলভাবে কাজ চালাবে। এটাই আমি আশা করবো।

—আপনি চইল্যা গেলে স্যার, আমি কার অর্ডার মত কাজ করুম। আমি যে স্যার, যার তার কথায় দৌড়াইতে পারিনা।

সামাদের সাদামাটা খোলামেলা কথায় একটু হোঁচট খেলাম। সত্যই তো আমার ভুল হয়েছে। তুমি শহীদ হামিদুল হক ও আর. ও. সাহেবের নির্দেশ ম কাজ করবে। তাঁদের নির্দেশই আমার নির্দেশ বলে মেনে নিবে।

—তাইলে স্যার, এই তিন স্যারের নাম একটা কাগজে লিইখ্যা দেন।

আমি একটা কাগজে এক আনোয়ারুল আলম শহীদ, দুই হামিদুল হ

তিন খোরশেদ আলম আর. ও. লিখে স্বাক্ষর করে দিলাম।

পরদিন সকাল। সাড়ে আটটায় সামাদকে ডেকে আনা হলো। কমাণ্ডার খোরশেদ আলম তার সামনে তিন-চারটা খাসী এনে হাজির করলো। খাসীগুলো সামাদকে দেখিয়ে বললাম, 'এর মধ্যে কোনটা তোমার পছন্দ? কোনটাতে তোমার প্রয়োজন মিটতে পারে? একটাতে না হলে দুইটাতেও কোন আপত্তি নেই। তুমি বল। শুধু তোমার জন্যেই আলাদা করে রান্না করা হবে।' সামাদ সব কটি খাসী মাটি থেকে উঁচু করে শূন্যে তুলে নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর আনন্দ ও সন্তুষ্ট চিত্তে মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটিয়ে ঈষৎ মাথাটা নাড়িয়ে একটি খাসী দেখিয়ে বললো, 'স্যার, এটাতে হবে।' সামাদের পছন্দ করা খাসী জবাই করা হল। মাংস বানানোর পর ওজন করে দেখা গেল, সাড়ে উনিশ সের হয়েছে। পুরো মাংস তার জন্য আলাদা করে রান্না করা হল। ডাল, তরকারী ও সের তিনেক চালের ভাতও, তার জন্য আলাদা করে পাকানো হলো। সব রান্না যখন শেষ, পুরো খাবার সামনে নিয়ে বেলা বারোটায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে পরম তৃপ্তি নিয়ে সামাদ গামা খেতে বসলো। আমি, হামিদুল হক, গণ-পরিষদ সদস্য বাসেদ সিদ্দিকী, আর. ও. সাহেব, শওকত মোমেন শাজাহান ও অধ্যাপক মাহবুব সাদিক, কাজী আতোয়ার সহ দপ্তরের প্রায় সবাই খাওয়ার অদ্ভুত পূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য সোৎসাহে সামাদ গামাকে ঘিরে বসলাম। সামাদ গামা খেতে শুরু করেছে, তার হাত দ্রুত তালে উঠানামা করছে। এক নাগাড়ে দ্রুত তালে পাঁচ-ছ মিনিট গোগ্রাসে খেয়ে আধ-এক মিনিট বিশ্রাম নিচ্ছে। মানে দু'একটা কথাবার্তা বলে নিচ্ছে। তারপর আবার পূর্বের মত হাত চলছে। হাত চলাতো নয় এ যেন সেলাই কলের সুই উঠানামা। এমনি ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সামাদ গামা তার জন্য রান্না করা সাড়ে উনিশ সের মাংসের প্রায় আঠার সের সাথে দেড় সের চাউলের ভাত, সের তিনেক তরকারী, এক গামলা ডাল খেয়ে উঠে পড়লো। খাবার শেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঢক ঢক করে দুই জগ পানি পান করে নিল। তারপর সারা মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললো, 'স্যার, আমি আপাত্তি মিটাইয়া খাইছি। আমারে এহন দশ মিনিট বিশ্রাম দিতে অইবো। সামাদ গামাকে দশ মিনিট বিশ্রাম দেয়া হলো। না! সে এত খেয়েও কোন অস্বস্তিবোধ করেনি, তার সেই মুহূর্তের বিশ্রাম মানে বাড়ীর বাইরের উঠানে একটু পায়চারী। সত্যিই তার কোন অস্বস্তিভাব লক্ষ্য করা যায়নি। অন্যান্য সহযোগীদের সাথে খাবার খেয়ে ২৪শে নভেম্বর দু'টায় পশ্চিমাঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। হেড-কোয়ার্টারের অন্যান্যদের সাথে সামাদ গামাও আমাকে তিন-চার মাইল পথ এগিয়ে দিল।

সামাদ গামার আর একটি ঘটনা উল্লেখ করে মুক্তিবাহিনীর এই গামা পর্বের ইতি টানবো। আমি চলে যাওয়ায় চার দিন পর সাময়িকভাবে মুক্তিবাহিনীর পাথরঘাটা ঘাঁটির পতন ঘটে। সেখানকার কমাণ্ডার মতি ও আজাদ কামাল হেড-কোয়ার্টারের কাছে মর্টার সাহায্য চেয়ে দূত পাঠায়। দূত এসে হামিদুল হককে পাথরঘাটার নাজুক পরিস্থিতি জানিয়ে মর্টার সাহায্য চায়। হামিদুল হক নিজে সামাদ গামার শিবিরে গিয়ে পাথরঘাটার মর্টার প্লাটুন নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু সামাদ

গামা হামিদুল হকের নির্দেশে তেমন গা করেনা। হামিদুল হক পরিস্থিতিরগুরুত্ব

ভ্রান্তিবিলাস

বারবার সামাদ গামাকে বুঝাতে চাইলে সামাদ তাকে অনেকটা ঠাণ্ডা ও নির্বিকার কণ্ঠে বলে, 'আপনারে তো স্যার, স্যার, বইলাই মনে অয়। আমি যুদ্ধ দেইখ্যা ভয় পাইনা, আর যাইতে পারুম না, তাও কই না! স্যার, আমারে যার যার অর্ডার শুনতে কইছে, তাগো অর্ডার ছাড়া যাইতে পারমু না।' হামিদুল হক উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তিতে পড়েন। যথা সম্ভব স্বাভাবিকতা বজায় রেখে তিনি সামাদ গামাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাকে কার কার অর্ডার মানতে বলা হয়েছে?' তখন তার কুচে গোঁজা কাগজটি বের করে হামিদ সাহেবের হাতে দিয়ে বলে, 'দেহেন, আমি তো নেহাপড়া জানি না, এইডার মধ্যে নাম নেখা আছে। শহীদ স্যার বইল্যা একজন আছে, যারে আমি হেই অর্জুনার চরে দেইখ্যাছি। এ ছাড়া আর দুই স্যারের কি নাম তাও জানিনা, তাগোর আমি জীবনে দেহিও নাই।' হামিদ সাহেব কাগজ হাতে আরও অস্বস্তি ও সংকটে পড়েন। আমি যখন কাগজে নাম লিখে স্বাক্ষর করছিলাম, হামিদুল হক তখন পাশেই ছিলেন। তিনি জানেন, এই কাগজে কার কার নাম আছে। তার সন্দেহ হয় সামাদ গামা তাকে চিনে না। আর তিনি যে হামিদুল হক একথা বললে সামাদ গামা বিশ্বাস নাও করতে পারে। তখন আবার আর একটা নতুন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তবুও প্রয়োজনের তাগিদে আশংকিত সকল ঝুঁকি নিয়ে কাজ হলেও হতে পারে, এমন একটা দুর্বল আশায় হামিদ সাহেব বললেন, 'এই কাগজে তিন জনের নাম লিখা আছে। আনোয়ারুল আলম শহীদ, হামিদুল হক এবং খোরশেদ আলম আর. ও.। আমার নামই হামিদুল হক। তোমাকে আমি অর্ডার দিচ্ছি, তুমি এখনই পাথরঘাটায় যাও। সামাদ গামার কল্পনায় পূর্ব হতেই একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল, বড় স্যার যার যার অর্ডার শুনতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁরা বড় স্যার থেকে শারীরিক গড়নে, লম্বায় ও স্বাস্থ্যবান না হতে পারেন তবে নেহায়েত ছোট হবেন না। দেখতে ছোটখাটো ঘন শ্যামল হামিদুল হককে প্রথম থেকেই স্যার ভাবতে পারলেও, হেড্-কোয়ার্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা কস্মিন কালেও ভাবতে পারেনি। তাই 'আমার নামই হামিদুল হক' কথাটি শোনার সাথে সাথে তার ধারণা বাস্তবের কড়কড়ে শুকনো ডাঙ্গায় হোঁচট খেল। তার ধারণার সাথে এত বিস্তর ফারাকটাকে সে সহজ বুদ্ধি দিয়ে কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না। তাই সহজাত সারল্য নিয়েই আচমকা আকাশ থেকে পড়ার মত চমকে গিয়ে তার মনের তীব্র বিপরীত প্রতিক্রিয়া গোপন না করে আন্তরিকভাবে প্রতিবাদ করলো, 'এ্যাঁ! কন কি? আপনি হামিদুল হক স্যার অইবেন ক্যামনে? তিনি এহন হেড্-কোয়ার্টারের সব চাইয়া বড় স্যার! স্যার দেহেন, আমারে বিপদে ফেলাইয়েন না। সত্যিই আপনার নাম কি?' হামিদুল হক এবার একেবারে বোকা বনে কিছুটা রেগে তার দপ্তরে চলে যান। একেবারে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে না দিয়ে অফিসে ফিরে চিঠি দিয়ে সামাদকে ডেকে পাঠান। হামিদুল হকের চিঠি এসেছে শুনে সামাদ উল্কাবেগে ছুটে সদর দপ্তরে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে তার আগের দেখা লোককে বসে থাকতে দেখে ভূত দেখার মত আঁতকে ওঠে! হামিদুল হককেই জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, হামিদুল হক

স্যার আমারে ডাইক্যা পাঠাইছেন। তিনি কোথায় ?' বুঝুন ব্যাপারটা। মর্টার সাহায্য যত দ্রুত পাঠানোর চেষ্টা চলছে, ততই জল ঘোলা হচ্ছে। উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির গিঁট যতই খোলার চেষ্টা হচ্ছে, ততই গিঁটের ফাঁস আটকে যাচ্ছে। হামিদ হক বনাম সামাদের ভুল বুঝাবুঝি উত্তরোত্তর আরো গভীর হয়ে উঠছে। একের পর এক মানসিকভাবে নাজেহাল হয়ে কঠিন অবস্থায় সামাল দিতে গিয়ে হামিদ সাহেব তখন একটু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কিছুটা উষ্মার সাথে বলেন, 'ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। প্রতিটি মিনিট এখন মূল্যবান। তোমার এখনই পাথরঘাটা যাওয়া উচিত। আমি তো বলেছি, আমিই হামিদুল হক,' বলিষ্ঠ সামাদ গামা যে আস্ত একটা খাসী খেয়ে ফেলতে পারে, যে সাড়ে চার-পাঁচ মন বোঝা অনায়াসে কয়েক মাইল কাঁধে নিয়ে যেতে পারে, মাঝারী গোছের সজীব গাছ, শুধুমাত্র বাহুতে ধরে সিনার বলে ভেঙ্গে উপড়ে ফেলতে পারে, সেই 'ছামাদ গামা' এই নাজুক অবস্থায় পড়ে একেবারে অসহায়ের মত কাঁদো কাঁদো হয়ে চেয়ারে বসে থাকা হামিদুল হককে অতি বিনয়ের সাথে বললো, 'স্যার, আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই, কেন আমারে এই রহম বিপদে ফেলাইছেন ? আপনি হামিদুল হক স্যার, তা আমি বুঝমু কি কইর‍্যা ?' অবস্থা যখন, 'কেহ কাহারে বুঝিতে নারে, দোহার ভাবা দুই মত' এই সময়ে কমাণ্ডার খোরশেদ আলম কোন কাজে অফিস ঘরে প্রবেশ করে, ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং এই সমূহ বিপদ থেকে হামিদুল হক ও সামাদ গামাকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়। কমাণ্ডার খোরশেদ আলম সামাদ গামার পূর্ব পরিচিত। তাই সে হামিদুল হককে ইঙ্গিতে দেখিয়ে সামাদকে বলে, 'ইনার নামই হামিদুল হক'। সামাদ গামা কিছুটা আশ্বস্ত হওয়ার পরেও, হামিদ সাহেবের পাশে বসে-থাকা গণ-পরিষদ সদস্য বাসেত সিদ্দিকীকে বলে, 'স্যার, বড় স্যার আপনারে খুব সম্মান করেন দেখলাম। আপনি বয়সী মানুষ, আপনিই বলেন, ইনিই কি হামিদুল হক স্যার ?' রসিক বাসেত সিদ্দিকী মিটিমিটি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ভাই, ইনিই হামিদুল হক।' সামাদ গামা তার উত্তর পেয়ে গেছে। এতক্ষণ পরিস্থিতিজনিত কারণে যার সাথে কানামাছি ভোঁ-ভোঁ খেলছিল, তিনিই যে তাকে নির্দেশ দেবার স্যার এবং তিনিই স্বয়ং হামিদুল হক, এই কথাটা বিশ্বাস করার পর সামাদ গামার সে এক ভিন্ন চেহারা। হামিদুল হকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, বুক ফুলিয়ে দপ্তরের মাটি কাঁপিয়ে সামরিক অভিবাদন করে অত্যন্ত অনুগত সৈনিকের মত বলে, 'স্যার, কি করতে হবে বলুন।' হামিদুল হক ক্রমবর্ধমান জটিল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যারপর নাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন দোষ কারও নয়, পরস্পর পরস্পরের কাছে অপরিচিত হওয়ার কারণে এবং সামাদ গামা নিয়ম-শৃংখলার প্রতি বড় বেশী অনুগত বলেই এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সামাদ গামার আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব নেই, তখন তিনি মনে মনে হাসছিলেন। খুশী মনে পাশের দূত দু'জনকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি এদের সাথে পাথরঘাটা যাও। যেভাবেই হোক পাথরঘাটা পুনর্দখল করতে হবে।'

—'স্যার, এই কথাটাই আমারে লিইখ্যা দেন, আমি একদৌড়ে পাথরঘাটা চইল্যা যাই।' হামিদ সাহেব সাথে সাথে নির্দেশ নামা লিখে দেন। নির্দেশের কাগজ

হাতে নিয়ে সামাদ দৌড়ে দপ্তর থেকে বেরিয়ে নিজেরশিবির থেকে ঝড়ের বেগে মর্টার গোলা ও সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাথরঘাটার দিকে ছুটলো। মাত্র দেড় ঘণ্টায় দৌড়ে বারো মাইল পথ অতিক্রম করে কোন বিশ্রাম না নিয়ে পাথরঘাটায় হানাদারদের উপর নির্ভুল নিশানায় গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সে হানাদারদের বিতাড়িত করে পাথরঘাটা ঘাঁটি পুনর্দখলে যে অভূতপূর্ব সাহায্য করেছিল, তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাথরঘাটা পুনর্দখলে ঐদিন মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে আর একজন অপরিসীম সাহায্য করেছিলেন, তাঁর নাম সামান ফকির।

দালালদের অপকীর্তি

পাকিস্তান রক্ষায় কিছু লোক কোমর বেঁধে নেমেছে। আমি একে একে এদের প্রধান কয়েকজন পাণ্ডার কথা বলছি। লুটতরাজ, জোর করে মুসলমান বানানো, নারীধর্ষণ ও হত্যা ছাড়াও হানাদারদের সাথে সক্রিয়ভাবে অস্ত্র হাতে যে পাণ্ডারা আমাদের বিরুদ্ধে নেমেছে তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিরা হচ্ছে—

এক। আমিনুল ইসলাম তালুকদার (খোকা), টাংগাইলের প্রধান রাজাকার কমাণ্ডার। তিন থেকে চার হাজার রাজাকার তার নিয়ন্ত্রণাধীন।

দুই। ননী মিঞা (রাজাফের, কালিহাতী) কালিহাতী থানার মূল রাজাকার কমাণ্ডার। সে পাঁচশ' রাজাকারের নেতা।

তিন। নায়েব আলী ও আবদুল্লাহ (সাকরাইল) দু'চারশ' রাজাকারের মূল নেতা এবং অসংখ্য অপকর্মের হোতা।

চার। হারেস আলী (ডিড্-রাইটার, টাংগাইল) দুই কোম্পানী রাজাকারের অধিনায়ক।

পাঁচ। কাগমারী কলেজের পিওন সোহরাব আলী দুর্দান্ত রাজাকার কমাণ্ডার।

ছয়। নুরু খলিফা—দর্জির কাজ বাদ দিয়ে সেও এক কোম্পানী রাজাকার কমাণ্ডার হয়ে বসেছে।

সাত। ইসমাইল (দিঘুলিয়া) দেড়শ' রাজাকারের কমাণ্ডার।

আট। মিজানুর রহমান (সন্তোষ) এক কোম্পানী রাজাকার কমাণ্ডার।

নয়। অধ্যাপক আবদুল হালিম (নেজামে ইসলাম) টাংগাইল আলবদরের কমাণ্ডার।

দশ। জববার মোক্তার নাগরপুর থানার রাজাকারদের মূল কমাণ্ডার হয়ে বসেছে।

এগারো। আফজল চৌধুরী (টাংগাইল) এক কোম্পানী রাজাকার কমাণ্ডার।

বারো। সামাদ বি. এস. সি. আলি শামস্ কমাণ্ডার।

তের। জসিম চৌধুরী (ধলাপাড়া) ঘাটাইল থানা রাজাকার সহকারী কমাণ্ডার।

চৌদ্দ। কাজলার তায়েজ উদ্দিন (তাজু চেয়ারম্যান) ঘাটাইল থানার রাজাকার সহকারী কমাণ্ডার।

পনের। ডাঃ শওকত আলী ভুইঞা (ধলাপাড়া) ঘাটাইল থানার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সহ ঘাটাইল থানার রাজাকারদের মূল কমাণ্ডার।

ষোল। আবদুল খালেক (গোপালপুর) গোপালপুর থানার রাজাকারদের মূল নেতা। এছাড়াও আরও অসংখ্য রাজাকার ও দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকজনদের নিয়ে হানাদাররা একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে।

পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ যখন চরমে তখন জঙ্গী সরকার এক ঘোষণার মাধ্যমে সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের রায়কে নস্যাৎ করে স্বাধীনতা পক্ষীয় গণ-পরিষদ সদস্যদের সদস্য পদ অবৈধ পন্থায় বাতিল করে টাংগাইলে কয়েকজনকে গণ-পরিষদ সদস্য হিসাবে মনোনীত করে। হানাদারদের দয়ার এম. পি.-রা হলো—

এক। টিপু মীর্জা—টাংগাইল দক্ষিণ এলাকা।
দুই। হুমায়ুন হোসেন খান—নাগরপুর এলাকা।
তিন। আজিজুল হক বাকা মিঞা—মির্জাপুর এলাকা।
চার। এমদাদ আলী খান—বাসাইল এলাকা।
পাঁচ। জোয়াহের আলী খাঁ—কালিহাতী এলাকা।
ছয়। ডাঃ শওকত আলী ভুইঞা—ঘাটাইল এলাকা।
সাত। নুরুল ইসলাম (আউসনার চেয়ারম্যান)—মধুপুর এলাকা।
আট। আবদুল হাই—গোপালপুর এলাকা।
নয়। দালাল অধ্যাপক আবদুল খালেক—টাঙ্গাইল-উত্তর এলাকা।

আমরা হাতের কাছে নিশ্চিত বিজয়কে আরও দ্রুত এবং দৃঢ় মুষ্টিতে ছিনিয়ে আনতে হিমালয়ের মতো দৃঢ়তা ও প্রত্যয় নিয়ে ব্যাপক ও গভীর কর্মচাঞ্চল্যে ব্যাপৃত। হানাদাররাও তাদের সাধের 'তখ্তে তাউস্',—মুক্তিযুদ্ধের উত্তপ্ত লাভা স্রোত থেকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টায় হতাশ হয়ে দিনকে দিন কু-কর্মের গতি ক্লান্তিহীনভাবে বাড়িয়ে দিল। কুমীরে পোকার মত নিজেদের খোঁড়া গর্তে নিজেরাই মরার পথ প্রশস্ত করে চললো।

টাংগাইল হানাদার শিবিরেও তৎপরতার বিরাম নেই, দারুণ কর্মব্যস্ততা। ছুঁড়ে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়-গোড় ভাগাভাগি কামড়া-কামড়ির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে হানাদার সমর্থক কিছু প্রভুভক্ত রাজনৈতিক হ্যাংলা কুকুর। খান-সেনাদের চাইতে তাদের উৎসাহই বহুগুণ বেশী। টাংগাইল পাক-হানাদারদের প্রধান পাণ্ডা কাগমারী কলেজের কুখ্যাত অধ্যাপক আবদুল খালেক। হেঁকিম হাবিবুর রহমানকে শান্তি কমিটির সভাপতি ও ঘাতক আবদুল খালেককে সাধারণ সম্পাদক করে (১) বিজু মিঞা (২) এমদাদ আলী খান দারোগা (৩) আফাজ ফকির (৪) ঘাটাইল হাই স্কুলের হেডমাস্টার সামচুজ্জামান (৫) ধলাপাড়ার ডাঃ শওকত আলী ভুইঞা (৬) বল্লার আবদুর রাজ্জাক আনসারী (৭) মুহাম্মদ ইসহাক আলী (৮) মির্জাপুরের আবদুল ওয়াদুদ মওলানা (৯) গোপালপুরের আবদুল খালেক (১০) করটিয়ার জমিদার মেহেদী খান পন্নী খসরু (১১) জমিদার পুত্র সেলিম খান পন্নী (১২) টাংগাইলের আজিজুল হক বাকা মিঞা (১৩) আশরাফ মীর্জা (১৪) সাইদ দারোগা (১৫) পট্টু হাফেজ (১৬) গিনি মিঞা (১৭) করটিয়া কলেজের অধ্যাপক আ. ফ. ম. খলিলুর রহমান (১৮) বেতকার (টাংগাইল) সিরাজ (গুণ্ডা) (১৯) আকুরটাকুর পাড়ার বাবু খান (২০) সন্তোষের মতি ড্রাইভার (২১) প্যাড়াডাইস পাড়ার নজরুল (২২) টাংগাইলের তুলা মোক্তার (২৩) টাংগাইল থানা পাড়ার জলিল মিঞা (২৪) শিবনাথ হাই স্কুলের শিক্ষক টিপু মীর্জা (২৫) নাগরপুরের হুমায়ুন হোসেন খান (২৬) পোষনা কালিহাতীর কুদ্দুস খানের ছেলে জোয়াহের হোসেন খান (২৭) পূর্ব

আদালত পাড়ার খন্দকার মহিউদ্দিন, (২৮) বিশু মিঞা, আদি টাংগাইল, ঔষধের দোকানদার (২৯) টিপু ফকির (৩০) নান্নু (৩১) খন্দকার আবদুর রহিম (৩২) ক্যাপ্টেন ডাক্তার আবদুল বাসেত (গান্ধিনা) (৩৩) ভুঙ্গু মিঞা (মোগলপাড়া, ইনসিওরেন্সের দালাল) (৩৪) জালাল মিঞা, টি. ও. টাংগাইল আদালতপাড়া, মন্টুর বাবা (৩৫) গনি দারোগা (৩৬) রেজাউর রহমান (৩৭) প্রফেসার হিরা, টাংগাইল (৩৮) আফজাল চৌধুরী, টাংগাইল (৩৯) খালেক মিঞা, টাংগাইল (৪০) সামাদ বি. এস. সি. টাংগাইল (৪১) লেবু মিয়া রওশন টকিজ, টাংগাইল (৪২) ইসমাইল মিঞা, ঘড়ির দোকানদার, টাংগাইল আদালত রোড (৪৩) গফুর মোল্লা, ব্যবসায়ী, টাংগাইল (৪৪) আবদুর রশিদ ভাতকুরা (৪৫) অধ্যাপক হাকিম জামাতে ইসলামী (৪৬) ইউসুফ জাই, এডভোকেট, টাংগাইল কোর্ট (৪৭) আবদুল হাই ছালাফী, (নেজামী ইসলামী) হতেয়া, বাসাইল (৪৮) আবদুস সালাম রাজী, (নেজামী ইসলামী) (৪৯) আতোয়ার হাজী টাংগাইল (নিউ মার্কেটে দোকান) (৫০) তাজমিঞা, তাজপ্রেস, টাংগাইল (৫১) আকরাম খান, আকুর টাকুর পাড়া, ম্যানেজার ঢাকার জমিদার (৫২) বাল্টিন, করটিয়ার জমিদার পুত্র (৫৩) মোটা বুলবুল, থানা পাড়া, টাংগাইল (৫৪) নবাব আলী মাষ্টার, করটিয়া আরো অনেককে নিয়ে টাংগাইল জিলা শান্তি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটির কর্মকর্তারাই হলো শান্তির নামে অশান্তির মূল হোতা। রাজাকার বানানো, ঘরবাড়ী জ্বালানো, লুটতরাজ, নারী অপহরণ ও ধর্ষণ, হেন জঘন্য অপকর্ম নেই, যা শান্তি কমিটির সদস্যরা করেনি। আবদুল খালেক এদের সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। এ ব্যাপারে করটিয়ার জমিদার মেহেদী খান পন্নীর (খসরু) স্থান দ্বিতীয়। রাজাকার দলভারী করতে এদের দু'জনে পাল্লা-পালি। কে কার চাইতে বেশী রাজাকার বানাতে পারে।

(১) বিজু মিঞা (২) এমদাদ দারোগা (৩) ডাঃ শওকত আলী ভুইঞা (৪) আফাজ ফকির (৫) ইসহাক আলী (৬) গোপালপুরের আবদুল খালেক (৭) মির্জাপুরের ওয়াদুদ মাওলানা (৮) বল্লার আবদুর রাজ্জাক আনসারী (৯) টিপু মির্জা (১০) জোয়াহের হোসেন খাঁ (১১) টিপু ফকির (১২) টাংগাইলের নান্নু (১৩) ক্যাপ্টেন ডাঃ আবদুল বাসেত (১৪) মোগলপাড়ার ভুঙ্গু মিঞা (১৫) টাংগাইলের হিরা প্রফেসার (১৬) আফজল চৌধুরী (১৭) টাংগাইলের খালেক (১৮) গনি দারোগা (১৯) সামাদ বি. এস. সি. (২০) গফুর মোল্লা (২১) অধ্যাপক হাকিম (২২) এডভোকেট ইউসুফ জাই (২৩) আবদুল হাই সাফাফী (২৪) সালাম রাজী (২৫) আতোয়ার হাজী (২৬) আকরাম খাঁ (২৭) করটিয়ার জমিদার পুত্র বাল্টিনসহ আরো অনেকে হানাদারদের নীচুস্তরের চৌকিদার হলেও নিজেদের দুষ্কর্মে এরা একে অপরকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

টাংগাইলের লুটপাটের মূল নায়ক (১) বেতকার সিরাজ গুণ্ডা (২) সাবালিয়ার ঠান্ডু (৩) টাংগাইলের দেলোয়ার (৪) রোস্তম (৫) হেকিম হাবিবুর রহমানের শ্যালক কিসলু (৬) টাংগাইলের ছানা (৭) ঢাকার জমিদারের ম্যানেজার আকরাম খাঁ (৮) সাদেক রেজা (৯) বল্লার মালেক মাওলানা (১০) বল্লার কাশেম আনসারী ও (১১) নান্নু আনসারী, এরা আবদুর রাজ্জাকের ভাই (১২)

কাগমারী কলেজের পিওন সোহরাব (১৩) তুলা (১৪) মির্জাপুরের ওয়াদুদ মাওলানা (১৫) সন্তোষের মতি ড্রাইভার (১৬) নাগরপুরের জব্বার মোক্তার (১৭) রাজা ফৈরের ননী মিঞা (১৮) টাংগাইলের বেড়াডোমার নূর (১৯) সাকরাইলের আফাজ (২০) অলোয়ার পিজু (২১) অলোয়ার মতিয়ার (২২) টাংগাইলের আবুল হোসেন বেপারী (২৩) (২৪) সন্তোষের মতি চেয়ারম্যান (২৫) বাসাইল থানার বাথুলীর কাদের খাঁ (২৬) আইনউদ্দিন (২৭) মধুপুরের ইব্রাহীম সরকার (২৮) করটিয়ার নবাব আলী মাষ্টার (২৯) কালিহাতী থানার পলাশতলী গ্রামের আলাউদ্দিন (৩০) ধলাপাড়ার জসিম চৌধুরী ও (৩১) টাংগাইলের আকুরটাকুর পাড়ার বাবু খাঁ আরো অনেক। বাবু খাঁ যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। বাবু খাঁর সাহসের তারিফ করতে হয় বৈকি! সে বহু জায়গায় লুটতরাজ তো করেছেই, এমনকি আমাদের বাড়ীর পোড়া টিনসহ জিনিসপত্র অন্যান্য লুটেরারা স্পর্শ করার সাহস না পেলেও বাবু খাঁ সেই হিম্মত দেখিয়েছে।

এ সময় কয়েকজন টাংগাইলে এক নয়া উপদ্রপ শুরু হলো। টাংগাইল-ঢাকা, টাংগাইল-ময়মনসিংহ বাসরোডে যত বাস, ট্রাক টেক্সি ও জীপ চলাচল করতো, সেগুলোকে এরা উপযাজক হয়ে তল্লাসী করতো। সুবিধা পেলে লুটপাট করতো, এমন কি মুক্তিবাহিনীর লোক বলে রাজাকার ও হানাদারদের কাছে অনেককে ধরিয়ে দিত। এদের মূল পাণ্ডা মুসলীম লীগের গিনি মিঞার সুদর্শন ও গুনধর পুত্র মণ্টু। দেখতে যতই সুন্দর হোক, তার ভিতরের ক্রুর ও কুৎসিত চেহারা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে উলঙ্গভাবে ফুটে ওঠে।

(১) আবদুল খালেক (২) আবদুর রাজ্জাক আনসারী (৩) ওয়াদুদ মাওলানা (৪) টিপু মীর্জা (৫) আবদুল হাই সালাফী (৬) এড্‌ভোকেট ইউসুফ জাই (৭) তাজ মিঞা (৮) আকরাম খাঁ (৯) টিপু ফকির (১০) হিরু প্রফেসার (১১) আফজাল চৌধুরী (১২) সামাদ বি. এস. সি. (১৩) গফুর মোল্লা (১৪) ছালাম রাজী (১৫) আতোয়ার হাজী (১৬) ননী মিঞা (১৭) মহিউদ্দিন এরা ইসলাম ধর্মের প্রচারে যেন নিবেদিত প্রাণ, বদমাইশগুলো প্রতিদিন হিন্দুদের ধরে এনে জোর করে মুসলমান বানাচ্ছে। আগস্টের মাঝামাঝি টাংগাইলের (১) অজিত হোম (২) কানু ভট্টাচার্য (৩) বাদল পাল (৪) ছিদাম ঠাকুর (৫) মনিধর প্রমুখকে ধরে এনে মুসলমান বানালো। ওয়াদুদ মাওলানা মির্জাপুরের আশেপাশের অসংখ্য হিন্দুদের দিনের পর দিন জোর জবরদস্তি করে মুসলমান বানিয়ে চললো। আবদুল খালেকের নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী সন্তোষ, ঘারিন্দা, এলেঙ্গা, মগরা, সদিলাপুর, এনায়েতপুর ও অসংখ্য গ্রাম একের পর এক জ্বালিয়ে ছারখার করে প্রায় দু'তিন শত নিরীহ লোককে আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। এ ছাড়াও রাজাকার ক্যাম্পে ধরে এনে খালেক সহস্রাধিক লোককে হত্যা করিয়েছে। অন্যদিকে গোপালপুরের আবদুল খালেক সমস্ত গোপালপুরটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

(১) মির্জাপুরের ওয়াদুদ মাওলানা (২) ধলাপাড়ার জসিম চৌধুরী (৩) টিপু মীর্জা, (৪) আকরাম খাঁ (৫) রাজাফৈরের ননী মিঞা (৬) পোষনার জোয়াহের খাঁ (৭) টিপু ফকির (৮) টাংগাইলের নান্নু (৯) গান্ধিনার ক্যাপ্টেন

ডাঃ আবদুল বাসেত (১০) সাবালিয়ার ঠান্ডু, বল্লার মালেক মৌলানা (১১) সন্তোষের মতি ড্রাইভার (১২) নাগরপুরের জববার মোক্তার (১৩) ইসহাক আলী ও তাদের আরো সাঙ্গ-পাঙ্গরাও জ্বালাও পোড়াও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকার পাত্র নয়। ওয়াদুদ মৌলানা মির্জাপুর, দেওহাটা, পাকুল্লা, মহেরা সহ বেশ কয়েকটি বিরাট, প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বাজার লুট ও পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। টাংগাইল পৌরসভার চেয়ারম্যান শওকত আলী তালুকদারের ভায়রাভাই মোহাম্মদ ইসহাক আলীও কম যায়না। বরুলিয়া ভুক্তা, সুরুজ, আইসড়া এবং টাংগাইলের পাড় দিঘুলিয়ার এমন কোন হিন্দু ও আওয়ামী লীগ সদস্যের বাড়ী নেই, যা এই শয়তান ইসহাক লুটপাট করায়নি।

মুক্তিবাহিনী এদের দুষ্কর্ম ক্ষোভ ও রোষের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। আমরা নানাভাবে ঘৃণ্য দালালদের প্রতিহত ও শাস্তিবিধান করতে বদ্ধপরিকর হচ্ছিলাম। অনেককে শাস্তি দিতে মুক্তিযোদ্ধারা সক্ষম হয়। যেমন—নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখে হানাদার বেষ্টিত মির্জাপুর বাজারের একেবারে মাঝখান থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে ওয়াদুদ মৌলানাকে দু'জন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা টেনে হিঁচড়ে রিক্সায় তুলে নদীর পারে নিয়ে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করে চকিতে মিলিয়ে যায়। বানরের পিঠা ভাগের মত ক্রম নিঃশেষিত হালুয়া-রুটির শেষ সুযোগ সদ্ব্যবহারে শান্তি কমিটির সব সদস্যই যে একই চরিত্রের ছিল, তা নয়। (১) আশরাফ মীর্জা (২) আবু সাইদ দারোগা (৩) অধ্যাপক আ. ফ. ম. খলিলুর রহমান (৪) জলিল মিঞা (৫) ইসমাইল মিঞা (৬) তাজ মিঞা (৭) লেবু মিঞা (রওশন টকিজ) সহ আরো অনেকে উদ্ধতভাবে ধরাকে সরা জ্ঞান করে লাফালাফি-দাপাদাপি করেনি। টাংগাইল শান্তি কমিটির একজন ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র হলেন, জামাতে ইসলামের সামচুজ্জামান। ইনি ঘাটাইল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামচুজ্জামানই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি শান্তি কমিটি শান্তির নামে অশান্তি শুরু করলে প্রকাশ্য জনসভায় প্রতিবাদ করেন। এতেও যখন কাজ হয়না, তখন পদত্যাগ করেন। এটাও একটা ইতিহাস যে, আর কোন শান্তি কমিটির মেম্বার এমনভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করার হিম্মত দেখাতে পেরেছেন কিনা আমার জানা নেই। আরও একজনের নাম উল্লেখ করতে হয়, সে হলো প্যাড়াডাইস পাড়ার নজরুল। কট্টর মুসলীম লীগার। অতীত কার্যকলাপ তার মোটেই প্রশংসনীয় নয়। গুন্ডা নজরুল বলেই সে সমধিক পরিচিত। অতীতে অসংখ্য বার ছাত্র ও নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করেছে। নজরুল ১৯৬৯-র গণ-আন্দোলনের সময় হামিদপুরের ছাত্রলীগের মোহনকে মারধর করেছিল। সে বারই প্রথম প্রতাপশালী গুন্ডা নজরুল, ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-জনতার হাতে উত্তম-মধ্যম খেয়েছিল। তার বাঁচারই আশা ছিল না। তবুও ভাগ্যগুণে সে বেঁচে যায়। ৬৯-র গণ-আন্দোলনের গণ-পিটুনিতে তার কোন গুনগত পরিবর্তন হয়েছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না হলেও এটা ঠিক, এরপর থেকে নজরুলের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, যে নজরুলের মুক্তিযুদ্ধের সময় দুষ্কর্মের অন্যতম হোতা হওয়ার কথা ছিল,

সেই নজরুল কিন্তু একেবারে নিরুৎসাহিত ছিল। যার ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাকে কোন ভোগান্তি সইতে হয়নি।

রাজাকার নেতা শান্তি কমিটির সেক্রেটারী জল্লাদ আবদুল খালেক অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে টাংগাইল বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে এক সভায় সগৌরবে ঘোষণা করলো—

"পাকিস্তানে একমাত্র মুসলমানরাই থাকবে। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে মুসলমান ব্যতীত ভিন্ন জাতির থাকার কোন অধিকার নেই। নিম্ন জাতের হিন্দু ও অন্যান্য যারা ধোপা, নাপিত, মেথর, মুচী তারা থাকতে পারবে, যেহেতু মুসলমানেরা ঐ ধরনের ছোট কাজ করতে পারেনা। যারা স্বেচ্ছায় মুসলমান হবে, তারাই শুধুমাত্র পাকিস্তানে থাকতে পারবে, তবে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোন হিন্দু মুসলমান হলে তাকে কোরবানী দেয়া হবে।"

যে সমস্ত হিন্দুরা তখন পর্যন্ত টাংগাইল শহরে ছিলেন তারা এই ঘোষণার চোখে অন্ধকার দেখতে থাকেন। এত কষ্টের পরও যারা এতদিন মাতৃভুমি ছাড়েনি এবার বুঝি তাদের জীবন যায়। টাংগাইলের শিবনাথ হাই স্কুলের শিক্ষক অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় কান্তি রায় তার ছেলে। শিবু রায় এবং বিন্দুবাসীনি হাই স্কুলের স্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত রাধিকারঞ্জন পাঠক। সর্বজন পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ডাঃ বীরেশ মজুমদার, কাগমারী কলেজের অধ্যাপক নিত্যানন্দ পাল, ভোলা পোদ্দার, শান্তিপদ সাহা এবং নিকুঞ্জবিহারী সাহার নাতিকে সহ অসংখ্য লোককে হানাদার রাজাকার দালালরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ওরা এপ্রিল থেকে হাজার হাজার মানুষকে ওরা নানাভাবে খুন অথবা গুম করেছে। এত ঝড়-ঝাপটা বিপদ মাথায় নিয়েও বুঝি হিন্দুরা শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। আবদুল খালেক টাংগাইলের বিশেষ বিশেষ হিন্দু তালিকা করেছে। একদিন বিকালে টাংগাইল শান্তি কমিটির মেম্বার জলিল মিঞা নিকুঞ্জবিহারী সাহার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। জলিল মিয়া শান্তি কমিটির মেম্বার হলেও খালেকের মত জল্লাদ নন। অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্র মানুষ। জলিল মিঞাকে বিমর্ষ দেখে নিকুঞ্জবিহারী জিজ্ঞেস করলেন,

হিন্দু থেকে মুসলমান

—জলিল ভাই, অমন করছেন কেন?

—আর বোধহয় আপনাদের রক্ষা করা গেলনা। খালেকের কারসাজিতে আপনাদের নামের তালিকা করা হয়েছে। আপনারা আজ রাতেই শহর ছেড়ে চলে যান। না হলে, আপনাদের ওরা হত্যা করবে। আর কি বলবো নিকুঞ্জ দা! খালেকের ঘোষণা মতো মুসলমান হওয়ার দ্বিতীয় পথ খোলা আছে, তাও ওরা আপনাদের বিশ্বাস করবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিনা।

জলিল মিঞার কথা শুনে থানা পাড়ায় মন্টু সাহাদের বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে গেল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিকুঞ্জবিহারী সাহা জলিল মিঞাকে বললেন,

—জলিল ভাই, আমাদের যেভাবে পারেন বাঁচান। আমাদের ঘণ্টা দুই ভেবে দেখার সময় দিন।

জলিল মিঞা চলে গেলে বাড়ীর মা-বোনেরা অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে অনুযোগ করে নিকুঞ্জবিহারী সাহাকে বললো,

—আমরা আগেই বলছিলাম কত লোক ভারতে চলে গেলো, আমরাও চলে যাই। কিন্তু শুনলনা। এখন মুসলমান হও! গরুর মাংস খাও। মুসলমানের সাথে মেয়ে বিয়ে দাও।

বাড়ীর মেয়েদের এই সমস্ত কথার কোন উত্তর নিকুঞ্জবিহারী সাহার জানা ছিল না। পরিস্থিতি বড়ই মারাত্মক ও বিচিত্র। তিন ঘণ্টা পর জলিল মিঞা আবার এলেন। ইতিপূর্বেই বাড়ীর অল্প বয়সী যুবক-যুবতীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তারা মুসলমান হবেন। সকলের অনুরোধে নিকুঞ্জবিহারী সাহাও রাজী হয়েছেন। তবে তার ইচ্ছা একটু পাঁজি দেখে নেবেন। পঞ্জিকা না দেখে তিনি জীবনে কোন কাজ করেননি। যদি আর জীবনে হিন্দু হতে না পারেন তাই শুভক্ষণ দেখে তিনি মুসলমান হতে চান। নিকুঞ্জবিহারী সাহার মনোভাব দেখে বাড়ীর যুবক-যুবতীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। 'মুসলমান হবা তাও আবার পাঁজি দেখা? ফালাইয়া দাও তোমার পাঁজি-টাজি।' এরপর তিনি আর কি করবেন। জলিল মিঞাকে ধর্ম পরিবর্তনের কথা জানালে, তিনি খুশী হয়ে মসজিদে ছুটলেন।

বিকাল তিনটায় অনুষ্ঠানিকভাবে নিকুঞ্জবিহারী সাহা, দুলাল কর্মকার, অসিত নিয়োগী, আনন্দ দাস, দুলাল সেন, হরিপদ সরকার, গোপাল সরকার, নিতাই বসাক, মদনমোহন সাহা, রাধাগোপাল সাহা, নিখিলচন্দ্র সাহা, বিমলকুমার সাহা, বলরাম সাহা, হরিপদ বসাক, আকালী বসাক, চিত্ত বসাক, বাদল বসাক, উৎপল বসাক, মুরারী ধর মণীন্দ্র সাহা, বিজয় চৌধুরী, অখিল বসাক, গোবিন্দচন্দ্র সাহা, সুনীলকুমার সাহা, গোপাল সাহা, মনোমোহন সাহা, অমূল্যকুমার বণিক, শৈলেশ সেন, মনোজ সাহা, রতনকুমার সাহা, রমেশচন্দ্র সাহা, স্বপনকুমার রায়, অনিলকুমার সাহা, জয় শীল, রবি শীল, লক্ষণকুমার সাহা, তারাপদ সাহা, রবীন্দ্র লাহিড়ী, শরৎ সাহা, যতীন সাহা, রতন মণ্ডল, অসিত রায়, মনোরঞ্জন সাহা, রুনু চক্রবর্তী, সমীর বোস, রনজিৎ মণ্ডল, পরেশ সাহা, চন্দন সাহা, শিমু বোস, শিখু বোস সহ শ'তিনেক হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হলো। তারা কতটা ইসলামের শান্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হলেন, তা ধর্মান্ধরা এক মুহূর্তের জন্য বুঝতে চেষ্টা করলোনা। টাংগাইল বড় মসজিদে ধর্মান্তরনের অনুষ্ঠান শুরু হলো। ইসলামের বড় বড় পাণ্ডারা নতুন ধর্মাবলম্বীদের টুপী উপহার দিল। টাংগাইল মসজিদের সামনে নবাগত মুসলমানদের দেখবার জন্য হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। এক পর্যায়ে আবদুল খালেক রেগেমেগে সমবেত জনতাকে বললো—'এরা কেউ আল্লাহ্‌র ফেরেস্তা না, দেখার এমন কিছু হয় নাই। এরা এখনও কাফের, এখনও মুসলমান হয়ে সারেনি। মসজিদের মোল্লা তুলাকে এদের অজুর নিয়মকানুন ও কলেমা শেখানোর দায়িত্ব দেয়া হলো। তুলা দীর্ঘদিন টাংগাইল বড় মসজিদে আযান দিয়ে আসছে। একবারে এতগুলো হিন্দুকে মুসলমান বানানোর প্রাথমিক দায়িত্ব পেয়ে সে ধন্য হয়ে গেল। খুশীতে আত্মহারা। দীর্ঘদিন আযান দেওয়ার পুণ্যে সে এতগুলো হিন্দুকে মুসলমান বানোনোর প্রাথমিক দায়িত্ব পেয়েছে।

সে ভাবলো—আল্লাহ্‌র খাস দরবারে পেঁাছে যেতে তার আর কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ্‌র আরশ থেকে তার ওপর আদেশ এসেছে। তাই পরম যত্নে সবাইকে অজু করিয়ে বার বার চার কলেমা তালিম দিয়ে মসজিদের ভেতরে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান বানানোর জন্য নিয়ে গেল। অর্ধেক মসজিদের ভেতর ঢুকে গেছেন এমন সময় আবার আবদুল খালেক তেড়েমেরে চিৎকার করে উঠলো, 'এরা এখনও মুসলমান হয় নাই। কোন কাফের মসজিদের চৌকাঠ পেরোতে পারেনা। আপনারা পেয়েছেন কি! মুসলমান না বানিয়েই এদের মসজিদের ভেতর নিয়ে এসেছেন? খালেক প্রফেসারের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, ওর একার কাঁধেই যেন পাকিস্তানী ইসলাম রক্ষার মূল দায়িত্ব পড়েছে। টাংগাইল মসজিদের মূল ইমাম সবাইকে কলেমা পড়ালেন এবং ইসলামের মহান দিকের কিছুটা আলোকপাত করলেন। তিনি বললেন,

"জোর-জুলুম ইসলামের পথ নয়, শান্তি ও সত্য ইসলামের পথ। আপনারা মনের দিক থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই সত্যিকারের মুসলমান হবেন। জোর-জুলুমের মুখে মুসলমান হলে কোন কাজ হবেনা। আপনারা নির্ভয় হোন—আল্লাহ্ আপনাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় সকলেরই বাঁচার অধিকার আছে। আপনারা মনের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। ধৈর্য ধরুন। সকল বিপদ কেটে যাবে। আপনাদের মন যদি সত্যিই ইসলামের শান্তিতে মোহিত হয়, আপনারা তবেই সত্যিকারের মুসলমান হবেন।"

নব দীক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে টাংগাইল শহরে ধর্মান্ধ মুসলমানদের আনন্দ উৎসব লেগে গেল, মিষ্টি খাওয়ার ছড়াছড়ি।

নিকুঞ্জবিহারী সাহা মুসলমান হয়ে বাড়ীতে ফিরেও সারেনি, মসজিদ থেকে কয়েকজন এসে হাজির।

—শুধু আপনারাই মুসলমান হলে চলবেনা। বাড়ীর মেয়েদেরও মুসলমান হতে হবে। না হলে একত্রে বসবাস করা যাবেনা।

নতুন মুসলমানরা তাতেও রাজী। নিজেরা যখন মুসলমান হয়েছেন তখন মেয়েরা-বউয়েরা বাকী থাকবে কেন? তাঁরা জানতে চাইলেন।

—মেয়েদের মুসলমান হতে আবার কি করতে হবে?

—না, তেমন কিছুই না। মওলানা সাহেব কলেমা পড়াবেন, এর নব নিয়মিত নামাজ-বন্দেগী করলেই চলবে।

মগরেবের নামাজের পর একচোট মেয়েদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার পালা চললো। পদ্ধতি বড় সুন্দর। কোন জটিলতা নেই। মা-বোনেরা ঘরের ভেতর রইলেন। একটা কালো শাড়ীর একমাথা ইমাম সাহেব, অন্য মাথা অন্দর মহলের মা-বোনেরা ধরলেন। শুরু হলো মুসলমান হওয়ার প্রক্রিয়া। ইমাম সাহেব কলেমা উচ্চারণ করলেন। ভেতর থেকে মেয়েরা সমস্বরে কলরব তুললেন। মা-বোনেরা কি উচ্চারণ করলেন, না করলেন, তা দেখে কে? কলরবই যথেষ্ট। এতেই কট্টরেরা খুশী। তারা এতদিনে একটা কাজের কাজ করেছেন, শাড়ী ধরে কলেমা পড়ে মুসলমান হলেন সরযূবালা সাহা, লক্ষ্মীরাণী সাহা, সিন্ধিরাণী

সাহা, জ্যোৎস্নারাণী সাহা, মিনু সাহা, পলি সাহা, অর্চনা সাহা, ভারতী সাহা, দীপ্তি লাহিড়ী, শিপ্রা লাহিড়ী আরো অনেকে।

শুরু হয়ে গেলো হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার জোয়ার। কয়েকদিনের মধ্যে তিন সাড়ে তিন হাজার মুসলমান হয়ে গেলেন। তারা নিয়মিত মসজিদে যাওয়া শুরু করলেন। নভেম্বরের শেষ এবং ডিসেম্বরের দিকে দেখা গেল, নব দীক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যাই মসজিদে বেশী। শেষ পর্যন্ত এমন হলো, কোন কোন জায়গায় পাঁচ-ছয়শ' জনের নামাজের জামাতে দু'তিন জন প্রকৃত মুসলমান। হিন্দু যারা মুসলমান হয়েছেন তারা কট্টরদের দেখাবার জন্য হলেও রীতিমত মসজিদে হাজিরা দিচ্ছেন। একদিন নিকুঞ্জবিহারী সাহা নামাজ পড়তে বসে হাঁটুর গুলে চোট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তাঁকে কট্টরেরা বলে দিল, আপনি শুধু মসজিদে এসে বসে থাকলেই চলবে। তা হলেই আপনি বেহেশ্তে চলে যাবেন।

টাংগাইলে মুসলমান হওয়ায় সাহা, বসাক, হোম নয়, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, সেন, সরকার কেউ বাদ পড়েনি। আমি অ.শা রাখি পরবর্তী সংস্করণে তাদের প্রত্যেকের নাম ও কি পরিবেশে তারা হিন্দু থেকে মুসলমান, আবার মুসলমান থেকে হিন্দু হয়েছিলেন, তা তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবস্থার নতুন মোড় নিল। দশ তারিখ মসজিদে প্রায় ছয়-সাতশ' লোক মগরেবের নামাজে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় টাংগাইলের আকাশে অসংখ্য যুদ্ধবিমান চক্কর মারতে থাকে। এক সময় জামাতের মাঝখান থেকে সাত-আট জন দৌড়ে পালিয়ে গেল। তার মধ্যে তুলাও রয়েছে। নব দীক্ষিতরা নামাজ পড়েই চলেছেন। কেউ উঠছেন, কেউ বসছেন, তাঁরা কোন নিয়মকানুন জানেননা। শিখেনওনি, কারণ নামাজ শিক্ষার আত্মিক প্রয়োজন কখনও অনুভব করেননি। জীবন বাঁচাতে এতদিন কাঠ মোল্লাদের দেখে দেখে তাল মিলিয়ে উঠাবসা করছেন। আসল মুসল্লীরা পালিয়ে গেলে নামাজে আউল-ঝাউল বেধে গেল। নতুন মুসলমানেরা কতক্ষণ উল্টাপাল্টা সেজদা দিয়ে আশপাশ ভালো করে দেখে অবস্থা বুঝে তাঁরাও মসজিদ থেকে চম্পট দিলেন। পরদিন আমাদের হাতে টাংগাইল শত্রু মুক্ত হলো, এরপর আর এঁদের মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে হয়নি।

২২ অথবা ২৩শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তিন-সাড়ে তিন হাজার নব-দীক্ষিত মুসলমানেরা টাংগাইল কালীবাড়ীতে অনুষ্ঠান করে আবার সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেন। এ অনুষ্ঠানও বিচিত্র। পুরোহিত কিছু জপতপ করলেন। গোবর, সামান্য গরুর চোনা ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে প্রসাদ বানিয়ে সকলের হাতে এক ফোঁটা, দুই ফোঁটা করে তুলে দিলেন। সকলে তৃপ্তি সহকারে তা খেলেন। দু'একজন আবার সে প্রসাদ খেতে গিয়ে বমি করে ফেললেন। পুনঃ হিন্দু হওয়ার অনুষ্ঠানকে ষোল কলায় পূর্ণ করে দিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য। তাঁরা পুরোহিতের হাতে শ্রদ্ধাভরে কয়েক ঘটি জল তুলে দিয়ে বললেন,

—আমরা খোদ গঙ্গা থেকে এ জল নিয়ে এসেছি।

পুরোহিত সেই জল সবার উপর ছিটিয়ে দিলেন। এতে সত্যিই হিন্দু বন্ধুরা পরম তৃপ্তি অনুভব করলেন।

টাংগাইল কালীবাড়ী রাজাকাররা ক্যাম্প করায় সেটাকে ধুয়ে মুছে গোবরজল ছিটিয়ে পাক-পবিত্র করতে কিছুটা সময় লেগে যাওয়ায় এদের আবার হিন্দু হতে একটু দেরী হয়েছিল।

টাংগাইল নতুন জিলা শহর তখন মিলিটারীদের আঞ্চলিক সদর দপ্তর। প্রতিদিন শত শত নিরীহ লোককে সেখানে ধরে নিয়ে রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হচ্ছে। টাংগাইল পুরানো শহরে রাজাকার ক্যাম্পেও একইভাবে হত্যাকাণ্ড চলেছে। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যে যেদিকে পারছেন পালাচ্ছেনা। যারা পারছেনা, তারা ক্রমান্বয়ে হানাদারদের পাশবিক তাণ্ডবের শিকার হচ্ছেন।

এমন হতাশা ও নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক অবস্থা বেশীদিন অপ্রতিহতভাবে চলতে দেয়া যায়না। তাই মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণের তেজ বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। এতে অভাবনীয় ফলও ফলে। মুক্তিবাহিনীর চাপের মুখে নভেম্বরের শুরু থেকে হানাদার মিলিটারী ও রাজাকারদের জনসাধারণের ওপর অত্যাচারের মাত্রা ও লুটতরাজের লোভ বহুলাংশে কমে যায়। বিশেষ করে শহরের বাইরে গ্রামে গিয়ে তারা আর কোনও প্রকার তৎপরতা চালাতে সাহসী হয়নি। এটাও লক্ষ্যণীয় যে, রাজাকার ও হানাদার বাহিনীর মধ্যে পূর্ব থেকেই দানা-বাঁধা ঠাণ্ডা লড়াই এ সময় চরমে উঠে। রাজাকারদের সবাই বাঙালী হওয়ায় খান-সেনারা তাদের সন্দেহ করতো। অক্টোবর থেকে তারা রাজাকারদের একেবারে বিশ্বাস করতে পারছিলনা। রাজাকারদের জাতীয়তাবাদী অনুভূতি কম মাত্রায় ও বিলম্বে হলেও জাগতে শুরু করে। স্বজাতির উপর পাশবিক অত্যাচার এবং নিজেরা রাজাকার হওয়া সত্বেও নিকট আত্মীয়স্বজন হানাদার মিলিটারীদের জঘন্য উৎপীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি না পাওয়ায় দেরীতে হলেও তাদের অনেকেরই বোধোদয় হয়। তাছাড়া মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে বাধ্য হয়ে রাজাকাররাও অবিশ্বাস করার মত কিছু কিছু কাজ করে চলেছিল। যেমন শিবির থেকে বাইরে যেতে পারলেই দলবদ্ধভাবে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ হানাদারদের অসংখ্য গোপন খবর মুক্তিবাহিনীর কাছে পাচার করা ইত্যাদি।

ভারতে মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি দল

আনোয়ারুল আলম শহীদ মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি দল নিয়ে মানকাচর পেঁছলে, টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম তাঁদেরকে স্বাগত জানালেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মাহমুদুল্লাহ, ক্যাপ্টেন আলি আহমেদ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আরও বেশ ক'জন অফিসার প্রতিনিধি দলকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানান। আনোয়ারুল আলম শহীদ মানকাচরে এনায়েত করিমের শিবিরে পেঁছালে বি. এস. এফ মেজর বিন্দার সিং ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাঁকে ও তাঁর দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং ঐ দিনই তাদের তুরার মুল ঘাঁটিতে পেঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দফায় নুরুন্নবীকে দেখে ব্রিগেডিয়ার সানসিং খুবই উৎসাহিত ও আনন্দবোধ করেন। তিনি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রতিনিধি দলের নেতা শহীদ সাহেবকে গ্রহণ করেন।

টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি দলের হাতে অনেক কাজ, কিন্তু সময় খুবই কম। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সব কাজ সেরে দেশে ফিরতে হবে। তাই আনোয়ারুল আলম শহীদ ও ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী পরদিন কলকাতা যাত্রা করেন। নুরুন্নবী থেকে যায় যুদ্ধকৌশল নিয়ে ভারতীয় জেনারেলদের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলাপ-আলোচনা ও নতুন পরিকল্পনা তৈরীর জন্য। ফারুক, নুরু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মত বিনিময় ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার দায়িত্ব নিয়ে তুরাতেই থেকে যায়।

আনোয়ারুল আলম শহীদ ৩রা নভেম্বর কোলকাতা পেঁছন। সেখানে পেঁছেই তিনি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগে সচেষ্ট হন। তাঁর বিশেষ সুবিধা ছিল যে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের সহ সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন। সেই সুবাদে বাংলাদেশের সকল জাতীয় নেতার সাথেই ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। ছাত্র, যুবক, শ্রমিক ও কৃষক নেতাদের সাথেও তার পূর্ব পরিচয় ছিল। এমনকি বাংলাদেশের গণ-পরিষদ সদস্যদের অধিকাংশকেই তিনি চিনতেন। এজন্য মুজিব নগরে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগে তার বেগ পেতে হয়নি। প্রসঙ্গতঃ একটা ব্যাপার উল্লেখ্য যে, আমি যখন আগস্টে ভারতে গিয়েছিলাম তখন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাত কারণে আমার সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ না দেখালেও সেপ্টেম্বর থেকে তারা আমাদের সম্পর্কে বেশ আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। পরবর্তীতে আমার প্রতিনিধিদের যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্মানও দেখানো হয়েছে। ৫ই নভেম্বর আনোয়ারুল আলম শহীদ বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ, প্রমুখ মন্ত্রী মহোদয় ও উপদেষ্টা ইউসুফ আলীর সাথে

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আশ্বাস

সাক্ষাৎ করেন। স্বাধীন বাংলা বেতারের ভারপ্রাপ্ত গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল মান্নান, এইচ. এম. কামারুজ্জামান, মিজানুর রহমান চৌধুরী সহ অন্যান্য বেশ কয়েকজন নেতার সাথেও শহীদ সাহেব ঐ একই দিনে কথা বলেন।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সুষ্ঠু, সার্থক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এই ঐতিহাসিক নেতৃত্বের মূলে যারা অনন্য ও অতুলনীয় ছিলেন, তাদের মধ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী অন্যতম। ঐ সময়ের অন্যতম প্রধানএক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খোন্দকার মুস্তাফ আহমেদ সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া অন্যান্য নেতাদের ভূমিকা সন্দেহাতীত ও অসাধারণ।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের সংগ্রামের একনিষ্ঠ সহযোগী। আওয়ামী লীগ রাজনীতির সুখে-দুঃখে, তিনি বার বার অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে সংগঠনের হাল ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু যত বার জেলে গেছেন, ততবারই অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিশেষ করে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সফলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ২৫শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হানাদারদের হাতে বন্দী হলে ১০ই এপ্রিল গঠিত গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে ১৭ই এপ্রিল শপথের মাধ্যমে গুরুদায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নেন। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে সাদাসিদে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রবাসী সরকারের প্রধান সিপাহসালার হিসাবে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও প্রিয় সহচরদের অন্যতম। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আন্দোলনে যতগুলো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল রচিত হয়েছে এর প্রতিটিতে জনাব তাজুদ্দীন আহমেদ তাঁর মেধা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তাজুদ্দীন আহমেদ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় নেতৃত্বে তাঁর স্থান তখন দুই বা তিনে। এমন অবস্থায় ২৫শে মার্চ হানাদাররা যখন বাঙালীর উপর হিংস্র দানবের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ছিনিয়ে আনার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে প্রবাসী গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনাব তাজুদ্দীন আহমেদ যে নিষ্ঠা, সততা, অপূর্ব কর্মক্ষমতা ও দক্ষ প্রশাসক হিসাবে ছাপ রেখেছেন, ইতিহাসের পাতায় তার নজির মেলা ভার। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর অনাড়ম্বর বিলাসহীন জীবন-যাপন ভাবীকালের মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন আহমেদ সরকারের দায়িত্ব নেয়ার প. পণ করেছিলেন, যতদিন না দেশ স্বাধীন হচ্ছে, ততদিন তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন না। তিনি কখনও এই পণ ভাঙেননি। যুদ্ধের পুরো ন'মাস থিয়েটার রোডের বাড়ীর ছোট্ট একটি কক্ষে কাটিয়েছেন। বেগম জোহরা তাজুদ্দীন ও ছেলেমেয়েরা থাকতেন সি.

আই. টি রোডের একটি বাড়ীতে। তিনি সপ্তাহে একমাত্র রবিবার দুপুরে সি. আই. টি রোডের বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আসতেন। কোলকাতায় প্রবাসী জীবনের একদিনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি ঢাকা থেকে যে প্যান্ট-সার্ট পরে বের হয়েছিলেন, যুদ্ধের চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত ঐ কাপড়েই কাটিয়ে দেন। সেই কাপড়েই তিনি ভারতীয় ও বিদেশী অনেক দায়িত্বশীল নেতা ও ব্যক্তির সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং সরকারের দৈনন্দিন কাজ সেরেছেন। তাজউদ্দীন আহমেদের সহকর্মীরা যখন তাকে বার বার অতিরিক্ত অন্ততঃ আর একটা কাপড় বানানোর অনুরোধ করেছেন তখনই তিনি তাদের এই বলে শান্ত করেছেন যে, যারা রণাঙ্গনে লড়াই করছে, তাদের এই এক কাপড়ও নেই। তাই তার ঐ এক কাপড় প্রবাসী সরকারের নেতৃত্ব দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরোয়াভাবে সহকর্মীদের তিনি এও বলতেন, পুরোনো কাপড়েই তিনি বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আগষ্টের পর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা জোর জবরদস্তি ও চাপাচাপি করে অফিসে ব্যবহারের জন্য দুই প্রস্থ পোষাক বানাতে বাধ্য করেন। যার এক প্রস্থ সামরিক, অন্যটি বেসামরিক। এরপরও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার হয়ত ত্রুটিমুক্ত ছিলনা। কিন্তু তারপরও নেতৃত্বের শীর্ষাসনে আসীন ব্যক্তিদের এমন কিছু সৎ, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে, যা যা অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে খুঁজে পেতে কষ্ট হবে।

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। প্রবাসী জীবনের নয়টি মাস তিনিও অতি সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। পেশায় একজন অধ্যাপক থাকার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে একজন সম্মানিত ক্যাপ্টেন হিসেবে কিছুদিনের জন্য যোগ দিয়েছিলেন। মনসুর আলী সাহেবের ঐ ক্যাপ্টেন পদ কোনদিন পুরাতন হয়নি। পরবর্তীতে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন, তবুও নামের আগে ক্যাপ্টেন বাদ দিতে পারেননি। বড় প্রাণখোলা মানুষ মনসুর আলী। তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি যারপর নাই দক্ষতা ও সততার সাথে সম্পাদন করেন।

এ ছাড়া প্রবাসী সরকারের সাথে জড়িত আরও অসংখ্য নেতা ছিলেন, যাদের মধ্যে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাহমুদুল্লাহ্, ফণিভূষণ মজুমদার, কোরবান আলী, সোহ্‌রাব হোসেন, মোল্লা জালালউদ্দীন, রওশন আলী, মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। এম. আর. সিদ্দিকী, আবদুল মালেক উকিল, সৈয়দ আবদুস সুলতান, রসরাজ মণ্ডল, গৌরচন্দ্র বালা, চিত্ত সুতার, চট্টগ্রামের আবদুল হান্নান ও আবদুল মান্নান প্রমুখ যোগ্যতার সাথে নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছেন।

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, মন্ত্রীসভার সদস্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শহীদ সাহেবের সাথে অত্যন্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বার বার আশ্বাস দেন, দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য যত রকম সাহায্যের প্রয়োজন তা অবশ্যই দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিয়মিত সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মনসুর আলী ও খোন্দকার মুস্তাক

আহমেদ আনোয়ারুল আলম শহীদের পেশকৃত হিসাব-কিতাবের কাগজপত্র দেখে অবাক ও বিস্মিত হলেন! এক পর্যায়ে মনসুর আলী সাহেব হিসাব সংরক্ষণের আধুনিক ও অভিনব পদ্ধতি দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে শহীদ সাহেবকে বলেন, 'তোমাদের হিসাব কিতাব দেখে আমি অবাক হচ্ছি। কাদেরের মত একজন পঁচিশ বছরের যুবক কি করে এমন একটি সুসংগঠিত সংগঠন গড়ে তুলেছে। সে তো দেখছি, শুধু যোদ্ধাই নয়! এত উত্তেজনা, এত নিরাপত্তাহীনতার মাঝেও তোমরা যেভাবে প্রতিটি জিনিসের, প্রতিটি পয়সার হিসাব রেখেছ, আমরা এখানে নিরাপদে থেকেও তা পারিনি। সত্যিই আমরা সোনার বাংলা গড়তে পারবো।' আনোয়ারুল আলম শহীদ অর্থদপ্তরের সচিব খোন্দকার আসাদুজ্জামানের (মঞ্জু) সাথেও বেশ কয়েক বার সাক্ষাৎ করেন। খোন্দকার আসাদুজ্জামান টাংগাইলের গোপালপুর থানার নীচের লোক। '৭১ সালে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের যুগ্ম অর্থসচীব ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে তিনি পাকিস্তান সরকারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং টাংগাইল সংগ্রাম পরিষদের প্রথম উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছিলেন। টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তার ধীর স্থির সিদ্ধান্ত টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে যথেষ্ট শুভ প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে ২৭শে মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত খোন্দকার আসাদুজ্জামানের কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ মুক্তিযুদ্ধের উপর সুদূর প্রসারী শুভ প্রভাব ফেলেছিল। যার একটি, ২৬শে মার্চ টাংগাইল গণ-সংগ্রাম পরিষদ যখন সমস্ত জেলার কর্তৃত্বভার নিজেদের হাতে নিয়ে নেন, তখন তাঁরা টাংগাইলের সমস্ত ব্যাংকের টাকা অন্যত্র সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র সংগ্রাম পরিষদের উপদেষ্টা খোন্দকার আসাদুজ্জামানের আপত্তিতে টাকা সরানোর সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী হতে পারেনি। তার বক্তব্য ছিল, এই সমস্ত ব্যাংক থেকে টাকা অন্যত্র সরানোর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। টাকা সরিয়ে ফেলতে গিয়ে হিতে বিপরীত হতে পারে। টাকা ব্যাংকেই থাক। প্রয়োজনীয় টাকা ব্যাংক থেকে চাহিদা পত্রের মাধ্যমে তুলে নেয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে। পরবর্তীকালে যদি টাকা সরানোর প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন আরও ভেবেচিন্তে তা' করা যাবে। টাংগাইল সংগ্রাম পরিষদ ব্যাংক থেকে টাকা সরাননি বা পারেননি। ৩রা এপ্রিল টাংগাইল শহর হানাদারদের দখলে চলে যায়। সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং হাজার হাজার জনসাধারণ ছিন্নমূল হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েন। নিয়মিত অর্থভাণ্ডারের অভাবে প্রথম অবস্থায় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আমার মুক্তিবাহিনী গঠনে যথেষ্ট আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু এই কষ্টের ফল স্বরূপ পরবর্তীতে সুষ্ঠ, সুন্দর ও সর্বাধুনিক হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা, জনসাধারণের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব নিয়মিত অর্থভাণ্ডার গড়ে ওঠে।

চার জাতীয় ছাত্রনেতা—নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুছ মাখনের সাথে আনোয়ারুল আলম শহীদের সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়। বাংগালীদের স্বাধীকার আন্দোলন স্বাধীনতা যুদ্ধে

উত্তরণের পটভূমিকায় চার জাতীয় ছাত্রনেতার অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশ ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের এই চার নেতার নির্দেশে ২৫শে মার্চের অনেক আগেই সারাদেশে 'জয় বাংলা বাহিনী' গড়ে ওঠে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে পল্টন ময়দানে জনসভায় এক ইস্তেহার প্রচার করেন। এরাই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার মূল রূপকার। 'ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ'ই 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'—কবিগুরুর এই গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বলে ঘোষণা করেন। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আহূত জনসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম পরিষদের পরিকল্পিত সবুজ-লাল ও লালের বুকে সোনালী রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা বঙ্গবন্ধু উত্তোলন করেন। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে চার ছাত্রনেতা তেমন অবদান না রাখতে পারলেও মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দিনগুলোতে তাদের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।

জাতীয় ছাত্রনেতাদের সাথে

শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদের সাথেও আনোয়ারুল আলম শহীদ সাক্ষাৎ করেন। চার নেতা আমার সম্পর্কে খুবই উৎসাহ দেখান। তাদের পক্ষে সম্ভাব্য সকল সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। বাংলাদেশের গত এক যুগের আন্দোলনে এই চার যুবনেতার অবদান খুবই প্রশংসনীয় ও গৌরবোজ্জল। জনাব তোফায়েল আহমেদ বেশী সময় আন্দোলনের মূল কেন্দ্রে না থাকলেও '৬৯-এর গণ-আন্দোলনে তিনি যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাই-ই তাকে এতটা শীর্ষে নিয়ে এসেছে। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক বিগত ১৫-১৬ বছর ধরে বাংলাদেশের সকল আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছেন। এই যুবনেতারাই মূল দল আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র, যুবক, কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে সব সময় একটা সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফল সমন্বয় ঘটিয়ে আন্দোলনকে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়েছেন। '৬৯-র গণ-আন্দোলনে এরা একইভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও তারা জাতীয় নেতৃত্ব ও ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে সর্বদা সুন্দর ও সফল সমন্বয় ঘটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

জাতীয় যুবনেতাদের সাথে মত বিনিময়

'স্বাধীন বাংলা বেতার' বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে। আমরা শত্রুমুক্ত এলাকায় দেখেছি, শত শত লোক পাট বিক্রি করে সম্ভব হলে প্রথমেই এক ব্যান্ড রেডিও কিনতেন। চুপিসারে দোকানীকে জিজ্ঞেস করতেন, 'এটায় স্বাধীনবাংলা বেতার শোনা যাবে তো ?' আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পাট কাটার পর যে কোন সাধারণ কৃষক একখানা রেডিওর প্রয়োজনীয়তা সবার আগে অনুভব করতেন। জুলাই থেকে অক্টোবর, এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার এক ব্যান্ড রেডিও, আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার জনসাধারণ কিনেছিলেন এবং প্রতি রেডিওর জন্য ১০ টাকা করে ট্যাক্স দিয়েছেন। মুক্ত এলাকায় 'স্বাধীন বাংলা বেতার' কার রেডিওতে কত জোরে বাজছে তার প্রতিযোগিতা চলতো।

স্বাধীন বাংলা বেতার

অন্যদিকে হানাদার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রায় সবাই ঘরের কোণে খুব নীচু শব্দে রেডিও শুনতেন। কোন বিশেষ খবর হলেই তারা তা নীচু স্বরে অন্যদের কাছে প্রচার করতেন। শীতের সময় অসংখ্য মানুষকে লেপ-কাঁথার নীচে রেডিও নিয়ে, মুখ ঢেকে ঘাপটি মেরে 'স্বাধীন বাংলা বেতার' শুনতে দেখা গেছে। পাশের কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করলেন, কি কিছু খবর আছে? কয়টা? যে রেডিও শুনেছিলেন, সে লেপের নীচ থেকে মুখ বের করে হয়ত সোল্লাসে বলে উঠতেন, চার-পাঁচটা। মানে চার-পাঁচজন হানাদার মারা পড়েছে। একটা বেতার মাধ্যম যে কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে, তা 'স্বাধীন বাংলা বেতারের' সেই সময়ের জনপ্রিয়তার দিনগুলো না দেখলে অনুভব করা দুঃসাধ্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ বেতারের এক অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিয়ত বেতারের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বেতার কেন্দ্রের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছি। আধুনিক কালে যে কোনও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা যে আরও গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ তা উপলব্ধি করে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামে একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'স্বাধীন বাংলা বেতার' কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, তাদের অন্যতম হলেন, বেতারের সর্বময় দায়িত্বে নিয়োজিত টাংগাইলের গণ-পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল মান্নান। অন্যরা হলেন আমিনুল হক বাদশা, শামসুল হুদা, টি. এইচ. সিকদার, আশফাকুর রহমান, শহীদুল ইসলাম, তাহের সুলতান, মাহবুব উদ্দীন, নজরুল, সুকুমার বিশ্বাস, মোস্তাফা আনোয়ার, আবদুল্লাহ্ আল ফারুক, আবুল কাশেম সন্দীপ, আবদুস শাকুর। বেতার প্রকৌশলীদের মধ্যে সৈয়দ আবদুস শাকের, রশীদুল হোসেন, আমিনুর রহমান, এ. এম. শফিউজ্জামান, রেজাউল করিম, কাজী হাবিবুল্লাহ প্রমুখ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠান সূচী ঃ—

১। অগ্নি শিখা,
২। রক্ত স্বাক্ষর,
৩। বজ্র কণ্ঠ,
৪। দর্পন,
৫। জাগরণী,
৬। ঐক্যতান,
৭। চরম পত্র,
৮। জল্লাদের দরবার,
৯। বহির্বিশ্ব ও বিদেশী নাগরিকদের জন্য ইংরেজী অনুষ্ঠান,
১০। বাংলা ও ইংরেজী খবর,
১১। পত্র-পত্রিকা থেকে বিশ্ব জনমত ইত্যাদি।

সুসাহিত্যিক শওকত ওসমান, রনেশ দাশগুপ্ত, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ এ. আর. মল্লিক, ডঃ সরোয়ার মুর্শেদ, ডঃ মযহারুল ইসলাম,

ডঃ সমজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, ডঃ অজয় রায়, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, ফয়েজ আহমেদ, গাজীউল হক, বিখ্যাত চিত্রপরিচালক জাহির রায়হান, সিকান্দর আবু জাফর, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবু তোয়াব খান, মহাদেব সাহা, ডঃ মইদুল ইসলাম, মাহবুব তালুকদার, উম্মে কুলসুম, নাসিমা চৌধুরী, নওয়াজেস হোসেন, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, বদরুল হাসান, মামুনুর রশিদ ও আরও অনেকের ক্ষুরধার লেখনি মুক্তিযোদ্ধাদের দেহ-মনে সিংহের তেজ ও ব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতা এনে দিত। তথ্য ও বেতার বিভাগের চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু, নাজির আহমেদ ও টাংগাইলের সৈয়দ আবদুল মতিন প্রমুখ বিভিন্ন ধরনের চিত্র অংকন করে নরপশু ইয়াহিয়া ও তার জল্লাদ বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ছবি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন।

স্বাধীন বাংলা বেতারের যেসব কণ্ঠশিল্পী বিপ্লবী বাংলার বীর সন্তানদের দেশাত্মবোধক গানের সুরে মাতিয়ে তোলেন, আন্দোলিত করেন তারা হলেন, বিখ্যাত গায়ক আবদুল জব্বার, সমর দাস, আপেল মাহমুদ, অজিত রায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, কাদেরী কিবরিয়া, রফিকুল আলম, এম. এ. মান্নান, সিলেটের স্বপ্না রায়, কল্যাণী ঘোষ, অলোকময় লাহা, প্রবাল চৌধুরী, অরুপরতন চৌধুরী, সুকুমার বিশ্বাস, আমার পরম প্রিয় সর্দার আলাউদ্দিন ও উমা চৌধুরী সহ আরও অনেকে।

খবর, বেতার কথিকা ও বেতার নাট্যে অংশ নিতেন হাসান ইমাম, সুভাষ দত্ত, সুমিতা দেবী, রাজু আহমেদ, নারায়ণ ঘোষ, বাবুল আখতার, মাধুরী চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ বোস, আজমল হুদা, মিঠু প্রমুখ। প্রযোজক ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন আলি যাকের, আলমগীর কবীর, মোস্তাফা মনোয়ার, তাহের সুলতান, এম. আর. আখতার মুকুল, কামাল লোহানী। ইংরেজী সংবাদ পড়তেন মিসেস পারভীন হোসেন ও নাসরীন আহমেদ। বাংলাদেশে বেতার অনুষ্ঠান মানার মধ্যে —বজ্রকণ্ঠ, চরমপত্র ও জল্লাদের দরবার সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

চলচ্চিত্র শিল্পীরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে বসে থাকেনি। বেতার, টি ভি ও সিনেমার সাথে জড়িত থেকে তারা প্রতি মুহূর্তে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে কাজ করেছেন। চিত্রাভিনেত্রী কবরী চৌধুরীর রেডিওতে আবেগময়ী করুণ সাক্ষাৎকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জল হয়ে আছে। আগস্টের মাঝামাঝি চলচ্চিত্র কলাকুশলীরা মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য কোলকাতার রাস্তায় নামেন। সুচন্দার সাথে জাহির রায়হানের দীর্ঘদিনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলেও এই সময় তারা যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বাংলাদেশ সরকরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ; তা এক অভাবনীয় ইতিহাস। ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের এই অভিযানে দলমত নির্বিশেষে সকল কলাকুশলীরাই আগ্রহ নিয়ে রাস্তায় নেমে ছিলেন এবং সংগ্রামের শেষ দিন পর্যন্ত দেশপ্রেমের দুর্বার সংকল্পে তারা ছিলেন একাগ্রচিত্ত।

১১ই নভেম্বর '৭১ সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আনোয়ারুল আলম শহীদের ৪০ মিনিটের এক সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। পরদিন সকালে তা পুনঃপ্রচার করা হয়। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন বেতারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল মান্নান। জনাব আবদুল মান্নান তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ও টাংগাইল জিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার ভবনে আনোয়ারুল আলম শহীদের সঙ্গে 'চরমপত্র' পাঠক ও লেখক বিখ্যাত এম. আর. আখতার (মুকুল) ও জয় বাংলা পত্রিকার মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশের খ্যাতনামা সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরীর সাক্ষাৎ হয়। এম. আর. আখতার (মুকুল) ও আবদুল গাফফার চৌধুরী আনোয়ারুল আলম শহীদকে আপন জনের মত গ্রহণ করেন। কোলকাতায় থাকার সময় প্রতিদিন তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। এম. আর. আখতার তার চরমপত্রের বহু জায়গায় আমার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এম. আর. আখতারই বলতে গেলে আমার নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধা দলকে 'কাদেরিয়া বাহিনী' বানিয়ে ছাড়েন। আমি এতে খুব একটা খুশী হতে পারিনি। বিশেষ কারো নামে বাহিনী না বলে, মুক্তিবাহিনী বললেই বেশী খুশী হব বলে শহীদ সাহেবকে অনেক করে বলে দিয়েছিলাম। তবুও আখতার সাহেব কিন্তু 'কাদেরিয়া বাহিনী', 'কাদেরিয়া মাইর', 'কাদেরিয়া বাহিনীর গাব্দুর মাইর'—এই সমস্ত বিশেষণে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীকে ভূষিত করতে নিরুৎসাহিত হননি বরং আরও উৎসাহ দেখিয়েছেন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী টাংগাইল মুক্তিবাহিনীকে তার লেখনীর মাধ্যমে সব রকম সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি তাঁর দেয়া আশ্বাস খুবই একাগ্রতার সাথে পালন করেন। আবদুল গাফফার চৌধুরী ভারত উপমহাদেশের একজন বিরল ক্ষুরধার লেখনী প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তার লেখা একটি গান, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি', বাঙালী মানসপটে চিরদিন স্থায়ী হয়ে থাকবে। গাফফার চৌধুরীর মত যুক্তি ও আবেগের সংমিশ্রণে সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লেখার ক্ষমতা বাঙালী সাংবাদিকদের মধ্যে ক'জনের আছে, তা জোরের সঙ্গে বলা খুবই দুষ্কর। তার কলম মুক্তিযুদ্ধের সারাটা সময় মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করতে আগুন ঝরিয়েছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেটের চেয়ে গাফফার চৌধুরীর কলমের একটি আঁচড় আমার কাছে মোটেই দুর্বল মনে হয়নি।

১৯শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব জয়দেবপুরে আসে। ঢাকা থেকে জয়দেবপুরের আসার পথে স্থানীয় জনগণ ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব সহ ১৬ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের গতিরোধ করেন। পাঞ্জাব রেজিমেন্ট জনগণকে বেরিকেড উঠিয়ে নিতে বললে জনগণ তা অস্বীকার করেন। এদিকে রাস্তা বেরিকেড মুক্ত করার জন্য ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব ২ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নির্দেশ প্রদান করে। নির্দেশ পেয়ে জয়দেবপুর রাজবাড়ী থেকে ২ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানী অবরুদ্ধ ১৬ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে উদ্ধারে এগিয়ে যায়। বাঙালী সৈন্যদের দেখেও স্থানীয় জনগণ ব্যারিকেড উঠাতে রাজী হয়না। তাদের একমাত্র দাবী 'পাঞ্জাবী সৈন্যরা ঢাকা ফিরে যাও'। শেষে ব্রিগেডিয়ার বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহকারী ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার মেজর সফিউল্লাহকে রাস্তা ব্যারিকেড মুক্ত করতে নির্দেশ দিয়ে, প্রয়োজনে গুলি চালাতে বলে। ব্রিগেডিয়ারের

মেজর সফিউল্লাহ

নির্দেশে ছোটখাট বাঙালী মেজর ভদ্রলোক কোন অস্বস্তিতে পড়েছিলেন কিনা জানিনা, তবে তার নির্দেশে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় ৩০০ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে। এতে সরকারী হিসাবে ৫ জন, বেসরকারী হিসাবে ২৫ জন নিহত ও ৭০-৮০ জন সাধারণ মানুষ আহত হয়। বাঙালীদের রক্তের উপর দিয়ে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট জয়দেবপুরে আসে। জয়দেবপুরের অবস্থা তেমন ভাল নয় দেখে তারা রাতেই আবার ট্রেনযোগে ঢাকা রওনা হতে গেলে জনগণ রেল সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে। জয়দেবপুর স্টেশনে ১৬ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ঢাকায় যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করার জন্যে সফিউল্লাহর নির্দেশে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে অস্বীকার করলে ১৫ জন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাধারণ সৈন্যকে আটক করা হয়। অন্যেরা দারুণ অনিচ্ছা নিয়ে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ২নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৬-১৭ জন সৈন্য ঐ রাতে অস্ত্রসহ শিবির থেকে পালিয়ে যায়। ২৩শে মার্চ ২নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার কর্নেল মাসুদুল হাসানকে ঢাকায় বদলি করে তার স্থলে কর্নেল কাজী আবদুর রকিবকে জয়দেবপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২৫শে মার্চ কাল রাতে ঢাকার বুকে ট্যাংক ও কামান নিয়ে হানাদাররা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সে খবর বিদ্যুৎগতিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২৬শে মার্চ দুপুরের পর সারা বাংলার একটি কাক পক্ষীরও জানতে বাকী থাকেনা যে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর ও দেশের অন্যান্য বড় বড় শহর ও সেনা বাহিনীর ছাউনিগুলোতে কি ঘটেছে। কিন্তু ঢাকার নাকের ডগায় থেকেও মেজর সফিউল্লাহ ২৭শে মার্চ পর্যন্ত নাকি এসবের কিছুই জানতাম না ২নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাধারণ সৈন্যরা আমাদের বার বার বলেছেন। তারা ২২-২৩ তারিখ থেকেই পশ্চিমাদের মনভাব বুঝতে পেরেছিলেন। সমস্ত সৈনিকদের চাপে ও জীবনের ভয়ে অনেকটা বাধ্য হয়ে ২৮শে মার্চ দুপুর ১২ টার দিকে ২ কোম্পানী সৈন্য নিয়ে টাংগাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

মেজর সফিউল্লাহ তাঁর ব্যাটেলিয়ান নিয়ে ময়মনসিংহে পিছিয়ে এসে কোনরকম প্রতিরোধ গড়ে না তুলে ময়মনসিংহ থেকে নরসিংদীর দিকে যাত্রা করে পথে গতি পরিবর্তন করেন। এক কোম্পানী সৈন্য নরসিংদীর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কুমিল্লার ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ায় পিছিয়ে যান। বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী নরসিংদীতে পৌঁছার একদিন পর ১লা এপ্রিল হানাদার বাহিনী নরসিংদীর উপর প্রচণ্ড বিমান হামলা চালায়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের কাছে বিমান বিধ্বংসী কোন অস্ত্র না থাকলেও তারা খুবই সাহসিকতার সাথে সারাদিন হানাদারদের আক্রমণ প্রতিহত করে কয়েকজন আহত সহযোদ্ধাকে নিয়ে নরসিংদী থেকে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার দিকে পিছিয়ে যান। মেজর সফিউল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে অপেক্ষা না করে এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে সোজা সিলেটে চলে যান। সেখানে কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল) এম. এ. জি. ওসমানীর সাথে দেখা করেন। কর্নেল সি. আর. দত্তের (চিত্তরঞ্জন দত্ত) সাথেও সিলেটে মেজর সফিউল্লাহর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সিলেট কিভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করে মেজর কিউ. এম.

জামানকে সিলেটের ভার দেওয়া হয়। মেজর সফিউল্লাহ আবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে ফিরে আসেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌঁছার একটু পরেই তিনি প্রথম হানাদারদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ৬-৭ ঘণ্টা সাহসিকতার সাথে স্থল ও বিমান হামলা প্রতিহত করে সসৈন্যে শাহবাজপুর ও মাধবপুরে সরে যান। সেখানে পৌঁছে পরবর্তী সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলা করতে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেন। ২-৩ দিন পর হানাদাররা শাহবাজপুর ও মাধবপুরও আক্রমণ করে। মেজর সফিউল্লাহের নেতৃত্বে সৈনিকেরা হানাদারদের ১৪-১৫ দিন ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। শত্রুর চাপ ভীষণ ভাবে বেড়ে গেলে তারা ভারতের দিকে আরও সরে গিয়ে তেলিয়াপাড়াতে নতুন ঘাঁটি গাড়েন। তেলিয়াপাড়াতেও হানাদারদের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চলে। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হানাদারদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে টেকা যাবেনা মনে করে নতুন রণকৌশল গ্রহণ করে ভারতের আরও কাছাকাছি মনতলা-সিংগাইর বিল এলাকায় দলকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন। মে মাসের শেষ দিকে হানাদারদের প্রচণ্ড চাপে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত সীমান্ত অতিক্রম করেন। আগষ্টের মাঝামাঝি তাঁরা আবার সুসংগঠিত হয়ে সিংগাইর বিল এলাকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেশ কিছু জায়গা শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হন। স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত মেজর সফিউল্লাহ এখান থেকেই পরিচালনা করেন। নভেম্বরের ৩০ তারিখ মেজর সফিউল্লাহ তার দল নিয়ে বাংলাদেশের আরও অভ্যন্তরে এগুতে শুরু করেন। ৪ঠা ডিসেম্বর বেঙ্গল রেজিমেণ্টের ১১ শত সৈন্যের একটি দল নিয়ে মাধবপুর, শাহবাজপুর ও সরাইলের পথে আশুগঞ্জে তিনি শত্রুর মুখোমুখি হন। ইতিমধ্যে মিত্রবাহিনীর একটি ডিভিশন আখাউড়ায় উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মেজর সফিউল্লাহের দল ৪-৫ই ডিসেম্বর সারা দিনরাত লড়াই চালিয়ে আখাউড়ায় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়। আশুগঞ্জে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রবল চাপের ফলে হানাদাররা সেতুর অপর পারে, ভৈরবে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মেজর সফিউল্লাহ ভৈরবে কিছু সৈন্য রেখে দ্বিতীয় বেংগল রেজিমেণ্টের বাকী সৈন্য নিয়ে নরসিংদীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময় ঐ পথে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরাও ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিল। সফিউল্লাহের দল ১৩ই ডিসেম্বর নরসিংদী-ডেমরার মাঝামাঝি অবস্থান নেন। ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তারা বিজয়গর্বে ঢাকায় প্রবেশ করেন।

মেজর খালেদ মোশাররফও তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫৭তম ব্রিগেডের একজন মেজর ছিলেন। ২২শে মার্চ তাকে কুমিল্লার ৪র্থ বেংগল রেজিমেণ্টের সহকারী অধিনায়ক হিসাবে বদলী করা হয়। খালেদ মোশারফ এর আগেও ৪র্থ বেংগল রেজিমেণ্টে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি তার পুরানো ব্যাটেলিয়ানে বদলীর আদেশ পেয়ে স্বভাবতঃই খুশী হয়েছিলেন। ২৪শে মার্চ ৪র্থ বেংগল রেজিমেণ্টের কমাণ্ডেন্ট লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল খিজির হায়াত খানের কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেন। দায়িত্বভার বুঝে নেয়ার সাথে সাথে তাকে নতুনভাবে আদেশ দেয়া হয় যে, একটি কোম্পানী নিয়ে (তাকে) সীমান্ত নিকটবর্তী শমসের নগর যেতে হবে। কারণ সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র ভারতীয় নক্সাল পন্থীরা একটি আক্রমণের পরিকল্পনা

মেজর খালেদ মোশারফ

আটিছে। ইতিমধ্যেই তাকে সাহায্যের জন্য বেংগল রেজিমেণ্টের আরও দুটি কোম্পানী এবং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানী পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়। খালেদ মোশাররফ ২৪ শে মার্চ রাতে বেংগল রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানী নিয়ে কুমিল্লা থেকে শমসের নগরের উদ্দেশে রওনা হন। যাবার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪র্থ বেংগল রেজিমেণ্টের কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর শাফায়াত জামিলের সাথে দেখা হয়। মেজর শাফায়াত জামিলকে দিন দশেক আগে কোম্পানী সহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। দায়িত্বশীল বাংগালী সামরিক অফিসারদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে কেন এমনিভাবে দূরে পাঠানো হচ্ছে, এই নিয়ে তাদের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। মেজর খালেদ মোশাররফ তার কোম্পানী নিয়ে ২৫শে মার্চ শমসের নগর এসে কমাণ্ডেণ্টের কথা অনুসারে পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের উপস্থিতির কোন হদিস তো পেলেনইনা।' আশেপাশে কোথাও বেংগল রেজিমেণ্টের যে দুটি কোম্পানী থাকার কথা ছিল, তাদের কোন ছায়াও দেখতে পেলেননা। এতে তার মনে পূর্ব সন্দেহ আরো ঘনীভুত হয়। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বেতারে কুমিল্লা হেড-কোয়ার্টারের সাথে বার বার যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফল হন। ঐ অবস্থাতেই ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শমসের নগরেই কাটান। বেতার যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ২৬শে মার্চ সকলে আবার কুমিল্লার সাথে বেতার যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু না! ততক্ষণে কুমিল্লা হেড-কোয়ার্টার থেকে সকল বেতার যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। মেজর খালেদ মোশাররফ তার কনভয় নিয়ে ২৬শে মার্চ বিকেলে আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেন। ইতিমধ্যে ২৬শে মার্চ দুপুরে মেজর শাফায়াত জামিলের কোম্পানীর সাথে খালেদ মোশাররফের বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ২৭শে মার্চ ভোর ৬টায় শাফায়াত জামিল খালেদ মোশাররফকে জানান যে, ব্যাটেলিয়ান কমাণ্ডার মিটিং ডেকেছেন। শাফায়াত জামিলের কথা শুনে খালেদ মোশাররফ বলেন, 'মিটিং-এ যোগদান করার অর্থ আত্মহত্যা! তুমি তোমার কাজ সেরে ফেল। পাঞ্জাবী কমাণ্ডিং অফিসার ও পাঞ্জাবী জোয়ানদের বন্দী কর। আমি তোমার কাছাকাছি পেঁছে গেছি।' শাফায়াত জামিল সকাল ৯টার মধ্যে পাঞ্জাবী কমাণ্ডিং অফিসার সহ বেশ কয়েকজন পাঞ্জাবী জোয়ানকে বন্দী করতে সক্ষম হন। মেজর খালেদ মোশাররফ ২৭ তারিখ দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শাফায়াত জামিলের সাথে মিলিত হন। তখন থেকে তারা উভয়ে পরিকল্পনা মাফিক কাজে হাত দেন। বেংগল রেজিমেণ্টের যারাই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাদের মধ্যে মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে পরিচালিত সৈন্যরাই হানাদারদের অগ্রাভিযানে প্রথম দুর্দান্ত সাহসিকতার সাথে বাধা প্রদান করতে সক্ষম হন। এটা খুবই সত্য যে, মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ৮নং বেংগল রেজিমেণ্ট, মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে ২নং বেংগল রেজিমেণ্টের চেয়ে মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বাধীন বেংগল রেজিমেণ্টের সৈন্যরা ২৫শে মার্চের পর ভারতের দিকে পিছিয়ে যাবার সময় অনেক বেশী যুদ্ধ করেছেন। আখাউরা-কসবা, যুদ্ধে খালেদ মোশাররফ বিপুল সফলতা অর্জনের পরও সুবিধাজনক

অনুকূল অবস্থানের জন্য আগরতলার কাছে মতিনগরের পাহাড়ী এলাকায় সরে এসে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি স্থাপন করেন। এখান থেকেই তিনি সুস্থিরভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। শালদা নদী, মন্দভাগ, কসবা, বেলুনিয়া, পরশুরাম ও আখাউরার কিছু অংশে মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে বেংগল রেজিমেন্টের সদস্যরা বহু সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেন। জুলাই মাসে শালদা নদীর পাশে রেলস্টেশনে হানাদারদের সুদৃঢ় ঘাঁটি দখল করতে যেয়ে মেজর খালেদ মোশাররফের এক প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার বেলায়েত অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে হানাদার ঘাঁটি দখলের সময় শহীদ হন। মেজর খালেদ মোশাররফের আর একজন সাহসী কোম্পানী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট আজিজ পরশুরামের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। মেজর খালেদ মোশাররফকে মতিনগর শিবির পরিচালনায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থেকে যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে সাহায্য করেন তৎকালীন ক্যাপ্টেন আবদুল গফফার, ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন আশরাফ, মেজর সালেক, মেজর আইনুদ্দীন, লণ্ডন প্রবাসী ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও ডাঃ মবিন। আগস্টের ৩০ তারিখ খালেদ মোশাররফের একটি গেরিলা দল ঢাকায় হানাদারদের হাতে ধরা পড়ে। মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ আছে অভিযোগে ঐ সময় বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার আলতাফ মাহমুদ এবং ঢাকা বেতারের হাফেজ উদ্দীনকেও গ্রেফতার করা হয়। ওপরে হানাদাররা তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মেজর খালেদ মোশাররফ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই তিনি স্বাধীন বাংলায় পদার্পণ করেন। ১৬ই নভেম্বর আনোয়ারুল আলম শহীদ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। শহীদ সাহেবকে অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাতে কোন বেগ পেতে না হলেও জেনারেল ওসমানীর সাথে সাক্ষাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এর একমাত্র কারণ তিনি যেমন জিয়াকে পছন্দ করতেন না, তেমনি টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর প্রতিও সন্তুষ্ট ছিলেননা। বিশেষ করে আমার প্রতি একেবারেই নয়। কর্নেল জিয়ার প্রতি অসন্তোষের কারণ ছিল জিয়ার বড় বেশী নামডাক হয়ে গেছে। আর জিয়াও জেনারেল ওসমানীকে খুব একটা তোয়াক্কা করতেন না। আমার ব্যাপার হলো, এলাকার লোকেরা এবং সহযোদ্ধারা আমাকে সি. ইন. সি. সাহেব বা স্যার বলে ডাকে। টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর ইস্তেহারেও আমাকে বার বার সর্বাধিনায়ক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি যারপর নাই চটে গিয়েছিলেন। তার ধারণা আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করছি। এমনি একটি অবস্থায় আনোয়ারুল আলম শহীদের সাথে সর্বাধিনায়ক এম. এ. জি. ওসমানীর সাক্ষাৎ হয়। স্বাভাবিক কারণে সাক্ষাৎকারটি খুব একটা মধুর হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তবুও শহীদ সাহেব ও সর্বাধিনায়ক ওসমানীর সাক্ষাৎকারে খুব একটা অপ্রিয় কিছু ঘটেনি। জেনারেল ওসমানী আমার প্রতিনিধি আনোয়ারুল আলম শহীদকে স্বাগত জানাতে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন, 'কি ব্যাপার। একটা দেশে কয়টা সেনাবাহিনী থাকে? আর তার কয়টাই বা সি. ইন. সি. হয়? আমি শুনেছি কাদের নাকি নিজেই

জেনারেল ওসমানী

নিজেকে মুক্তিবাহিনীর সি. ইন. সি. হিসাবে ঘোষণা করছে।' শহীদ সাহেব অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জেনারেল ওসমানীর এই অযৌক্তিক অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'স্যার, আপনাদের খবর সংগ্রহের মাধ্যম কতটা শক্তিশালী তা আমার জানার কথা নয়। মুক্তিযুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী আমার নেতা। তিনি কখনো কালেও নিজেকে সি. ইন. সি. হিসেবে দাবী করেননি। আমরা তাঁকে সর্বাধিনায়ক পদে বরণ করেছি। তিনি বাংলাদেশ বাহিনীর অথবা সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক নন। তিনি আমাদের সর্বাধিনায়ক, আমাদের দলের সর্বাধিনায়ক।' আনোয়ারুল আলম শহীদের ধারালো যুক্তিপূর্ণ কথার তোড়ে জেনারেল ওসমানী কিছুটা শান্ত ও প্রকৃতস্থ হন। সাক্ষাৎকারের পরিবেশ ও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ও মধুর হয়ে আসে। শহীদ সাহেবের কাছ থেকে আমার নেতৃত্ব সম্পর্কে বহু কথা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বহু সফল যুদ্ধের বর্ণনা শুনে এক পর্যায়ে খুশীতে আহ্লাদিত হয়ে জেনারেল ওসমানী বলে ওঠেন, 'ব্রিটিশ আমল থেকে সেনাবাহিনীতে রয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত ছিলাম। খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখেছি, গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছি, আমার যদি যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও থেকে থাকে (গলার স্বর উচ্চগ্রামে তুলে ম্যাপ দেখিয়ে) আমি বলছি, 'কাদের সিদ্দিকী উইল বি দ্যা ফার্স্ট ম্যান টু রীচ ঢাকা।' জেনারেল ওসমানীর ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। আমি সত্যিই ঢাকায় প্রথম প্রবেশ করেছিলাম।

জেনারেল ওসমানী ব্রিটিশ আমলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি সামরিক বাহিনীতে আয়ুবখানের চাইতে সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর বাঙালী হওয়ায় এবং তার নিজস্ব কিছু গোঁ থাকায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেকে কর্নেলে পদোন্নতি পেয়ে আটকে থাকেন এবং ৬৫ সালের পর সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কুমিল্লার মরহুম মেজর ওসমান গনি যেমনি বেংগল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা তেমনি এম. এ. জি. ওসমানী বেংগল রেজিমেন্টের শ্রীবৃদ্ধিতে প্রশংসনীয় ভুমিকা রেখেছেন। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সময় কর্নেল ওসমানীকে আন্দোলনের স্বার্থে এখানে ওখানে দেখা যেতে থাকে। এইভাবেই তিনি বাংলার স্বাধীকার আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের তোড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মুক্তি পেলে বঙ্গবন্ধুর সাথেও কর্নেল ওসমানীর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। যদিও তাঁরা একে অপরের সাথে আগেই পরিচিত ছিলেন। '৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনে মৌলভী বাজারের এক নির্বাচনী এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের টিকিটে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় জয়লাভে পাকিস্তানী শাসক-শোষকগোষ্ঠী উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে নানা অপকৌশল শুরু করলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙ্গালীরাও সেই ঘৃণ্য অপকৌশলের সমুচিত জবাব দিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বাঙালী সৈনিকদের উপর প্রভাব পড়বে মনে করে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কর্নেল ওসমানীকে জেনারেল পদে উন্নীত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর

সর্বাধিনায়ক ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব দেন। জেনারেল ওসমানী স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রায় পুরো সময়টাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে কাটিয়েছেন। তিনি খুব কম সময়ই যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করেছেন। তাঁর কথা ছিল, "একজন সার্থক ও কার্যকরী সেনাপতির যুদ্ধক্ষেত্রে বাংকারে বসে কিংবা এখানে ওখানে যুদ্ধরত সৈনিকদের সাথে থেকে যুদ্ধ পরিচালনার কোন দরকার পড়েনা। নিখুঁত পরিকল্পনা করাই সফল সেনাপতির কাজ।" তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়াটা মোটেই পছন্দ করতেন না। শোনা যায়, মুজিবনগর সরকারের কাছে তিনি মাঝে-মধ্যেই পদত্যাগ করতে চাইতেন। এও শোনা যায়, লিখিত পদত্যাগপত্র নাকি সর্বদাই তাঁর পকেটে থাকতো। দুষ্ট লোকেরা বলে, জেনারেল ওসমানী নাকি মুজিবনগর সরকারের কাছে আশি বার পদত্যাগ করতে চেয়েছেন।

১৬ই ডিসেম্বর সকাল দশটায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সানসিং, ব্রিগেডিয়ার ক্লেও টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে আমি নিজে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশন হেড-কোয়ার্টারে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করি। সেই খবর কোলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান সেনাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার কাছে পাঠানো হয়। লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল অরোরা খবর পেয়েই তাৎক্ষণিকভাবে তা জেনারেল ওসমানীকে জানান। কিন্তু বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী খবরের সত্যতা প্রথম অবস্থায় মানতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। তাকে ঢাকায় আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ পর্বে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ সময় বাংলাদেশ সরকারও জেনারেল ওসমানীকে ঢাকায় হানাদারদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে হাজির হতে অনুরোধ করেন। জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, 'ঢাকা পুরোপুরি মুক্ত কিনা সেই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ নন। এমতাবস্থায় তার ঢাকা যাওয়াটা কোনমতেই বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা।' তিনি ঢাকা যানও নি। তাই বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ সরকার এয়ার কমাডোর খোন্দকারকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন। জেনারেল ওসমানী ১৮ই ডিসেম্বর দুপুরে ভারত থেকে হেলিকপ্টারে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হন। হেলিকপ্টার সিলেটের আকাশে এলে তার হেলিকপ্টারে ১ বা ২টি গুলি লাগলেও হেলিকপ্টারটি তেমন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। সিলেটে অবতরণ সমীচিন হবেনা মনে করে তিনি আবার ভারতে ফিরে যান। ভারতে ফিরে গিয়েই দুটি অভিযোগ আনেন—

এক। তাঁর সন্দেহ তাকে হত্যা করার উদ্দেশে হেলিকপ্টারে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।

দুই। তাঁকে হত্যার পিছনে কর্নেল জিয়ার উস্কানি অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মদত থাকলেও থাকতে পারে।

তিনি একবারও পাকিস্তান সেনাবাহিনী অথবা পাক-সমর্থক অন্যান্য অস্ত্রধারীদের কথা উল্লেখ করেননি। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকাতে হানাদাররা

আত্মসমর্পণ করলেও সিলেটের হানাদাররা করেনি। তারা ১৮ই ডিসেম্বর সকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও কর্নেল জিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তখনও হানাদারদের ছোট ছোট অনিয়ন্ত্রিত দল এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। জেনারেল ওসমানীর হেলিকপ্টারে গুলি লেগেছিল। এটা সত্য, কর্নেল জিয়ার দলের অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন সদস্য গুলি ছুঁড়েছিল কিনা তা আজও প্রমাণিত হয়নি। আর আদৌ কেউ ইচ্ছা করে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি করেছিল কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। সিলেট হানাদার মুক্ত হলে মুক্তিযোদ্ধারা আনন্দ-উল্লাসে আকাশে অসংখ্য গুলি ছুঁড়েছিল। তার কোন গুলি হেলিকপ্টারে লেগেছিল কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায়না। সিলেটের অনেকের ধারণা, হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে পালিয়ে থাকা ভীত ও অনিয়ন্ত্রিত হানাদারদের কেউ গুলি ছুঁড়েছিল। এই ঘটনার পর জেনারেল ওসমানী একা আর কোথাও যাননি। ২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রী মহোদয়দের সাথে একত্রে তিনিও ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

আনোয়ারুল আলম শহীদ যখন সকলের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করছিলেন, তখন তার আর একজন সহকারী ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী, স্বাস্থ্য সচীব ডাঃ টি হোসেন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য কর্তাব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা করে দেশের অভ্যন্তরে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর স্বাস্থ্য বিভাগের কাজকর্ম কি করে আরো সুষ্ঠভাবে চালানো যায়, তা ঠিক করে নিচ্ছিলেন। ১৭ই নভেম্বর টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদ্বয় বিমান যোগে কোলকাতা থেকে গৌহাটি হয়ে তুরাতে পেঁছেন।

স্বাস্থ্যদপ্তরে ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী

এ-প্রসঙ্গে কোলকাতার আর একটি ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তরুণ নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও টি. ভি.-র অনুষ্ঠান উপস্থাপক মামুনুর রশিদ টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর উপর তিনটি ধারাবাহিক বেতারনাট্য বাণীবন্ধ করেন। মামুনুর রশিদ মে মাসে কালিহাতীতে অস্ত্র উদ্ধারের সময় আমার সাথে ছিলেন। তারপর নানা দুঃখকষ্ট সয়ে ভারতে চলে যান এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। আমাদের প্রথম যুদ্ধ প্রচেষ্টা দেখে এবং নিজেও সেই প্রচেষ্টায় জড়িত থাকার কারণে স্বভাবতঃই তিনি টাংগাইলের যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহ ও প্রচারে আগ্রহান্বিত ছিলেন। নানাভাবে টাংগাইলের মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহ করে বেতারে নিয়মিত প্রচার করছিলেন। টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধের উপর তার রচিত নাটক বাণীবন্ধ করে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ স্বাধীন বাংলা বেতারে পর্যায়ক্রমে প্রচার শুরু করেন। আনোয়ারুল আলম শহীদ কোলকাতা পেঁছায় ২ দিন পর প্রথম অংশটি দুই দুইবার স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত হয়। ১৪ অথবা ১৫ই নভেম্বর দ্বিতীয় অংশটি প্রচার করা হয়। তৃতীয় অংশটি ২১শে নভেম্বর প্রচার করার কথা ছিল। কিন্তু কোন কালো হাতের ইশারায় তা বন্ধ হয়ে যায়। কর্তাদের আপত্তি ও বিরাগের কারণ ছিল, মামুনুর রশিদের লেখা বেতার নাট্যগুলো কাদের [illegible] বড় বেশী প্রশংসা করা হচ্ছে, হিরো বানানো হচ্ছে। ভাবখানা যেন এই, প্রশংসা

দুঃখজনক অভিজ্ঞতা

করতে আপত্তি নেই তবে সেই প্রশংসা ও কৃতিত্ব যদি তাঁদের চাইতে বেশী উপরে তুলে দেয়, তাহলে পরে নীচে নামানো মুস্কিল হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এমন মনোভাব সকল নেতা পোষন না করলেও কিছু কিছু নেতা করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করবে, শহীদ হবে, দেশ স্বাধীন করবে আর তাঁরা ক্ষমতায় বসবেন। যদি কোন কৃতি মুক্তিযোদ্ধা সেই সম্মানে ভাগ বসাতে চান তাতে তাঁরা কস্মিন কালেও রাজী নন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যেমন অসংখ্য আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল দিক আছে তেমনি, এমনি দু'চার টি অন্ধকার ও কলংকজনক দিকও আছে।

আনোয়ারুল আলম শহীদ ও ডাঃ শাহাজাদা চৌধুরী যখন কোলকাতায়, তখন নুরুন্নবী, ফারুক আহমেদ ও সৈয়দ নুরু বসে নেই। নুরুন্নবী বার বার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী যুদ্ধ পরিকল্পনা ঠিক করে নিচ্ছিল।

সামরিক পরিকল্পনা

নুরুন্নবীর সাথে লেঃ জেঃ অরোরার একবার, মেজর জেনারেল গিলের তিন বার এবং মেজর জেনারেল ওভানের একবার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে ২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ইতিমধ্যে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। তাদের দায়িত্ব ছিল, ঢাকায় কতগুলো যুদ্ধ বিমান আছে, কি ধরনের বিমান এবং কোন দেশের তৈরী তার খোঁজখবর নেওয়া। দুত পৌঁছানোর আগেই নিজে থেকেই ঢাকা বিমানঘাঁটির সর্বশেষ খোঁজখবর নিয়ে পূর্ণাংগ একটি রিপোর্ট তুরাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। নুরুন্নবীর সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আলোচনায় শেষ সিদ্ধান্ত হলো—

এক। সে দেশের অভ্যন্তরে এসেই ভারতে খবর পাঠাবে। তার খবর অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কয়েকজন অফিসার মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্ত এলাকায় আসবেন।

দুই। টাংগাইল মুক্তিবাহিনীকে নভেম্বরের শেষে অথবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে টাংগাইলের কোন স্থানে দশ-বারো মাইল নিরাপদ এলাকার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে প্রয়োজনে ভারতীয় ছত্রীসেনা অবতরণ করতে পারেন।

অন্যদিকে সৈয়দ নরু ও ফারুক আহমেদ তুরা ও তুরার আশেপাশে মুক্তি-যোদ্ধাদের শিবিরে শিবিরে ঘুরছিল। তারা টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর শুভেচ্ছা দেশের সকল প্রান্তের মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিচ্ছিল। তাঁদের সাথে এক পর্যায়ে ইসলামপুরের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুল বারেক, জামালপুরের কমান্ডার

শিবিরে শিবিরে

আজিজ মাষ্টার, জামালপুর পাথালিয়ার মুক্তিযোদ্ধা হিরু, ফুলপুরের কমান্ডার আলতাফ হোসেন, মাদারগঞ্জের কোম্পানী কমান্ডার মুক্তা, শ্রীবর্দীর সফল মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি, ইসলামপুরের কমান্ডার মোহাম্মদ আলি, দেওয়ানগঞ্জের কমান্ডার ফজলুর রহমান, ময়মনসিংহের ডাঃ আবদুল হান্নানের ভাতিজা মিন্টু, ফুলপুর হালুয়াঘাটের কমান্ডার এখলাম উদ্দীন, রফিক ভুইঞার দেহরক্ষী, পরবর্তীতে কোম্পানী কমান্ডার আবদুর রশীদ সহ তুরা সেক্টরের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জামালপুরের মজনু, ঢাকা ও ইসলামপুরের হাশেমী মামুদ জামিলের (যুগল) সাথে সাক্ষাৎ হয়। এ ছাড়া বাঘমারা সেক্টর কমান্ডার গৌরীপুরের তোফাজ্জল হোসেন চুন্নু, ময়মনসিংহের হাবিবুর রহমান, রংরার

কোম্পানী কমান্ডার নাজমুল, কোম্পানী কমান্ডার উথুরায় তারা, দুর্গাপুরের জালাল ও কাঞ্চনের সাথে দেশের অভ্যন্তরের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।

তুরা সেক্টারের 'বিশেষ গ্রুফের' সদস্য হাশেমী মামুদ জামিল ও আকতারকে নভেম্বরের মাঝামাঝি, নেত্রকোণার কেন্দুয়া থানার মুক্তিবাহিনীর দুটি কোম্পানীর সাথে যোগাযোগের জন্য পাঠানো হয়। তাদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়, কেন্দুয়ার আশেপাশে অবস্থানরত খালিয়াজুড়ির মোহাম্মদ ইলিয়াস ও বারহাট্টার আবদুল কাদেরের কোম্পানীকে, নেত্রকোণা ও কেন্দুয়া সড়কের সব চাইতে বড়, বসুবাজারের সেতু ধ্বংস করার নির্দেশ পেঁৗছে দেওয়া। হাশেমী মামুদ জামিল ও আকতার যথারীতি তাদের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কেন্দুয়ার পাশে এক গ্রামে মোহাম্মদ ইলিয়াসের কোম্পানী হেড-কোয়ার্টারে পেঁৗছে। মোহাম্মদ ইলিয়াস মাত্র কয়েকদিন আগে ট্রেনিং শেষ করে দল নিয়ে ভারত থেকে এসেছে। তাকে যখন জানানো হলো, 'কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, বসুবাজারের সেতু ভাঙ্গতে হবে।' তখন তিনি হাশেমী মামুদ জামিল ও আকতারের সাথে থেকে সেতু উড়িয়ে দেয়ায় সহায়তা করতে অনুরোধ জানাল। যুগল ও আকতার সানন্দে কোম্পানী কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াসের অনুরোধ রক্ষা করে। পরদিন সেতুটি সারজমিনে দেখতে আঠার-উনিশ বৎসরের কিশোর হাশেমী মামুদ জামিল ইলিয়াস কোম্পানীর একজন যোদ্ধাকে নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ে। সহযোদ্ধাটি যুগলকে বসুবাজারের একটি দোকানে নিয়ে যায়। দোকানদার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। সবকিছু শুনে তিনি সেতুর পাশের রাজাকারদের পরিচিত ও প্রিয় চাঁদ নামে ১৫-১৬ বছরের একটি কিশোরকে ডেকে এনে সবকিছু খুলে বলে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে বলেন। চাঁদ-যুগলকে বেয়াই পরিচয় দিয়ে সেতু দেখাতে নিয়ে যায়। চাঁদ দীর্ঘদিন পুলের রাজাকারদের নানাধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছিল। তাই তার বেয়াই পরিচয় দেয়ায় রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধা হাশেমী মামুদ জামিলকে কোন সন্দেহ করে না। কিন্তু সেতু দেখে ফেরার সময় রাজাকারদের মনে সন্দেহ জাগে। তাকে ফিরে আসতে দেখে রাজাকার কমান্ডার বলে, 'কি বেয়াই ফিরে আসলেন যে?' যুগল একটু ভয় পেয়ে গেলেও বিচলিত না হয়ে ঝটপট উত্তর দেয়, 'আমি ভুলে বাজারে কিছু জিনিস রেখে এসেছি।' তখন ছয়-সাত জন রাজাকার তাকে পাহারা দিয়ে বাজারে নিয়ে যায়। যে দোকানে যুগলকে প্রথম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই দোকানের দূর থেকে সে দোকানদারকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'কি আমার জিনিসগুলো কোথায়?' ছয়-সাত জন রাজাকার পরিবেষ্টিত হয়ে সকলের পরিচিত কিশোরটি কোন জিনিস রেখে যায়নি অথচ চাইছে এবং রাজাকারদের হাবভাবে সন্দেহের আভাস পেয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক দোকানদারটি ব্যাপারটা আঁচ করে নেন। তাড়াতাড়ি দোকানের ভিতর থেকে দুটি 'টোপলা' এনে দেন। 'টোপলা' হাতে যুগল চলে যেতে উদ্যত হলে দোকানদার আবার বলে ওঠেন, 'আপনি দেখছি মিঞা সাংঘাতিক ভোলা মানুষ। শুধু সওদা কি, এই যে এটাও রেখে যাচ্ছেন।' এই বলে দোকানদার একটি তেলের বোতলও যুগলের হাতে তুলে দেন। 'মেঘ না চাইতেই জল', দোকানদার ভদ্রলোকের এমন

হাশেমী মামুদ জামিল
(যুগল)

নিখুঁত নিপুণ অভিনয়ের পর রাজাকারদের সন্দেহ করার মত কোন কারণ রইলোনা। যুগল ঘাঁটিতে ফিরে কোম্পানী কমান্ডার ইলিয়াসকে সব কিছু অবহিত করে। ঐ রাতেই সেতু উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ইলিয়াস ও আবদুল কাদেরের কোম্পানীতে চার'শ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। দুই কোম্পানীর তিন'শ মুক্তিযোদ্ধা মিলে রাত তিনটায় বসুবাজার সেতু আক্রমণ করলো। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে একটি ব্রিটিশ এল. এম. জি. একটি ২ ইঞ্চি মর্টার, শতাধিক এস. এল.আর. ও ৩০৩ রাইফেল সহ বেশ কয়েকটি এল. এম. জি.। মুক্তিযোদ্ধারা তিনভাগে ভাগ হয়ে তিন দিক থেকে সেতুতে আক্রমণ হানল। জবাবে সেতু থেকে রাজাকার ও মিলেশিয়ারা পাল্টা গুলি চালালে মুক্তিবাহিনীর নব্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূর পিছিয়ে যায়। জামিল দশ-বারো জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান নিয়েছিল। দলের একমাত্র এল. এম. জি. চালক মোকারম যুগলের সামনে সেতুর অনেকটা কাছে অবস্থান নিয়ে হানাদারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার সাথে ছয়-সাত জন সহযোদ্ধা। অন্যেরা কখন পিছিয়ে গেছে, এক পর্যায়ে দেখা গেল, উভয় পক্ষের গুলির তোড় কমে এসেছে। যুগলের দৃষ্টি ছিল সামনে, লক্ষ্যবস্তুর উপর। পাশের সহযোদ্ধাদের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই তার চক্ষু চরকগাছ, কেউ নেই! কোন ফাঁকে সহযোদ্ধারা তাকে একা ফেলে চলে গেছে। চারদিকে অন্ধকার। নিঃসীম অন্ধকার! যতদূর দৃষ্টি যায় কারও অস্তিত্ব নেই। শুধু সামনে এল. এম. জি. চালক মোকারামও তার ছয়-সাত জন সহযোদ্ধা। এমনি এক অস্বস্তিকর অসহায় অবস্থায় যুগল দিশেহারা হয়ে যুদ্ধ থেকে ফেরার সংকেত হিসাবে পর পর দুটি গ্রেনেড ফাটাল। কিন্তু তাতেও সামনে এগিয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে আসতে পারছিল না। কারণ তারা শত্রুর বাংকারের একেবারে কাছে, তাই পিছুতে অসুবিধা হচ্ছিল। অনেক চেষ্টার পর একমাত্র এল. এম. জি. চালক ছাড়া বাকীরা পিছিয়ে আসতে সক্ষম হলো। এল. এম. জি. চালক আহত হয়ে পড়ায় সে পিছুতে পারছিলনা। এমন নিদারুণ সংকটময় মুহূর্তে কি করা উচিত, ভেবে উঠতে পারছিলনা, তবু পিছিয়ে এসে সহযোদ্ধাদের পাগলের মতো খুঁজতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চার-পাঁচশ' গজ পিছনে প্রাচীর ঘেরা একটি বাড়ীর বিরাট পুকুরের পাশে সবাইকে জটলা পাকিয়ে বসে থাকা অবস্থায় পেয়ে গেল। তারা একজন দু'জন করে ক্রমে ক্রমে পিছু হটে এখানে এসেজড়ো হয়েছে। পিছিয়ে আসার একমাত্র কারণ, এই-ই তাদের জীবনের প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ। কিন্তু তাবা যখন শুনলো, তাদের এক সাথী আহত হয়ে শত্রুর নলের মুখে পড়ে আছে। তখন তাদের ভয়-ভীতি কর্পূরের মত উড়ে গেল।

রাতের ঘন অন্ধকার, তার চাইতেও বেশী কালো বিভ্রান্তির অন্ধকার। এমনি এক পরিবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের দেহ-মনে কোথা থেকে যেন এলো অমিত তেজ। তাদের মনে স্পন্দিত হলো আত্মশক্তির শুভ উদ্বোধন। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে আবার পূর্ণোদ্যমে বসুবাজার সেতুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের সেই তেজ ও গতি পৃথিবীর প্রবলতম শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটি অনায়াসেই তছনছ করে দিতে পারে। হানাদার পোষ্য

রাজাকার ও মিলেশিয়া কোন ছার! রাজাকার ও মিলেশিয়ারা এবার পাল্টা গুলি করার কোন সুযোগই পেলনা। তার আগেই খেল খতম। শুধুমাত্র উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যাওয়া কয়েকজন রাজাকারের ভীত সন্ত্রস্ত হাত, আচমকা অজান্তে রাইফেলের ট্রিগারে চাপ পড়ায় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে একটা কি দু'টা গুলি শূন্যে ভেসে এলো। বসুবাজার সেতু মুক্তিবাহিনীর সম্পূর্ণ দখলে। অন্ধকার তখনও কাটেনি, শীতের আমেজ কাটিয়ে, সূর্যদেব মুখ বের করছে এবং ক্রমশ কুয়াশার চাদর ভেদ করে আলো ফুটে উঠছে। অস্পষ্ট আলোতেও সেতুর পাশের গ্রামের জনসাধারণ যখন বুঝতে পারলেন সেতুর উপর যারা আছে তারা রাজাকার নয়, মুক্তিবাহিনী। তখন তাঁদের সে কি উল্লাস। চতুর্দিক থেকে লোকেরা যে যা পারলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিয়ে এলেন।

মুক্তিবাহিনীর এই আক্রমণে সেতুতে পাহারারত চল্লিশ জন রাজাকার ও মিলেশিয়ার মধ্যে ছাব্বিশ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে, দু'জন নিহত হয়। সেতুর দায়িত্বে নিয়োজিত বারোজন মিলেশিয়া নেত্রকোণার দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্থানীয় জনসাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচুর আদর-যত্ন করলেন। কিন্তু তাঁরা যখন শুনলেন, মুক্তিযোদ্ধারা সেতুটি উড়িয়ে দেবে, তখন জনসাধারণ স্তম্ভিত হয়ে যান। নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সেতু উড়িয়ে দেয়া থেকে বিরত করতে সচেষ্ট হন। জনগণের কথা, 'সেতু উড়িয়ে দিলে হানাদাররা এসে আশেপাশের গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেবে।' কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে সেতু না উড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন উপায় ছিলনা। সেতু ও সেতুর আশেপাশে সারাদিন অপেক্ষা করে পশ্চিম দিগন্তে যখন অস্তমিত সূর্যের শেষ রক্তিম আভা মিলিয়ে আসছিল তখন মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসুবাজার সেতু উড়িয়ে দিয়ে বিজয় গৌরবে নিজেদের ঘাটির পথ ধরে সাফল্যের আনন্দে হৃদয় তাদের ভরপুর, মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃংখল মোচনের দৃপ্ত শপথে চোখের তারায় ঝিলিক দিচ্ছে নতুন দিনের স্বপ্ন।

২১শে নভেম্বর, আনোয়ার উল আলম শহীদ তাঁর দল নিয়ে নৌকাপথে ভারতের মানকাচর থেকে টাংগাইলের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এবার তাঁদের সাথে আর এক ব্যক্তিত্ব, টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকারী নেতা গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী। আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বেশ কিছুদিন যাবৎ দেশের অভ্যন্তরে এসে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে শত্রুর আক্রমণে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ক্ষতি হওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই, বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চলের সার্বিক প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মুক্তিবাহিনী সফলতার সাথে পালন করছে। এমনি অবস্থাতে আমি বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকীকে দেশের অভ্যন্তরে এসে কাজ করার অনুরোধ জানাই, তাই তিনি দীর্ঘ কয়েক মাস বাইরে কাটানোর পর নিজের হাতে যে- টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন, সেই বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত থেকে স্বাধীনতার লড়াই আরো জোরদার করতে অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের পীঠস্থান, প্রিয় জন্মভূমি টাংগাইলে প্রবেশ করছেন। ভাটি পথে তাঁরা ২৩শে নভেম্বর নির্বিঘ্নে, নিরাপদে কন্দুছ নগরে এসেই তারা এক হৃদয় বিদারক মর্মন্তুদ পরিস্থিতির মুখোমুখি হন।

প্রতিনিধি দলের প্রত্যাবর্তন

১৭ই নভেম্বর, সিরাজগঞ্জের দিক থেকে এক ব্যাটেলিয়ন হানাদার কুন্দুছ নগরের উপর হামলা করে। হামলায় মুক্তিবাহিনীর কোন ক্ষয়ক্ষতি করতে না পারলেও ফিরে যাওয়ার পথে হানাদাররা কুন্দুছ নগরের পশ্চিমে ছাব্বিশা গ্রামটি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। হানাদাররা ঐ গ্রামের চল্লিশ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু ও মহিলাকে অগ্নিদগ্ধ করে এবং প্রায় দু'শ জনকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে পৈশাচিক তান্ডব নৃত্য করতে করতে সিরাজগঞ্জে চলে যায়। এই আকস্মিক হামলার কারণে কুন্দুছ নগরের দায়িত্বে নিয়োজিত মেজর আবদুল হাকিম পূর্ব-পরিকল্পনা মত টাংগাইল-ময়মনসিংহ পাকা সড়কের যে কটি সেতু ধ্বংসের ভার তার উপর ন্যস্ত ছিল, তারা কোন সেতুই ধ্বংস করতে পারেনি। হানাদাররা কোন ক্ষতি করতে না পারলেও, আবদুল হাকিমের সকল পরিকল্পনা উলটপালট করে দিতে সক্ষম হয়। ১৭ই নভেম্বরের রাত থেকে মুক্তিবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকরা ছাব্বিশা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে। তারা এই বিষয়ে সদর দপ্তরেও খবর পাঠায়। তবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কুন্দুছ নগরের দূত সদর দপ্তরে যাবার পথে কুন্দুছনগর-টাংগাইল রাস্তায় হানাদারদের হাতে ধরা পড়ে নিহত হয়। এর ফলে সদর দপ্তর এবং আমি ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত কুন্দুছ নগরের কোন খবরাখবর পাইনি। আমি যখন এলাচীপুরে তখন আনোয়ারুল আলম শহীদের প্রেরিত দূত ভারত সফরে মুক্তিবাহিনীর অন্যতম প্রতিনিধি সৈয়দ নুরুর কাছে প্রথম কুন্দুছ নগরের বিপর্যয়ের সংবাদ পাই। ভারত প্রত্যাবর্তিত দল, গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, আনোয়ারুল আলম শহীদ, নুরুন্নবী ও ডাঃ শাহজাদা চৌধুরীর কাছে মুক্তিবাহিনীর জন্য ঔষধপত্র, কাপড়চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল। তাঁরা সব কিছু দিয়ে ছাব্বিশা গ্রামের দুঃস্থদের সাহায্য করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। শহীদ সাহেব কুন্দুছ নগর আসা মাত্র ছাব্বিশা গ্রামে ত্রাণ পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। শহীদ সাহেব আসার আগে এই ব্যাপারটি দেখার মত তেমন দায়িত্বশীল কেউ ছিল না। তাই ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য এবং আহতদের চিকিৎসার কাজ আশানুরূপ দ্রুততার সাথে চলছিলনা। শহীদ সাহেব এসে ছাব্বিশা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের জন্য এক হাজার করে নগদ টাকা বরাদ্দ করেন। প্রতি পরিবারের প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রসহ কাপড়-চোপড় এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি করে ঘর তৈরী করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, আনোয়ারুল আলম শহীদ, নুরুন্নবী, ডাঃ শাহজাদ চৌধুরী, ফারুক আহমেদ ও লক্ষণ বর্মন সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে দুর্গতদের সেবায় লেগে পড়েন। ভারত থেকে নিয়ে আসা ঔষধপত্র এখানে এত কাজে লাগে, যেটা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। দীর্ঘ পাঁচ দিন এক নাগাড়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে আনোয়ারুল আলম শহীদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ছাব্বিশা গ্রামের করুণ অবস্থা অনেকটা ঘুরিয়ে ফেলেন। ছাব্বিশা গ্রামের দুঃস্থদের সব রকমের সাহায্যের ব্যবস্থা করে সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ২৮শে নভেম্বর রাতে আনোয়ারুল আলম শহীদ তার দল নিয়ে আমার সাথে মিলিত হতে দক্ষিণে যাত্রা করেন।

দুর্গতদের মাঝে

এলাসিন ঘাটে বিপর্যয়

আমি বাউইখোলা দিয়ে টাংগাইল-ঢাকা সড়ক পার হওয়ার সময় প্রথম জানতে পারলাম পুরো রাস্তাসহ মির্জাপুর থানা হানাদারদের দখলে চলে গেছে। মেজর হাবিব বিশেষ যোগ্যতার সাথে ঢাকার দিক থেকে সড়ক আগলে রেখেছিল। তাই ঢাকার দিক থেকে হানাদাররা রাস্তা দখল নিতে পারেনি। তবে ময়মনসিংহের দিক থেকে এক ব্যাটেলিয়ন হানাদার এসে ঢাকা-টাংগাইল সড়ক দখল নিতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, মেজর হাকিম নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট দিনে তার ওপর যে কয়টি সেতু ভাঙার দায়িত্ব ছিল, সেইগুলো ভেঙে ময়মনসিংহের দিক থেকে আসা হানাদারদের গতিরোধ করতে পারেনি। ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যায় হানাদাররা ঢাকা-টাংগাইল সড়ক মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে দখল নিতে পারলেও, এর পর থেকে যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত সড়কের উপর মুক্তিবাহিনীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় থাকে। ২৫শে নভেম্বরের পর থেকে হানাদাররা এক মুহূর্তের জন্যও এই রাস্তায় নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেনি। নভেম্বরের ২৫ তারিখের পর বায়েজিদ আলমের বজ্র কোম্পানী, শামসু ও সোলেমানের কোম্পানী এবং গাজী লুৎফরের কোম্পানীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও দুর্জয় সাহসিকতার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। এই সময় থেকে মনে হতে থাকে, এই সমস্ত কোম্পানীর যোদ্ধারা ঢাকা-টাংগাইল সড়কে নানাভাবে হানাদারদের বাধা দিয়ে ধ্বংস করে ব্যতীব্যস্ত রাখতেই বুঝি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ২৫শে নভেম্বরের পর তারা বিধ্বস্ত সেতুগুলোর পাশে তৈরী বিকল্প কাঁচা রাস্তায় নিয়মিতভাবে ট্যাংক-বিধ্বংসী মাইন লাগাতে শুরু করে। ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন লাগাতে গিয়ে প্রথমাবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা কিছু অসুবিধায় পড়ে। প্রথম দিনে মাইনের আঘাতে একটি যাত্রীবাহী বাস দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ঘটনার পর মুক্তিযোদ্ধারা আগে থেকে মাইন পোঁতা বন্ধ করে, শত্রুর গাড়ী দেখার পর মাইন পুঁতার কৌশল অবলম্বন করে। এমনকি দুই-একবার এমনও হয়েছে ছদ্মবেশে মুক্তিযোদ্ধারা যাত্রীবাহী গাড়ী থামিয়ে বাসে উঠে আস্তে আস্তে ড্রাইভারের কাছে গিয়ে সামনের 'ডাইভারসনে' বিপদের কথা জানিয়ে দিয়েছে। এমনকি দু'একটা যাত্রীবাহী গাড়ীকে তারা পুঁতে রাখা মাইনের ফাঁক দিয়ে পথ দেখিয়ে নিরাপদে রাস্তা পার করে দিয়েছে।

২৫শে নভেম্বর সন্ধ্যায় এলাচীপুরে এলাম। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা তখন বিপুল মনোবলে বলীয়ান। তাদের দুর্বার দুঃসাহসিক আক্রমণের সামনে হানাদাররা যে কিছুই না, তা ঢাকা-টাংগাইল সড়ক দখল এবং কয়েকদিন পর পর বেশ কয়েকটি যুদ্ধ জয়ে বুঝে ফেলেছে। তাই আমি চাইছিলাম, এই অটুট মনোবল থাকতে থাকতেই আরও দু'একটি বড় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে বিজয় হাসিল করতে। গত কয়েক দিনের যুদ্ধাভিযানে উপর্যুপরি সফলতার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন দেহ-মনে সিংহ-বিক্রম বোধ করছিল, তেমনি আবার পর পর হেরে পর্যুদস্ত হয়ে হানাদার

পশুরা ভয়ে কুকড়ে গিয়েছিল। শত্রুর বড় বড় ঘাঁটিতে আঘাত হেনে বিজয় ছিনিয়ে আনার এই তো সুযোগ। এলাচীপুরে এসে আবার নতুন করে কয়েকটি কোম্পানীর দায়িত্ব বন্টন করে দিতে মনোনিবেশ করলাম। এক হাজার যোদ্ধা বাছাই করে একটি শক্তিশালী দল গঠন করা হলো।

২৫শে নভেম্বর রাতে ভারত প্রত্যাগত প্রতিনিধি দলের সদস্য সৈয়দ নূরু এলাচীপুরে এলো। সৈয়দ নূরুর কাছে ভারত সহ কদ্দুছ নগরের বহু খবর জানার পর রাতেই কদ্দুছ নগরে দূত পাঠান হলো। দূতের কাছে খবর পেয়ে শহীদ সাহেব গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী সহ অন্যান্যদের নিয়ে ২৮শে নভেম্বর কদ্দুছ নগর থেকে কেদারপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এর মধ্যে ২৭শে নভেম্বর কদ্দুছ নগর থেকে বিশেষ দূত বাদশাহ ও কোম্পানী কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার আনিস এলো। এ সেই বাদশা যাকে আমরা মুক্তিবাহিনীর 'বিদেশ মন্ত্রী' বলে অভিহিত করে পূর্বে উল্লেখ করেছি। টাংগাইল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সেই প্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি যে বলতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের সারাটা সময় জুড়ে বিভিন্ন দায়িত্বভার নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত যাতায়াত করেছে। সে কম করেও চল্লিশ বার ভারতের মানকাচর এবং বাংলাদেশের কদ্দুছ নগরের মধ্যে যাতায়াত করে খবর ও রসদপত্র আনা-নেয়া করেছে। কদ্দুছ নগর থেকে মানকাচর পর্যন্ত নদীপথে এমন কোন জায়গা নেই, যা সে চিনেনা, এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে সে যায়নি বা থাকেনি, এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে সে পরিচিত নয় এবং দু'একজন বিশ্বস্ত লোক নেই। এমন একজন সফল ও নির্ভরশীল দূত এক গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছে, দু'এক দিনের মধ্যে ভারত থেকে কোন এক দায়িত্বশীল সামরিক অফিসার আসবেন। তাকে কোথায় রাখা হবে এবং কিভাবে সাহায্য করা হবে, তা জানতেই সে এসেছে। কোম্পানী কমান্ডার আনিস ও বাদশাহকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে পরদিন সকালে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

২৮শে নভেম্বর সকালে, এলাচীপুর থেকে কেদারপুরে ঘাঁটি স্থানান্তরিত হলো। এই সময় এলাচীপুর, ফাজিলহাটি, লাউহাটি, ফতেপুর ও কেদারপুরে প্রায় চার হাজার মুক্তিযোদ্ধা, ডিফেন্স গেড়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কেদারপুর ঘাটে কয়েকদিন ধরে পুরোদমে বিপুল খাদ্যসামগ্রী জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হচ্ছিল। আমি ২৮শে নভেম্বর খাদ্যসামগ্রী বিতরণ পরিদর্শনে গেলে এক মারাত্মক অঘটন ঘটে। আমাদের পৌঁছার দু'তিন মিনিট পর পূর্বদিক থেকে দুটি যুদ্ধ বিমান, 'স্যাবর জেট' বিতরণ কেন্দ্রের উপর দিয়ে উড়ে গেল। 'স্যাবর জেট' দুটি এত নীচ দিয়ে গেল যে আমাদের গায়ে দুরন্ত ঝটকা, ঝড়ো হাওয়া এসে লাগলো। আচম্বিতে ঘটে যাওয়া পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা ও আমি হতভম্ব ও বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমাদের সামনে চটের 'ছালাগুলো' হাওয়ায় এদিক-সেদিক ছেঁড়া কাগজের মত উড়তে লাগলো। বিতরণের জন্য ছড়িয়ে রাখা গম-চালও বাতাসে উড়তে থাকলো। ধুলোবালি ঝড় আকাশটাকে ধুসর চাদরে ঢেকে দিল। পলকে ঘটে যাওয়া ঘটনা পূর্বে জানতে না পারলেও পর মুহূর্তে কি ঘটবে সেটি বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী হলোনা, চিৎকার করে

বিমান হামলা

সহযোদ্ধা ও খাদ্যসামগ্রী নিতে আসাদের বললাম, 'যে যেদিকে পার এদিক-ওদিক দৌড়ে সরে যাও। সাবধান, দলবেঁধে যাবেনা। কোথাও জটলা পাকাবেনা।' চিৎকার করতে করতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ দক্ষিণে দৌড়ে গিয়ে নদীর উঁচু পারের আগলে মাটির সাথে মিশে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার পাশে আজাহার ছাড়া দ্বিতীয় কোন মুক্তিযোদ্ধা নেই। আমার আশংকা সত্যি হলো। যুদ্ধ বিমান দুটি পূর্বদিক থেকে সোজা পশ্চিমে গিয়ে আধ মিনিটের মধ্যে ঘুরে এসে মেশিনগানের কয়েক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে গেল। সমস্ত জায়গাটা মেশিনগানের আওয়াজে থর থর করে কেঁপে উঠলো। নদীর পারে ও মাঠে যে গরু-ছাগলগুলো ছিল যেদিক পারলো দড়ি ছিঁড়ে দৌড়ে পালালো। নদীর পারের গ্রামগুলোতে ভয়ার্ত মানুষের চিৎকার, আশেপাশে ও দূরবর্তী লোকালয় থেকে ভেসে আসা ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া কুকুরের ভয়ার্ত আর্তনাদ ছাপিয়ে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ বিমান দুটি পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে বিকট শব্দে 'স্ট্র্যাপিং' করে উড়ে গেল। এমনি করে বিনা বাধায় প্রায় আট-দশ বার চক্কর দিয়ে উপর্যুপরি 'স্ট্র্যাপিং' করে বিমান দুটির হানাদারদ্বয় (পাইলট) বেকুবের মত যখন মনে মনে নিশ্চিত হলো, 'মুক্তি লোগ বিলকুল সাফ', তখন তারা ঢাকার দিকে উড়ে গেল। রক্ষা এই যে, পূর্বদিক থেকে প্রথম যখন স্যাবর দুটি আসে, তখন আমরা নদীর পাশে একটি উঁচু রাস্তার আড়ালে ছিলাম বলে শত্রু বিমান দুটি আমাদের দেখতে পায়নি। অপ্রস্তুত অবস্থায় পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে চলে যাওয়ার সময় আমাদের আচমকা দেখতে পেয়ে আঘাত হানার আগেই বিমান দুটি নির্দিষ্ট স্থানটি পেরিয়ে যায়। প্রস্তুত হয়ে বিমান দুটি আবার পশ্চিম থেকে পূবে আক্রমণের উদ্দেশে ফিরে এলো। এই সামান্য সময়ের ফাঁকে আমরা নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। স্যাবর দুটি আট-দশ বার প্রায় দু'শ গজ জায়গা জুড়ে 'স্ট্র্যাপিং' করে চলে যায়। বিমান দুটি চলে যাওয়ার পর আমরা সবাই আবার খাদ্যসামগ্রী বিতরণের স্থানে এলাম। মুক্তিযোদ্ধারা চার পাশে দ্রুততার সাথে বেশ কয়েকটি বড় বড় গর্ত খুঁড়ে ফেললো। এগুলো যেমন-তেমন গর্ত নয়, শেয়ালে খোঁড়া গর্তের মত ভিতরের দিকটা বাঁকানো। আমি বার বার সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাইলাম। হানাদার বিমান দুটি যদি পূর্বদিক থেকে না এসে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম যেকোন দিক থেকে আসতো, তবে প্রথম 'গোঁত্তাতেই' আমাদের খালি ময়দানে অসহায় অবস্থায় পেয়ে যেতো। সেক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচার সম্ভাবনা থাকতো খুবই কম। দুটি হানাদার বিমানের এত তর্জন-গর্জন ও খালি মাঠে উদ্যত আস্ফালনে মুক্তিযোদ্ধা তো দূরের কথা, একটি কাক-পক্ষীরও কোন ক্ষতি হয়নি। ক্ষতির মধ্যে যা হবার তা হলো, প্রায় পাঁচশ' গম-চাল ভর্তি বস্তা ছিঁড়ে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং সমস্ত গম-চাল পঞ্চাশ-ষাট গজ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ধুলোবালির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যাওয়া গম-চাল একত্র করার কাজে লেগে পড়লো। হানাদার বিমান দ্বিতীয় বার আক্রমণ হানতে আসেনি। ঢাকা গিয়ে তাদের 'হাই কমান্ডের' কাছে রিপোর্ট করে, তারা সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসেছে। রাতেই পাকিস্তান বেতারে খবর পরিবেশন করা হয়, বিমান বাহিনীর দুটি 'স্যাবর

জেট' 'টাংগাইল-মাণিকগঞ্জের মাঝামাঝি পাঁচশ' দুষ্কৃতিকারীকে নিশ্চিহ্ন করেছে।

আমি কেদারপুরের ঘাট থেকে লাউহাটি এলাম। লাউহাটির দায়িত্বে তখন ছিলেন কর্নেল ফজলুর রহমান। তিনি ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। লাউহাটি ও ফাজিলহাটির বিভিন্ন ডিফেন্স লাইন পরিদর্শন করে কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের বেছে আলাদা দলে বিভক্ত করে এক জায়গায় রেখে রাত প্রায় দশটায় কেদারপুর খালের পারে একটা ভাঙাছনের ঘরে রাত কাটালাম। বিভিন্ন কোম্পানী থেকে বাছাইয়ের

ট্রাইকিং স্কোয়াড

পর আলাদা করে রাখা মুক্তিযোদ্ধারা পরদিন সকালে কেদারপুরের পাশের চরে গাছপালায় ঢাকা একটি জায়গায় সমবেত হলো। ভালোভাবে আরেক বার নিরীক্ষণ করে সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজন মত ছোট ছোট কয়েকটি দলে ভাগ করলাম। বিভক্ত দলগুলোর কমাণ্ডার এবং সার্বিক দায়িত্ব ও অভিযানের সমন্বয় সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় কমাণ্ডও ঠিক করে নিলাম। যদিও পরবর্তী অপারেশনে আমি নিজেই তাদের সঙ্গে থাকবো তবুও সুষ্ঠভাবে অভিযান পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো কোনটা কার নেতৃত্বে কিভাবে পরিচালিত হবে এবং তাদের কে কে নির্দেশ দেবে, তা ঠিক করে দেয়া হলো। এক হাজার মুক্তিযোদ্ধার দলকে মোট সাত ভাগে ভাগ করা হলো। প্রতি দলে একজন কমাণ্ডার নিয়োগ করা হলো। সাতটি দল তিনটি কেন্দ্রীয় কমাণ্ডে বিভক্ত হলো। তিনটি কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের দায়িত্ব পেল যথাক্রমে ক্যাপ্টেন সবুর, মেজর মোস্তফা ও ক্যাপ্টেন ফজলুল হক। এই তিনটি কমাণ্ডের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পড়লো মেজর মোস্তফার ওপর। অভিযান সার্বিকভাবে পরিচালনা করবো আমি নিজে। সাতটি কোম্পানীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কমাণ্ডাররা হলো, এক, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন দুই, ক্যাপ্টেন রবিউল আলম তিন, ক্যাপ্টেন মকবুল হোসেন খোকা চার, ক্যাপ্টেন সাইদুর রহমান পাঁচ, মেজর মোস্তফা ছয়, ক্যাপ্টেন ফজলুল হক সাত, ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর খান।

কোম্পানী বিভক্তির পর পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিয়ে সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে এক ভাষণে বললাম, 'অভিযানে সফল হওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো সহযোদ্ধাদের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে কমাণ্ডারের এবং কমাণ্ডারের পরিচালনা কৌশল সম্পর্কে সহযোদ্ধাদের সম্যক ধারণা। পরস্পরের মধ্যে যদি পরিষ্কার বুঝাবুঝি না থাকে তা হলে যত আধুনিক মারণাস্ত্র এবং যত সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণই থাক না কেন, অভিযানে সাফল্য অর্জন দুষ্কর। তাই অভিযানের আগে তোমরা যতটা সময় পারে একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করবে। আমার বিশ্বাস, অতীতে যেভাবে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে সফলকাম হয়েছি, বিশেষ করে রাস্তা দখলে আমরা যে সঙ্গবদ্ধ সফলতা অর্জন করেছি, সেই গতি অব্যাহত থাকলে স্বাধীনতা অর্জনে শীঘ্র সফলকাম হবো। তোমাদের সকলকে আমার অসংখ্য সালাম।

আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হউন।

'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মুক্তিবাহিনী।'

এত কিছুর পরও কিন্তু সহযোদ্ধাদের পরবর্তী অভিযান স্থল বা লক্ষ্যবস্তুর কোন পরিষ্কার ধারণা দিলামনা। মুখ খুলে বা পরোক্ষভাবে, আকারে-ইঙ্গিতেও

কাউকেই বুঝতে দিলামনা, মুক্তিবাহিনী এর পর কোথায় আঘাত হানবে। মুক্তিযোদ্ধারা শুধু বুঝলো, আঘাত হানতে হবে। যুদ্ধ পরিচালনায় এটা আমার একটা অন্যতম কৌশল। সহযোদ্ধাদের কাছে সময়ের আগে কোন পরিকল্পনা প্রকাশ করিনি। সাথে সাথে এও সত্য যে, যুদ্ধ সম্পর্কিত পরিকল্পনা এমনিভাবে গোপন রাখলেও কোন সময় সহযোদ্ধাদের মনে হয়নি যে তাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সময়মত ওয়াকিবহাল করা হয়নি। কোন কোন অভিযানের কথা বিশেষভাবে গোপন রেখেছি। এমনকি একান্ত সহকারীকেও পরিকল্পনার কথা আগে জানাইনি। কিন্তু অন্যান্য অনেক ব্যাপারে অতি সাধারণ ও একেবারে খোলামেলা ছিলাম। শুধু যেটা অসময়ে প্রকাশ পেলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সেটাই গোপন রাখার চেষ্টা করেছি। এটা বুঝে সহযোদ্ধাদের মনে কখনও অহেতুক কোন প্রশ্ন জাগেনি বা অতিরিক্ত কোন কৌতূহলও প্রকাশ পায়নি।

কেদারপুর, ২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় খবর এলো, শহীদ সাহেবের দলকে বহনকারী নৌকা কেদারপুর থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই নৌকাটি কেদারপুর ঘাটে ভিড়বে। সংবাদ পেয়ে খুবই উৎফুল্ল ও আনন্দিত হলাম। প্রতিনিধি দল সফল সফর শেষে ফিরে আসছে, তদুপরি বড় ভাই আবদুল লতিফ সিদ্দিকী আসছেন। বড় ভাইয়ের সাথে তুরাতে ২০শে সেপ্টেম্বর শেষ দেখা হয়েছিল। তাই বড় ভাই আসাতে যারপর নাই আনন্দিত ও উল্লসিত হয়ে উঠলাম। লতিফ ভাই টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর প্রথম সংগঠক। তবে তিনি তীব্র গতিতে সংগঠিত বিরাট মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক কর্মকাণ্ড দেখে যেতে পারেননি। তিনি যখন টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর সক্রিয় কর্মকাণ্ড থেকে পরিস্থিতিজনিত কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তখন মুক্তিবাহিনী কেবল ভূমিষ্ঠ হয়েছে, বাঁচবে কি বাঁচবে না তা অনেকের পক্ষে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব ছিল না। তারপর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, জয়-পরাজয়, অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে হাঁটি-হাঁটি পা থেকে টাংগাইল মুক্তিবাহিনী আজ শক্ত পায়ে দৌড়াতে শিখেছে, সেই দৌড় পিছনে নয়, সামনে। পরাক্রমশালী শত্রুর ঘাঁটি দখল ও তছনছ করতে যে দুরন্ত তেজ, যে অবিশ্বাস্য গতির দরকার সেই তেজ ও গতি আজ টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর করায়ত্বে। স্বাভাবিক কারণে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর প্রথম সংগঠক বড় ভাই গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চলে স্বাগত জানাতে পারায় এবং ভবিষ্যতে তার (লতিফ সিদ্দিকীর) মূল্যবান পরামর্শে ও উপস্থিতিতে মুক্তিবাহিনীর আরও কলেবর ও শ্রীবৃদ্ধি হবে বিধায় নিজে গৌরবান্বিত ও পুলকিত বোধ করছিলাম। শহীদ সাহেবের আসার খবর পেয়ে কেদারপুরে শিবির থেকে ঘাটের দিকে এগোলাম। কেদারপুর ঘাট থেকে মাইল খানেক এগিয়ে নদীর ধারে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলোনা। কয়েক মিনিট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার পর অগ্রবর্তী দলের একজন যোদ্ধা ছুটে এসে খবর দিল, প্রতিনিধি দলকে নৌকা থেকে নামানো হয়েছে এবং তাঁরা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছেন। আমি যে জায়গায় অপেক্ষা করছিলাম, সেখান থেকে

কেদারপুরে লতিফ ভাই

এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর কুড়ি জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। সে স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতায় প্রতিনিধি দলকে সাগ্রহে নৌকা থেকে নামিয়ে পথ দেখিয়ে মুক্তিবাহিনীর ঘাটির দিকে অগ্রসর হলো। আমরাও প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আরও এগিয়ে যেতে লাগলাম। মাঝপথে প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা হলো। আনোয়ারুল আলম শহীদ আগে আগে। তাঁর পিছনেই গণ-পরিষদ সদস্য বড় ভাই আবদুল লতিফ সিদ্দিকী। প্রথমে আনোয়ারুল আলম শহীদকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। শহীদ সাহেবকে ছেড়ে দিতেই বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী আমাকে জাপটে বুকে তুলে নিলেন। অজান্তে কয়েক ফোটা অশ্রুও উভয়ের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। দুই ভাই মিলনের আনন্দ সাগরে ভাসছিলাম। আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে লতিফ ভাইকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম। এর পর নুরুন্নবী, ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী, ফারুক সহ অন্যান্যদের একে একে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এরপর সবাই কেদারপুরের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে ধীর পায়ে এগোলাম। কেদারপুরে আমার সাথে একই বাড়ীতে শহীদ সাহেব সহ অন্যান্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। নির্দিষ্ট বাড়ীতে পৌঁছালে, বাড়ীর উঠোনে কর্নেল ফজলুর রহমান সত্তর জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে প্রতিনিধি দলকে আনুষ্ঠানিক 'গার্ড অব অনারের' মাধ্যমে সম্মানিত ও অভ্যর্থনা করলেন। পরে প্রতিনিধি দলকে নিয়ে একটি ঘরে গিয়ে বসলাম। আমাদের মধ্যে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা হতে লাগল। গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকীর খুশী যেন আর ধরেনা। অনেকদিন পর নিজ জেলার মুক্তাঞ্চলের মাটির স্পর্শ পেয়ে তার হৃদয়-মন পুলকিত, শিহরিত। যে বীজ তিনি রোপন করেছিলেন, তা আজ মহীরুহ ; সেই মহীরুহের সুন্দর ফল টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর সূর্য সেনারা। তাদের দেখে ও তপ্ত প্রাণের স্পর্শে তিনি শিশুর মত আনন্দে উদ্বেলিত, অভিভূত। বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাইতে অতীতের স্মৃতিচারণের খেই হারানো আবেগে অনেক কথার পর তিনি আমার সামনে কিছু জিনিসপত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি দেশের অভ্যন্তরে তোদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি জেনে বাংলাদেশ সরকার সরকারীভাবে তোদের জন্য সামান্য কিছু উপহার পাঠিয়েছেন। বিশেষ করে তোর জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম একখানা চাদর ও কম্বল পাঠিয়েছেন। আর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি রেডিওগ্রাম ও বেশ কয়েকখানা দেশাত্মবোধক গানের রেকর্ড। টাংগাইল মুক্তিবাহিনীকে স্বীকৃতি জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তোর উদ্দেশ্যে যে দুটি অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন, তা আমি শহীদকে দিয়ে দিয়েছি।' লতিফ ভাই আমাকে একটি ব্যক্তিগত উপহারও দিলেন। উপহারটি হলো, শীত নিবারণের একটি অতি সুন্দর চামড়ার জ্যাকেট। জ্যাকেটটি দু-এক বার ব্যবহার করেই তা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

খাওয়া-দাওয়া শেষে প্রায় সারারাত গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী সহ সবাই তাঁদের কথা বললেন। প্রতিনিধি দল কোথায় কি করেছেন, কতটা সাড়া পেয়েছেন, একে একে তা বলে গেলেন। প্রতিনিধি দলের অনুপস্থিতির সময় দেশের

অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের ধারাবাহিক সাফল্যের প্রায় সমস্ত ঘটনা আমিও এক এক করে তুলে ধরলাম। আলাপ-আলোচনার সময় মোটেই বুঝা যাচ্ছিলনা, কে কাকে রিপোর্ট করছেন বা কে কার চেয়ে বেশী দায়িত্বশীল। আলাপ-আলোচনার সময় বার বার মনে হচ্ছিল, আমরা সবাই সমান। একে অপরের পরিপূরক। কোন বাধা-নিষেধ নেই, কোন গোপনীয়তা নেই, সব কিছু খোলামেলা ভাবেই আলোচিত হচ্ছে। নিতান্ত পরবর্তী যুদ্ধের গোপন পরিকল্পনা ছাড়া মুক্তিবাহিনীতে অন্য সব কিছুর আলোচনার পরিবেশ মুক্ত হাওয়ার মত স্বচ্ছ, বন্ধনহীন। রাত দু'টায় নুরুন্নবী আমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললো এবং তা নুরুন্নবী ও আমার মধ্যে সীমিত রইলো। নুরুন্নবী আমাকে অত্যন্ত গোপনভাবে পরবর্তী পরিকল্পনায় কথা জানালো। বিশেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরবর্তী পরিকল্পনা কি, তার প্রেক্ষিতে মুক্তিবাহিনীর কি করা দরকার, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অবহিত করলো।

৩০শে নভেম্বর, সকাল আটটা। আলাদা করে রাখা এক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে আবার নির্ধারিত স্থানে জমায়েত করা হলো। সেখানে গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, আনোয়ারুল আলম শহীদ, নুরুন্নবীও উপস্থিত হলেন। এইখানেই প্রথম নাগরপুর থানা অভিযানের পরিকল্পনা পেশ করলাম। আনোয়ারুল আলম শহীদ ও বড় ভাইকে বললাম, 'নাগরপুর থানা অভিযানের পরিকল্পনা তিন দিন আগে থেকে তৈরী হয়ে আছে। আপনারা অপেক্ষা করুন। নাগরপুর অভিযান শেষে এক অথবা দুই দিনের মধ্যে আমরা পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করবো।' বাছাই করা দুঃসাহসিক ও সুসংগঠিত এক হাজার মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে নাগরপুর রওনা হলাম। বেলা বারোটায় নাগরপুর থানার উপর পশ্চিম দিক খোলা রেখে তিন দিক থেকে একসাথে আঘাত হানা হলো। মেজর মোস্তফা দক্ষিণে, ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর দক্ষিণ-পূবে, ক্যাপ্টেন ফজলুল এবং আমি পূবদিকে এবং ক্যাপ্টেন হুমায়ুন, ক্যাপ্টেন সাইদুর ও ক্যাপ্টেন মকবুল হোসেন খোকা উত্তর-পূব দিক থেকে থানার উপর আঘাত হানলো। দুখানা ব্রিটিশ ৩ ইঞ্চি মর্টার নাগরপুর থানার তিন মাইল দক্ষিণ-পূব থেকে অবিশ্রান্তভাবে গোলা নিক্ষেপ করতে লাগলো। প্রায় একঘণ্টা ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপে থানার হানাদারদের অবস্থানটি একেবারে ধূলিময় হয়ে গেল। ধূলির ধূসর অবগুণ্ঠনের সুযোগেই বিশেষ সংকেতের মাধ্যমে হানাদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলাম। সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে সহযোদ্ধারা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূবের নাগরপুর বাজার মেজর মোস্তফা ও দুর্ধর্ষ কমাণ্ডার আবদুস সবুর খানের চাপে মিনিট দশেকের মধ্যেই শত্রুমুক্ত হয়ে গেল। তারা পলায় পর শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে নাগরপুর থানার হানাদার ঘাঁটির একশ' গজের মধ্যে এগিয়ে গেল। পূবদিকে ক্যাপ্টেন ফজলু তার দল নিয়ে থানা সীমানার প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এগিয়ে আটকে পড়লো। উত্তর-পূবে তিন জন দুর্ধর্ষ কমাণ্ডার হুমায়ুন, সাইদুর ও খোকা থানার প্রায় ২৫ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল।

নাগরপুর থানায় ব্যর্থ অভিযান

মুক্তিযোদ্ধারা চতুর্দিক থেকে ঘাঁটিটি চেপে ধরেছে। শত্রুদের শ্বাস ফেলার জো নেই। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল এর পরই। মুক্তিযোদ্ধারা কোন দিক থেকে আর এগোতে পারছেনা। সামনে সমতল খালি প্রান্তর, কোন আড়াল নেই এমনকি কোন গাছ ঝোপঝাড় পর্যন্ত নেই। এক ঘণ্টা অনবরত মর্টার থেকে নিখুঁত নিশানায় গোলা নিক্ষেপের পরও শত্রুর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। গোলার আঘাতে থানা কম্পাউন্ডের ঘরের টিনগুলো ঝরাপাতার মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। তবুও হানাদাররা অক্ষত। কারণ হানাদাররা মাটির নীচে এমনভাবে শক্ত বাংকার করেছে যে, সেখানে কোন গোলায় আঘাত পেঁছাতে পারছেনা। অন্যদিকে বাংকারগুলো একটার সাথে আরেকটা সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুক্ত। মুক্তিযোদ্ধারা থানার পঞ্চাশ গজের মধ্যে পেঁছে গেলে মর্টার থেকে দ্বিতীয়বার গোলা নিক্ষেপেরও কোন সুবিধা থাকলোনা। আবার মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করলে তা নিজেদের উপরও পড়তে পারে। মুক্তিযোদ্ধারা ঝড়ের বেগে প্রথম অবস্থায় থানার চল্লিশ-পঞ্চাশ গজের মধ্যে এগিয়ে গেলেও, আক্রমণের ধার ক্রমেই কমে আসতে থাকে। পূর্বদিক থেকে প্রথম আক্রমণের সময় ক্যাপ্টেন ফজলুর দলের ষোল-সতের বছরের যোদ্ধা শামসুল হক শত্রুর গুলিতে আহত হয়ে কুড়ি-পঁচিশ গজ সামনে পড়েছিল। হানাদারদের ভারী ও মাঝারী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের অনবরত গুলির মাঝেও তার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, 'আমারে হানাদার ধইর‍্যা আইন্যা দেও। আমি তাগোর রক্ত খামু।' এ সময় আর এক মুক্তিযোদ্ধা ঘাটাইলের সুফী পাগল নুরুজ্জামানের পেটের ডান পাশে গুলি লেগে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সাথে সাথে তাকে পিছনে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো, কিন্তু আমার সামনে ছোট আলের আড়ালে অসহায়ভাবে পড়ে থাকা চর পাকুল্লার শামসুল হককে কিছুতেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছিলনা।

হানাদাররা মুক্তিবাহিনীর প্রথম ধাক্কা সামলে নিলে নতুন করে আক্রমণের কৌশল ভাবা শুরু হলো। আর সামনে না' এগিয়ে যার যার অবস্থানে থাকতে নির্দেশ দেয়া হলো। টাংগাইলের মুক্তিযোদ্ধারা এ যাবৎ যতগুলো যুদ্ধ করেছে, সবগুলোর চাইতে বেশী অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে এই আক্রমণে। দুটি ৩ ইঞ্চি মর্টার, কুড়িটি ২ ইঞ্চি মর্টার, দুটি '৮২ ব্লান্ডার সাইট, দুটি রকেট লাঞ্চার এবং পঁচিশটি গ্রেনেড থ্রোয়িং রাইফেল, পাঁচটা এম. এম. জি., চল্লিশটা এল. এম. জি. ও কয়েক শত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। এত প্রচণ্ড চাপের মুখেও হানাদার ঘাঁটির পতন না হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা বেশ বিস্মিত বোধ কর্রছিল। কারণ ছ-সাত দিন আগেও ঢাকা-টাংগাইল সড়কের নানা স্থানে হানাদারদের কুকুর ধাওয়া করেছে। যেখানে মুক্তিবাহিনী সেখানেই হানাদাররা লেজ তুলে দে ছুট্। শত শত রাজাকার মিলেশিয়ার আত্মসমর্পণ। এসবের পর মুক্তিযোদ্ধারা হেঁটে নাগরপুর থানা দখলের আশা করেছিল। কিন্তু তা হলোনা।

হানাদার ঘাঁটির দখল নিতে আমরা ব্যর্থ হলাম। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে একদিনে চার লাখের উপর গুলি খরচ করে। গোলার পরিমাণও নেহায়েত কম নয়। নাগরপুর থানা অভিযানে চারশ' ৩ ইঞ্চি মর্টার, পাঁচ হাজার ২ ইঞ্চি মর্টার, এক

হাজার রকেট লাঞ্চার ও ব্লান্ডার সাইটের গোলা এবং পাঁচ হাজার গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, এত ব্যাপক আক্রমণের পরও নাগরপুর হানাদার ঘাঁটির পতন ঘটেনি। এর কারণ কি? এখানকার হানাদাররা অন্যান্য জায়গার পর্যুদস্ত বিপর্যস্ত হানাদারদের চাইতে কি বেশী সাহসী ছিল? না, তা মোটেই নয়। মুক্তিবাহিনীর একটি অংশ যুদ্ধ পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভুল করে বসে, যার দরুন জয় করেও পুরো জয় সম্ভব হলোনা। মূল পরিকল্পনা ছিল, উত্তর, পূব ও দক্ষিণ দিক থেকে একযোগে চাপ সৃষ্টি করলে হানাদাররা ঘাঁটি ছেড়ে পশ্চিমে সরে যাবে। হয়েছিলও তাই। কিন্তু বাদ সাধলো উত্তর-পূর্বদিকের ক্যাপ্টেন হুমায়ুন। পরিকল্পনা মাফিক তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে হানাদাররা পশ্চিমে সরে যেতে শুরু করলে ক্যাপ্টেন হুমায়ুন উত্তেজনার বশে এবং জয় সুনিশ্চিত জেনে পশ্চিমে হানাদারদের পিছানোর রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এতে যা হবার তাই হলো। কোনদিকে পালাবার পথ না দেখে হানাদাররা আবার বাংকারে আশ্রয় নেয়। আর কোন পথ নেই। একমাত্র উপায়, যতক্ষণ সম্ভব মাটি কামড়ে বাংকারে পরে থাকা এবং প্রতিপক্ষকে জান দিয়ে প্রতিহত করা। কারণ তাদের পক্ষে আত্মসমর্পণের কথা বলারও কোন সুযোগ ছিল না।

এক জন মুক্তিযোদ্ধা আহত ছোট শামসুকে আনতে গিয়ে আহত হয়ে পিছু ফিরতে বাধ্য হয়েছে। আহত সহযোদ্ধা শামসুকে পিছনে নিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়েছে। একে ত হানাদার ঘাঁটি সুনিশ্চিত দখল, সামান্য ভুলের জন্য মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার উপর একজন আহত সহযোদ্ধা শত্রুর গুলির সামনে পরে আছে, যে কোন মুহূর্তে আর একটা গুলি বীর মুক্তিযোদ্ধাটির প্রাণ প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে। অনেকেই সহযোদ্ধাটিকে নিজের জীবন বাজী রেখে আনতে চাইছিল। কিন্তু সবাইকে টেক্কা দিয়ে ত্রিশালের আবুল কালাম পলকে হামাগুড়ি ও চিৎবাক খেয়ে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাহসিকতার সাথে এগিয়ে গেল। গুলির বর্ষণ তখনও অব্যাহত রয়েছে। কালামের ডাইনে-বামে, সামনে-পিছনে গুলি পড়ছে। কোন কোন সময় গুলি তার এত কাছে পড়ছিল যে দূরে থেকে সহযোদ্ধারা মারাত্মক অঘটনের আশংকায় শিউরে উঠছিল। তাদের চোখগুলো বিস্ফারিত, পলকহীন। পূব দিককার মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত অস্ত্রগুলো একসাথে হানাদারদের বাংকারের উপর গুলি বর্ষণ করতে শুরু করল। উদ্দেশ্য, শামসুকে বয়ে আনার সময় আবুল কালাম আজাদকে হানাদারদের গুলি থেকে আড়াল করা। যেই মুক্তিবাহিনীর গুলি আরম্ভ হলো সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী আবুল কালাম চাপ চাপ রক্তের উপর পড়ে থাকা শামসুকে জাপটে ধরে বিদ্যুৎ চমকানোর মত এক ঝলকে প্রায় পঁচিশ গজ পেছনে এসে একটি মরা খালে গড়িয়ে পড়লো। আমি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ ছুটে গিয়ে শামসুকে ও কালামকে ভালোভাবে দেখে নিলাম। দু'জনের শরীরই রক্তে মাখামাখি। ভালোভাবে হাতিয়ে হাতিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখা গেল, কালামের গায়ে গুলির কোন আঁচড় লাগেনি। শামসুর পেটের ডান দিকে গুলি লেগে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। প্রায় দু'ঘন্টা পড়ে থাকার ফলে তার শরীর থেকে প্রচুর রক্ত ঝরেছে এবং তখনও চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

যার দরুন তার মুখটা অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে হাঁফাচ্ছে, শরীর নেতিয়ে পড়েছে, তবুও গুলি লাগার পর থেকেই তার একই বায়না, প্রলাপের মত বকেই চলেছে, 'আমাকে মিলিটারী ধইর‌্যা আইন্যা দেও। আমি মিলিটারীর রক্ত খামু।'

বিকাল চারটায় নতুন কৌশলে মুক্তিযোদ্ধারা আবার হানাদারদের ওপর বিপুল বিক্রমে আঘাত হানলো। মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে সফল রকেট লাঞ্চার ও ব্লান্ডার সাইট চালক মজনু হানাদার ঘাটির পূব দিককার ৪-৫টি বাংকার গুঁড়িয়ে দিল। পূব দিকের বেশ কয়েকটি বাংকার মুক্তিযোদ্ধাদের দখলেও এসে গেল। কিন্তু তবুও আর এগুনো যাচ্ছেনা, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাংকার খোঁড়া হয়েছে। তাই পূব দিককার কয়েকটা বাংকার মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে গেলেও হানাদারদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন বরাবরের মতই রয়ে গেল। আমি দীর্ঘ সময় ধরে ২ ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা নিক্ষেপ করলাম। কয়েক ঘণ্টা লাগাতার ২ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা ছোঁড়াতে দুটি হাতের কিছু কিছু ছিঁড়ে যাওয়ায় রক্ত ঝরতে থাকে। নাগরপুর থানা অভিযানে আমি ও মেজর মোস্তফা, অন্যদের চাইতে নিখুঁত লক্ষ্যে ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করলাম। দীর্ঘ সময় গোলা নিক্ষেপ করে ক্লান্ত হয়ে কিছুটা পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের জন্য 'চাইনীজ ব্লান্ডার সাইট' থেকে কয়েকটা সেল নিক্ষেপ করতে চাইলাম। মজনু বিরামহীনভাবে তার ব্লান্ডার সাইট থেকে গোলা নিক্ষেপ করে চলেছে। দ্বিতীয় ব্লান্ডার সাইটটি আমি নিলাম, এটা এর আগে একবারও ব্যবহার করা হয়নি। কারণ তাতে 'ফ্লাশ প্রটেকটর' ছিল না। যদিও বিখ্যাত আর. ও. সাহেব একটা কাঠের ফ্রেম তৈরী করে তাতে সুন্দর করে টিন লাগিয়ে সামান্য একটু ফুটো করে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের টুকরো দিয়ে ঢেকে কাজ চালানোর মত করে 'ফ্লাশ প্রটেকটর' তৈরী করেছিলেন। কিন্তু তা কতটা কার্যকরী হবে, এই ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধাদের কারও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। আমারও না। 'ফ্লাশ প্রটেকটর' সেল নিক্ষেপের সময় কতটা প্রয়োজনীয় তাও তখন কারও জানা ছিল না। সব কিছু অজানা থাকা সত্ত্বেও অব্যবহৃত দ্বিতীয় 'ব্লান্ডার সাইট' থেকে গোলা বর্ষণের প্রস্তুতি নিলাম। হানাদারদের বাংকার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে খালের পারে শুয়ে সরাসরি বাংকারে প্রথম গোলা নিক্ষেপ করলাম। গোলাটি গিয়ে নির্ভুল নিশানায় আঘাত হানলো ঠিকই। কিন্তু এদিকে মস্ত বড় এক বিপর্যয় ঘটতে ঘটতে বেঁচে গেলাম। গোলা ছোঁড়ার সাথে সাথে আর. ও. সাহেবের তৈরী 'ফ্লাশ প্রটেকটর' ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ছেঁড়ে-ফুড়ে প্রায় পঁচিশ গজ পিছনে উড়ে গিয়ে উঁচুতে একটা বাঁশঝাড়ে লটকে রইলো। ব্লান্ডার সাইটের ফ্লাশের তোড়ে আর. ও. সাহেবের তৈরী 'ফ্লাশ প্রটেকটর' উড়ে পিছনে যাওয়ার সময় আমার কপালের খানিকটা কেটে নিয়ে গেল। গোলার হল্কা যখন মুখে এসে লাগল তখন মনে হলো, আমার মাথার খুপড়ি উড়ে গেছে। চট করে হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরলাম। তখনও মনে হচ্ছিল, কপালের চামড়া নীচ থেকে উপরের উঠে গেছে। চেপে ধরা হাত উপর থেকে নীচে, আস্তে আস্তে নামিয়ে আনলাম। না, আমার মাথার খুলি উড়ে যায়নি, কপালের চামড়াও ছিঁড়ে যায়নি। শুধু কপালের বাম দিকটা ফ্লাশ প্রটেকটরের ধাক্কায় খানিকটা কেটে গেছে। রক্ত ভেজা

হাত মুছে আবার কপালে হাত দিলাম। এর মধ্যেই দুলাল, হালিম এবং ফজলু আমাকে ধরে সামান্য একটু পিছনে সরিয়ে নিয়ে ভেজা রুমাল কপাল বেঁধে দিল। অনভিজ্ঞতায় আকস্মিক ঘটে যাওয়া ঘটনায় খুব লজ্জাবোধ করলাম এবং বুঝতে পারলাম ঐ ব্লান্ডার সাইট থেকে গোলা ছোঁড়ার আগে হাতিয়ারটি সম্পর্কে আরো ভেবে নেয়া উচিত ছিল। যদিও এর আগে মজনুর ব্যবহৃত ব্লান্ডার সাইট থেকে অনেক বার গোলা ছুঁড়েছি। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। তাই এর পর কি করা হবে, তা নিয়ে আলোচনার জন্য সকল কোম্পানী কমান্ডারদের ডেকে পাঠানো হলো। যারা কোম্পানী কমান্ডারদের ডাকতে গিয়েছিল। সবাইকে বার্তা পেঁাছে দিয়ে ফেরার সময় ক্যাপ্টেন হুমায়ুন, সহকারী কমান্ডার আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী ও আরেক জন যোদ্ধার গুরুতর আহত হবার খবর নিয়ে এলো। অবশ্য আহত হবার পর পরই তাদেরকে পিছনে কেদারপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। নাগরপুর যুদ্ধে ছজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হলেও ঐ সময় কেদারপুরে ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী থাকায় এবং সংগে সংগে চিকিৎসা পাওয়ার কারণে সকলে বেঁচে যায়।

ছ জন কোম্পানী কমান্ডার নিয়ে যখন পরবর্তী যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছিলাম, তখন কমান্ডারদের প্রশ্ন করলাম, 'যে থানা দখল করতে আমাদের কয়েক মিনিটের বেশী লাগা উচিত নয় অথচ আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের কয়েক ঘণ্টার প্রবল চাপের মুখেও শত্রু ঘাঁটির কেন পতন ঘটছে না? তা আমি তো কিছুতেই বুঝে পারছিনা? তোমাদের যদি এর অন্তর্নিহিত কারণ জানা থাকে, তা হলে বল। তখনই জানা গেল হানাদার ঘাঁটির পতন না হওয়ার মূল রহস্য। হুমায়ুনের অবর্তমানে তার কোম্পানীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার জানালো, 'স্যার, পূব-দক্ষিণ দিক থেকে যখন আক্রমণ করা হয় তখন হানাদাররা গুটি গুটি পায়ে পশ্চিমে পালাতে শুরু করে। আমরা প্রায় একশ' জন মুক্তিযোদ্ধা দৌড়ে গিয়ে ওদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দিই। ওরা আবার ঘাঁটিতে ফিরে বাংকারে আশ্রয় নেই।' এবার বুঝলাম কেন ঘাঁটির পতন ঘটছেনা। রাতের মত যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দিয়ে নাগরপুর থেকে প্রায় দু'মাইল পূবে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করি। ক্যাপ্টেন সবুর ও মেজর মোস্তফা নাগরপুর থানার এক-দেড় মাইল দক্ষিণে সরে গিয়ে রাত কাটালো। উত্তরের যোদ্ধারাও প্রায় এক-দেড় মাইল পূব-উত্তরে সরে গেল।

পরদিন সকালে নব উদ্যমে থানার উপর মুক্তিযোদ্ধারা পুনর্বার আঘাত হানলো। মুক্তিযোদ্ধারা যেন পণ করে বসেছে, নাগরপুর থানার দখল নিতেই হবে। এটা খুবই সত্য যে, এক হাজার মুক্তিযোদ্ধার সামনে নাগরপুর থানার নব্বই জন পশ্চিম পাকিস্তানী মিলেশিয়া ও একশ' চাল্লশ-দেড়শ' জন রাজাকার কিছুই না। তবুও অবস্থান প্রতিকূল হওয়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের বিধ্বস্ত করতে পারলো না, ঘাঁটি দখল নিতে পারলোনা। ৩০শে নভেম্বর, ও ১লা ডিসেম্বর সকালের কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধে ষোল-সতের জন আহত নিহত ও দুজন হানাদার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়লেও ঘাঁটি হানাদারদের দখলেই থেকে গেল।

১লা ডিসেম্বর সকাল ন'টায় খবর এলো, নাগরপুরের অবরুদ্ধ হানাদারদের উদ্ধারে টাংগাইল থেকে এক ব্যাটেলিয়ন নিয়মিত সৈন্য আসছে। খবর পেয়ে

নাগরপুরে অপেক্ষা করা সমীচীন মনে না করে সবুর ও রবিউলের কোম্পানী নিয়ে এলাসিন ঘাটের দিকে এগিয়ে এলাম। মেজর মোস্তফা ও ক্যাপ্টেন মকবুল হোসেন খোকাকে নাগরপুরের মূল দায়িত্ব দেয়া হলো। এলাসিন খেয়াঘাট পারে এসে শাহজানিচরের কমান্ডার মইনুদ্দীনকে দলসহ পেয়ে গেলাম, তার কাছে এলাসিনের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানলাম। ধলেশ্বরী নদীর উত্তর পারে যে হানাদাররা এসে গেছে, তা একটু একটু দেখা যাচ্ছিল। নদী প্রায় মাইল দেড়েক প্রশস্ত তাই অপর পারের অবস্থা সঠিক বুঝা যাচ্ছিলনা। তবুও মোটামুটি আন্দাজে ক্যাপ্টেন মইনুদ্দীন জানালো, 'হানাদাররা অপর পারে এসে গেছে। মাঝে মাঝে এইচ. এম. জি. থেকে গুলি ছুঁড়ছে বটে, তবে এ পর্যন্ত নদী পার হওয়ার কোন চেষ্টা করেনি। আমরা খেয়া নৌকাগুলো পারে এনে ডুবিয়ে দিয়েছি।' মইনুদ্দীনকে ওখানেই শক্তভাবে অবস্থানে থাকতে বলে নদীর পার ঘেঁষে উত্তর-পশ্চিমে এগোতে লাগলাম। এলাসিন খেয়াঘাটের উত্তর-পশ্চিমে লম্বালম্বি প্রায় এক মাইল প্রশস্তে চর পড়েছে। কোথাও পানির নাম নিশানা নেই; চর বরাবর আধা মাইল প্রশস্তে অপর পার ঘেঁষে নদী বয়ে গেছে। তাই ওখান দিয়েই হানাদারদের পক্ষে নদী পার হওয়া সহজ। একবার তারা যদি পানি পার হয়ে চরের অর্ধেকটা পেরিয়ে আসতে পারে, তাহলে আর ফিরিয়ে রাখা যাবেনা। তাই শক্ত প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তুলতে খেয়াঘাটের উত্তর-পশ্চিমে এগুতে লাগলাম। এলাসিন ঘাট থেকে আধ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক, ধনবাড়ীর আবদুর রাজ্জাক, তার কোম্পানী নিয়ে অবস্থানে ছিল। সেখানে পৌঁছুলে আবদুর রাজ্জাক খুবই আনন্দিত ও গর্বভরে বললো, 'স্যার, আমরা হানাদারদের এগুনো বন্ধ করে দিয়েছি। আজ আর ওদের পক্ষে নদী পার হওয়া সম্ভব হবে না।' উত্তর-পশ্চিমের অবস্থা কি জানতে চাইলে আবদুর রাজ্জাক জানাল তার কোম্পানীর একটি অংশ ওখান থেকে আরো এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে সমগ্র এলাকা জুড়ে অবস্থান নিয়ে আছে। আবদুর রাজ্জাককে উৎসাহিত করে আরও উত্তরে এগুতে থাকলাম। রাজ্জাকের কাছ থেকে দু'শ গজও এগুতে পারিনি বৃষ্টির মতো এইচ. এম. জি.-র গুলি আসতে লাগলো। প্রথমাবস্থায় অপর পার থেকে ছোঁড়া গুলির কোন মূল্যই দিতে চাইনি। কারণ প্রায় দেড়-দুই মাইল দূর থেকে হানাদাররা গুলি ছুঁড়ছে। আমাদের অহংকার ছিল, ওরা তিনশ' গজ দূর থেকেও মুক্তিবাহিনীর গায়ে গুলি লাগতে পারেনা। তাই আবার আড়াই তিন হাজার গজ দূরের গুলি কিভাবে লাগবে। কিন্তু না, মেশিনগানের গুলি আমাদের আশেপাশে সমানে পড়ছে। মেশিনগানের গুলি পাঁচ হাজার গজ দূরেও যদি কারো গায়ে লাগে, তাতে কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে তা আমাদের মোটেই অজানা ছিল না। তাই অবহেলা না করে কিছুর আড়াল নেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফাঁকা জায়গা, ডানে-বামে-পিছনে দু-তিনশ' গজের মধ্যে আড়াল নেবার মত কোন জায়গা নেই। শুধু ধু-ধু বালির চর। খানিকটা সামনে মরা খালের মত একটা জায়গা দেখে দৌড়ে গিয়ে সেই খাদে লাফিয়ে পড়লাম। বেশ কিছু সহযোদ্ধাও আমাকে অনুসরণ করলো। খাদে লাফিয়ে

পরায় হয়ত হানাদাররা আমাদেরকে দৃষ্টি থেকে হারিয়ে ফেলে। কারণ মাইল দেড়েক দূর থেকে কেউ কাউকে খুব একটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলনা। আমরা যেখানে লাফিয়ে পড়েছিলাম, সেখানে নদীর পারে বেশ কয়েকটি বড় বড় নৌকা বাঁধা থাকায় তার আড়াল পেয়ে গেলাম। নৌকার আড়ালে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম, গুলি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন সবুর ও রবিউলকে তাদের কোম্পানী নিয়ে খুব সন্তর্পণে আরো আধ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে অবস্থান নিয়ে আমাকে খবর পাঠাতে বললাম। ক্যাপ্টেন সবুরের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পরই আমরা আরো উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে যাবো। সবুর ও রবিউল, তাদের নিজ নিজ দল নিয়ে নদীর পার ঘেঁষে নিরাপদে নির্বিঘ্নে প্রায় এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

ইত্যবসরে চার-পাঁচ জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে বড় একটি নৌকায় গিয়ে উঠলাম। নৌকাটিতে লবণ ভর্তি। নৌকা ওয়ালাদের বাড়ী রংপুর জেলার গাইবান্ধায়। আজীবন ব্যবসায়ী। নদীপথে নৌকাযোগে তারা ব্যবসা করেন। নৌকার মাল্লাদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এই লবণ কোথা থেকে নিয়ে এলেন? আর ঢাকায়ই বা কি নিয়ে গিয়েছিলেন।' নৌকায় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বললেন,

—আমরা এক সপ্তাহ আগে পাট নিয়ে ঢাকা গিয়েছিলাম।' এই যুদ্ধের সময় নদীপথে যাতায়াতে আপনাদের কোন অসুবিধা হয় না?

—যুদ্ধের শুরুতে যাতায়াতে আমাদের সামান্য অসুবিধা হতো। তবে চার-পাঁচ মাস যাবৎ কোন অসুবিধা নেই। ব্যবসার জন্য মিলিটারীরা তেমন কোন অসুবিধা করেনা। এখন মুক্তিবাহিনীর দিক থেকেও কোন অসুবিধা নেই। কেন নেই, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বেশ কয়েক টুকরো কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই যে, এই কাগজগুলো দেখালেই মুক্তিবাহিনীর দিক থেকে কোন অসুবিধা হয়না। মিলিটারীদের কাছে শুধু লাইসেন্স দেখাতে পারলে আর কোন অসুবিধা নেই। কাগজগুলো খুঁটিয়ে দেখলাম, তের-চৌদ্দ টুকরো কাগজ। তার মধ্যে দশ-এগারো টুকরো কাগজই আমার দলের। কাগজগুলোর প্রত্যেকটিতে আনোয়ারুল আলম শহীদের স্বাক্ষর রয়েছে। চার-পাঁচটি কাগজে আদায়কারী হিসাবে আবদুস সামাদের ও ছ'সাতটিতে আলীম ও মইনুদ্দীনের স্বাক্ষর রয়েছে। কাগজগুলো নদীপথে যাতায়াতকারী ব্যবসায়ীদের মুক্তিবাহিনীকে কর প্রদানের রশিদ। তিনটিতে ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীর স্বাক্ষর রয়েছে। রশিদগুলোর একটিতে সর্বোচ্চ কর ছ'শ কয়েক টাকা। বাকীগুলোতে দু'শ, কোনটাতে দেড়শ', কোনটাতে ষাট-সত্তর টাকা। রশিদগুলো দেখে বেশ কৌতুহল জাগল। অন্যান্য নৌকায়ও একই রকম রশিদ আছে কিনা জানতে চাইলে নৌকার লোকজনেরা অনুরূপ কর প্রদানের রশিদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। সব কটি নৌকায় ব্যবসায়ীদের কাছে ফিরতি পথে তিন দিন আগে স্বাক্ষর করা ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীর রশিদ রয়েছে। অন্যদিকে এক সপ্তাহ আগে, কোনটাতে দশদিন আগে ঢাকা যাওয়ার পথে আবদুল আলীম ও ক্যাপ্টেন মইনুদ্দীনের স্বাক্ষর করা রশিদ রয়েছে, দেখে খুবই উৎফুল্ল হলাম। সর্বত্র যে শৃঙ্খলার সাথে দ্রুত কাজ এগোচ্ছে তা নিয়মিত কর গ্রহণ দেখে বুঝতে পারলাম। ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের কর দিতে অসুবিধা হয় না? আপনারা

কি সবাই স্বেচ্ছায় এই কর দেন ?' ব্যবসায়ীরা বলেন, 'এই কর দিতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। বরং সুবিধাই আছে। মুক্তিবাহিনীকে সামান্য কর দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করি। কর না দিলেই বরং অসুবিধা। করের পরিমাণও মোটেই বেশী নয়। একশ' টাকার জিনিসে মাত্র এক টাকা। তাই আমরা স্বেচ্ছায় কর দিই। এতে নদীপথে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা নিরাপদ হয়েছে।' কথার ফাঁকে একবার নৌকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে বললাম, 'কি, আপনাদের নৌকায় কোন খাবার-দাবার নেই ? নৌকার প্রবীণ লোকটি সানন্দে বললেন,

—নিশ্চয়ই আছে। কিছুক্ষণ আগে আমরা ভাত পাক করেছি। গোলাগুলির চোটে খেতে পারিনি।

—দিন না, আমাদের কিছু খেতে। নৌকার লোকেরা অবাক ! তারা সমস্বরে বলে উঠেন,

—আপনারা আমাদের খাবার খাবেন ?

—কেন খাবোনা ? দিয়েই দেখুননা ! বলতেই নৌকার লোকজনেরা পাঁচ-ছয়জন মুক্তিযোদ্ধাকে টিনের থালা ও মাটির শানকীতে ভাত বেড়ে দিলেন। অন্যান্য নৌকার লোকেরাও সানন্দে দু'এক জন করে তাঁদের নৌকায় নিয়ে খাওয়ালেন।

খাবার শেষে নৌকার লোকজনদের ধন্যবাদ দিয়ে চটপট উত্তর-পশ্চিমে রওনা হলাম। ক্যাপ্টিন সবুর ও কমাণ্ডার রবিউলের কাছে পেঁছালে তারা উভয়েই সামনে এবং উত্তর-পশ্চিমের কিছু এলাকায় তাদের নিজেদের অবস্থান ঠিক আছে বলে জানাল। সবুরকে আমার তিন-চারশ' গজ পিছনে এবং রবিউলকে সবুরের তিন-চারশ' গজ পিছনে থেকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে আরও উত্তর-পশ্চিমে এগোতে থাকলাম। আমাদের উদ্দেশ্য শুকনো চর সামনে রেখে শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করা। সবুর থেকে প্রায় দু'শ গজ এগিয়ে এসেছি। সবুরও রবিউলকে দু'শ গজ পিছনে ফেলে এসেছে। উত্তর-পশ্চিম বরাবর নদীর পার দিয়ে এগুচ্ছি, এমন সময় নদীর অপর পার থেকে আবার অসংখ্য গুলি আসতে থাকে। গুলি এড়ানোর উদ্দেশ্যে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নদীর পারে খোলা প্রান্তরে শুইয়ে পড়াও নিরাপদ নয়। যেকোন ভাবেই একটা আড়াল চাই-ই। একবার নীচু হয়ে আবার সোজা হয়ে উত্তর-পশ্চিম বরাবর দ্রুত ছুটতে লাগলাম। ভাগ্যক্রমে, সোজা পশ্চিমে বয়ে যাওয়া ছোট একটি খালের আড়াল পেয়ে গেলাম। সাথের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় সবাই আমার পিছু পিছু দৌড়ে উলটেপালটে খালের মধ্যে এসে পড়লো এবং তড়িৎ-অবস্থান নিয়ে নিল। এ সময় পাকুল্লার ফজলু হোঁচট খেয়ে কুড়ি-পঁচিশ হাত পিছনে গুলি বৃষ্টির মধ্যে ধানক্ষেতে শুয়ে পড়লো। খালের পারে অবস্থান নিয়ে পিছনে পড়ে থাকা একমাত্র সহযোদ্ধা ফজলুকে চিৎকার করে ডাকলাম, 'তাড়াতাড়ি আয়, না হলে মারা পড়বি।' ডাক শুনে ফজলু আচমকা সম্বিত ফিরে পেল এবং গুলি বৃষ্টির মাঝে দৌড়ে এসে খালে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আমি পূব-দক্ষিণে মুখ করে ধলেশ্বরী নদীর পারে অবস্থান নিয়েছি। সংগে মাত্র আট জন সহযোদ্ধা। বাকীরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার কোন হদিস জানিনা। নীচে তাকাতেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

একি! আমার থেকে মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ গজ নিচে বালুর চরে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন হানাদার খান-সেনা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাল বিলম্ব না করে রাশিয়ান এল. এম. জি থেকে হানাদারদের উপর মুষলধারায় গুলি ছোঁড়া শুরু করলাম। আমার পাশে আবদুল্লাহ্। তার হাতের হাতিয়ারও তখন গর্জে উঠেছে। সে তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে দেখে দেখে, গুনে গুনে হানাদারদের উপর গুলি চালাচ্ছে। হানাদারদের অবস্থান এত খারাপ যে, মার খাওয়া ছাড়া তাদের কোন কিছু করার নেই। অথচ আমাদের অবস্থান পরিবর্তনে কয়েক সেকেন্ড দেরী হলে, এখন হানাদারদের যা ঘটছে তাই-ই উল্টো মুক্তিযোদ্ধাদের ঘটতো। একটু সময় পেলেই হানাদাররা একেবারে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাড়ে এসে চেপে পড়তো। হঠাৎ হানাদারদের একটি গুলি আমার ডান পাশে অবস্থান নেয়া কামুটিয়ার ছানোয়ারের পিঠে এসে লাগে। সে সাথে সাথে নীচে গড়িয়ে পড়ে। ছানোয়ারকে জিজ্ঞেস করলাম,

—তুই পড়ে গেলি কেন? তোর কি হয়েছে?

—আমার গায়ে গুলি লেগেছে।

—কে বলল তোর গায়ে গুলি লেগেছে?

—হ্যাঁ স্যার, আমার গায়ে গুলি লেগেছে।

—আমি বলছি, তোর গায়ে গুলি লাগে নাই।

—তাইলে স্যার আমার গায়ে গুলি লাগে নাই।

—তুই পশ্চিমে চলে যা। ঐ যে বজলুরা গেছে! দে ছুট্। এক দৌড়ে তাদের কাছে চলে যা। খালের পার ঘেঁষে প্রায় তিনশ' গজ পশ্চিমে হালিম, আজাহার, বজলু, মামুদ, দুলাল ও পাকুল্লার ফজলু অবস্থান নিয়েছিল। আমি দেখেছি, ছানোয়ারের পিঠে গুলি লেগেছে। তবুও ছানোয়ারকে ধমকে আরও পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পাঠানো ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমার ধমক খেয়ে ছানোয়ার গুরুতর ক্ষত নিয়েও একদৌড়ে হালিম, আজাহার, বজলু, মামুদ, দুলাল ও পাকুল্লার ফজলু কাছে পৌঁছে যায়। তারা ছানোয়ারকে জাপটে ধরে বলে, 'তুই দৌড়াচ্ছিস কেন? তোর গায়ে গুলি লেগেছে? তোর গা থেকে রক্ত ঝরছে।' ছানোয়ার তখন বেসামাল, মোহাবিষ্টের মত শুধুমাত্র দু'একবার বললো, 'না, স্যার বলেছেন, আমার গায়ে গুলি লাগে নাই।' বলার পরপরই সে সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঘণ্টা খানেক সেবা শুশ্রূষা করার পর আবার তার জ্ঞান ফিরে আসে। অন্যদিকে এগিয়ে আসা হানাদারদের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে বেশ কিছুক্ষণ গুলি চালিয়ে আবদুল্লাহ্‌কে আরো ডাইনে সরে যেতে বললাম। আবদুল্লাহ্ আমাকে একা রেখে সরে যেতে কিছুতেই রাজী নয়। আমি দুই দুই বার ধমক দিয়ে বলার পরও আবদুল্লাহ্ একটুও সরে গেলনা। এর পর আবদুল্লাহ্‌কে আর পীড়াপীড়ি না করে অবস্থাটা কিছু সামলে নিয়ে দুজনেই চট্ করে পশ্চিমে ভাররা বাজারের দিকে সরে গেলাম।

এলাসিন ঘাটে আমার পিছন থেকে আকস্মিক গুলি আসার কারণ কি? আর ক্যাপ্টেন সবুর, ক্যাপ্টেন রবিউল ও ক্যাপ্টেন ফজলুই বা গেল কোথায়?

যখন সবুর ও রবিউলের সঙ্গে কথা বলে উত্তর-পশ্চিমে এগোচ্ছিলাম, ফজলু তখন আমার থেকে প্রায় একশ' গজ পিছনে ছিল। তার শ'গজ পিছনে সবুর। হানাদাররাও সেই সময় নদীর অপর পারে বসে বসে শুধু হাওয়া খায়নি। হানাদারদের একটি দল এলাসিন ঘাট থেকে প্রায় দু'মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরে নদী পার হয়ে নাগরপুরের পারে এসে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল উঁচু পারে, হানাদাররা নদী পার হয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া নদীর পানি ঘেঁষে মুক্তিযোদ্ধাদের নজর এড়িয়ে দক্ষিণ-পূবে এগুতে থাকে। আমি যখন সবুরের কাছ দিয়ে উত্তরে যাচ্ছিলাম তখন হানাদাররা আমাদের বড়জোর একশ' গজ পূবে নীচু তীর ঘেঁষে দক্ষিণে এগুচ্ছিল। আমরা ঐ স্থান ত্যাগ করে ছোট্টখালের আড়াল নেবার একটু পরেই রবিউল যেখানে অবস্থান নেয়, হানাদাররা ঠিক সেইখানে নদীর উঁচুপারে উঠে আসে। ক্যাপ্টেন রবিউল তার সামনে আচমকা বেশ কিছু হানাদার দেখে ভয় পেয়ে যায়। সে নিজেও যেমন গুলি ছোঁড়েনি তেমনি সহযোদ্ধাদেরকেও গুলি ছুঁড়তে নির্দেশ না দিয়ে 'দে ছুট' নীতি অবলম্বন করে। রবিউল 'দে ছুট' দিলেও তার দলের সদস্যরা অসীম সাহসিকতার সাথে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। কমাণ্ডারের নির্দেশ না পাওয়ায় গুলি ছুঁড়তে সামান্য দেরী হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা একটু অসুবিধায় পড়ে। তবুও ক্যাপ্টেন রবিউল পালিয়ে যাওয়ার পরও দুর্জয় যোদ্ধারা হানাদারদের উপর গুলি চালিয়ে তাদের গতি যদি সাময়িকভাবে রোধ করে দিতে না পারত তাহলে ক্যাপ্টেন সবুর ও ক্যাপ্টেন ফজলু সহ প্রায় সত্তর-আশি জন মুক্তিযোদ্ধা নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করতো। আমিও প্রাণে বাঁচতাম কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কমাণ্ডারহীন মুক্তিযোদ্ধারা প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে লড়াই করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আস্তে আস্তে পিছু হটতে থাকে। কিন্তু তাদের দু'জন সহযোদ্ধা হানাদারদের গুলিতে আহত হয়। হানাদারদের প্রচণ্ড চাপের মুখে আহতদের ফেলে নেতৃত্বহীন বাকী যোদ্ধারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ক্যাপ্টেন সবুর ও ক্যাপ্টেন ফজলুর দলের সদস্যরাও আচমকা ঘটে যাওয়া বিপত্তিতে চার-পাঁচ ভাগে এদিক-ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে ছিটকে পড়ে। দশ-বারো জনকে নিয়ে সবুর সোজা দুই-আড়াই মাইল পশ্চিমে চলে যায়। অন্যদিকে ফজলু ছ-সাত জন সহ এলাসিন ঘাট থেকে মাইল খানেক পশ্চিমে গিয়ে তারপর সোজা দক্ষিণে কেদারপুরে পেঁছে যেতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন ফজলু কেদারপুরে পেঁছিবার প্রায় একঘণ্টা আগে

উড়ো খবরে শোকাহত কেদারপুর

ক্যাপ্টেন রবিউল কেদারপুরে পেঁছেছিল। সে কেদারপুরে আনোয়ারুল আলম শহীদ সহ গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকীকে এই বিপর্যয়ের কথা জানিয়েছিল। ক্যাপ্টেন সবুর ও ক্যাপ্টেন ফজলু সহ বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা হানাদারদের হাতে ধরা পড়েছে। সর্বাধিনায়ক তাঁর থেকে দূরে ছিল তাই সে তাঁর সঠিক খবর বলতে পারছেনা। তবে তিনি নিজেও চারদিক থেকে শত্রুর দ্বারা ঘেরাও হয়েছিল, এরপর কি হয়েছে তা সে জানেনা। ক্যাপ্টেন রবিউলের ওই খবরে নেতৃবৃন্দ যারপর নাই ব্যাকুল হয়ে পড়েন। বিশেষ করে গণ-পরিষদ সদস্য বড় ভাই আবদুল লতিফ সিদ্দিকী শিশুর মত অঝোরে কাঁদতে থাকেন। আনোয়ারুল আলম শহীদ ও নুরুন্নবীর চোখেও অশ্রু। নুরু

ও ফারুক হাউমাউ করে ঢুকরে ঢুকরে কাঁদতে থাকে। কারণ যুদ্ধের পুরো সময়টা হানাদার কর্তৃক আমি ঘেরাও হয়েছি, এমন খবর ওরা কখনও পায়নি। আর রবিউলের ভেজা জামা-কাপড়, উদ্‌ভ্রান্ত চোখ-মুখ ও ধূলিমাখা শরীর দেখে তার রিপোর্ট কেউই একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছিলনা। বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী বার বার বুক চাপড়ে, কপালে করাঘাত করে বিলাপ করে বলেছিলেন,

—আমি এলাম আর কাদেরের এমন বিপদ হলো। কাদেরকে আর দেখতে পারো না ? এখন যুদ্ধই বা চলবে কি করে ?' এ সময় কর্নেল ফজলু কেদারপুরে এসে হাজির।

কর্নেলের কীর্তি :

উনি নিজেও ঐদিন এক অদ্ভুত কান্ড বাঁধিয়েছিলেন। আমি যখন আক্রান্ত হই তখন কর্নেল ফজলুর রহমান লাউহাটি থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বীরদর্পে এলাসিনের দিকে আসছিলেন। এলাসিন থেকে আধ-মাইল দক্ষিণে থাকতেই প্রচন্ড গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। কর্নেল সাহেব আর যুদ্ধক্ষেত্র এলাসিন ঘাটে না গিয়ে সবাইকে পিছনে ফেলে কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে সোজা পূব-দক্ষিণে 'দে ছুট্'। এক দৌড়ে লাউহাটি। লাউহাটি গিয়ে প্রকৃতস্থ হয়ে কাপড়-চোপড় বদল করে আবার পূর্বের কর্নেলের বেশে ফিটফাট হয়ে মাত্র কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া নিদারুণ ঘটনাটি বেমালুম ভুলে গিয়ে নতুন কোন খবর আছে কিনা জানার জন্য হম্বিতম্বি করতে করতে কেদারপুরে আসেন। কেদারপুর এসে রবিউলের দেওয়া খবর থেকে উদ্ভূত নাজুক পরিস্থিতি দেখে একেবারে হতবাক হয়ে যায়। শহীদ সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কি ব্যাপার! এম. এ পি সাহেব কাঁদছেন ? ফারুক-নুরুর কি হয়েছে ? আপনারই বা চোখ ছলছল করছে কেন ? কি ব্যাপার ?' শহীদ সাহেব বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'আমি বলতে পারবোনা, আপনি রবিউলের কাছ থেকে শোনেন।' কর্নেল ফজলু ক্যাপ্টেন রবিউলকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, সে টেপ-রেকর্ডারের মত হুবহু একই বর্ণনা দেয়। ক্যাপ্টেন রবিউলের কথা শুনে কর্নেল স্বমূর্তি ধরেন। তার সহযোদ্ধাদের রবিউলকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিলেন। কর্নেল ফজলুর উগ্র, রুদ্র, রূপ এবং রবিউলকে পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধতে দেখে গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী এবং আনোয়ারুল আলম শহীদ সহ সবাই বলেন, 'ওকে বাঁধছেন কেন ? ওর কি দোষ ? যা ঘটেছে ওতো তাই বলেছে।' বিশেষ করে লতিফ সিদ্দিকী বলেন, 'তুই ওকে ছেড়ে দে।' লতিফ সিদ্দিকী ঐ সময় এত ভেঙে পড়েছিলেন যে, কথা বলতে পারছিলেন না। লতিফ সিদ্দিকী এবং কর্নেল ফজলু একসময় টাংগাইল বিবেকানন্দ আশ্রমে একই ক্লাশে পড়তেন। তাই বহুদিন থেকে তাঁদের মধ্যে 'তুই, তুমি' সম্পর্ক।' কর্নেল উত্তেজনায় রাজ্যের সমস্ত উষ্মা ও ক্রোধ প্রকাশ করে উচ্চস্বরে চিৎকার করে লতিফ সিদ্দিকীকে বলেন, 'তুই তো জানিস না। এই হারামজাদা ফট্‌কাবাজরে আমি খুব ভালভাবে চিনি। শহীদ স্যার শুনুন, এইমাত্র আমি এলাসিন থেকে এসেছি। এই হারামজাদা কুত্তা যা বলেছে, সব মিথ্যা! আমার সাথে স্যারের একঘণ্টা আগেও যোগাযোগ হয়েছে। (চোখমুখ খিঁচে, দাঁত কট্‌মট্ করে রবিউলের দিকে তাকিয়ে) এই হারামজাদা শুয়োরের মিথ্যা খবরে আপনারা চিন্তা করছেন!' কর্নেল ফজলুর কথা শুনে

লতিফ সিদ্দিকীর চোখে-মুখে একবার হাসির ঝিলিক খেলে যায়। পরক্ষণেই তিনি অঝরে কেঁদে ফেলেন। অন্য সবার অবস্থাও একই রকম। কোনটা তারা বিশ্বাস করবেন? কর্নেলের কথা? না, প্রত্যক্ষদর্শী রবিউলের কথা? কর্নেল ফজলু চতুর্দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি, আপনারা আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেননা। আমার কথায় একঘণ্টা বিশ্বাস রাখুন, এই হারামজাদা যে আপনাদের মিথ্যা বলেছে, আমি অন্ততঃ তার একটা প্রমাণ দিচ্ছি।' এই বলে কর্নেল ফজলু জোরে জোরে পা ফেলে মাটি কাঁপিয়ে কেদারপুর থেকে আবার লাউহাটির ঘাঁটির দিকে রওনা হলেন। আনোয়ারুল আলম শহীদ সহ সবাই আশার ক্ষীণ আলোটুকু বাঁচিয়ে রেখে কর্নেলের উপরই ভরসা করছেন। উপায় কি? এ ছাড়া তাদের করার আর কি আছে!

আসলে কিন্তু আমার সাথে কর্নেল ফজলুর কোন যোগাযোগ হয়নি। কর্নেলের ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন। কেদারপুর থেকে লাউহাটি আসার পথে ক্যাপ্টেন ফজলুর সাথে তার দেখা হয়ে যায়। কর্নেল যেন আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেন ফজলুর কাছে পই পই করে সব শুনলেন। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিছুই নিশ্চিত হতে পারলেননা। তবুও নৈরাশ্য ও হতাশাজনক অবস্থা সামাল দিতে ফজলুকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ফজলুকে বলেন, 'দেখ্, ব্যাটা তোকে কমাণ্ডার করার সময় আমিও স্যারকে অনুরোধ করেছিলাম। সেজন্য তুই কমাণ্ডার হতে পেরেছিস। একে তো তুই স্যারকে ফেলে পালিয়ে এসেছিস। এ জন্যই তোর গুলি খাওয়া উচিত। এরপরও আমি যা বলি তা যদি তুই ঠিক ঠিক না করিস তাহলে বেটা আমিই তোকে গুলি করব।' ক্যাপ্টেন ফজলুল হককে কর্নেল সাহেব বলে দিলেন, সে যেন শহীদ সাহেবদের বলে—সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানোর জন্যই সর্বাধিনায়ক তাকে কেদারপুরে পাঠিয়েছেন। ফজলুল হক একবার কর্নেলকে অনুনয় করে বলল, 'আমি স্যারের কথা জানিনা, তারপরও এই মিথ্যা কথা কি করে বলবো? সত্যিই যদি স্যারের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে আমার কি উপায় হবে।' কর্নেল সাহেব অগ্নিমূর্তি ধারণ করে তাঁর ডান হাতের বেত বাম হাতের তালুতে জোরে জোরে বার কয়েক ঠুকে বললেন, 'বদমাশ, তোর পরে কি হবে জানিনা। তবে এখন যদি আমার হাত থেকে বাঁচতে চাস্, তাহলে আমি যা যা বলছি, তাই সবাইকে বলবি।' এই বলে ফজলুকে সাথে নিয়ে আবার কেদারপুরে ফিরে গেলেন।

ক্যাপ্টেন ফজলুল হককে দেখে কেদারপুরের সবাইত অবাক। ফজলুল হকও কর্নেল সাহেবের শিখানো বুলি তোতা পাখীর মত গড়গড় করে আউরে গেল। এতে কিছুটা ফল দিল। কেদারপুরের শোকাতুর থমথমে ভাব কিছুটা কেটে গেল। কর্নেল সাহেব নিজের ঘাঁটি লাউহাটিতে না ফিরে, রাতে কেদারপুরে থাকা স্থির করলেন।

আমি এবং সাবদুল্লাহ দ্রুত পশ্চিম দিকে দৌড়ে ভাররা বাজারে এলাম। নদীর পারের চাইতে জায়গাটি অনেকাংশে নিরাপদ। আহত ছানোয়ারকে ভাররা বাজারের একটি দোকানের পাশে বেঞ্চিতে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তার ক্ষত থেকে তখনও

রক্ত ঝরা বন্ধ হয়নি। তার কাঁধের পিছনে গুলি লেগে ছ-সাত ইঞ্চি গভীর গর্ত হয়ে গেছে। গুলিটা সম্ভবত ভিতরেই রয়ে গেছে। কারণ বেরিয়ে যাবার কোন চিহ্ন নেই। ক্ষতের রক্ত-মাংস থক্ থক্ করছে। গুলি লাগার তিন ঘণ্টা পরও তাকে একটুও ঔষধ দেয়া সম্ভব হয়নি। কারণ আমাদের দলের চিকিৎসক আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। একে ত' আমাদের সংখ্যা কম, তার উপর এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে বেশ ক্লান্ত। এরপর যদি আবার মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত হানাদাররা আক্রমণ করে বসে তখন কি করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই আরও নিরাপদ স্থানে সরে যাবার কথা ভাবছিলাম। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ভাবতে ভাবতে এবং ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে গুরুতর আহত ছানোয়ার সহ আমরা ভাররা বাজার থেকে আধ মাইল পশ্চিমে ভাররা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। এখানে উঠে আর এক বিপত্তি বাধলো। ভাররার চেয়ারম্যান মোটেই সুবিধাজনক লোক ছিল না। দালালির অভিযোগে ঐ বাড়ীর কর্তাকে কর্নেল ফজলুর ছোট ভাই মুসা আগস্টের শেষাশেষি গ্রেফতার ও পরে হত্যা করেছিল। শুধু চেয়ারম্যানকে হত্যা করেই মুসা ক্ষান্ত হয়নি। দু'তিনটি ঘর সহ সব কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিল। যদিও মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর এ সার এই কার্যকলাপ অনুমোদন করেননি। সে আমার অনুপস্থিতিতে তখন নিয়ন্ত্রণহীন বিদ্রোহীদের অন্যতম ছিল। এই অননুমোদিত কাজ করায় সদর দপ্তর কৈফিয়ত তলব করলে, মুসা সদর দপ্তরকে কোন পাত্তা না দিয়ে ভারতের দিকে সরে যায় এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর ভারতে পৌঁছালে কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে। যদিও আমার কাছে রিপোর্ট ছিল, মুসা ভাররার চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা করেছে এবং বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবে এই বাড়ীই যে সেই বাড়ী, তা এখানে উঠার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি। সে যাই হোক, ভুলে হলেও চেয়ারম্যানের বাড়ীতে উঠে বাড়ীর করুণ অবস্থা দেখে সত্যিই মর্মাহত হলাম। বাড়ীর লোকেরা মুক্তিযোদ্ধাদের কোন শীতবস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারলোনা। আমরা না খেয়েই কোন প্রকারে রাতটা কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আহত ছানোয়ারকে নিয়ে। প্রায় ছ'সাত ঘণ্টা হয়ে গেল, তাকে কোন ঔষধ দেয়া হয়নি এমনকি কোন পথ্য দেয়াও সম্ভব হয়নি। শুধু কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বার বার বাঁধা ছাড়া। কিন্তু রক্তক্ষরণ কিছুতেই বন্ধ হচ্ছেনা। শীতের রাত অনবরত রক্তক্ষরণে ছানোয়ারের চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাপও অনেক বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় কি করা যায়? শত কষ্টের মাঝেও বাড়ীর মহিলারা আহত মুক্তিযোদ্ধাটিকে শীত থেকে বাঁচাতে শতছিন্ন একটি লেপ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। রাত দশটার দিকে কোনক্রমে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সন্ধান পেয়ে তাকে নিয়ে আসা হলো। তাঁর কাছে একখানা সিরিঞ্জ ছিল। এ. টি. এস এবং কমবাইয়োটিকস ইঞ্জেকশনও তিনি নিয়ে এসেছেন। ইঞ্জেকশন দিতে বলা হলে দেখা গেল ডাক্তার শুধু সিরিঞ্জ ধরে আছেন। তাঁর হাত থর থর করে কাঁপছে। তিনি কিছুতেই এ. টি. এস ইঞ্জেকশনের এ্যাম্পুল ভাঙছেন না বা ভাঙতে পারছেন না। চুপ করে আছেন কেন, জিজ্ঞেস করলে, কাঁদো কাঁদো হয়ে ডাক্তার

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভাররা বাজারে

বললেন, 'আমি স্যার, ইঞ্জেকশন দিতে জানিনা। আমার কাছে এই ঔষধগুলো ছিল। আমাকে ঔষধসহ দু'তিনজনে নিয়ে এসেছে। আমাকে আপনি রক্ষা করুন।' ডাক্তার সত্য কথা বলেছেন। সেই সময় যুদ্ধে আহতদের প্রয়োজনীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররাও রাখতেন যদিও তার ব্যবহার গ্রামাঞ্চলের খুব কম হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারই জানতেন। ডাক্তারের কথা শুনে তার হাত থেকে সিরিঞ্জ এবং ঔষধ নিয়ে গরম পানিতে তাড়াতাড়ি সুঁই ও সিরিঞ্জ ধুয়ে ছানোয়ারের গায়ে গুলি লাগার প্রায় অষ্ট ঘণ্টা পর প্রথম ইঞ্জেকশন দিলাম। এ সময় ঐ বাড়ীর এক যুবক কয়েকটা এ্যাসপ্রো ও নভালজিন ট্যাবলেট কোথা থেকে এনে দিল। দুটি নভালজিন ছানোয়ারকে দেয়া হলো। এরপর উষ্ণ গরম পানিতে ডেটল ঢেলে তুলা ভিজিয়ে কোন রকমে ছানোয়ারের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা হলো। ক্ষতস্থান তুলোতে ঢেকে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাঁধা হলো। ছানোয়ারের গায়ে বেশ জ্বর এসেছিল। সে যন্ত্রণায় প্রচণ্ড ছটফট করে প্রলাপ বকছিল, 'আমি আর বাঁচুমনা। আমি আর মা-বাবারে দেখতে পামু না। স্যার আমারে ফালাইয়া যাইয়েন না। মরলে কবর দিয়া যাইয়েন।' আমরা তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা, সাহস ও উৎসাহ দিলাম। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর তাকে কমবাইয়োটিক্‌স ইঞ্জেকশন দেয়া হলো। এরপর প্রতি দুঘণ্টা পর পর একটি করে কমবাইয়োটিক্‌স ইঞ্জেকশন দেয়া হতে লাগলো। আহত ছানোয়ারকে এ. টি. এস ও আধ ঘণ্টা পর কমবাইয়োটিক্‌স ইঞ্জেকশন দেয়ার পর আজাহার ও বজলুকে ছানোয়ারের পাশে রেখে আমি বাইরে এলাম। আমাদের সংখ্যা তখন একেবারে কম, তার মধ্যে আবার একজন গুরুতর আহত। সর্বদা সতর্ক থাকতে না পারলে যে কোন মুহূর্তে যে কোন দিক থেকে বিপদ ঘটতে পারে। বিপদ যেমন হানাদারদের দিক থেকে ঘটতে পারে, তেমনি মুক্তিবাহিনী এই বাড়ী পুড়িয়েছিল, বাড়ীর কর্তাকে গুলি করে হত্যা করেছিল, সেই কারণেই বাড়ীর লোকজনদের দিক থেকেও আসতে পারে। তাই সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। তবে বাড়ীর লোকজনদের দিক থেকে আন্তরিক আচরণই পাওয়া গিয়েছিল, কোন বিপদ আসেনি। বাইরে এসে বাকী পাঁচ জনকে ডেকে খুব আস্তে আস্তে বললাম, 'যত কষ্টই হোক, আমাদের পর্যায়ক্রমে দুইজনকে সর্বদা সতর্ক পাহারায় থাকতে হবে। একরাত না ঘুমুলে আমরা মরে যাবোনা। কাল সকালেই হয়ত আমাদের খাবার জুটবে। তোমরা একটা রাত কষ্ট কর। ছানোয়ারকে বাঁচানোই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য।' বাড়ীর কাছারি ঘরে থাকার একটা ব্যবস্থা করতে আবদুল্লাহ্ ও দুলালকে নিয়ে কাজে লেগে পড়লাম। পাঁচ জনের থাকার মত জায়গা জুড়ে মাটির উপর বিঘত পুরু খড় বিছিয়ে তা অনেকক্ষণ পাড়িয়ে অনেকটা সমান করে নৌকার ছেঁড়া বাদাস বিছানো হলো, তার উপর আবার একখানা পুরানো চাদর। চাদরের উপর আবার এক-দেড় ফুট পুরু করে খড় বিছিয়ে পাড়িয়ে মসৃণ করে শোবার মত এক অভিনব শয্যা তৈরী হলো। শোবার প্রক্রিয়াটা হলো, আস্তে আস্তে বাদাস ও চাদরের মাঝখানে ঢুকে পড়া। দু'জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে প্রায় চল্লিশ মিনিট পরিশ্রম করে খড়ের দুই পরতের মাঝে কোনরকমে একটি শীতের বিপর্যস্ত রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা হলো। আমার পাহারা রাত দু'টা থেকে

রাত দু'টা পর্যন্ত পাহারায় থাকবে আজাহার ও মাসুদ। পাকুল্লার ফজলু আর বজলু থাকবে ছানোয়ারের শুশ্রূষায়। পরের পালায় আমি, দুলাল, হালিম ও আবদুল্লাহ্। আমি, দুলাল ও হালিম প্রহরায় থাকবো, আবদুল্লাহ্ দেখবে ছানোয়ারকে। সব ব্যবস্থা পাকা করে রাত সোয়া বারোটায় আমি, দুলাল হালিম ও আবদুল্লাহ্ কেবল খড়ের ভাঁজের মধ্যে নিজেদেরকে গলিয়ে দিয়েছি। মাসুদ ডেকে উঠল, 'স্যার স্যার, একজন লোক আপনার সাথে কথা বলতে চান।' প্রথম ডাকেই জবাব দিয়ে খড়ের তৈরী লেপ-তোষকের স্তরের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে এমনভাবে বেরিয়ে এলাম, যাতে উপরের পরতের খড় ছড়িয়ে না যায়। কাছারি ঘরের একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে দেখলাম, দুজন যুবককে সাথে নিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসরের

যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে গেলেই, যুগপৎ তারা সামরিক কায়দায় অভিবাদন করলো। জিজ্ঞেস করতেই মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এই ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে খবর পেয়েছি মুক্তিযোদ্ধারা এদিকে এসেছেন। আমি তাই খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি। আপনি স্বয়ং আছেন, তা অবশ্য জানতামনা।' কিছুটা সন্দিগ্ধ ও কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যে স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার তার কি কোন প্রমাণ আছে?' আগত ভদ্রলোক কোন উচ্চবাচ্য না করে তার লুঙ্গির কোঁচে গোঁজা একখানা ফুলস্কেপ কাগজ বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন। কাগজটি আর কিছু নয়, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তালিকা। তাতে কমান্ডার হিসাবে ভদ্রলোকের নাম পরিষ্কারভাবে লিখা রয়েছে। তালিকাটিতে আমার ও আনোয়ারুল আলম শহীদের স্বাক্ষর আছে। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারের স্বাক্ষরও তালিকাটিতে রয়েছে। তাই যখন তাকে স্বাক্ষর করতে বললাম, তখন তিনি নির্দ্বিধায় তালিকার উল্টোপিঠে তিন-চার বার স্বাক্ষর করলেন। তার স্বাক্ষর তালিকার স্বাক্ষরের সাথে হুবহু মিলে গেল। এরপর আর আমার সন্দেহের কোন অবকাশ থাকলোনা। প্রায় আট-ন'ঘণ্টা বিচ্ছিন্ন থাকার পর এই প্রথম, স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারকে পেয়ে আমরা কিছুটা আশার আলোর ঝিলিক দেখতে পেলাম। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারকে বললাম, 'আপনি যে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার, এতে কোন সন্দেহ নেই। এখন বলুন, আপনি কি করতে পারেন?' আমার কথায় স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার কিছুটা অবাক হলেও, দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'স্যার, যা বলবেন, তাই করতে পারবো।' অনুরোধের সুরে স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারকে বললাম, 'দেখুন, আমাদের একজন আহত হয়েছে। তার জন্য তেমন কোন ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতে পারিনি। আপনি যদি ঔষধপত্রের একটা ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে ভালো হয় এবং আমাদের জন্য দু'একটা শীতবস্ত্র হলে বেঁচে যাই। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার খুব উৎসাহের সাথে বললেন, আমি এক্ষুনি ঔষধ এবং শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করছি।' এই বলে দু'এক পা এগিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন,

—স্যার, আপনারা কি খেয়েছেন?

—না ভাই, খাবারের কোন দরকার নেই। আপনি এই দুইটি কাজ করতে পারলেই যথেষ্ট।

—কেন স্যার খাবার লাগবেনা ? আমি ব্যবস্থা করছি। এই বলে চলে গিয়ে পনের মিনিটের মধ্যে তিন-চার জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে বড় বড় তিনটি লেপ নিয়ে এলেন। অন্যদিকে, প্রায় একই সময়ে দু'জন স্বেচ্ছাসেবক কিছু ঔষধপত্র নিয়ে হাজির। লেপ এবং ঔষধপত্র দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার উৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞেস করলে,

—স্যার, আমার উপর আর কোন আদেশ।

—না ভাই, যথেষ্ট হয়েছে। সকাল হোক। তারপর দেখা যাবে।

—স্যার, হুগরার কোম্পানী কমান্ডার এখান থেকে দেড় মাইল পশ্চিমে আছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আরও দু'তিনটি দল এদিক-ওদিক আছেন। যদিও তাদের সঠিক সংবাদ জানিনা, তবে চেষ্টা করলে রাতের মধ্যেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবো।

—যদি কোন অসুবিধা না হয়, ছত্রভঙ্গ মুক্তিযোদ্ধাদের সংবাদ এনে দিতে পারেন কিনা, একটু চেষ্টা করে দেখুন।

কমান্ডার ভদ্রলোক যারপর নাই দৃঢ়তার সাথে বললেন,

—স্যার, বলেন কি! কিসের কষ্ট! ছ'মাস হয় স্বেচ্ছাসেবক হয়েছি। এমন কোন কাজ নেই যা নির্দেশ পেলে করিনি। সব কাজ আপনার নামে করেছি। আজ আপনি নিজে এসেছেন, তারপরও অসুবিধা হবে! আমাদের কোন অসুবিধা হবেনা। সব দিকে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাচ্ছি। ইনশাল্লাহ্ রাতেই সব খবর পেয়ে যাবো।

বাকী রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলাম। যদিও স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার দেখা করার পর আর তেমন কোন উৎকণ্ঠা ছিল না। এই স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার যেন আল্লাহ্র আশীর্বাদ হিসেবে ১লা ডিসেম্বর রাতে হাজির হলেন। স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডারের সাথে দেখা হওয়ার পনের মিনিট পরে শীতবস্ত্র ও ঔষধ চল্লিশ মিনিটের মধ্যে খাবার, দু'ঘণ্টা পরই কমান্ডার সবুরের সংবাদ, রাত তিনটায় হুগরার কোম্পানী কমান্ডারকে ডেকে আনা—এ সমস্ত কাজ যেন অলৌকিকভাবেই সুসম্পাদন করলেন। ভোর ৪টায় নিজে সবুরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন এবং সকালের খাবারের ব্যবস্থাও তিনিই করলেন। সকাল হতেই অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এলো। তখনও শুধু আহত ছানোয়ারকে নিয়ে কিছুটা অসুবিধা রয়ে গেল। ওকে এখন কি করা যায়? ছানোয়ার খুবই সাহসী যোদ্ধা। জুনের সেই কামুটিয়ার যুদ্ধ থেকে শুরু করে ঢাকা-টাংগাইল সড়ক দখল, বাথুলীর সম্মুখ যুদ্ধ, একদিন আগে নাগরপুর যুদ্ধ— এই সমস্ত যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। যেকোন ভাবে হোক, ছানোয়ারকে সারিয়ে তোলা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সকালেও ছানোয়ারের গায়ে একটি এ্যান্টিবায়োটিক্স ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে। ওর গায়ে তেমন জ্বর নেই। শরীরের ব্যথা-বেদনাও অনেক কমে এসেছে। সকালের রোদে বাড়ীর উঠোনে একটি চেয়ারে ওকে বসানো হলো। চোখ-মুখ ফ্যাকাশে, তবে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মাথা ও গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম,

—চেষ্টা করে দেখ্ তো দাঁড়াতে পারিস কিনা ?

একবার দাঁড়াতে চেষ্টা করেই বসে পড়লো,

—না, স্যার, পারছিনা।

ছানোয়ারের অফুরন্ত মনোবল ও জেদী মানসিকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম। তাই ওর দৃঢ় আস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা নিলাম,

—ছানোয়ার, আমি একটা বিপদে পড়েছি। গতকাল থেকে ভাবছি, কথাটা তোকে কি করে বলি! তুই তো জানিস, যুদ্ধের কোন নিয়ম ভাঙা উচিত নয়।

—হ্যাঁ, স্যার, আপনি তো কোন নিয়ম ভাঙতে পারেননা। আপনি নিয়ম ভাঙলে যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে!

—দেখ্, যুদ্ধে একটা নিয়ম আছে। গুরুতর আহতকে বয়ে নিতে না পারলে এবং তাঁর শত্রুর হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে, নিজেদেরই তাকে গুলি করে মেরে সৎকার করে যেতে হয়। কারণ আহত হয়ে শত্রুর হাতে ধরা পড়লে, শত্রুরা তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে সংগঠনের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে। এখন তুই-ই বল্, আমি কি করি? আমার কথা শুনে ছানোয়ার চমকে উঠলো। সে যেন সামনে একটা ভয়ংকর বিপদসংকুল গভীর খাদ দেখতে পাচ্ছে, পেরোতে না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু। মনে হলো খাদ পেরোনোর ক্ষমতা ও সামর্থ্য তার তখনও আছে।

—হ্যাঁ স্যার, মিলিটারীদের হাতে ধরা পড়লে এর চেয়েও খারাপ হবে। আপনি আর কি করবেন? আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিন। যদি একটু একটু চলতে পারি, তাহলে আমাকে নিয়ে আপনাদের কোন অসুবিধা হবেনা।

ওর কথা শুনে ও অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো—আমার কথা ও পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে। ছানোয়ার আস্তে আস্তে দুই জনের কাঁধে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর এক পা, দু'পা করে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে নিঃশেষিত শক্তির শেষ সঞ্চয়টুকু একত্রিত করে একাই একটা চক্কর দিল। আমি বুঝে নিলাম, ছানোয়ার মনোবল ফিরে পেয়েছে। ভাররা চেয়ারম্যানের বাড়ী থেকে কোনক্রমে যদি ওকে দেড় মাইল পশ্চিমে সরিয়ে নেয়া যায়, তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। নৌকাপথে যেকোন দিক দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। শাহাজানীর 'শান্তি দলের' (গোয়েন্দা বিভাগ) সিরাজ, শহীদ ও অন্য আরও দু'জনকে দূরে ডেকে বললাম,

—যে ভাবেই হোক ছানোয়ারকে শাহাজানী পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্য রাখবে ওর যাতে কোন কষ্ট না হয়। প্রয়োজনে ওকে পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তরে পেঁছে দেয়া তোমাদের প্রধান দায়িত্ব। আমি খবর রাখবো, এই কাজে যেন বিন্দুমাত্র অবহেলা না হয়। ছানোয়ার যদি কোন কারণে মরে যায়, তাহলে তোমাদের দায়ী করে ভবিষ্যতে অন্য দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে বঞ্চিত করা হবে। শান্তিরা নিশ্চয়তা দিয়ে বললো,

—স্যার, যে করেই হোক, আমরা এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো এবং একেবারে পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তরে পেঁছে দেবো। স্যার, দেখবেন, একে সদর দপ্তরে পেঁছে দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার সামনে ইনশাল্লাহ্ হাজির হবো।

২রা ডিসেম্বর সকাল ন'টায় ছানোয়ারকে নিয়ে চারজন শান্তি ও দু'জন স্বেচ্ছাসেবক আস্তে আস্তে গন্তব্যস্থলের দিকে চলে গেল।

এর মিনিট পনের পর আমরাও চেয়ারম্যানের বাড়ী থেকে চটপট বেরিয়ে পড়লাম। ভাররা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার বারোটা পর্যন্ত সাথে থাকবেন।

চেয়ারম্যানের বাড়ী থেকে ভাররা বাজার হয়ে এলাসিন ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছি। এলাসিনের মাইল দেড়েক পশ্চিমে থাকতেই হানাদারদের দেখতে পেলাম। হানাদাররা নাগরপুর থেকে টাংগাইল ফিরছে। সাথে নাগরপুরের অবরুদ্ধদের নিয়ে যাচ্ছে। কমান্ডার সবুর, আজাহার ও হালিম দুরবীন নিয়ে হানাদারদের গতিবিধি ভালোভাবে লক্ষ্য করে রিপোর্ট করে চলেছে। হানাদাররা সংখ্যায় কত, কয়জনকে কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে কতজন নিহত ও আহত হতে পারে। তিনজনে মিলে একের পর এক ধারাবিবরণীর মত রিপোর্ট দিয়ে চলেছে। তাদের রিপোর্ট, হানাদারদের সংখ্যা চারশ'র নীচে নয়, সাথে শতাধিক সাধারণ মানুষ এবং ছয়-সাতটি গরুর গাড়ী। চল্লিশ-পঞ্চাশ জনকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের ধারণা, চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের মধ্যে কম করে কুড়ি জন নিহত ও বাকীরা আহত।

আমাদেরকে প্রায় একঘন্টা ভাররা বাজারের দক্ষিণ-পূবে একটি গাছের নীচে অপেক্ষা করতে হলো। এ সময় দুইজন স্বেচ্ছাসেবক এসে খবর দিল। ঘাটপারে ধানক্ষেতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ পড়ে আছে। খবর শুনে এলাকাটা তন্ন তন্ন করে খোঁজার ইচ্ছা হলো। হানাদাররা নদী পার হয়ে চলে গেলে সহযোদ্ধাদের নিয়ে নদীর পারে যেখানে যেখানে গতকাল মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিল, সেই বিস্তীর্ণ এলাকার ধান ক্ষেতগুলি খোঁজা শুরু করলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি অস্ত্রসহ দু'জন মুক্তিযোদ্ধার লাশ পাওয়া গেল। পাশের গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বললেন, 'এদের দু'জনের একজন সকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। হানাদাররা ঘাটপাড়ে ঘাঁটি গেড়ে থাকায় গ্রামের লোকেরা তাকে তুলে আনতে পারেননি। সকালে হানাদাররা আহত মুক্তিযোদ্ধাটির কাতরানি শুনে বেয়নেট দিয়ে তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। গ্রামবাসীদের কথাই হয়তো ঠিক। কারণ একজনের পাশে পড়ে থাকা রক্ত তখন পর্যন্ত চাপ ধরেনি। এক বুক বেদনা নিয়ে দু'জন শহীদ যোদ্ধার লাশ সহ দুপুর বারোটায় কেদারপুর পৌঁছলাম। আমাকে দেখে আনোয়ার উল আলম শহীদ, গণ-পরিষদ-সদস্য লতিফ সিদ্দিকী সহ সবাই যেমন আনন্দে উদ্বেলিত তেমনি দু'জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার লাশ দেখে ব্যথিত হলেন। দু'জন শহীদ যোদ্ধাকে আমাদের তৈরী ষ্ট্যাম্পে কেদারপুর জুম্মাঘরের সামনের ছ' ডেসিমেল জায়গা কিনে পূর্ণ ধর্মীয় ও সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হলো।

তিনদিন পর আবার কেদারপুরের শিবিরে এসেছি। গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী, আনোয়ার উল আলম শহীদ, ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী ও নুরুন্নবী সহ সবাই আমাকে ঘিরে বসলেন। কর্নেল ফজলুও তখন সেখানে। কর্নেল বললেন,

—স্যার, আপনার সাথে কিছু জরুরী কথা আছে। যা আমি কারো সামনে বলতে চাইনা।

কর্নেল সাহেবের কথা শুনে সবাই উঠে যাচ্ছিলেন। সবাইকে বসিয়ে কর্নেলকে নিয়ে বাইরে গেলাম। কর্নেল সাহেব আগের দিনের সমস্ত ঘটনা খুলে বলে শেষে বললেন,

—স্যার, আমি অন্যায় করে ফেলেছি। শহীদ স্যারসহ সবাইর কান্নাকাটি দেখে আমি আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় আপনার সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছি।

—আপনি ঠিক কাজই করেছেন। এ জন্য আপনি প্রশংসা পাবার যোগ্য।

কেদারপুরে ঐ বিশেষ রাতে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছিল। কর্নেল ফজলুর প্রচণ্ড ধাতানির চোটে ক্যাপ্টেন ফজলু কেদারপুরে পেঁছে। প্রথম অবস্থায়, শিখিয়ে দেয়া কথামতোই রিপোর্ট করেছিল। কিন্তু ফজলু নিজেও যে আমার সম্পর্কে কিছুই জানেনা, তা রাত বারোটার মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যায়। ফজলু আমাকে খুব ভালবাসে এছাড়া সে আমার নিত্য সহচর দলের কমাণ্ডার। একদিকে বয়স কম, তদুপরি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে অন্ততঃ সেই মুহূর্তে পালন করতে না পেরে সোজা কেদারপুর এসে কর্নেলের চোখ রাঙানীতে অনিচ্ছাকৃতভাবে, অবলীলাক্রমে তাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। বিবেকের দংশনে সে ক্ষত বিক্ষত যন্ত্রণায় জর্জরিত। ফিরে আসার পর থেকে সে আদৌ সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। তার চোখ রক্ত জবার মত লাল, শূন্য দৃষ্টি, চোখ দুটি অশ্রুতে ছল ছল করছে, উস্কো-খুস্কো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত মুখাবয়ব দেখে কেদারপুরের অনেকেই আন্দাজ করে নেন ফজলু কিছু একটা লুকাচ্ছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছুতেই সে স্বাভাবিক হতে পারছিলনা। রাতের খাবার দেয়া হলে, ভাল লাগছেনা বলে না খেয়েই উঠে যায়।

কর্নেল উপস্থিত থাকায় ফজলু যেমন মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিলনা, তেমনি অন্যরাও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছিলেননা। রাত বারোটায় ফজলু নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনা, সে ফারুকের কাছে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে, 'ফারুক ভাই, সত্যিকারে আমি স্যারের কোন খবর জানিনা। কর্নেল সাহেবের ধমকে যা বলেছি, সব মিথ্যে। স্যার আমার থেকে প্রায় একশ' গজ উত্তরে ছিলেন। তাকে আমি শুধু উত্তর দিকে চলে যেতে দেখেছি। আমি কোনরকমে দক্ষিণে পালিয়ে এসেছি।' ফজলুর কথা শুনে ফারুক দৌড়ে গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকীর কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে,

'লতিফ ভাই, সব মিথ্যে। ফজলু স্যারের কথা কিছুই জানেনা।' কর্নেল সাহেব একটু সময়ের জন্য কেদারপুর ঘাটে গিয়েছিলেন। তাঁরও প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ছিল। তিনি নিজেও অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার খবর সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। তবে অতীতে সমস্ত রকম বিপর্যয়ে যেভাবে মোকাবেলা করতে দেখেছেন, সেই অভিজ্ঞতা ও সাহস থেকেই তিনি শহীদ সাহেবদের দৃঢ়তার সাথে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। ক্যাপ্টেন ফজলুর স্বীকারোক্তির পর কেদারপুর শিবির আবার স্বজনহারা কান্নায় ভেঙে পড়ে। এই সময় কর্নেল কেদারপুর ঘাট থেকে ফিরে নিদারুণ অসহায় কান্নাকাটি দেখে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে সবাইকে বললেন, 'আপনাদের কি বলবো ? আমার মত একজন দায়িত্বশীল কমাণ্ডারের কথা বিশ্বাস করতে পারেননা, অথচ এক হারামজাদা রবিউল আর এই চ্যাংড়া ফজলু, যার নাক টিপলে এখনও দুধ পড়বে, এদের বিভ্রান্তিকর কথাই আপনারা বিশ্বাস করছেন! ভাবলে আমার লজ্জা হয়, দুঃখও হয়। আমি এলাম একটা ভাল সংবাদ দিতে। এইদিকে আপনারা কাঁদছেন। আপনাদের সংবাদ দিয়ে কি লাভ! আপনাদের মন যতো চায় কেঁদে নিন। আমি চললাম। স্যার আসলেই এর একটা বিহিত করবো।'

কর্নেল ফজলুর রহমান আবার কেদারপুরের ঘাটে চলে গেলেন। বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও নতুন সুসংবাদের একটি শব্দও প্রকাশ করলেননা।

সত্যিকার অর্থেই সেইদিন সামরিকভাবে হলেও কেদারপুর শিবিরের নেতৃস্থানীয়রা বিচার-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রথম রবিউলের নিদারুণ দুঃসংবাদ কেদারপুরের সবাইকে শোকাহত করেছিল। তারপর কর্নেল ফজলু এসে আশার ক্ষীণ আলো জ্বালিয়ে অবস্থা কিছুটা সামাল দিলেও ক্যাপ্টেন ফজলু যখন মিথ্যে বলাটা সবাইর কাছে স্বীকার করলো, তখন তাঁদের মানসিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটলো। অবস্থাটা এমন যে যখন যা বলছে, তাই মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, পরক্ষণেই তাদের মনে হয়েছে, না এটা হতে পারেনা। আমার বিপদের আশংকায় তারা যেমন আশংকিত তেমনি বিপদ মুক্তির কথা শুনতেও আগ্রহী। পর পর তিনজনের বিপরীত ভাষ্য। বিভ্রান্তির পর মহাবিভ্রান্তি, অন্ধকার থেকে মহা অন্ধকারে তাঁরা ক্রমশঃ খেই হারিয়ে ফেলেন। সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে সঠিক কোন সংবাদ না পেয়ে সব কিছু তালগোল ও জট পাকিয়ে ফেললেন। তাঁরা আর কারো কথায় বিশ্বাস রাখতে পারছিলেননা। মনের এই দুঃসহ দোটানার মাঝে রাতটা কাটলো। সকালেও কোন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলেননা। সকালে কর্নেল ফজলু, বিখ্যাত 'সিগন্যালম্যান' ব্যারিষ্টার বাচ্চু, লাউহাটির ফজলু ও বাসাইল-শুন্নার রঙ্গিলাকে ছয়-সাতজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে এলাসিনে পাঠালেন সর্বশেষ খবর সংগ্রহ করতে। তিনি নিজে কেদারপুর থেকে আড়াই-তিন মাইল এলাসিনের দিকে এগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কর্নেল ফজলুর দূতরা যখন এলাসিন ঘাটের দক্ষিণ-পূবে বসে হানাদারদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল, তখন আমরা এলাসিন ঘাটের এক-দেড় মাইল উত্তরে বসে অনুরূপভাবে গতিবিধি দেখছিলাম। হানাদাররা চলে গেলে এলাসিন ঘাটে আসার মিনিট দুই পর দক্ষিণ দিক থেকে উর্ধশ্বাসে বাচ্চুকে ছুটে আসতে দেখলাম। বাচ্চু সহ কর্নেল ফজলুর দলের অন্যান্যরা আমাকে দেখে খুশীতে নাচতে লাগলো। তারা নিজেরাও গত রাতের দুঃসহ যন্ত্রণার শিকার। মহা বিভ্রান্তির ঘন অন্ধকার অবসানে স্বভাবতঃই তারা শিশিরে সূর্যের আলোর মত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তখনও এদের এত আনন্দ-উল্লাসের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলামনা। কিছুটা অবাক হয়ে বাচ্চুকে জিজ্ঞেস করলাম,

—তুই কোথা থেকে এলি ? তোর তো এখানে আসার কথা ছিল না ? প্রধান 'সিগন্যালম্যান' ব্যারিষ্টার বাচ্চু ঘটনার আদ্যোপ্রান্ত খুলে বললো,

—স্যার, আপনি যখন নাগরপুরে চলে যান, তার একটু পরেই হেড-কোয়ার্টার থেকে কেদারপুরে আমি। আপনার সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার। তাই কেদারপুরে অপেক্ষা করছিলাম। গতকাল বিকেলে রবিউল গিয়ে আপনার সম্পর্কে দুঃসংবাদ দেয়ার পর সে যে কি কান্ড ঘটেছে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেননা।

—ঠিক আছে, তোমরা এক্ষুনি কেদারপুরে চলে যাও। আমি ওখানে গিয়েই যা ঘটেছে, তা জানবো। আর শোন, কেদারপুরে ভাল দেখে দু'জনের কবরের জায়গা দেখতে বল।

বাচ্চু ব্যারিস্টার লোকজনসহ দারুণ সুসংবাদ নিয়ে শত মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার মত কেদারপুরের দিকে ছুটলো। মাইল খানেক এগুবার পর কর্নেল সাহেবের সাথে তাদের দেখা হয়ে গেল। আমি দু'ঘণ্টার মধ্যে কেদারপুরে ফিরছি, এই খবর পেয়ে সবাইকে অনেক পিছনে ফেলে আকাশ-বাতাস ধরণী কাঁপিয়ে কর্নেল কেদারপুর শিবিরে উপস্থিত হলেন। তাঁর তখন হাঁটা-চলা, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি সবই আলাদা। উন্নত শির, স্ফীত বুক, চোখে গৌরবের জ্যোতি, ঘন কালো গোঁফের ফাঁকে সবজান্তা হাসির উজ্জ্বল চিকনাই। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত ডিঙিয়ে শক্তিশালী শত্রুর বিষদাঁত ভেঙে বিশাল রাজ্যজয়ের বিজয়ী সেনাপতির ঢঙে নিজস্ব চিরাচরিত স্বাভাবিক চালের সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কচমচ করে বীরদর্পে শিবিরের এদিক-ওদিক ঘুরছেন। হাতের বেত উঁচিয়ে একে-ওকে হাঁক-ডাক করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন, চতুর্দিকে নেতৃস্থানীয় ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের উপর চুপচাপ, 'মজাদেখ' এমন ইঙ্গিতপূর্ণ চাহনী বুলিয়ে নিচ্ছেন। এক সময় কেদারপুর স্বেচ্ছাসেবক কমাণ্ডার সামাদকে ডেকে গলায় যথাসম্ভব গমগমে ভরাট ভাব এনে বললেন, 'দেখ্, কোথাও দু'টা কবরের জন্য ভাল জায়গা বের কর্।' কিসের কবর, কার কবর, কেন কবর, তার কিছুই বলছেন না। শুধু বিজয়গর্বে, এদিক-ওদিক পায়চারী করছেন, আর প্রয়োজনীয় কাজের তদারকি করছেন। কর্নেল সাহেব কাউকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না, কারোর সাথে কোন আলোচনা করছেননা, যা করার একাই করছেন, তাঁর উপরও যে কেদারপুর শিবিরে কোন কমাণ্ডার বা কর্মকর্তা আছে, তা তাঁর হাবভাব দেখে মোটেই মনে হচ্ছিলনা। অবশেষে, অবরুদ্ধ কৌতূহল দমন করতে না পেরে শহীদ সাহেব কোন খবর আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই কর্নেল সাহেব বললেন,—'না, স্যার, আপনাদের সাথে কথা বলে লাভ নেই। আপনারা তো আমার কথা বিশ্বাস করতে চাননা। স্যার আসুক, তাঁকেই সব বলবো।' শহীদ সাহেবের পর একে একে লতিফ সিদ্দিকী, নুরুন্নবী, ডাঃ শাহাজাদা চৌধুরী, ফারুক, নুরু, এমনকি ক্যাপ্টেন ফজলুল হকও বার বার কর্নেল সাহেবের কাছে তাঁর রহস্যময় হাবভাবের প্রেক্ষিতে কিছু জানতে চাইলে একই উত্তর, 'না, আমি কিছু বলতে চাইনা।' ভাবখানা এই যে, এতক্ষণ এত করে বলার পরও তাঁর কথা বিশ্বাস করা হয়নি। এখন তাঁর কাছে সঠিক সংবাদ থাকা সত্ত্বেও তিনি আর ঐ ব্যাপারে 'টুঁ' শব্দটি করতে নারাজ। তিনি যেন অভিমান করে সবার সীমাহীন দুঃসহ কৌতূহল জাগিয়ে পূর্বের অবিশ্বাসের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে চান। এমনি অবস্থাতে দুপুর বারোটার পর কেদারপুরে এসে পৌঁছলাম। সদর দপ্তরের দূত বাচ্চু ব্যারিস্টারের মত কন্দুছ নগর থেকে বিশেষ দূত বাদশাহ্ মিঞাও কেদারপুরে অপেক্ষা করছিল। সে খবর নিয়ে এসেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অফিসার কন্দুছ নগরে এসেছেন। বাদশাহের কাছ থেকে কন্দুছ নগরের সমস্ত সংবাদ জেনে তখনই নুরুন্নবীকে বাদশাহের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। নুরুন্নবীকে নির্দেশ দেয়া হলো, ভারতীয় অফিসারটির সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাৎক্ষণিকভাবে একটি লিখিত রিপোর্ট তৈরী করে পাঠিয়ে দিতে এবং আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর সব রকমের নিরাপত্তা ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতে। নুরুন্নবী ও বাদশাহকে বিদায় জানিয়ে দু'টি বকেয়া কাজে হাত দিলাম।

পন্নীদের বিচার ঃ আক্রালুর অকাল

২০শে নভেম্বর। পাক বাহিনীর প্রথম সারির দালাল করটিয়ার জমিদার খসরু খান পন্নী, তার দুই ছেলে—সেলিম খান ও বাবলু খান পন্নীকে কোমরে দড়ি বেঁধে এলাচীপুর আনা হয়েছিল। তাদের বিচার স্থগিত রয়েছে। ইতিমধ্যে পন্নীদের নিয়ে ছোট-খাটো দু'একটা পরস্পর বিরোধী ঘটনাও ঘটে গেছে। কোন কোন মুক্তিযোদ্ধা পন্নীদের বিন্দুমাত্র মর্যাদা দিতে চায়নি। আবার দু'চারজন আছে যারা হাজার হলেও তো জমিদার, এই সংস্কারে একটু বেশী সুযোগ সুবিধা দেবার চেষ্টা করেছে। গরীবের রক্তশোষক জমিদাররাও তাদের অহংকারী ঠাট-ঠমক বজায় রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। অনেকটা শরৎচন্দ্রের 'নতুন দা'র হারানো পাম্পসু খোঁজার মত।' কোমরে দড়ি বাঁধার সময় তারা মুক্তিযোদ্ধাদের খুব অনুনয় বিনয় করেছিল। কোমরে দড়ি বাঁধলে নাকি মান-সম্মান থাকবেনা। এলাচীপুরে তাদেরকে যখন একটি বাড়ীতে রাখা হয় তখনও সাধারণ মানুষের রক্তের পয়সায় কেনা দুগ্ধ-ধবল-ফেনুনিভ মোলায়েম গদীর মখমলের বিছানায় অভ্যস্ত জমিদাররা সারারণ শক্ত বিছানায় শুতে পারবেন না। গরীব প্রজাদের পিঠে চড়ে তাদেরই পিঠে চাবুক মেরে যারা বেড়ে উঠেছে, তাদের শক্ত সাধারণ মানের কাঠের বেঞ্চিতে বসলে ইজ্জত যাবে, দরিদ্র জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যারা পোলাও কোরমায় অভ্যস্ত, গ্রামের সাধারণ খাবারে তাদের পেট জ্বালা করবে। প্রথম প্রথম এমনি নানা ধরনের অনুযোগ করার পর যখন তারা বুঝলো যে তাদের কোন বিশেষ মর্যাদা দেয়া হবেনা। তখন তাদের শক্ত বিছানা, গ্রামের খাবার, বেঞ্চে বসা, কোন কিছুতেই আর অসুবিধা হয়নি। এলাচীপুর ও লাউহাটিতে রাখার সময়ে লাউহাটির চেয়ারম্যান ও স্বেচ্ছাসেবক কমান্ডার জামাল খাঁ পন্নীদের সাথে অপ্রয়োজনে বার কয়েক দেখা করেছে। কর্নেল ফজলুর রহমানের কাছে কামাল খাঁ একটি লোভনীয় প্রস্তাবও দিয়েছিল। প্রস্তাবটি হলো, দুই-তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করে তাদেরকে ছেড়ে দিলে তারা মুক্তিবাহিনীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। এই সমস্ত কোন ঘটনাই আমার অজানা ছিলনা। তাই অবিলম্বে পন্নীদের ব্যাপারটা সেরে ফেলতে চাই। এই ধরনের জঘন্য প্রকৃতির লোকদের সংস্পর্শে মুক্তিযোদ্ধারা যত কম আসে ততই মঙ্গল।

২রা ডিসেম্বর দুপুরে কেদারপুর বাজারের পাশে খালের ধারে দুটি বিচার অনুষ্ঠিত হলো। প্রথমটি বিচার নয়, শুধুমাত্র শুনানী।

ধৈর্য্য ধরে রবিউলের সমস্ত কথা শুনে সকলকে বললাম,

'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসলে একজন কমান্ডারকে যতটা দায়ী করা উচিত, এই ক্ষেত্রে কমান্ডার রবিউলকে তার চাইতেও বেশী দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। কারণ রবিউল শুধু পালিয়েই আসেনি। তার ভীরুতার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এমনকি দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদৎ বরণ

করেছে। তাই আমি মনে করি, ক্যাপ্টেন রবিউলের ব্যাপারে আরো খুঁটিয়ে দেখে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে বিচার করা উচিত। এজন্য তাকে সদর দপ্তরে সাময়িকভাবে অন্তরীন করে রাখাই উপযুক্ত মনে করছি। এর জন্য একটি ট্রাইবুনাল গঠন করে তাদের হাতে বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

কমান্ডার রবিউলকে সরিয়ে নিলে রাজাকার বানানোর হোতা পাক-হানাদারদের দালাল ও তার দুই ছেলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে হাজির করা হলো। করটিয়ার জঘন্যতম বদমেজাজী জমিদার খসরু খান পন্নী ও তার দুই ছেলে সেলিম খান ও বাবুল খান পন্নীদের প্রথা অনুযায়ী বাঁধন খুলে দেয়া হলো। প্রথমে খসরু খান পন্নীর ছোট ছেলে বাবুল খান পন্নীকে জিজ্ঞেস করা হলো,

—তোমার কিছু বলার আছে ?

—আমাকে কি কারণে ধরে আনা হয়েছে জানিনা। বাবা এবং ভাই বর্তমান সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও আমি মোটেই সক্রিয় নই। আমার আর কিছু বলার নেই।

এ সময় খসরু খান পন্নী বসার জন্য একটি চেয়ার চাইলে তাকে জানিয়ে দেয়া হলো. 'কোন অভিযুক্তকে বিচারের সময় চেয়ার দেয়া হয় না এবং কোন অভিযুক্তকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী 'আপনি' বলে সম্বোধন করেনা। গাদি গাদি টাকা আছে বলে তোমাদের জন্য এই রীতির কোন হেরফের হবেনা।'

এরপর সেলিম খান পন্নীকে গ্রেফতার করে আনার ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে ?

সে বিন্দুমাত্র আত্মপক্ষ সমর্থন না করে বললো,

—আমরা রাজাকার বাহিনী গঠন করেছি। আমরা বুঝতে পারছি অন্যায় হয়ে গেছে। আপনারা আমাদের অর্থদণ্ড করে অন্ততঃ একবার সুযোগ দিন। আমরা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, এরপর সর্বস্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করবো।

পর্যায়ক্রমে খসরু খান পন্নীকে তার কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। খসরু খান পন্নীও সব কিছু অকপটে স্বীকার করে বললো,

—আমাদের ভুল স্বীকার করছি। (একেবারে গলে গিয়ে) বাবা, আপনারা আমাদের অর্থদণ্ড করে মাফ করুন।

—তোমাদের অর্থদণ্ড করা হলে তা কত হতে পারে বলে মনে কর ?

আমার কথা শুনে খসরু খান পন্নী যেন কিছুটা ভরসা পেল। সে বেশ বিগলিত ও উৎসাহিত গলায় বললো,

—আমাদের আগের অবস্থা নেই। বাড়ীতে কোন টাকা-পয়সা নেই। অর্থদণ্ড করা হলে বাড়ীর বউদের গহনা ও বগুড়ার যে জমি আছে তা বিক্রি করে শোধ করতে হবে। সাহেব, আপনিই ভেবেচিন্তে শাস্তি বিধান করুন।

খসরু খান পন্নীকে ব্যঙ্গ করে বললাম,

—না, সাহেব অর্থদণ্ডের পরিমাণ নিরূপন করবেন না। তোমাকেই তিনি পরিমাণটা বলতে বলেছেন।

খসরু খান পন্নী কয়েক বার হাত কচলে বললো,

—দুই লাখ হলে···আমরা কোনরকমে শোধ করতে পারবো। তিন লাখ টাকা হলে···দিতে কষ্ট হবে। আপনি দয়া করে এর মধ্যে একটা সাব্যস্ত করে দিন।

খুব বিরক্ত হয়ে সাংঘাতিক রূঢ়ভাবে বললাম,

—আমি খুব ভাল করেই জানি, তোমাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা-শরম নেই। তুমি যদি আমাকে তোমার জমিদারীর প্রজা ভেবে থাক, তাহলে ভুল করছ। আমি তোমাদের মত লোকের মোসাহেব নই। তুমি কামাল খাঁকে দিয়ে কর্নেল ফজলুকে দুই লক্ষ টাকা পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়েছ। এমনিতেই রাজাকার বানানোর জন্য তোমার হাড়-মাংস কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত। তার উপর আবার মুক্তিবাহিনীকে অর্থের লোভ দেখাচ্ছ? নিশ্চয়ই অর্থদণ্ড হবে, তবে তোমাদের ইচ্ছামত নয়।

এ কথা শুনে খসরু খান পন্নী কেঁদে ভেঙে পড়ে হাত জোর করে বললো,

—বাবা, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করেন। এর চেয়ে বেশী জরিমানা আমরা দিতে পারবোনা।

—শুধু অর্থদণ্ড নয়, বেত্রাঘাতও করা হবে। আমরা খুব ভাল করে জানি, অর্থশালীদের শুধু অর্থদণ্ড তাদের গায়ে-পায়ে বাজেনা। তোমাকে এবং তোমার বড় ছেলেকে মুক্তিবাহিনী গুলি করে মারতো। তবে আর একবার অপরাধগুলো করার জন্য বেত্রাঘাত ও অর্থদণ্ড করে ভবিষ্যতের টোপ হিসেবে রেখে দিচ্ছি। আরেক বার আগের অপরাধগুলোর একটা করলেই মুক্তিবাহিনী তোমাদের পরপারে পাঠিয়ে দেবে।

খসরু খানের বাকশক্তি রহিত, একেবারে থ' মেরে গেল। চোখ মুখ ফ্যাকাসে। তাকে দেখে মনে হবে একটা মৃতদেহকে দাঁড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছে।

'আসামীদের মধ্যে দু'জন খসরু ও সেলিম খান পন্নী হানাদারদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরা দু'জনে মিলে টাংগাইলের চার ভাগের এক ভাগ রাজাকার বানিয়েছে। দু'জনকে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে এবারের মত বেত্রাঘাত ও অর্থদণ্ড করা হলো। বাবুল খান পন্নী হানাদারদের সাথে সক্রিয় না থাকায় তাকে মুক্তি দেয়া হলো। খসরু খান ও সেলিম খান পন্নীর একশ' এক টাকা করে দুইজনের দুইশ' দুই টাকা জরিমানা ও প্রত্যেককে পাঁচটি করে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেয়া হলো। খসরু খান পন্নীর বয়স যেহেতু ষাটের উর্ধ্বে সেইহেতু তাকে মৃদুভাবে বেত্রাঘাত করা হবে। বেত্রাঘাত শেষে এরা পায়ে হেঁটে পাকা সড়ক পর্যন্ত যাবে। কোন যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেনা।' বিচার শেষে কামাল খাঁ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আমাকে অনেকভাবে বললেন,

—স্যার, আমি অমনভাবে বলি নাই। আমাকে পন্নী সাহেব বলেছিলেন তাই আমি কর্নেল সাহেবকে বলেছিলাম এদের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করে ছেড়ে দেয়া যায় কিনা।

—বুঝতে পেরেছি, আপনিও ধনী মানুষ। জমিদাররা আপনার মত ধনী। আর এক সময় তো আপনারা ওদের প্রজা ছিলেন। তাই মনিবের নুনের গুণ

ভুলতে পারেননি। এতে আর আপনার দোষ কি?

বিচার শেষে পন্নীদের বিদায় করে দেয়া হলো। এখানেও কামাল খাঁ নিজের শ্রেণী স্বার্থে নিয়ম বহির্ভূত কাজ করেন। কেদারপুর থেকে পাকা রাস্তার দূরত্ব বারো মাইল। এতটা রাস্তা হেঁটে যেতে সত্যিই খসরু খান পন্নীর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। পন্নীরা যখন কেদারপুর থেকে চার-সাড়ে চার মাইল অতিক্রম করেছেন তখন অন্য পথে কামাল খাঁ দুটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে তাতে জমিদারদের তুলে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। তার ধারণা ছিল, অতো দূরে মুক্তিযোদ্ধারা হয়তো আর লক্ষ্য করবেনা। কিন্তু দুটি গাড়ি যখন বাশাইলের কাছে পেঁছে তখন একদল মুক্তিযোদ্ধা গাড়ির গতি রোধ করে। অপরিচিত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গাড়ির গতি রোধ করায় কামাল খাঁ নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন,

—দয়া করে গাড়ি ছেড়ে দিন। এরা আমার আত্মীয়। আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।

কামাল খাঁর অনুরোধ মুক্তিযোদ্ধারা শোনেনি। গাড়ি থেকে পন্নীদের নামিয়ে নেয়। তাদের এক কথা, 'আপনাদের আবার কেদারপুরে যেতে হবে।' পন্নীরা ঘোড়ার গাড়িতে যেতে চাইলে মুক্তিযোদ্ধারা তাতেও আপত্তি তোলে। বাধ্য হয়ে পন্নীদের আবার প্রায় ছ'মাইল পায়ে হেঁটে সন্ধ্যায় কেদারপুর ফিরে যেতে হয়। পন্নীদের দেখে হাসতে হাসতে বললাম, 'চোর বাটপাড়দের এমনি হয়। তবে নির্দোষ বাবুল খান পন্নীকে মুক্তিযোদ্ধারা ফিরিয়ে এনে ঠিক কাজ করেনি। বাবুল খান পন্নী ইচ্ছে করলে এখান থেকে যে কোনও ভাবে যেতে পারেন। কিন্তু বাকী দু'জনকে অবশ্যই পায়ে হেঁটে পাকা সড়ক পর্যন্ত যেতে হবে। আর একবার ছলের আশ্রয় নিলে গুলি করা হবে।' শওকত আলী ব্যারিস্টারের চাচাতো ভাই লাউহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কামাল খাঁকে কঠোরভাবে বললাম, 'স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আপনার যথেষ্ট অবদান থাকলেও আপনার অতীত কার্যকলাপ খুব প্রশংসনীয় নয়। আপনি আবার এই ধরনের অসৎ পন্থা অবলম্বন করলে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই গুলি করা হবে।'

কামাল খাঁ ভয়ে কাঁপতে থাকে। তাকে যে এইবারই গুলি করা হলোনা, এই পরম সৌভাগ্য। কামাল খাঁ এরপর আর তেমন ছলাকলা করেনি। পন্নীরাও পায়ে হেঁটে ঢাকা-টাংগাইল পাকা সড়ক পর্যন্ত যায়।

আনোয়ার উল আলম শহীদ সহ গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী পরদিন সকালে সদর দপ্তরের উদ্দেশে রওনা হবেন, শহীদ সাহেবদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হলো সফল সিগন্যাল ম্যান বাচ্চু ব্যারিস্টারকে। পাকা সড়কের পশ্চিম পার পর্যন্ত শহীদ সাহেবের দলের নিরাপত্তার দায়িত্ব কর্নেল ফজলুর রহমানের হাতে দেয়া হলো।

কর্নেল ফজলুকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করে টাংগাইল-করটিয়া রাস্তার কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে করটিয়া ও টাংগাইলের উপর চাপ সৃষ্টির নির্দেশ দিয়ে ৩ তারিখ সকালের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই কন্দুছ নগরের দিকে যাত্রা করলাম।

কেদারপুর থেকে সিলিমপুর হয়ে চাড়াবাড়ী-পোড়াবাড়ীর রাস্তা ধরে কন্দুছ

নগর যাবো। সকাল ন'টায় যখন এলাসিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন ক্যাপ্টেন সবুর প্রস্তাব দিল যে, আমাদের কাছে যে উদ্বৃত্ত বিস্ফোরক আছে তা দিয়ে যাবার পথে এলাসিনের পাকা সেতু উড়িয়ে দিলে কেমন হয়? নাগরপুর মুক্ত রাখার জন্য নাগরপুর-টাংগাইল রাস্তা অকেজো করে রাখা একান্ত প্রয়োজন। সেই বিচারে এলাসিনের সেতু ধ্বংসে আমার আপত্তি নেই। সকাল দশটায় এলাসিনের সেতু ধ্বংস করা হলো। এই সেতু ধ্বংস করতে মুক্তিযোদ্ধারা তেমন আনন্দ পাচ্ছিলনা। কারণ সেতু দখল ও ধ্বংস করার জন্য তাদের কোন যুদ্ধ করতে হলোনা। যুদ্ধের উত্তেজনা অনুভব করলোনা, প্রতিপক্ষের কঠিন বাধা চুরমার করে কষ্টার্জিত জয়ের মধুর স্বাদ পেলনা। শত্রুপক্ষের বাঁধার প্রাচীরের সবচেয়ে কঠিন অংশে আমি আঘাত হানবো, এই প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে কেউ নামতে পারলোনা, নিদেনপক্ষে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু করেই রাজাকাররা যেমন প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায়, তেমন কোন ঘটনাও ঘটলোনা। আশেপাশে কোন শত্রুর চিহ্ন নেই। নিরাপদে খালি মাঠে গোল দেয়ার মত পুল ভাঙতে আনন্দ না হবারই কথা। এলাসিন সেতু ধ্বংস পর্ব আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম। সেতু ধ্বংসের পর টাংগাইলের রাস্তা ধরে সোজা সুলতান হাজির বাড়িতে উঠলাম। সুলতান হাজী একজন কোটিপতি লোক। পাক-হানাদারদের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েনি বটে তবে সে স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোকও নয়। এটা তার বহু কর্মকান্ড থেকে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। তাঁকে বাড়ীতে পাওয়া গেলনা। গ্রামের মধ্যে জমিদারী ঢঙে বিরাট বাড়ী। ঘরের ভেতরে চোখ-ধাঁধানো আসবাবপত্রে শান শওকতের ছাপ। এই বাড়ীতেই খাবার ব্যবস্থা করা হলো। চার-পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি গেলাম আটিয়ায় হজরত শাহানশাহের মাজার শরীফে। টাংগাইলের লক্ষ লক্ষ লোক অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে প্রতি বছর আটিয়ার মাজার জিয়ারত করেন। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। জীবনে বহু বার আটিয়া মাজারে গিয়েছি, তবে যুদ্ধকালীন সময়ে এই প্রথম এবং শেষ। মাজার জিয়ারত করে সুলতান হাজীর বাড়ীতে খাবার খেয়ে ভরদুপুরে আবার পশ্চিম-উত্তরে বেরিয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যার একটু আগে চাড়াবাড়ী-পোড়াবাড়ীর এক মাইল উত্তর-পূবে চাড়াবাড়ী-গোয়ালপাড়ায় আকালু মন্ডলের বাড়ীতে এসে হাজির হলাম। এখানে আসার উদ্দেশ্য, বাড়ীর মালিক দুর্দান্ত বদমাইস আকালু মন্ডলকে পাকড়াও করা।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাক-হানাদার বাহিনী মজলুন জননেতা মওলানা ভাসানীর সন্তোষের বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই আকালু মন্ডলই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে।

আগষ্টের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর সংগঠন সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলে চাড়াবাড়ী-গোয়ালপাড়ার আকালু মন্ডল নদীপথে প্রাণভয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়া কিছু শরণার্থীর সর্বস্ব লুট করে নেয়। এমনকি ভারতে পৌঁছে দেবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দু'চারজনের যথাসর্বস্ব মাঝপথে লুট করে নেয়।

টাংগাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক স্বাত্বিক পুরুষ আমার পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে ভারতে পৌঁছে দেবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে

জগন্নাথগঞ্জের কাছাকাছি তাদের সব কিছু লুট করে নিয়ে চম্পট দেয়। হীরেন স্যার অশেষ কষ্ট করে নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে মানকাচরে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর বিশেষ প্রতিনিধি আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিমের হাতে আমার জন্য একখানা পত্র তুলে দেন।

বাবা কাদের,

তুমি কেমন আছ, জানিনা। আমি সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতে এসেছি। আমার সব গেছে তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। কিন্তু অসহায় লোকদের হয়রানির হাত থেকে তুমি রক্ষা করতে পারবে, এটাই আমার আশা। চাড়াবাড়ীর কাছে আকালু মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি আমাকে নিরাপদে ভারতে পেঁছে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে নিয়ে এসে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। এমনকি সে আমাদের মাঝপথে ফেলে পালিয়ে গেছে। শুধু আমাকে নয়, এই রকম অনেক ঘটনা সে নিয়মিত ঘটাচ্ছে। যুদ্ধ ছাড়াও, সম্ভব হলে তোমার এইগুলি দেখা উচিত।

ভগবান তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

তোমার শিক্ষক
হীরেন চক্রবর্তী
২৫-১০-৭১

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হীরেন স্যারের পত্র পেয়ে আমার গায়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা। স্থলপথ ও জলপথ নিরাপদ করা। আমরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছি। আমার অবর্তমানে আকালু মণ্ডলের এই তস্করীর কথা শুনে বিশেষ করে স্যারের চিঠি পেয়ে আকালু মণ্ডলকে ধরে আনার জন্যে কয়েকটি কোম্পানীর উপর দায়িত্ব দিই। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, দাইন্যার ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী। নিয়ত আলী চাচা দু'তিনবার আকালু মণ্ডলের বাড়ী ঘেরাও করে কিন্তু আকালু মণ্ডল কাকের চেয়েও চালাক। সে প্রতিবারেই ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী চাচার হাত থেকে ফসকে যায়। মেজর মাইন উদ্দীনের কোম্পানী একবার আকালু মণ্ডলকে ধরি ধরি করেও হারিয়ে ফেলে। সেহেতু আমি নিজে ছ'সাত দিন আগে থেকে খোঁজখবর নিয়ে আকালু মণ্ডলকে জালে ফেলার পরিকল্পনা করি।

আকালু মণ্ডলের জানা ছিল, মুক্তিবাহিনীর কোন বড়সড় দল তখন তার গ্রামের আশেপাশে নেই। আর আমিও যে তখন অনেক দক্ষিণে এটা ধূর্ত আকালু মণ্ডলের অজানা ছিল না। সিলিমপুর থেকে আকালু মণ্ডলের বাড়ী প্রায় পনের-ষোল মাইল। সিলিমপুর থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাওয়ার বেগে ছুটেছি। এতো দ্রুত ছোটার কারণ, চলতি পথে সহযোদ্ধারা বুঝতে না পারলেও আকালু মণ্ডলের বাড়ী ঘেরাও করে তাকে যখন পিছন বাড়ীর জঙ্গল থেকে ছোঁ মেরে ধরে আনা হলো, তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটার কারণ সহযোদ্ধাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। শুধু মণ্ডলকে ধরা নয়, আমরা ঠিক করলাম, বাড়ীটাও পুড়িয়ে দেবো। সেইমত, আধ ঘণ্টার মধ্যে

বাড়ী পুড়িয়ে দেয়ার কথা মহিলাসহ অন্যান্যদের জানিয়ে দেয়া হলো। তাদের বলা হলো, তাঁরা নিজস্ব ব্যবহারিক জিনিসপত্র ও খাদ্য-দ্রব্য সরিয়ে ফেলতে পারবেন। আমরা যখন বললাম, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে নেয়া যাবে, তখন দেখা গেল বাড়ীর লোকজনদের কাছে সমস্ত জিনিসপত্রই প্রয়োজনীয়। যে যা পারছেন, সরাচ্ছেন। প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রই আগে সরাচ্ছেন। তাঁদের সরানোর ঢঙ দেখে মনে হচ্ছিল দু'তিন দিনেও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরানো শেষ হবেনা আর মুক্তিযোদ্ধারাও বাড়ীতে আগুন দিতে পারবেনা।

আকালু মণ্ডলকে হাত-পা বেঁধে বাড়ীর সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আধঘণ্টা শেষ হলে, ক্যাপ্টেন সবুর বাড়ীর ভেতর গিয়ে লোকজনদের গদাই-লস্করী কর্মকাণ্ড দেখে, ফিরে এসে বললো, 'স্যার, এরা যে তালে কাম করতাছে তয় একমাসেও এগোর দরকারী জিনিস সরানো শেষ অইবোনা। আপনি যে কি অঠার দিলাইন, স্যার। অখন কি করমু স্যার?'

সবুরকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দিলাম, 'তুমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে বল, আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো। এরপর ঘরে আগুন দেয়া হবে। তাই নেহায়েত যেটা প্রয়োজন, তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যান।' সত্যি করেই পাঁচ মিনিট পর কাচারি ঘরে প্রথম আগুন দেয়া হলো। আকালু মণ্ডলের বাড়ীতে ছ'সাতটি ঘর। গোলাঘরে তখন পঞ্চাশ-ষাট মণ ধান-চাল ছিল। কাচারি ঘরে আগুন জ্বলে উঠলে নিজে বাড়ীর ভেতর গিয়ে কয়েকজনকে ডেকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললাম, 'এক মিনিটে গোলাঘরের সমস্ত ধান-চাউল বের করে ফেল।' ধমক খেয়ে দশ-বারোজন ঝড়ের বেগে গোলাঘর থেকে ধান-চাল বের করা শুরু করলেন। কুড়ি-পঁচিশ জন মুক্তিযোদ্ধাও তাঁদের সাথে হাত লাগালো। নির্ধারিত এক মিনিটে অবশ্য পঞ্চাশ-ষাট মণ ধান-চাল তাঁরা বের করতে পারলেন না কিন্তু দ্রুততার সাথে কাজ করায়, পুরো ধান-চাল বের করতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগলোনা। ক্যাপ্টেন সবুর একটার পর একটা ঘরে আগুন দিয়ে চলেছে। বাড়ীর উঠোনে স্তূপ করে রাখা ধান-চাউলের উপর ছালা ও তালাই চাপিয়ে পানি ঢেলে ভিজিয়ে দেয়া হলো। তদুপরি পনের-কুড়িটা কলাগাছ এনে ধান-চালের স্তূপের উপর ফেলা হলো। ক্যাপ্টেন সবুর সবশেষে শূন্য গোলা-ঘরটিতে আগুন দিল। দাউ দাউ করে ঘর গুলি জ্বলছে। আগুনের প্রচণ্ড তাপে টেকা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়লো। মুক্তিযোদ্ধারা বাধ্য হয়ে বাড়ী থেকে প্রায় দু'তিনশ' গজ দূরে সরে গেল। আকালু মণ্ডলের বাড়ীর আগুনে তখন সমস্ত এলাকাটা লালে লাল হয়ে উঠেছে। আগুন একটু নিস্তেজ ও ঝিমিয়ে পড়ল আমরা আরও উত্তরে এগোতে শুরু করলাম। সাথে হাতে ও কোমরে দড়ি বাঁধা দুর্দান্ত দুষ্ট প্রকৃতির সেই আকালু মণ্ডল।

ছত্রীসেনা অবতরণ পরিকল্পনা

৩রা ডিসেম্বর গভীর রাতে চৌধুরী মালঞ্চরের একটি বাড়ীতে উঠলাম। চৌধুরী মালঞ্চের জীর্ণ বাড়ীতে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে আবার রওনা হলাম। সকাল আটটায় জোগারচর খেয়া পার হবো এই সময় ধলেশ্বরী নদীর বারুই-পোটলের দিক থেকে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা দৌড়ে এসে খবর দিল, নুরুন্নবী সেখানে আছে। খবর পেয়ে আর উত্তরে না গিয়ে আধমাইল পশ্চিমে জোগারচরের ধলেশ্বরীর মোহনায় হাজির হলাম। নদীর পারে ছোট্ট দুটি নৌকা। দুটি নৌকাতেই মুক্তিযোদ্ধারা রয়েছে। নুরুন্নবী অনেক দূর এগিয়ে এসে স্বাগত জানালো। নুরুন্নবীকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলাম,

—কি খবর? অতিথি ভালো আছেন তো? নিরাপদ বোধ করছেন তো?

—হ্যাঁ স্যার, অতিথির কোন অস্বস্তি ভাব নেই। উনি বোধহয় নিরাপদ বোধ করছেন।'

আমি নৌকার কাছে গেলে সাধারণ পোষাক পরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পিটার নৌকা থেকে নেমে অভিবাদন করলেন। অভিবাদনের জবাব দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। উষ্ণ আলিঙ্গন শেষে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে নৌকার ভেতরে গেলাম।

ভারতীয় সামরিক অফিসারটির নাম ক্যাপ্টেন পিটার বলা হলেও তার নাম আদৌ ক্যাপ্টেন পিটার নয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনি একজন মেজর। তবে আমরা তাঁকে তাঁর ছদ্মনাম ক্যাপ্টেন পিটার বলেই অভিহিত করবো। ক্যাপ্টেন পিটারই হয়ত একমাত্র ভারতীয় সামরিক অফিসার, যিনি ২৮শে নভেম্বর রওনা হয়ে ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের দু'শ মাইল অভ্যন্তরে এসেছেন। নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত আর কোন ভারতীয় অফিসার হয়ত বাংলাদেশের এত গভীর অভ্যন্তরে এমনভাবে একা প্রবেশ করেননি।

ক্যাপ্টেন পিটার টাংগাইলে এসেছেন মূলতঃ আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্ত এলাকায় নিরাপদে ভারতীয় ছত্রীবাহিনী নামানোর জায়গা নির্ধারণ ও জায়গাগুলোর ম্যাপ-পয়েন্ট হাইকমান্ডের কাছে পাঠানো। শত্রুঘাঁটিগুলোর উপর আমরা বিমান সাহায্য চাইলে ম্যাপ-পয়েন্ট ঠিক করে এয়ার ব্যাজে সংবাদ দেয়া। আমি বিমান সাহায্য চাইলে ভারতীয় বিমান বাহিনী যে সেই সাহায্য দেবেন তা তাঁরা নুরুন্নবীকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন পিটার এসে পৌঁছায় বিমান সাহায্য চাওয়া আরো সুবিধা হলো।

টাংগাইল ময়মনসিংহে হানাদার পাক-বাহিনীর অবস্থান এবং তাদের শক্তি সামর্থের মোটামুটি একটা প্রত্যক্ষ ধারণা অর্জন করে পরবর্তী আক্রমণের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। দায়িত্বগুলি ক্যাপ্টেন পিটার খুব দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। তার প্রমাণ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে

ডিভিশন ময়মনসিংহ-জামালপুর-টাংগাইল প্রবেশ করেছিল সেই কলামই মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় পূর্ব পরিকল্পনা ও যথোপযুক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম না থাকার পরও ঢাকায় প্রথম প্রবেশ করে এবং মেজর জেনারেল জামশেদ ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির কাছ থেকে আত্মসমর্পণের সম্মতি আদায় করে।

যখন ক্যাপ্টেন পিটারের সাথে কথা বলছিলাম, তখন একটি সফল অভিযানের খবর এলো। অভিযানের নেতা স্বয়ং এসেছেন। ২৭শে নভেম্বর এলাচিপুরে মেজর আনিসকে বাহাদুরাবাদ ফেরী ঘাট ধ্বংস করার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। আনিস আগ্রহভরে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। সে আমাকে অনুরোধ করেছিল, যেহেতু তার বাড়ি সরিষাবাড়ীতে সেইহেতু বাহাদুরাবাদ ঘাটের ফেরী ডুবানোর দায়িত্ব তাকেই দেয়া হোক। এমনিতেই জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের উপর নজর রাখার দায়িত্ব তার কাঁধে আগে থেকেই ছিল। ১লা ডিসেম্বর রাত দশটায় বারোজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মেজর আনিস বাহাদুরাবাদ ঘাটের দশ মাইল উজানে ম্যাগনেটিক মাইন সহ তিস্তা, ধলেশ্বরী ব্রহ্মপুত্রের পানিতে নেমে পড়ে। তাদের প্রত্যেকের কাছে দুটি করে মাইন। সাথে টাইম ফিউজ। ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার, ঠাণ্ডা পানিতে এক ঘন্টা ভাটিপথে সাঁতার কেটে তারা বাহাদুরাবাদ ঘাটে আসে। স্রোতের টানে ভাটিপথে ফেরীগুলোর একেবারে গা ঘেঁষে যাবার সময় টাইম ফিউজের বোতাম টিপে মাইনগুলো ছেড়ে দেয়। মাইনগুলো চুম্বক আকর্ষণে আপনা-আপনি চারটি ফেরী ও একটি জেটির গায়ে আটকে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা চার মাইল ভাটিতে আসতেই বাহাদুরাবাদ ঘাটে কেয়ামতের আলামত শুরু হয়। দশ মিনিটে চব্বিশটি মাইনের ভয়ংকর বিস্ফোরণে চারটি প্রধান ফেরীসহ মূল জেটিটি নদীর গর্ভে ডুবে যেতে থাকে। মাইন বিস্ফোরণে পাহারারত চার-পাঁচজন রাজাকারও মারা যায়।

মেজর আনিস এই অভূত পূর্ব সফল অভিযানের সংবাদ দিতে নিজেই এসেছে। শুভ সংবাদে ছোট-খাটো মেজর আনিসকে বুকে জড়িয়ে আনন্দে নাচতে লাগলাম। আনিসকে নিয়ে কি যে করবো, কখনও বুকে, কখনও কোলে, কখনও বা কাঁধে তুলে নেয়ার পরও ভেবে পাচ্ছিলামনা। পরবর্তী যুদ্ধের জন্য বাহাদুরাবাদ ঘাট অচল করে ফেলা যে কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তা যে কোনো সমর কুশলীই অনুধাবন করতে পারবেন। বাহাদুরাবাদ ঘাট অচল করে দিতে মুক্তিবাহিনীকে অনুরোধ করতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন পিটারকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন পিটার নুরুন্নবীকে সে কথা বলেছিলেনও। হয়তো আর একটু সময় পেলে আমাকেও বলতেন। কিন্তু একি অদ্ভুত যোগাযোগ! অনুরোধের আগেই বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট এমন লণ্ডভণ্ড, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সংবাদ শুনে ক্যাপ্টেন পিটার কিছুটা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর মনোভাব গোপন না রেখে খোলাখুলিভাবে আমাকে বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, আপনার এই কমান্ডার সাহেব কি করে এত দ্রুত ও নিখুঁতভাবে বাহাদুরাবাদ ঘাট অচল করে দিলেন। আর উনাকেই বা কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন পিটারকে কাছে টেনে বললাম, 'নির্দেশটা আমিই দিয়েছিলাম। যুদ্ধের জন্য ঘাট অচল করা খুবই জরুরী। বাহাদুরাবাদ ঘাট অচল করে দিতে আমার কাছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষেরও একটা অনুরোধ ছিল।' ক্যাপ্টেন পিটার সোল্লাসে বলে

উঠলেন, 'আমার হয়ত আপনার সাথে অনেক সময় থাকতে হবে। সবাই আপনাকে 'স্যার' সম্বোধন করছেন। আমি আলাদা থাকতে চাইছিনা। আমিও আপনার দলের হয়ে যাচ্ছি। আমি আপনাকে এখন থেকে 'স্যার' সম্বোধন করবো। স্যার, এবার বলুন, ঐ সামান্য অনুরোধে আপনি বাহাদুরাবাদ ঘাট অচল করে দিলেন, এটা যে আমার কাছে অবিশ্বাস্য। পূর্বের অনুরোধ কার্যকরী করতে আমাকে বলা হয়েছিল। আমি আপনার সম্পর্কে আগে প্রায় একমাস অনেক কিছু শুনেছি। এখন দেখছি, আপনার এবং আপনার দল সম্পর্কে আমি খুব সামান্যই শুনেছি।' ক্যাপ্টেন পিটারের পিঠ আলতোভাবে চাপড়ে দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে ভাই. আমাদের সঙ্গে যখন থাকছেন যতটুকু যা শোনার এবং দেখার, তা দেখেশুনে নিতে পারবেন।' ক্যাপ্টেন পিটারের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়ে সাংগঠনিক কাজে একটু সময়ের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। ক্যাপ্টেনকে বলে গেলাম, 'রাতে আবার দেখা হবে। তখন ম্যাপ নিয়ে বসবো! আজ রাতেই ম্যাপের কাজ সেরে ফেলতে চাই।'

পোটল ইউনিয়ন অফিস থেকে নানা জায়গায় দূত পাঠানোর কাজ শুরু হলো। মল্লা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে আগেই আকালু মণ্ডলকে হেড-কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। মেজর আবদুল হাকিম, কমাণ্ডার আঙ্গুর, কমাণ্ডার আরজু, মেজর আনিস, ক্যাপ্টেন চাঁন মিঞা, ক্যাপ্টেন ইউনুস, ক্যাপ্টেন হবি, মেজর হাবিব, ক্যাপ্টেন বকুল, ক্যাপ্টেন মান্নান, ক্যাপ্টেন মোজাম্মেল, ক্যাপ্টেন রেজাউল করিম তরফদার, সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন বেনু, ক্যাপ্টেন হাবিব, ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ, মেজর মোস্তফা, ক্যাপ্টেন কাজী নুরু, ক্যাপ্টেন আবদুর রাজ্জাক, ক্যাপ্টেন আবদুল হাই ও মেজর তারা সহ।

প্রায় সত্তর জন কোম্পানী কমাণ্ডারকে তাদের কোম্পানীসহ কন্দুছ নগরের আশে-পাশে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বার্তা পাঠানো হলো। বার্তা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর দূতেরা যার যার গন্তব্যের দিকে ছুটলো। দূত পাঠানোর পর ক্যাপ্টেন আমানউল্লাহর কোম্পানী নিয়ে কন্দুছনগর-টাংগাইল সড়কে এসে উঠলাম। উদ্দেশ্য কন্দুছ নগর কিভাবে আরো নিরাপদ রাখা যায়। প্রয়োজনে কন্দুছ নগর টাংগাইল সড়কের আরো সেতু ধ্বংস করে ফেলা হবে। পাইলমা সেতুটি আগেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। ফুলতলার দক্ষিণের সেতুটিও ধ্বংস করে দেয়া প্রয়োজন মনে হলো। ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহকে সেতুটি উড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়ে তখনই জোগারচরের বারুই পটলের পথ ধরলাম।

ধলেশ্বরী নদীর বুকে নৌকায় রাতের খাবার শেষে ক্যাপ্টেন পিটারের সাথে ম্যাপ নিয়ে বসলাম। চারিদিকে নিস্তব্ধতা। নৌকায় জলের আঘাত লেগে একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সিম্ফনি। শীতের গভীর হিম রাতের ঘুম ভাঙিয়ে উত্তপ্ত ও উত্যক্ত করে মাঝে মধ্যে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে গুলি-গোলার শব্দ। দূর গ্রামে সচকিত মারমেয়ের থেমে থেমে শীতার্ত কাতর চিৎকার আর নদীর উপর বয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার মৃদু সোঁ সোঁ ধ্বনির ঐক্যতান ছাড়া সর্বত্র এক নীরবতা। নৌকার ভেতরে ছোট্ট টিমটিমে কেরোসিন একটি বাতীর মলিন আলো ঘিরে দেশ মাতৃকার মুক্তির সাধনায় নিবেদিত কয়েকটি উজ্জ্বল মুখ, তাদের সকলের দৃষ্টি সামনে ম্যাপের

উপর। সামান্য ঝুঁকে, উৎসাহ আর কৌতুহল নিয়ে আমাকে আর ক্যাপ্টিনকে ঘিরে রয়েছে, নুরুন্নবী, ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর, গৌরাঙ্গীর আবদুল লতিফ ও ক্যাপ্টেন ফজলুল হক। আমি ও ক্যাপ্টেন পিটার ছাড়া আর কারোরই ম্যাপ সম্পর্কে ধারণা নেই, তবুও তাদের আগ্রহের বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিল না। আমি আদৌ ম্যাপ পড়তে জানি কিনা সেটাও ক্যাপ্টেন পিটার জানেননা। ক্যাপ্টেন পিটারের কাছে টাংগাইলের কোয়ার্টার ইঞ্চি সমান এক মাইল। এক ইঞ্চি সমান এক মাইল—এই দুই ধরনের সামরিক ম্যাপ ছিল। ক্যাপ্টেন পিটার সযত্নে রাখা ম্যাপ দুটি থলি থেকে বের করে বললেন, 'এটা টাংগাইল সহ আশেপাশের এলাকার এক ইঞ্চি এক মাইল ম্যাপ। এর চার পাশে আরও ম্যাপ ছিল। তবে সেইটুকুর আমাদের দরকার নেই বলে বাদ দিয়ে দিয়েছি। দিক নির্দেশ করে, 'ম্যাপের এটা উত্তর, এটা দক্ষিণ।' (ম্যাপের একটি জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে) 'খুব সম্ভবত আমরা এখানে বসে আছি। পর পর কয়েকটি পয়েন্ট নির্দেশ করে—এই টাংগাইল, এই কালিহাতী এই কস্তুর নগর, এই যে ধলেশ্বরী, যমুনা নদী।' ক্যাপ্টেন পিটার আরো একটু এগুতে যাবেন, এই সময় ম্যাপের একটি জায়গা দেখিয়ে বললাম, 'এই যে এইখানে হয়তো আমাদের হেড-কোয়ার্টার, আর এটা খুব সম্ভবত পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ময়মনসিংহ যাওয়ার কাঁচা রাস্তা।' আর বেশী বলতে হলোনা, ক্যাপ্টেন ম্যাপ থেকে চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে মুগ্ধ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'স্যার, আপনি তাহলে ম্যাপ পড়তে জানেন ?'

—হ্যাঁ, কিছু কিছু। আমার কাছেও একই ধরনের ম্যাপ আছে তো, তাই জায়গাগুলো আগে থেকেই চেনা।

—না, স্যার, আপনি ম্যাপ পড়তে জানেন। আপনি ম্যাপ পড়তে জানায় আমার সমস্যা অর্ধেকটা কমে গেল। স্যার, আমাদের কয়েকটা নিরাপদ ম্যাপ পয়েন্ট বের করতে হবে এবং তা লোক মারফত কালকের মধ্যেই পাঠিয়ে দেয়া উচিত। বেতারে বিশেষ সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে বার্তা পাঠানোর চেষ্টাও করবো। এই ম্যাপ পয়েন্টগুলি পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

দীর্ঘ সময় ধরে নিরাপদ স্থান নির্ধারণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলো। টাংগাইল থেকে ছয়-সাত মাইল উত্তর, পূব ও পশ্চিমে যে কোন দিকে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত হতে পারে। চিহ্নিত স্থান থেকে খুব তাড়াতাড়ি ভারী গাড়িগুলি যাতে পাকা সড়ক পর্যন্ত অনায়াসে পৌঁছাতে পারে, সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া ছত্রীসেনা অবতরণের পর কম করে এক ঘন্টা তাদের (ছত্রীসেনাদের) উপর সম্ভাব্য যেকোন হামলা মুক্তিবাহিনীকেই ঠেকাতে হবে। সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে ছত্রীসেনা অবতরণের তিনটি স্থান প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হলো।

এক। ঘাটাইল থানার ব্রাহ্মণশাসন-মোগলপাড়ার পশ্চিমে—চার-পাঁচ মাইল লম্বা দুই-আড়াই মাইল পাশ গোরাঙ্গীর চক (মাঠ)।

দুই। কালিহাতী থানার বাংড়া-শোলাকুরার উত্তরে পাঁচ-ছয় বর্গমাইল বিস্তীর্ণ একটি চক।

তিন। কালিহাতী থানার ইছাপুর-সহদেবপুরের দক্ষিণে পাঠনের পূবে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা চক।

তিনটি জায়গার মধ্যে বেশী প্রাধান্য দেয়া হলো ব্রাহ্মণশাসন-মোগলপাড়ার পশ্চিমে গৌরাঙ্গীর চকটিকে। এই চকে যেমন প্রয়োজনে বিমান নামানো সম্ভব, তেমনি হানাদারদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাও মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সহজ। দ্বিতীয় প্রাধান্য দেয়া হলো—৩নং স্থানটি অর্থাৎ ইচ্ছাপুর-সহদেবপুরের দক্ষিণে পাঠনের উত্তর-পূবের অপেক্ষাকৃত ছোট চকটিকে। এইটিও মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নিরাপদ রাখা সহজ। ২নং স্থানটি অর্থাৎ বাংড়া ও শোলাকুরার উত্তরের চক। তিনটি স্থানের মধ্যে সবচেয়ে আয়তনে বড় হলেও স্থানটি মুক্তিবাহিনীর পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। অনেক আলাপ-আলোচনা করে তিনটিরই ম্যাপ পয়েন্ট ডিগ্রীসহ চিহ্নিত করে পরদিন সকালে আবার সেই বাদশা মিঞাকে ভারতে পাঠানো হলো। অন্যদিকে বেতারে বিশেষ সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে হেড-কোয়ার্টারকে জানিয়ে দেয়া হলো।

ব্যাপক আক্রমণের প্রস্তুতি

পরদিন সাংগঠনিক সফরে বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্যস্থল বেলকুচি বোতল থানার একটি গ্রাম। পাবনা জেলার শাজাদপুর, সোহাগপুর, বেলকুচি ও বোতল থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছিল। মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলতে সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ থেকে লতিফ মির্জাকে অনেকগুলো যুদ্ধে আমার নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। তখনও একটি তিন ইঞ্চি মর্টার, একটি এইচ. এম. জি সহ দশটি এল. এম. জি নিয়ে একশ' জন মুক্তিযোদ্ধা লতিফ মির্জাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছিল। বারুই পটল থেকে সোজা পশ্চিমে ধলেশ্বরী যমুনা পার হয়ে আরো তিন-চার মাইল পশ্চিমে গেলে হয়তো লতিফ মির্জাকে পাওয়া যেতে পারে,

সাংগঠনিক সফর

এমন আশায় প্রায় আট-দশ মাইল প্রাশ ধলেশ্বরী-যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে পশ্চিম পারে যাচ্ছিলাম। পথের মাঝে হুগড়া চরের কাছে আমার নৌকার পাশে ছোট্ট একটি নৌকা এসে লাগলো। নৌকায় মাত্র চার জন। ভালো করে খেয়াল করে দেখা গেল, সবাই মুক্তিযোদ্ধা। এই নৌকার যে মূল ব্যক্তি, তাঁকে ওরা ডিসেম্বরে ঢাকায় খোঁজখবর নিতে পাঠানো হয়েছিল। মোশাররফ হোসেন পাক-বিমানবাহিনীর ঢাকা ঘাঁটির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সৈনিক। তিন মাস আগে সে তেঁজগা ঘাঁটি থেকে চলে এসেছিল। স্বাভাবিকভাবেই সে ঢাকার সামরিক ঘাঁটির খুঁটিনাটি সব খবর জানতো। তারই সহায়তায় মাত্র পনের-ষোল দিন আগে ঢাকা সামরিক ঘাঁটির সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে ভারতীয় বিমান বাহিনীকে দেয়া হয়েছিল। ভারতীয় বিমান আক্রমণের পর ঢাকা বিমান ঘাঁটির ক্ষয়-ক্ষতির নিশ্চিত খোঁজখবর নিতে তাকে আবার ঢাকা পাঠানো হয়। মোশাররফ হোসেন ঢাকা বিমান ঘাঁটিতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণের খবর নিয়েই এসেছে। তার মতে চীনের তৈরী এগারোটি মিগ-১৯ বিমান প্রথম আক্রমণেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কুর্মিটোলা হানাদার সামরিক ঘাঁটির রেল স্টেশনের পাশে সিগন্যাল ও এম. টি'র ব্যারাকগুলি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে তেঁজগা বিমান ঘাঁটির রানওয়ে অচল হয়ে গেছে, তেঁজগা ঘাঁটির দুটি হ্যাঙ্গার ভেঙে পড়েছে এবং বিমান বন্দরের রাডার স্টেশনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি দলের নেতা বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদ একমাস কয়েকদিনের ভারত সফর শেষে ফিরলে সদর দপ্তরে তাঁদের প্রাণঢালা উষ্ণ সম্বর্ধনা জানানো হলো। দীর্ঘদিন পর গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী দেশের অভ্যন্তরে নিজের এলাকায় এসে যারপর নাই আনন্দিত বোধ করেন।

৫ই ডিসেম্বর সকালে অস্থায়ী বেসামরিক প্রধান হামিদুল হক লিখিতভাবে আনোয়ার উল আলম শহীদের কাছে দায়িত্বভাবে বুঝিয়ে দিলেন। শহীদ সাহেবের

অনুপস্থিতিতে হামিদুল হক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করার পরও দু'একটি কাজ শহীদ সাহেবের অথবা আমার অনুমোদনের জন্য স্থগিত ছিল। শহীদ সাহেব পুনরায় তাঁর দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে রাতদিন খেটে বকেয়া কাজগুলো সেরে ফেলতে কাজে হাত দিলেন। একদিকে বকেয়া কাজ শেষ করা; অন্যদিকে জনসংযোগ এবং গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর যত্ন নেয়া। এসব তিনি স্বাভাবিক স্বকীয় দক্ষতায় সুচারুরূপে সম্পাদন করেন।

৬ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হলো, গণ-পরিষদ সদস্যদ্বয়—আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ও বাসেত সিদ্দিকীকে নিয়ে বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চলে ব্যাপক সাংগঠনিক সফর। পাথর ঘাটা, কালিদাস, সখীপুর, কচুয়া, বড় চওনা, সাগরদীঘিতে তাঁরা বেশ কয়েকটি বিরাট বিরাট জনসভা করলেন। সব জনসভাতে তাঁদের সকলের এক বক্তব্য, 'আপনারা সমস্ত ভয়-ভীতি ঝেড়ে ফেলে শক্তভাবে মুক্তিবাহিনীর পাশে এসে দাঁড়ান। ইনশাল্লাহ্ স্বাধীনতা আর বেশী দূরে নয়।' মুক্তাঞ্চল সফরকারী দল ১০ই ডিসেম্বর সাগরদীঘিতে সর্বশেষ জনসভা করলেন।

মুক্তিবাহিনীর দুর্বার চাপের মুখে, একের পর এক ঘাঁটি হাতছাড়া হওয়ার প্রেক্ষিতে যুদ্ধকে আর বিস্তৃত না করে হানাদাররা আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে নিজেদের শামুকের মত খোলসে গুটোতে শুরু করলো। ডিসেম্বরের শুরুতে হানাদারদের আর কোন ঘাঁটি জিলা সদরের বাইরে রইলোনা। যোগাযোগের সুবিধার কারণে পাকা রাস্তার পাশে তখনও যে ক'টি থানা হানাদারদের কব্জায় রয়েছে, সেই কটির অবস্থাও নড়বড়ে, জুবুথুবু। যে কোন সময় যে কোন দিন বেহাত হয়ে যেতে পারে, এই আশংকায় হানাদাররা নিশিদিন শংকিত। পাকা রাস্তার বাইরে বাসাইল, নাগরপুর, কন্দুহ নগর থানা এখন মুক্তিবাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

লতিফ মির্জার সাথে দেখা হলোনা বটে, তবে তার দলের অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার সাথে বোঁতিল থানার একটি গ্রামে দেখা ও আলাপ-আলোচনা হলো। লতিফ মির্জা তখন সাংগঠনিক সফরে দশ-পনের মাইল দূরে ছিল। কোন আগাম খবর না দেয়াতে সে মোটেই জানতো না যে আমি ঐ দিন তার এলাকায় যাবো।

৬ই ডিসেম্বর সকালে বোঁতিল থেকে সল্লায় ফিরে এলাম। লতিফ মির্জাকে অভিযানে সাহায্য করতে যারা তখনও ছিল, তাদের পরদিন নিকড়াইলের আশেপাশে হাজির থাকার নির্দেশ দিলাম। ৬ই ডিসেম্বর সারাদিন সারারাত সল্লাতে নৌকায় বসে পরবর্তী আক্রমণ পরিকল্পনার একটা খসড়া তৈরী শুরু করলাম। এরই ফাঁকে একবার জেনে নিলাম পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কোম্পানীগুলো ঠিকমত আসতে পারছে কিনা বা পূর্বে পাঠানো খবর তারা ঠিক সময়ে পেয়েছে কিনা। পশ্চিম এলাকায় মুক্তিবাহিনীর শক্তি কতখানি, কি ধরনের এবং কি পরিমাণ অস্ত্র আছে, মজুদ বিভিন্ন ধরনের গুলি-গোলার পরিমাণ কত, যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ কিভাবে ত্বরিত সরবরাহ করা সম্ভব, কাকে কাকে সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে—এসবের আলোকে একটা খসড়া পরিকল্পনা সল্লাতে বসে তৈরী করে ফেললাম।

৭ই ডিসেম্বর নুরুন্নবী নিকড়াইল স্কুলের পাশে ঘাঁটি গাড়লো। বেতার যন্ত্রগুলো শেষ বারের মত পরীক্ষা করা হলো। সকাল দশটায় আমি নিজেও নিকড়াইলে

গেলাম। ৬ই ডিসেম্বর গভীর রাতে মহান ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সাত তারিখ সকাল হতে না হতেই, সকল শ্রেণীর মানুষ ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতির কথা রেডিও ও বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে মুখে জেনে গেছেন। স্বীকৃতির খবর শুনে জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনে খুশীর বান ডেকেছে। শত শত হাজার হাজার লোক আমাকে যেখানে পাচ্ছেন, সেখানেই জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার ও আকাশবাণীর অনুষ্ঠান দিনের পর দিন শুনে ও উপর্যুপরি জাতীয় নেতাদের ভাষণ এবং মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ে, তদুপরি বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চলে টাংগাইল মুক্তি বাহিনীর ব্যাপক জনসভা ও নিজস্ব পত্রিকা রণাঙ্গনের বদৌলতে '৭১-র স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষও স্বীকৃতির অর্থ স্পষ্ট বুঝে ফেলেছেন। নিকড়াইল পেঁছবার সাথে সাথে বিভিন্ন দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন পিটার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অবস্থা দেখে নিজেও এগিয়ে এসে আমাকে অভিনন্দিত করে বললেন, 'আমার দেশ আপনাদের দেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেজন্য আমি জনগণ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আপনাকে, মুক্তিবাহিনীকে ও জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' ক্যাপ্টেন পিটারকে বুকে চেপে ধরে বললাম, 'অভিনন্দন তো আপনাকেই জানানো উচিত। আপনি মহান ভারতের নাগরিক ও সেনাবাহিনীর একজন সদস্য। আমি আপনাকে অভিনন্দিত করছি। আপনার দেশ মুক্তি সংগ্রামের পুরোটা সময় যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তা আমরা কোনদিন ভুলবোনা। বাংলার মানসপটে আপনাদের এই বন্ধুত্বের কথা চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আপনি আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ভারতের জনগণ ও কর্তৃপক্ষের কাছে পেঁছে দিন।'

নিকড়াইলে বৃহৎ সমাবেশ

ত্রিশটি কোম্পানীতে বিভক্ত পাঁচ হাজার মুক্তিযোদ্ধা চরম আঘাত হানার প্রস্তুতি হিসাবে নিকড়াইলের আশেপাশে হাজির হয়েছে। কোম্পানী কমান্ডাররা একে একে আমার সাথে দেখা করে কথা বলছে। তাদের বিকেল দু'টা ত্রিশ মিনিটে নিকড়াইল স্কুলে একত্রিত হতে বলা হয়েছে। কমান্ডারদের জমায়েতের আগে সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক বসল। বৈঠকে মোয়াজ্জেম হোসেন খান, আবদুল আলীম, ভোলা, দুদুমিঞা, শামসু, বারী মিঞা, খোদা বক্স ও সিরাজ সহ আরও বেশ কয়েকজন উপস্থিত হলো। আলাদাভাবে আলীম ও ভোলার কাছ থেকে পশ্চিমাঞ্চলের মওজুদ অস্ত্র ও গোলা-গুলির হিসাব নিকাশ নিলাম। পরে সকলের সাথে পরবর্তী অভিযানে কিভাবে, কোনদিকে অস্ত্র ও গোলা-গুলি সরবরাহ করতে হবে, খাবার জোগাতে হবে, আহত-নিহতদের কিভাবে দেখতে হবে, উপরন্তু বন্দী ও ধরাপড়া শত্রুদের কোথায় কিভাবে সাময়িকভাবে রাখতে হবে তা নিয়ে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করলাম। দুদুমিঞা, মোয়াজ্জেম হোসেন খান ও বারী মিঞা অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। তাদের পরামর্শ এবং তৈরী খসড়া মিলিয়ে সরবরাহের একটা সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা হলো। ভোলা, আলীম,

মোয়াজ্জেম হোসেন খান, দুদু মিঞা, শামসু, বারী মিঞা, সিজার খোদা বক্স, ক্যাপ্টেন মাহফুজ, সামচু ও গিরানী সহ আরো বেশ কয়েকজনকে সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হলো। সরবরাহ ব্যবস্থার মূলে রইলো ভোলা ও আবদুল আলীম। কারণ গোলাগুলি কোথায় কি মজুদ আছে তা দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল এদের দুজনের উপর। তাই সামগ্রিকভাবে সরবরাহ ব্যবস্থাপনার মূল নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপর বর্তাল।

পরবর্তী অভিযান সফল করতে পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগের পূর্ণ দায়িত্বভার নুরুন্নবীর হাতে তুলে দেয়া হলো। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানীর সাথে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন, সফল অভিযানের একটি অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্বাভাবিকভাবে নুরুন্নবীর সঠিক দায়িত্ব পালনের উপর অভিযানের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগের জন্য তাকে মুক্তিবাহিনীর দেড়শ' জন সফল সংবাদবাহক দেয়া হলো। এছাড়া দশটি সামরিক বেতার ও চারটি বেসামরিক বেতার যন্ত্রের সাথে তার বেতারে লাইন করে দেয়া হলো। তদুপরি, ভারতের সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বেতারযন্ত্র ও একটি সংকেত শব্দ প্রেরক যন্ত্র দেয়া হলো। সর্বোপরি আমার নিত্য সহচর দলের জন্য বিশেষভাবে বেতার প্রশিক্ষণ নেয়া দলের অর্ধেক সদস্য ২টি বেতার নিয়ে নুরুন্নবীর দলের সাথে যুক্ত হলো, যাতে আমার সাথে নুরুন্নবী সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকে। নুরুন্নবীকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে নিকড়াইল স্কুলের একটি ঘরে সত্তর জন কমান্ডারকে নিয়ে যুদ্ধ পরিকল্পনায় বসলাম।

আমরা যখন জরুরী শলাপরামর্শ করছি তখন নিকড়াইলে অগণিত লোক সমবেত হয়েছেন! তাঁরা সবাই আমার সাথে মিলিত হতে চান। মুক্তিযোদ্ধারা সকাল থেকে বার বার জনসাধারণকে অনুরোধ করেছে, 'সর্বাধিনায়ক আপনাদের সাথে অবশ্যই খোলাখুলি মিলিত হবেন। আপনারা এখানে ভীড় না করে দয়া করে যার যার কাজে চলে যান।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! একে তো চতুর্দিকে বিপুল পরিমাণ মুক্তিবাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে, তদুপরি স্কুলের পাশে খালি মাঠে দশ-বার খানা মাইকের হর্ণ পড়ে থাকতে দেখে জনসাধারণ একটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন, হয়তো মুক্তিবাহিনীর কোন সভা হতে পারে। জনগণও মুক্তিবাহিনীর কাছ থেকে কিছু শুনতে চান। বিশেষ করে আমি যখন সেখানে আছি। আমার কাছ থেকেই তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন। দুপুর পর্যন্ত জনসাধারণকে বার বার বলা হচ্ছিল, 'আপনাদের যথা সময়ে জানানো হবে, সর্বাধিনায়ক কখন আপনাদের সাথে মিলিত হবেন।' এতে দু-চার জন মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, 'কখন আমাদের জানাবেন? রাত হয়ে গেল? হয় আপনারা সি. ইন. সি সাহেবকে গিয়ে বলুন, আমরা তাঁর কথা শুনতে চাই; নয়তো আমাদের তার কাছে যেতে দিন। আমরা নিজেরাই তাকে বলবো।' মুক্তিযোদ্ধারা জনসাধারণকে এই বলে থামিয়ে দেয়, 'এই মুহূর্তে আপনাদের কিছুতেই সর্বাধিনায়কের সাথে কথা হতে পারেনা। তিনি খুবই জরুরী কাজ করছেন।' জনসাধারণ কোন কথা শুনতে চাননা। বিকেল তিনটায় নিকড়াইল বাজারে ছয়-সাত হাজার লোক জড়ো হয়ে

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে মুহুর্মুহু শ্লোগান দিতে থাকেন। কয়েকবার জোর শ্লোগান শুনে সভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে তাকালাম। আমাকে বেরুতে দেখে তাঁরা আরো জোরে জোরে শ্লোগান দিতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি জনতার দিকে এগিয়ে গেলাম। স্কুল মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছলে মুক্তিযোদ্ধারা বাজারের দিককার ব্যারিকেড তুলে নিল। ব্যারিকেড তুলে নিলে অপেক্ষমান জনতা দৌড়ে এসে আমার সামনে জড়ো হলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে শোরগোল, ও পরে শ্লোগান তুললেও আমি তাঁদের সামনে যাওয়া মাত্র সবাই একেবারে চুপচাপ শান্ত হয়ে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন, আমি হয়তো কিছু বলবো। জনতার মনের ভাব বুঝে বললাম, 'আপনারা অধীর হবেননা। আমার হাতে এখন মোটেই সময় নেই। আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই কথা বলবো। ঐ যে দেখছেন মাইকের হর্ণ রাখা হয়েছে, ও শুধু আপনাদের সাথে ভালভাবে কথা বলার জন্য। আপনারা এখন শান্তভাবে অপেক্ষা করুন। আমরা দশ মিনিটের মধ্যে জানিয়ে দেবো কখন কোথায় সভা হবে?' খালি গলায় আমার এই কথা বড় জোর দু-তিনশ' জন শুনতে পেলেন। কেউ কেউ আগ্রহ নিয়ে শুনবার জন্য ভিড়ের মধ্যে গলা বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু তারা স্পষ্ট কিছু শোনার আগেই কথা শেষ করে চলে এলাম।

স্কুল ঘরে এসে সিগন্যালম্যান লতিফকে ডেকে বললাম, 'নুরুন্নবী, আলীম ও ভোলাকে ডেকে আনো।' নুরুন্নবী সেই সময় বেতার যন্ত্রগুলোর চ্যানেল মিলাচ্ছিল। ২টি বেতার যন্ত্রে অপারেটর অনবরত সীমান্তবর্তী ভারতের মূল ঘাঁটির সাথে যোগাযোগের চেষ্টায় কোড-ওয়ার্ডে ডেকে চলছিল। নুরুন্নবী, ভোলা ও আলীম আসামাত্র বললাম, 'নুরুন্নবী, তুমি ছোট দুইটা চৌকি দিয়ে সভার মঞ্চ তৈরী করে ফেল। ভোলা ও আলীম, তোমরা মাইক লাগাবার ব্যবস্থা কর। আর মোয়াজ্জেম হোসেন খানকে বল, তিনি এবং দুদু মিঞা যেন নিকড়াইল বাজারে গিয়ে ঘোষণা করে দেন, সন্ধ্যায় সভা হবে। সন্ধ্যার আগে কাউকে নিকড়াইল স্কুল মাঠে ঢুকতে দেয়া হবেনা। সভা শুরুর মাত্র পাঁচ মিনিট আগে জনগণকে সভাস্থলে আসতে দেয়া হবে।' দায়িত্ব নিয়ে যে যার কাজে চলে গেল। মোয়াজ্জেম হোসেন খান ও দুদু মিঞা নিকড়াইল বাজারে গেলেন। মোয়াজ্জেম হোসেন খান একটা টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমাদের প্রিয় নেতা, মুক্তিযুদ্ধের বীর সিপাহ্‌শালার কাদের সিদ্দিকী নিকড়াইল স্কুল মাঠে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ ও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আজ সন্ধ্যায় আহুত সভায় আপনারা দলে দলে যোগদান করে সভাকে সাফল্য মণ্ডিত করুন।' সন্ধ্যায় সভা হবে শুনে স্থানীয় জনগণ তো অবাক! এ কি! এলাকায় এতদিন সাধারণত সভা হতো দিনে, রাতে সভা হবার নজির একেবারে বিরল। কিন্তু সর্বাধিনায়ক সন্ধ্যার পর সভা করতে চান কেন? নানা জন নানা কিছু ভাবতে ভাবতে যার যার বাড়ীর দিকে চললেন। কেউ কেউ আবার ওখানেই বসে রইলেন। বক্তৃতা শুনে একেবারেই বাড়ী ফিরবেন। মুক্তিবাহিনী ঐ এলাকায় একটি সভা করবে, এমন একটা চাপা গুঞ্জন গত তিন দিন ধরে জনগণের মুখে মুখে ফিরছিল। কিন্তু কখন ও কোথায় সভা হবে, তা কারও জানা ছিল না। তিনটায় পর যখন সভার

স্থান ও সময় ঘোষণা করে দেয়া হলো, তখন সভার সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়লো।

বিকেল চারটায় কমান্ডারদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষ হলো। আলোচনা শেষে নিকড়াইল স্কুল মাঠে তাদের লাইনে দাঁড় করে চরম আঘাতের পূর্বে সকলের মুখে একে একে মিষ্টি তুলে দিলাম। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। আমি এক-একজনের মুখে মিষ্টি তুলে দিচ্ছি। কমান্ডারদের কেউ কেউ আমার হাতের থালা থেকে মিষ্টি নিয়ে আমার মুখে গুঁজে দিচ্ছে। আট-দশটি মিষ্টি খাওয়ার পর আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। আমি দিচ্ছি প্রতি কমান্ডারকে একটি করে, কিন্তু আমাকে যদি একটা করে খেতে হয়, তাহলে সত্তর জন কমান্ডারের হাতে সত্তরটি মিষ্টি খেতে হবে, যা আমার সাধ্যের অতীত। আমি আগেই বলেছি খোলামেলা পরিবেশে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি যোদ্ধা, প্রতিটি কমান্ডার স্বচ্ছ নির্মেঘ আকাশে মনের খুশীতে উড়ন্ত পাখির মতো প্রাণবন্ত ও উচ্ছল হয়ে উঠতো। এমন একটি মহৎ পবিত্র অনুষ্ঠানে একে অপরকে মিষ্টি মুখ করানোর মহাপার্বনে কিছুতেই মুখে গুঁজে দেয়া মিষ্টি ফেলতে পারছিলামনা। স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের আকর্ষণে কমান্ডারদের মিষ্টি তুলে দেয়ার বিরাম নেই। এমন আনন্দঘন উচ্ছল মুহূর্তে কে শোনে কার কথা। এমন বড় সমাবেশ হয়তো কোন কমান্ডার আর নাও দেখতে পারে। রক্তের দামে স্বাধীনতা কিনতে মৃত্যুকে তারা কেউই পরোয়া করেনা। চায় মৃত্যুকে জয় করতে, চায় যতক্ষণ লড়ছে ততক্ষণ একে অপরের ভালোবাসার মাঝে বেঁচে থাকতে। যুদ্ধক্ষেত্রের রূঢ় কঠিন নিয়ম নিষ্ঠার মাঝে যখনই তারা অবসর পায়, তখনই একে অপরকে প্রাণ নিঙড়ানো ভালোবাসায় অভিষিক্ত করতে চায়। কাকে না করবো? মানা করা কি সম্ভব? এমন পরিস্থিতিতে কৌশলের আশ্রয় নিলাম। সারিতে দাঁড়ানো কোন কমান্ডার আমার মুখে মিষ্টি তুলে দিল, সেই মিষ্টি নিয়ে পরবর্তী কমান্ডারের মুখে মিষ্টি তুলে দিলাম। এভাবে মুখে মিষ্টি নিয়েই হয়তো পর পর ছয়-সাত জন কমান্ডারের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

আমার হা-করা মুখে মিষ্টি থাকার পরও কোন কোন কমান্ডার এমনভাবে ওর মধ্যেই আর একটি গুঁজে দিল, যা দেখবার মত। পাঁচ-ছয়টি করে মিষ্টি মুখে নিয়ে সত্তর জন কমান্ডারকে মিষ্টি খাওয়ানো শেষ করলাম। এতে আমাকেও কম করে চোদ্দ-পনেরখানা মিষ্টি খেতে হয়েছিল।

সব চাইতে মজার ব্যাপার হয়েছিল, আমার হা করা মুখে চার-পাঁচটা মিষ্টির ফাঁক দিয়ে যখন কোন কমান্ডার আরও একটা গুঁজে দিতে চাইছিল, আর আমি মুখ শক্ত করে রাখছিলাম। কিন্তু কমান্ডাররা এতো জোরে ঠুসছিল যে, আরো বড় হা না করে আমার উপায় থাকেনি। কল কল করে মিষ্টির রস পড়ে আমার জামাকাপড় যে ভিজে যাচ্ছিল, সেদিকে কারও কোন খেয়াল নেই। মিষ্টি খাওয়ার পর শুরু হলো পাঁচ দলে বিভক্ত পাঁচ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে পর্যায়ক্রমে নিকড়াইল স্কুল মাঠে সমবেত করার কাজ।

ত্রিশটা কোম্পানীকে পাঁচটি মূল দলে ভাগ করা হয়েছে। মূল পাঁচটি দলকে

আমার সার্বিক নেতৃত্বে বিশেষ অভিযানকারী বিশাল দলে পরিণত করা হলো ঃ পাঁচটি মূল দলের নেতৃত্ব পেল—

এক। মেজর হাবিবুর রহমান

দুই। মেজর আবদুল হাকিম

তিন। মেজর আনিসুর রহমান

চার। ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর খান

পাঁচ। ফজলুল হক ও গোলাম মোস্তফা।

এক। মেজর হাবিবের দায়িত্ব—আমার দলের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করা।

দুই। মেজর হাকিম—বাকী চারটি দলকে সমভাবে ভারী অস্ত্র, যেমন—তিন ইঞ্চি মর্টার, ব্রান্ডার সাইট, ৭২ আর. আর. ও রকেট লাঞ্চার দিয়ে আক্রমণে সাহায্য এবং ভারতীয় ছত্রীসেনা অবতরণের সময় অবতরণ স্থানটির নিরাপত্তা বিধান করবে।

তিন। মেজর আনিসের উপর দায়িত্ব দেয়া হলো জগন্নাথগঞ্জ ও বাহাদুরাবাদ ঘাটের দিক থেকে আসা সম্ভাব্য হানাদার আক্রমণ প্রতিহত করার।

চার। ক্যাপ্টেন সবুর আঘাতকারী দলের ভূমিকা পালন করবে।

পাঁচ। মেজর গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে মেজর তারা, মেজর হাবিব, ক্যাপ্টেন রেজাউল করিমের দল আমার সাথে থেকে ক্যাপ্টেন সবুরের দলের মতই আঘাতকারী দলের দায়িত্ব পালন করবে। আমার সাথে দুই দলের সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব পেল ক্যাপ্টেন ফজলুল হক।

মেজর হাবিব তার দলকে নিকড়াইল স্কুল মাঠে প্রথম সমবেত করলো। মেজর হাবিবের দল মাঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালে প্রত্যেকের সাথে দু'একটি কথা বলে পরিদর্শন শেষে আহবান জানালাম,

'মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা, হানাদাররা বাংলার উপর যে তান্ডব লীলা চালাচ্ছে, তা আর বরদাশ্‌ত করা যায় না। তোমরা জান, মহান ভারত গত রাতে আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন আর আমরা একা নই। ভারতের মত অনেক দেশ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থনে অচিরেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে; আমাদের স্বীকৃতি দেবে। আমার বিশ্বাস—হানাদাররা আমাদের স্বাধীনতা আর বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। গত একমাস ধরে প্রতিটি যুদ্ধে তোমাদের যে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা দু'একদিনের মধ্যেই টাংগাইল, ময়মনসিংহ ও জামালপুর মুক্ত করে ফেলতে পারবো। আজ আমাদের অস্ত্র ভান্ডার হানাদারদের চেয়ে মোটেই দুর্বল নয়। ওদের যে অস্ত্র আছে, আমাদেরও তা আছে। একদিন আমরা ওদের কামানের জবাবে রাইফেল ব্যবহার করেছি। আজ অবস্থা ঘুরে গেছে। এবার কামানের জবাব কামান দিয়েই দেবো। ওদের সমস্ত সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে, সহযোদ্ধা ভাইয়েরা ওদের একটিও অতিরিক্ত গুলি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ আমাদের তিন রকম সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।

এক। আমাদের নিজস্ব মজুদ আছে।

দুই। হানাদারদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনার সুযোগ পুরো মাত্রায় রয়েছে।

তিন। ভারতের সাথে আমাদের সরবরাহ লাইন সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে। প্রয়োজনে ওদের উপর আমরা বিমান ব্যবহার করব। দস্যুরা এতদিন আমাদের উপর বিমান থেকে আক্রমণ করতো। এবার ওদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

সহযোদ্ধা ভাইয়েরা, ওদের একটা অস্ত্রও আমরা ফিরিয়ে নিতে দেবনা। আমরাই হানাদারদের যুদ্ধের খায়েস মিটিয়ে দিতে পারতাম। তার উপর আবার ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসছে। আজ থেকে প্রতিটি আঘাত হবে পুনঃ পুনঃ ধারাবাহিক জয়ের আঘাত। আমরা মৃত্যুকে বরন করবো কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে পারিনা। আমি আশা করি, এরপর আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় এমনিভাবে আবার মিলিত হবো। আমি কামনা করি, প্রতিটি যুদ্ধে তোমরা সফল হও। প্রতিটি যুদ্ধে আমি আগের মতই তোমাদের পাশে পাশে থাকবো। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হউন।'

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মুক্তিবাহিনী, বাংলা-ভারত মৈত্রী অমর হউক।

মেজর হাবিবের দল চলে গেলে দ্বিতীয় দল, তারপর তৃতীয়, এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি দলের সাথে মিলিত হলাম এবং প্রত্যেক দলের সামনে একই বক্তৃতা করলাম।

হানাদারদের দৌড় কতটা, ওদের ক্ষমতা কি, তা নভেম্বরের ১৫ তারিখের পর মুক্তিবাহিনী ও জনগণ পুরোপুরি যেমন বুঝে ফেলেছিলেন, তেমনি হানাদাররাও নিজেদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। শুধু তাই নয়, মুক্তিবাহিনী যে হেলাফেলার বস্তু নয় বরং পাল্টা আঘাত হানায় তারা দিনকে দিন দক্ষতা অর্জন করছে; তাও হানাদাররা বুঝে নিয়েছিল। যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় তারা ছিল শঙ্কিত। আকাশ পথ খোলা থাকলেও খালি মাঠে তলোয়ার ঘুরানোর ক্ষমতা ও সাহস তখন হানাদাররা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা অন্ততঃ এটুকু বুঝেছিল, হামলা হয়তো করা যাবে তবে বিনা ক্ষতিতে আগের মত আর ফেরা যাবেনা। তবুও শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সতর্ক পাহারা রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের যেমন পাঁচ ভাগে ভাগ করে পালাক্রমে স্কুল মাঠে সমবেত করা হলো, তেমনি একই কারণে জনগণকে সন্ধ্যার পর নিকড়াইলে জনসভায় আহবান করা হলো।

পাঁচটার পর আশেপাশে ও দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে নিকড়াইলের দিকে মানুষের ঢল নামলো। মুক্তিযোদ্ধারা নিকড়াইল স্কুল মাঠ থেকে বেশ দূরে চারদিকে শক্ত বেষ্টনী সৃষ্টি করে জনসাধারণকে থামিয়ে দিয়া যাতে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের আগে মাঠে প্রবেশ করতে না পারেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক সমাবেশের কারণ কি? নতুন কিছু ঘটছে কি? শেষ যুদ্ধ কি আসন্ন? ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর জানার কৌতুহলে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কিছু শোনার বুকভরা আশা নিয়ে জনসাধারণ বেষ্টনীর বাইরে বসে, দাঁড়িয়ে, অধীর আগ্রহে ছটফট করছেন। তাঁদের প্রতীক্ষার দুঃসহ সময় দেখতে দেখতে শেষ হলো। মগরেবের নামাজের পর কোরান ও গীতা পাঠের মাধ্যমে সভা শুরু হলো। ঘনায়মান শীতের সন্ধ্যায় নিকড়াইল স্কুল মাঠ কানায় কানায় ভরে গেছে। সভার শুরুতে দুদু মিঞা বক্তব্য

রাখলেন। এরপর ঘাটাইল থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন খান বক্তৃতা শুরু করলেন। তাদের একই বক্তব্য, 'ভারত আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমাণ্ড গঠিত হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে চলেছে। স্বাধীনতা আর সুদূর পরাহত নয়। আপনারা আমাদের নেতা কাদের সিদ্দিকীর উপর অবিচল আস্থা রেখে শত্রুর উপর আরো দুর্বার গতিতে মুক্তিবাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহায্য করুন।' দুদু মিঞা ও মোয়াজ্জেম হোসেন খান দু'জনই সুবক্তা। গ্রাম্যে জনসভায় তাঁদের মত আকর্ষণীয় বক্তা খুব কমই দেখা যায়। দুইজনের বক্তৃতার উঠানামার তাললয়ের সাথে সভাস্থল যেন সমুদ্রের ছন্দিত ঢেউয়ের মত দুলছিল, জ্বালাময় বক্তৃতার উম্মাদনায় সমবেত জনতা ফুটন্ত জলের মত টগ্‌বগ্‌ করছিলেন। আসন্ন বিজয়ের উচ্চকিত ঘোষণায় তাদের মন-প্রাণ পরম প্রাপ্তির আশার আনন্দ-পুলকে বার বার আলোড়িত হচ্ছিল।

মোয়াজ্জেম হোসেন খানের বক্তৃতা চলার সময় আমি একবার সভাস্থল থেকে সামান্য দূরে একটি বেতার যন্ত্রের কাছে গেলাম। বেতারে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের সাথে সংযোগ হয়েছে। ওঁরা আমার সাথে কথা বলতে চান। এর আগে কখনও আমার অথবা আমার দলের সাথে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের সাংকেতিক শব্দ ছাড়া বেতারে কথা হয়নি। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সমস্ত গোপনীয়তা ও নিয়মকানুনের বালাই ভেঙে ব্রিগেডিয়ার সান সিং সরাসরি ওয়ারলেসে আমাকে অভিনন্দিত করলেন। সান সিং উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন,

'আমার দেশ তোমাদের মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে, মুক্তিবাহিনীকে এবং তোমার দেশবাসীকে অভিনন্দিত করছি।'

উত্তরে বললাম,

'আমিও বাংলার সংগ্রামী জনগণ, মুক্তিবাহিনী ও আমার পক্ষ থেকে আপনাকে, আপনার সেনাবাহিনীকে, মহান ভারতের জনগণ ও সরকারকে আপনার মাধ্যমে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

ব্রিগেডিয়ার সান সিং পাল্টা অভিনন্দন পাওয়ার পর পরই বললেন,

'আমরা খুব শীঘ্রই একত্রিত হতে পারবো বলে আশা করছি। তুমি তৈরী থেকো। প্রয়োজনে উত্তরে, তোমার সাহায্য চাওয়া হতে পারে।'

ব্রিগেডিয়ার সান সিং-এর খোলাখুলি আলাপে আমার মনে হলো, ইচ্ছে করে শত্রুপক্ষকে আমাদের কথা শোনানোর জন্যই এমনটা করছেন। শত্রুপক্ষের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা, যুদ্ধের একটি প্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক অঙ্গ। এটাও সত্য যে, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি তখন একেবারে ঘুরে গিয়েছিল। ৪ঠা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমন একটি সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য বলতে গেলে, ভারত প্রস্তুত হয়েই ছিল। তাই পাল্টা আঘাত হানতে ভারতের এক মুহূর্ত'ও লাগেনি। পাকিস্তান নামক বস্তুত তখন মৃত। দেশের হাজার মাইল ব্যবধানের দুই অংশই আক্রান্ত। পূর্ব অংশে পূর্ব পাকিস্তানের কবর

রচনা করে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ মুক্তির প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুণছিল। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠেছিল মুক্তাঞ্চল। দিনকে দিন, মুক্তাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটেছিল, আর মুক্ত বাংলার আকাশে পত্‌পত্‌ করে উড়া লাল, সোনালী ও সবুজ রঙের জাতীয় পতাকাকে সুন্দর সকালের সোনালী সূর্যকিরণে, আর অস্তগামী সূর্য, সোহাগের লাল আভায় প্রতিদিন রাঙিয়ে দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরই, আবার সভাস্থলে ফিরে এলাম। মোয়াজ্জেম হোসেন খানের পর বক্তৃতা করতে দাঁড়ালাম। সভায় প্রায় কুড়ি হাজার লোক জমায়েত হয়েছে। সবাই গভীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন। আমি উঠে দাঁড়াতেই সভাস্থল শ্লোগান ও করতালিতে ফেটে পড়লো। অনেকক্ষণ শ্লোগান চলার পর শান্ত হয়ে এলে, উচ্চারণ করলাম,

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার শান্তি আপনাদের উপর বর্ষিত হউক। ভাই ও বন্ধুরা, আপনারা জানেন, আজ বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশ মহান ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতি পেয়েছে। দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ থামিয়ে রাখতে পারে, স্তব্ধ করে দিতে পারে। হানাদাররা প্রথম যখন আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন তারা হয়তো ভাবেনি বাঙালীরা চিরকাল শুধু মার খাবেনা, মার দিবেও। ওরা জানতোনা, 'বাঙালীর মাইর দুনিয়ার বাইর। যখন মারে তলপেটে মারে।' ২৫শে মার্চের পর ওরা একের পর এক আমাদের উপর আঘাত হেনেছে। দু'একটি ক্ষেত্রে ওদের প্রতিহত করতে পারলেও গুঁড়িয়ে দিতে পারিনি। আপনারা জানেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নরসিংদী রংপুর, সৈয়দপুর, ভৈরব, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কালিহাতী, মধুপুরে ওরা নির্বিচারে বোমা ফেলেছে, মেশিনগান থেকে অগ্নি ঝরিয়েছে। কোথায় বোমা ফেলা হয়? কাদের বিরুদ্ধে মেশিনগান উঁচিয়ে ধরা হয়? একজন নয়, দুই জন নয়, ওরা সমস্ত বাঙালী জাতিটাকেই পাকিস্তানের শত্রু ধরে নিয়েছিল। ভাইয়েরা অনেক অনেক ভুল করলেও ওরা এ ব্যাপারে নির্ভুল ছিল। সমস্ত বাঙালী জাতি যে স্বাধীনতার পক্ষে এটা আজ দিবালোকের মত সত্য। গোরান-সাটিয়াচরা ও কালিহাতী যুদ্ধে হানাদারদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করতে পারলেও এর অব্যবহিত পরেই আমরা যখন ছিন্নমূল, বিশৃংখল হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিলাম, তখন জনসাধারণের উপর হানাদারদের অত্যাচার দেখে দুঃখে ব্যথায় বুক ফেটে যেতো। তখন আমার কিছু করার ছিল না। বার বার শুধু আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলেছি —'আল্লাহ্‌ তুমি শক্তি দাও'। আল্লাহ্‌ হয়তো আমার কান্না শুনেছিলেন। অনেকে বলেন—এতবড় মুক্তিবাহিনী আমি না থাকলে নাকি গড়ে উঠতোনা। আমার পরিশ্রম ও সাহসই নাকি এই এলাকায় এতবড় একটি দুর্বার ও সুসংগঠিত মুক্তিবাহিনী গঠনে প্রধান শক্তি, প্রধান স্তম্ভ।

বন্ধুরা ভাইয়েরা, আমার কিন্তু কোনদিনই তা মনে হয়নি। ১৯শে এপ্রিলের পর আমি যখন ছিন্নমূল দিশেহারা হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত বার বার টাংগাইলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছি, সমগ্র এলাকাটা চষে বেড়িয়েছি, তখন আমার না ছিল শক্তি সাহস, না ছিল জনবল। এমনকি আমার কাছে তখন যে

হাতিয়ার ছিল তাতে একটিও গুলি ছিল না। ১৯শে এপ্রিলের পর ৪ঠা মে প্রথম যখন সংগ্রামপুরে অভিযান পরিচালনা করেছিলাম তখন রাতারাতি কিসের জোরে এত দুর্বার মৃত্যু ভয়হীন হতে পেরেছিলাম? টাংগাইলের বিস্তীর্ণ এলাকা সেই তের-চৌদ্দ দিনে একোণ থেকে সেকোণ পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণে প্রতিটি স্থানে শত শত মানুষ যেভাবে আমাকে সব কিছু উজার করে দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন, যে-ভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে সাহস ও শক্তি জুগিয়েছেন, যেভাবে নিজেরা না খেয়ে আমাকে খেতে দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। জনগণের সম্মিলিত সেই অভূতপূর্ব উৎসাহ, সাহস ও সহযোগিতার উপর ভর করেই আমি এতটা দুর্বার হতে পেরেছিলাম। আমার মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধারা এতটা প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হতে পেরেছিল। আমি মাত্র দশজন সহযোদ্ধা নিয়ে প্রথম অভিযানে নেমেছিলাম। আজ আমরা নই। মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বহু হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া লক্ষাধীক স্বেচ্ছাসেবক কোন কোন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের হার মানিয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করছেন। আজ হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক শুধু নয়, আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের প্রতিটি স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ এক একজন দুঃসাহসিক দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধা।

আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত আমরা খুব একটা আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে পারিনি। একশত যুদ্ধ হলে, বড় জোর দশটাতে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে পেরেছিলাম, বাকীগুলো ছিল আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে শত্রু আমাদেরকে আঘাত হানার আগেই তাদের উপর তীব্র আঘাত হানার কৌশল অবলম্বন করেছি। অক্টোবর-নভেম্বর পুরো দু'টি মাস আমাদের পরিকল্পিত, "আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আক্রমণ" হানার কৌশল একটানা দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে কাজে লাগিয়ে আমরা যেমন একদিকে কন্দুছনগর, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, চারাবাড়ি-পোড়াবাড়ি, নাগরপুর সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করেছি, তেমনি অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর আকস্মিক আঘাতের তোড়ে হানাদাররা পাথরঘাটা, ফুলবাড়িয়া, ভালুকাথানা, শিবগঞ্জ, কাশীগঞ্জ বাজার, ধলাপাড়া, দেওপাড়া, বল্লা ও বাসাইল থানা থেকে লেজ তুলে পিছু হট্‌তে বাধ্য হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ওদের টাংগাইল শহর ছেড়ে জীবনেও আর গ্রামের দিকে পা বাড়াবার হিম্মত হবে না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। পাকিস্তানী দস্যুদের, তার বিচারের নামে প্রহসন ও তাকে বন্দী রাখার কোন অধিকার নেই। বঙ্গপিতাকে অবিলম্বে সসম্মানে ফিরিয়ে না দিলে, তাকে তার প্রিয়জনদের মাঝে আসতে না দিলে অবশিষ্ট পাকিস্তান অচিরেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পৃথিবীতে ঘাতক পাকিস্তানের নাম-নিশানা থাকবেনা। সারা বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের কাছে আমার আবেদন—আপনারা নরপশুদের বলুন, বঙ্গবন্ধুকে ওরা সসম্মানে মুক্তি দিক।

ভাইয়েরা, বন্ধুরা, আমরা চরম আঘাত হানতে এগিয়ে যাচ্ছি। জানি না, আপনাদের সাথে এমনিভাবে আবার একত্রিত হতে পারবো কিনা। আপনারা আমাদের দোয়া করবেন, আমরা যেন শত্রু হননে নির্মম ও দুর্বার হতে পারি। আমি অত্যন্ত

শ্রদ্ধাভরে মহান ভারত, তার জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য মহান ভুটানকেও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সারা বিশ্বের কাছে আমাদের আবেদন দিবালোকের মত সত্য, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে ভারত ও ভুটানের মতো আপনারাও স্বীকার করে নিন, স্বীকৃতি দিন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করুন। আমি শহীদ আত্মার শান্তি কামনা করে শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় যৌথ বাহিনী, জয় বাংলা ভারত মৈত্রী।

সভাশেষে জনতা উৎফুল্লচিত্তে যার যার পথ ধরলেন। তাঁদের অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। আর হানাদার অত্যাচারে অত্যাচারিত হতে হবেনা। স্বাধীন বাংলায় তাঁদের আর না খেয়ে মরতে হবেনা। বর্ষায় ভাঙাচাল দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে পানি পড়বেনা। বিনা চিকিৎসায় তাঁদের মরতে হবেনা। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা শিক্ষার সুযোগ পাবে, পরে মাথা গোঁজার ঠাঁই। বাংলার ঘরে ঘরে আবার হাসির প্লাবন বইবে, মনের আনন্দে জেলে মাছ ধরবে, কৃষক হাল চালাবে, এমনি কত কি ভাবতে ভাবতে কল্পনায় ভবিষ্যতের একটি সুন্দর বাগান সাজাতে সাজাতে তাঁরা যার যার ঘরে ফিরলেন।

মেজর আনিস এগিয়ে গেল বাহাদুরাবাদ ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের মাঝামাঝি সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে তুলতে। দুই নম্বর দলের কমান্ডার মেজর হাকিম ঘাটাইলের দিকে এগুতে শুরু করলো। এক নম্বর দলের নেতা মেজর হাবিবের দায়িত্ব পড়লো টাংগাইল-ময়মনসিংহ পাকা রাস্তা দখল নেয়ার। তিন নম্বর ও পাঁচ নম্বর দল নিয়ে গোপালপুর থানা দখলে বেরিয়ে পড়ার আগে নুরুন্নবী ও ক্যাপ্টেন পিটারকে ডাকলাম। ক্যাপ্টেন পিটার নিকড়াইলে মুক্তিবাহিনীর সারাদিনের কার্যক্রম দেখে যারপর নাই অভিভুত হয়ে পড়েছিলেন। ক্যাপ্টেন পিটার টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হবার পর থেকে সব সময় আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলেন, মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কত, আর স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যাই বা কত হবে? মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ও যোদ্ধাদের সংগে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় কৌশলে এ সম্পর্কে জানার চেষ্টাও করেছেন। এই প্রথম, প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের এতবড় সমাবেশ দেখে এবং আমার বক্তৃতা শোনার পর তাঁর ধারণা হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কুড়ি-পঁচিশ হাজারের কম নয়। স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা লক্ষাধিক। একজন সামরিক অফিসার এমন একটি বিশাল বাহিনীর নেতার পদমর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সফল কর্মকাণ্ড দেখে ও ধীরে ধীরে মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হবার পর এবং সর্বোপরি আমার উপর ক্রমশঃ অপরিসীম আস্থা ও শ্রদ্ধা জানানোয় তিনি যেন প্রতি মুহূর্তে বেশী করে সম্মান দেখানোর চেষ্টা করছিলেন। ক্যাপ্টেন পিটারের প্রতি তাঁর কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ ছিল, কাদের সিদ্দিকীকে মর্যাদা দেখানোর ব্যাপারে কখনো যেন তিনি কৃপনতা না করেন। যদিও আমার সাথে ক্যাপ্টেন পিটারের সম্পর্কটা শুরু হয়েছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী। প্রথম অবস্থায় তিনি যে সম্মান দেখিয়েছেন তা আন্তরিক না উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন, তা বোঝা না গেলেও ক্রমে ক্রমে

নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত ধারণা থেকে তাঁর ব্যবহারের আন্তরিকতা ও বৈশিষ্ট্য থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি অকৃত্রিমভাবেই আমাকে সম্মান করছেন, আস্থা ও বিশ্বাস করেছেন। গোপালপুর থানা অভিযানে বেরিয়ে পড়ার আগে ক্যাপ্টেন পিটারকে আরেক বার বললাম, 'আপনাকে আগেই বলেছি, ম্যাপ পয়েন্ট সম্পর্কে আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই সন্দেহমুক্ত হতে পারছিনা। তিনটা নির্দিষ্ট স্থানের দুইটার ম্যাপ পয়েন্ট আমার কাছে একটু ভুল মনে হচ্ছে। আমরা খুব সম্ভবত এ দুইটি একটু উত্তরে চিহ্নিত করেছি।' ক্যাপ্টেন পিটার খুব ভালোভাবে ম্যাপের নর্থিং ও ইস্টিং লাইন মিলিয়ে দেখলেন। তাঁর পাঠানো বার্তার সাথে ডিগ্রির কোন গরমিল নেই। ক্যাপ্টেন পিটার নিশ্চিত হয়ে বললেন, 'না স্যার, আমাদের চিহ্নিতকরণে ভুল নাও হতে পারে। আপনার সন্দেহ যদি সত্যও হয়, তাহলেও তা এক-দেড় মাইলের বেশী সরে যাবার সম্ভাবনা নেই। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেননা।' রাত এগারোটায় নিকড়াইল ত্যাগের সময় নুরুন্নবীকে বললাম, 'তোমরা শেষ রাতে নিকড়াইল ত্যাগ করো। এত বড় একটা জমায়েতের পর নিকড়াইলে বেশী সময় থাকা ঠিক হবে না।'

দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধার বিশাল দুটি দল নিয়ে গোপালপুর থানা দখলের উদ্দেশে ৮ই ডিসেম্বর দুপুরের পর ঝাউয়াইল পেঁছিলাম। পুরো দলকে গোপালপুর থেকে বেশ দূরে নিরাপদ অবস্থানে রাখা হলো। ঠিক হলো, সন্ধ্যার পরই গোপালপুর থানায় আঘাত হানা হবে। সন্ধ্যার পর যখন আমরা গোপালপুর থানার দিকে এগিয়ে যাবো ঠিক তখন ভারতের সীমান্তবর্তী ঘাঁটি থেকে আমাদের সংকেত গ্রাহক যন্ত্রে বিশেষ সংকেত আসতে থাকে। ভারতীয় সেনা-কর্তৃপক্ষ আমার সাথে কথা বলতে চান। তাঁরা সরাসরি ও. টি. সেটে কথা বলবেন। অপারেটর তাড়াতাড়ি সেট চালু করলো। সেট চালু হওয়ামাত্র অপর প্রান্ত থেকে অনুরোধ আসলো, হেডকে দিন, ফাদার কথা বলবেন।' 'হ্যালো' বলতেই অপর প্রান্ত থেকে পরিচিত কণ্ঠ ভেসে এলো। ছোট্ট অনুরোধ, 'জামালপুরের শত্রুর অবস্থান খুবই শক্ত। ভাঙা যাচ্ছেনা। আপনি পিছন থেকে জামালপুরের উপর আঘাত হানুন। যত শীঘ্র সম্ভব আঘাত করুন।' ভাবনায় পড়ে গেলাম। কি করবো। আমরা জামালপুর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। গ্রাম-গঞ্জের ভিতর দিয়ে যেতে দূরত্ব আরো বেড়ে যাবে। একটু ভেবে নিলাম, এই দূরত্ব পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে কতটা সময় লাগবে? জামালপুর পেঁছিার পর শত্রু ঘাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে মুক্তিযোদ্ধাদের কতটা বিশ্রামের প্রয়োজন? ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, জামালপুর যাবো। মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্য ক্লান্তি ছিল না, থাকার কথাও নয়। আগে থেকে এমন ব্যবস্থা ছিল যে, মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়া ও সরবরাহের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। প্রয়োজন মত সব কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যাবে।

৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জামালপুরের দিকে রওনা হওয়ার পর চার নম্বর বাহিনীর কমান্ডার মেজর আনিসকে জামালপুর-মধুপুরের মাঝে ধনবাড়ীতে আমাদের সাথে যোগ দিতে নির্দেশ পাঠালাম। এক নম্বর দলনেতা মেজর হাবিবকে নির্দেশ দেয়া হলো, পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ময়মনসিংহ-টাংগাইল সড়ক দখল না নিতে।

দুই নম্বর দলের কমাণ্ডার মেজর হাকিমকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুতে বলা হলো। আমরা ঝাউয়াইল হয়ে ধনবাড়ীর দিকে এগুতে শুরু করলাম। একই সময়ে পশ্চিমের পিংনা-সরিষাবাড়ী থেকে মেজর আনিস তার দল নিয়ে ধনবাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো। ঝাউয়াইল থেকে ধনবাড়ীর দিকে হাটতে হাটতে বার বার জামালপুর আক্রমণের পরিকল্পনা আঁটছিলাম। আর জামালপুর অভিযানে ভারতীয় সেনা বাহিনীর গোপনীয়তা না রেখে খোলাখুলি সাহায্য চাওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ উদ্ধারের চেষ্টা করছিলাম। রাত তিনটায় ধনবাড়ীর কাছে এক স্কুলের মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্রামের নির্দেশ দিয়ে মনে মনে ঠিক করলাম আর জামালপুরের দিকে না এগিয়ে মেজর আনিসের দলের জন্যই অপেক্ষা করবো। একটু পরে ধনবাড়ীর দুই মাইল দক্ষিণে স্কুল মাঠে মেজর আনিস তার দল নিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হলো। আমরা উভয় দলই দুই দিক থেকে কুড়ি মাইল পথ হেঁটে এসেছি।

সূর্যোদয়ের আগে আবছা আলোতে ধনবাড়ীর স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় আমরা ভালোরকম নাস্তা করে পূবে মধুপুর থানার দিকে এগুতে লাগলাম। তিনটি দল একত্রে বেশ কয়েক মাইল পূবে এগুবার পর, তিন নম্বর ও পাঁচ নম্বর দল নিয়ে ডাইনে মোড় নিলাম। মেজর আনিসের দলটি দুইভাগে ভাগ হয়ে একদল মধুপুর, আরেকদল গোপালপুরের উপর আঘাত হানতে এগুতে থাকলো। ৯ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুক্তিবাহিনীর হাতে মধুপুরে হানাদার ঘাটির পতন ঘটলো। ৯ তারিখেই মেজর আনিসের দলের দ্বিতীয় অংশ গোপালপুর হানাদার ঘাটির উপর আঘাত হানলো। গোপালপুরের হানাদাররা এবারও ঘাটির পতন রোধে সক্ষম হলো। পূর্ব পরিকল্পনা মত গোপালপুর আক্রমণে এগিয়ে না গিয়ে ৯ তারিখ রাতে আমি গোরাঙ্গীচকের কাছাকাছি দত্তগ্রাম-নেয়ামতপুরে এলাম। দত্তগ্রাম-নেয়ামতপুরের আশেপাশে মেজর আবদুল হাকিম অপেক্ষা করছিল। সে তার দলটি তিনভাগে ভাগ করে তিনটি চিহ্নিত স্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাকা করেছে। মেজর হাকিমকে সাথে নিয়ে গোরাঙ্গীচকের চারদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গোরাঙ্গীর উপর সবদিক থেকে শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের রাস্তাগুলোতে কঠোর সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করেছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোন খুঁত ধরা পড়লোনা। আমি যখন দু'জায়গার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে মেজর হাকিমকে প্রশ্ন করলাম, মেজর হাকিম তখন খুব গর্বের সাথে উত্তর দিল, 'এখানকার চাইতেও সেখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেক সুদৃঢ় করা হয়েছে। আমি নিজে সেখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তদারকি করে এসেছি। এখানকার চাইতেও ঐ দুটি স্থানের যোদ্ধা সংখ্যাও কিছু বেশী।' গোরাঙ্গীচক থেকে দীঘলকান্দি আবদুল হালিম চৌধুরীর বাড়িতে গেলাম। সেখানে একদিন-আগে নুরুন্নবী ক্যাপ্টেন পিটার সহ তার দল ও সরঞ্জামাদি নিয়ে হাজির হয়েছিল। দীঘলকান্দিতে মেজর হাবিব ও মেজর হাকিমকে ডেকে শেষরাতে ঘাটাইল থানা অপারেশন কৌশল ঠিক করা হলো। থানায় সরাসরি আক্রমণ করবো ক্যাপ্টেন সবুরের দলসহ আমি নিজে। মেজর হাকিম প্রয়োজনে ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে গোলা বর্ষণ করে থানা দখলে সাহায্য করবে।

মেজর মোস্তফার একটি কোম্পানী থানার দুই-আড়াই মাইল দক্ষিণে কালিদাসপাড়া

সেতুর দখল নেবে এবং সেতুটি ধ্বংস করে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে এবং তারা মাঝেমধ্যে গুলি ছুঁড়বে। এতে যদি প্রলুব্ধ হয়ে ঘাটাইল থানার মূল ঘাঁটি থেকে কিছু হানাদার সেদিকে এগিয়ে যায়, তাহলে থানা দখলে বিশেষ সুবিধা হবে। দ্বিতীয়তঃ

ঘাটাইল থানা দখল

কালিদাসপাড়া সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটার আধ ঘণ্টা পর মেজর হাবিব ঘাটাইল থানার এক মাইল উত্তরে বানিয়াপাড়া সেতু দখল করে উড়িয়ে দিয়ে অবস্থান নেবে। হানাদাররা যদি কালিদাসপাড়া সেতুর দিকে নাও যায়, এক মাইল উত্তরে বানিয়াপাড়া সেতু ধ্বংস হলে তারা অবশ্যই সেইদিকে যাবে। রাত দশটায় আমরা যার যার লক্ষ্যে এগুতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন সবুর ও মেজর মোস্তফার দলসহ কালিদাসপাড়া সেতুর এক-দেড় মাইল পশ্চিমে সাধুটি স্কুল পর্যন্ত এগুলাম। রাত দু'টায় মেজর মোস্তফাকে সাধুটি স্কুলে রেখে আমরা আরো উত্তরে অগ্রসর হওয়ার আগে মেজর মোস্তফাকে বললাম,

'তোমার অস্ত্রের অভাব নেই, সহযোদ্ধাদের সংখ্যাও প্রচুর। আমি আশা করি তুমি সফল হবে। তোমার ঠিক সময়ে পুল দখলের উপর আমাদের থানা দখল নির্ভর করছে।' বীর-ঘাটাইল পর্যন্ত এগিয়ে সেখানে মূল দল রেখে সত্তর জনকে নিয়ে করটিয়া কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক আবুল হোসেন সাহেবের বাড়িতে এলাম। বাড়িতে তেমন কেউ না থাকলেও তাড়াহুড়ো করে বাড়ির কাজের লোকেরা পরম যত্ন সহকারে রাত তিনটায় আমাদের ডাল-ভাত খাওয়ালেন।

ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল রেখে ঠিক চারটায় মেজর মোস্তফা কালিদাসপাড়া সেতুতে আঘাত হানবে। মেজর হাবিব সাড়ে চারটার দিকে বানিয়াপাড়া সেতুতে আঘাত করবে। ভোর সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে আমরা ঘাটাইল থানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। বীর ঘাটাইলের কুমুদিনী কলেজের অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় বার বার ঘড়ি দেখছিলাম। ঠিক চারটায় কালিদাসপাড়ার দিক থেকে গুলির শব্দ আসতে শুরু করলো। গুলির শব্দ শুনে আরো দ্রুত পা চালিয়ে থানার পশ্চিমে রতনপুর মাদ্রাসার সামনে এলাম। ক্যাপ্টেন খোকা, ক্যাপ্টেন সবুর, ক্যাপ্টেন হবি তাদের কোম্পানী নিয়ে ঘাটাইল থানার পশ্চিম পাশে অবস্থান নিয়েছে। রতনপুর মাদ্রাসার সামনে মিনিট দশেক অপেক্ষা করতেই উত্তরে বানিয়াপাড়া সেতুতে মেজর হাবিব বিস্ফোরণ ঘটালো। কোন গোলা-গুলি ছাড়াই বিস্ফোরণ ঘটায় একটু বিস্মিত হলাম। দখলের আগে সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব নয়। আর দখল নিতে অন্ততঃ দু'একটি গুলি তো উভয় পক্ষ থেকে চলবে। তবে কি বিনা যুদ্ধে সেতু দখল হয়েছে? সত্যিই তাই, সেই রাতে মেজর হাবিব গোলা-গুলি ছাড়াই সেতু দখল করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। মিলিশিয়ারা সেই রাতে সেতুতে ছিল না, ছিল শুধু রাজাকার। মেজর হাবিব সেতুর কাছে গেলে পাশের গ্রামের একজন রাজাকার তার হাতে ধরা পড়ে। সে বলে, 'পুলে কোন মিলিশিয়া নেই। রাজাকার যারা আছে, জীবন ভিক্ষা দিলে, তারা সারেন্ডার করতে রাজী আছে। যদি ছেড়ে দেন, আমি তাদের সবাইকে নিয়ে আসতে পারি।' মেজর হাবিব তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে সেতুর আরো কাছে এগিয়ে

রাজাকারটিকে ছেড়ে দেয়। রাজাকারটি তার কথা মতই কাজ করে। মিনিট দু'য়ের মধ্যে ত্রিশ জন রাজাকার হাতিয়ার সহ দুই হাত উপর তুলে বানিয়াপাড়া সেতু থেকে ঢালু বেয়ে পশ্চিমে নেমে এলো। মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তার নীচেই অপেক্ষা করছিল। রাজাকারদের তাৎক্ষণিকভাবে নিরস্ত্র করে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার পাহারায় রতনপুরে পাঠিয়ে দেয়। মেজর হাবিব রাত চারটার আগেই সেতু দখল করে। সেতুতে বিস্ফোরক বসিয়ে সেফ্টি ফিউজ লাগিয়ে প্রহর গুনছিল। ঘড়ির কাটা ঠিক সাড়ে চারটা ছোঁয়ার সাথে সাথে সে ফিউজে আগুন দেয়। সাথে সাথে দিগ্-বিদিক কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। মুক্তিযোদ্ধাদের অনুমান মতো দুই সেতুর দিকে ঘাটাইল থানা থেকে সত্তর-আশি জন হানাদার গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যায়। ভোর পাঁচটায় আমরা ঘাটাইল থানায় আঘাত হানলাম। প্রথম ঝটকা আক্রমণে ঘাঁটির উত্তর দিকটা আমাদের দখলে এসে গেল। কিন্তু সর্বত্র কংক্রিটের বাংকার থাকায় বাকী তিন দিকের বাংকারগুলো কিছুতেই দখল নিতে পারলামনা। ঘাটাইল থানায় তখন নিয়মিত সেনা, মিলিশিয়া ও রাজাকার মিলে প্রায় আড়াই'শ হানাদার ছিল। আশি-নব্বই জন দু'দিকে বেরিয়ে গেলেও বাকীরা শক্তভাবে ঘাঁটি আগলাচ্ছে। আধঘণ্টা বার বার আক্রমণ চালিয়েও যখন পশ্চিম দিকের বাংকারগুলো দখল নেয়া সম্ভব হচ্ছিলনা, তখন ব্লান্ডার সাইট হাতে হানাদারদের যম দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা মজনু থানার সত্তর-আশি গজ পশ্চিমে একটি গাছের আড়াল নিয়ে ব্লান্ডার সাইট থেকে একটার পর একটা সেল নিক্ষেপ করে চললো। তিনশ' জন মুক্তিযোদ্ধা দু'টি এম. জি., চারটি এম. এম. জি., চল্লিশটি এল. এম. জি. এবং অন্যান্য নানা ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে যা করতে পারছিলাম না, মজনু একটি ব্লান্ডার সাইটের পুনঃ পুনঃ আঘাত হেনে তা করতে সক্ষম হলো। ডাইনে-বামে একশ' গজ জায়গা জুড়ে দৌড়াদৌড়ি করে বার বার অবস্থান বদল করে দশ মিনিটে দু'শ খানা সেল ছুঁড়ে থানার পশ্চিমের পাঁচটি বাংকারের তিনটি গুঁড়িয়ে দিল। আধঘণ্টা মরনপণ লড়াইয়ের পর পশ্চিমের বাংকারগুলো আমাদের দখলে এলো। থানার উত্তর ও পশ্চিমের বাংকারগুলো দখল নিতে আমাদের চারজন গুরুতর আহত হলো। উত্তর ও পশ্চিম মুক্তিবাহিনীর দখলে আসার পরও থানার পুরোপুরি দখল নেয়া সম্ভব হচ্ছেনা দেখে এক মাইল পশ্চিমে পিছিয়ে রতনপুরের ফারুকদের বাড়ির পাশে মর্টার নিয়ে অবস্থানরত মেজর হাকিমের কাছে গেলাম। হাকিম ভোর চারটা থেকে গোলা ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। অথচ সকাল ছ'টা পর্যন্ত একটাও গোলা ছুঁড়তে পারেনি। কারণ, সে গোলা ছোঁড়ার কোন নির্দেশ পায়নি। আমাকে দেখা মাত্র মেজর হাকিম দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার, আমি কি করবো? আমার মর্টারের কি কোন দরকার নেই?'

—না কমান্ডার, শেষ পর্যন্ত দেখছি থানা দখলে তোমার মর্টারেরই বেশী দরকার হয়ে পড়েছে।

মেজর হাকিম গোলা নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলো। গোলা ছুঁড়তে গিয়ে সমস্যা দেখা দিল, তা হলো মুক্তিযোদ্ধারাও হানাদার ঘাঁটিতে প্রায় ঢুকে পড়েছে। একই জায়গায় শত্রু ও মিত্র থেকে মেজর হাকিম কি করে গোলা ছুঁড়বে? বাধ্য

হয়ে মেজর হাকিমকে আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। উত্তর ও পশ্চিমের বাংকার থেকে মুক্তিযোদ্ধারা দু'শ গজ পিছিয়ে এলো। সাড়ে ছয়টায় মেজর হাকিম মর্টার থেকে গোলা ছুঁড়লো। গোলা লক্ষ্যস্থল থেকে কতদূরে এবং কোন্ দিকে পড়ছে তা দেখার জন্য একজন সহযোদ্ধাকে ও. পি. রাখা হলো। পর্যায়ক্রমে খবর আসতে লাগলো, মেজর হাকিমের প্রথম গোলা থানা পার হয়ে দু'তিনশ' গজ পিছনে পড়েছে। দ্বিতীয় গোলা থানার দুইশ' গজ ডানে ও তৃতীয় গোলা পড়লো থানার পিছনে পাকা রাস্তায়। মেজর হাকিম পঞ্চম ও ষষ্ট গোলাতেই তার নির্দিষ্ট নিশানা পেয়ে গেলো। ষষ্ট গোলা থানার মূল ঘরের টিনের চালে গিয়ে পড়লে ও. পি. আনন্দে লাফিয়ে উঠে। সে সাথে সাথে পিছনে সংকেতপাঠায়, 'টার্গেট' ঠিক হয়ে গেছে। এরপর মেজর হাকিমের সেকি রুদ্রমূর্তি। তার দ্রুত হাত চালনা দেখবার মতো।

একটানা দশ-বারোটি গোলা ছোঁড়ার পর দৌড়ে পিছনে, সামনে এবং ডানে-বামে গিয়ে মাথা নীচু করে ব্যারেলের দিকে উঁকি মেরে কি যেন দেখে নিয়ে আবার দৌড়ে মর্টারের কাছে এসে ব্যারেল ঠিক করে দশ-বারো কিংবা পনেরটি গোলা ছুঁড়ছে। আবার সেই পূর্বের মত সামনে পিছনে এবং ডানে-বামে থেকে ব্যারেলের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারা। এমনি করে আধঘণ্টায় সে দু'শটি গোলা নিক্ষেপ করলো। যার একশ'সত্তর খানা ঘাটাইল থানার উপর পড়ে একেবারে তছনছ করে দেয়। ঘাটাইল থানা দখলে মেজর হাকিম যে অব্যর্থ লক্ষ্য ও ক্ষিপ্রতার সাথে মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে তা' মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম অবিস্মরণীয় ঘটনা।

মেজর হাকিম মর্টার থেকে গোলা ছোঁড়ার সময় মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে পিছনে এবং ডান-বাম থেকে ব্যারেলের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল এই জন্য যে, তার কাছে মর্টারের রেঞ্জ-ফাইন্ডার ছিল না। তাই মর্টার প্লাটুনের মুক্তিযোদ্ধারা মর্টার বসিয়ে মর্টারের ব্যারেলের সরাসরি দশ-পনের হাত সামনে-পিছনে ও ডানে-বামে চারটি আড়াই থেকে তিন হাত লম্বা কাঠি গেড়ে রেখেছিল। মর্টার থেকে প্রথম গোলা ছোঁড়ার পর গোলা যখন থানার তিনশ' গজ পিছনে পড়লে তখন মেজর হাকিম বামের কাঠি উঠিয়ে দু'তিন ইঞ্চি পিছনে এনে গেড়ে দেয়। কাঠি একটু সরিয়ে দ্বিতীয় গোলা নিক্ষেপ করে ও. পি.-র সংকেতের অপেক্ষা করতে থাকে। সংকেত আসে, গোলা থানার দু'শ গজ পিছনে একটু বাম দিকে পড়েছে। ডান পাশের কাঠি ইঞ্চি দুই পিছনে সরিয়ে আবার গোলা নিক্ষেপ করে। এবার খবর এলো গোলাটি সামান্য ডানে একশ' গজ পিছনে পাকা রাস্তার উপর পড়েছে। মেজর হাকিম এবার ডানের কাঠি আরো ইঞ্চি খানেক পিছনে সরিয়ে এবং সামনের কাঠি একটু বামে নিয়ে চতুর্থ গোলা নিক্ষেপ করে। এইভাবে সামনের পিছনের ডাইনের বামের কাঠি নাড়িয়ে-চাড়িয়ে ষষ্ঠ গোলায় নিশানা পেয়ে যায়। সত্যিকার অর্থে ঐ কাঠিতেই ছিল মেজর হাকিমের যত যাদুমন্ত্র।

মজনুর ব্লান্ডার সাইট এবং মেজর হাকিমের মর্টারের গোলার আঘাতে সকাল সাতটায় ঘাটাইল থানার পতন ঘটলো। নিয়মিত খান-সেনা, মিলিশিয়া ও রাজাকার মিলে মোট একশ' ত্রিশ জন মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়লো।

মেজর হাকিমের মর্টারের প্রথম গোলার আঘাতেই থানার অফিসঘরে চার জন হানাদারের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। থানা দখলের পর অফিসঘরে চারটি ছিন্নভিন্ন দেহ ও মজনুর ব্লান্ডার সাইটের আঘাতে ধ্বসে যাওয়া বাংকার থেকে দশ-বারোটি থেঁতলে যাওয়া দেহ পাওয়া গেল। অফিসঘরে পড়ে থাকা চারটি ছিন্নভিন্ন দেহই পাওয়া গেল থানার সিন্দুকের কাছে। হয়তো অবস্থা শোচনীয় ভেবে সিন্দুকে রাখা লুঠের মালামাল নিয়ে সগার পার হওয়ার ধান্দায় ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। কালিদাসপাড়া ও বানিয়াপাড়া সেতুর দিকে যাওয়া রাজাকার ও মিলিশিয়ারাও মুক্তিবাহিনীর হাতে কেউ ধরা পড়লো, কেউ কেউ বা আত্মসমর্পণ করলো। কালিদাসপাড়া সেতু দখল নিতে গিয়ে মেজর মোস্তফার দলের একজন শহীদ ও দু'জন আহত হলো।

অপর দিকে ১০ই ডিসেম্বর সকালে জামালপুর ও ময়মনসিংহ থেকে মার খাওয়া হানাদার বহনকারী সামরিক ও বেসামরিক চারশ' গাড়ির কনভয় মধুপুরের দিকে পিছিয়ে আসতে থাকে। মেজর আনিস ও ক্যাপ্টেন আরজু হানাদারদের বিশাল বাহিনী মধুপুরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মধুপুর ঘাঁটি ছেড়ে পিছিয়ে আসে। হানাদার ব্রিগেডিয়ার কাদের খাঁ, ব্রিগেডিয়ার আজার নেওয়াজের ও কর্নেল সুলতান মাহমুদের কমান্ডে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ছয় হাজার নিয়মিত সৈন্য টাংগাইলের রাস্তা ধরে ঢাকার দিকে আত্মরক্ষায় পিছিয়ে আসতে থাকে। দুপুর বারোটায় তারা ঘাটাইলের উত্তরে বানিয়াপাড়া সেতুতে মেজর হাবিবের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বাধা পেয়ে হানাদাররা কনভয়ের উপর বসানো পনের-কুড়িটি মেশিনগান থেকে একসাথে বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। মেজর হাবিব সামনে বিরাট হানাদার বাহিনী দেখে বেশীক্ষণ বাধা না দিয়ে পশ্চাদাপসরন করে। পশ্চাদাপসরনের সময় তিনজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হয়। মেজর হাবিব বানিয়াপাড়া প্রতিরক্ষা তুলে নিলে ঘাটাইল থানায় বেশীক্ষণ থাকা সমীচীন বোধ হলো না। মুক্তিযোদ্ধাদের থানা থেকে দুই মাইল পশ্চিমে পিছিয়ে যাবার নির্দেশ দিলাম।

আমরা পিছিয়ে গোয়ালগন্ডার আধা-মাইল উত্তরে বিলের মাঝে একটি গ্রামে গিয়ে উঠলাম। থানায় প্রচন্ড গোলা-গুলির কারণে অনেকেই গ্রাম থেকে আরো পশ্চিমে নিরাপদ স্থানে সরে যাচ্ছিলেন। আমরা যে বাড়িতে গিয়ে উঠলাম, সেই বাড়ির অর্ধেক লোকজনও পশ্চিমে সরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে উঠলে ভিতর থেকে সতের-আঠার বছরের একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে কোন পরিচয় না দিয়ে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ছোট ভাই, কেমন আছেন?' আমি মেয়েটিকে এর আগে কখনো দেখিনি। তাই 'ছোট ভাই' বলে সম্বোধন করায় প্রথমে একটু বিস্মিত হলাম। আমাকে 'ছোট ভাই' বলে ডাকে শুধুমাত্র আমার ছোট ভাই-বোনেরা এবং ছোট ভাইবোনদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবীরা। মেয়েটি আমার দিকে কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আবার বললো, 'আমাকে চিনতে পারছেননা? আমি রহিমার সাথে কুমুদিনী কলেজে পড়ি।' মেয়েটিকে আমি চিনতে না পারলেও মেয়েটি আমাকে চেনে। মেয়েটির কথা শুনে বললাম, 'ওহ্, তুমি রহিমার সাথে

পড়! কেমন আছ? কতদিন হয় বাড়ি এসেছ?' মেয়েটি নিঃসংকোচে সমস্ত কথার উত্তর দিল।

আমরা দেড় ঘণ্টা সে বাড়িতে কাটালাম। আমাকে ও আমার দলের প্রায় আশি জন মুক্তিযোদ্ধাকে বাড়ির ছয়-সাত জনে মিলে পরম যত্ন সহকারে বসতে দেয়া খেতে দেয়া, সব কিছুতেই কুমুদিনী কলেজের ছাত্রীটি অন্যান্য সকলকে তড়িৎ কর্মতার দিক থেকে হার মানিয়ে দিল। দুপুরে খাওয়ার সময় আশীজন মুক্তিযোদ্ধার একজনও বাদ পড়ল না, যাকে মেয়েটি নিজ হাতে তরকারী, ভাত, ডাল অথবা পানি এগিয়ে দেয়নি।

বেতারে ক্যাপ্টেন পিটারের সাথে যোগাযোগ করলাম। তাঁকে বললাম, 'ঘাটাইল ও গোপালপুর থানায় বিমান সাহায্য প্রয়োজন। আপনি কর্তৃপক্ষকে ঘাটাইল ও গোপালপুরে বিমান সাহায্য দিতে বলুন। সাবধান মুক্তিযোদ্ধারা ঘাটির দু'তিনশ' গজের মধ্যে পৌছে গেছে। হামলা যেন ঘাটির মধ্যে সীমিত থাকে। ঘাটির পঞ্চাশ গজ বাইরে বিমান থেকে ছোড়া একটি বুলেটও যেন না পড়ে।' ক্যাপ্টেন পিটার বললেন, 'স্যার, আমাব সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ এখনও চালু রয়েছে। আমি একটু আগেও আপনাকে বার কয়েক পাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। কর্তৃপক্ষ জানতে চেয়েছেন, আমাদের দেয়া পয়েন্টগুলো নিরাপদ আছে কিনা? আজ যে কোন সময় একটি বিশেষ মেসেজ আসতে পারে। এই ব্যাপারে তাঁদের কি জানাবো?'

বিমান সাহায্যের অনুরোধ

এখনও সব ঠিক আছে। তবে বিশেষ কাজটির জন্য তৈরী হতে যেন আমাদের হাতে এক ঘণ্টা সময় থাকে, এটা আপনি জানিয়ে দিন।

—স্যার, আমি আপনার বার্তা এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আধঘণ্টার মধ্যে আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করবো।

টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে এই প্রথম ভারতের কাছে বিমান সাহায্য চাওয়া হলো। আমি তখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই, বিমান সাহায্য আসবে কিনা, এবং আসলে তা কখন আসবে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে আধঘণ্টা পর যখন বিলের মাঝের বাড়ি থেকে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো, তখন বেতারে সংবাদ আসতে লাগলো। ক্যাপ্টেন পিটার জানালেন, 'বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এক ঘন্টার মধ্যে বিমান সাহায্য আসছে। এরপর যখনই বিমান সাহায্যের প্রয়োজন হবে, অনুরোধ পাবার আধ ঘন্টার মধ্যেই বিমান সাহায্য পাঠাবেন।' ক্যাপ্টেন পিটারের কথা শুনে খুব খুশী হলাম। পিটারের সাথে বেতারের লাইন কেটে দিয়ে তাড়াতাড়ি গোপালপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। গোপালপুরকে পাওয়া গেল। তাদের নির্দেশ দিলাম। 'তোমরা থানা থেকে পাঁচশ' গজ পিছিয়ে যাও। এখনি তোমাদের জন্য বিমান সাহায্য আসছে। হানাদার ঘাটির উপর বিমান হামলা শেষ হবার আগে তোমরা এগিয়ে যাবেনা। বিমান আক্রমণ হবার পরও এগিয়ে যাবার আগে আমার সাথে যোগাযোগ করো।' ঘাটাইলের দিকেও দূত পাঠানো হলো। কেউ যেন থানার দিকে না যায়। বিমান সাহায্য আসছে।

ঠিক তিনটায় ভারতীয় তিনটি মিগ-২১ ঘাটাইল ও গোপালপুর থানার উপর উপর্যুপরি স্ট্রাপিং শুরু করলো। আমি ঘাটাইল থানার এক মাইল দূরে বীর ঘাটাইলের একটি বিরাট বট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। বিমান একবার করে ছোঁ মারছে আর মেশিনগানের বিকট শব্দে পুরো এলাকাটা থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। থানা এলাকা থেকে কুন্ডলী পাকিয়ে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে। এতদিন মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটির উপর হানাদার বিমান এমনি করে মেশিনগান চালাতো, রকেট সেল নিক্ষেপ করতো, বোমা ফেলতো। মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি থেকে কুন্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উঠে আকাশে মিলিয়ে যেতো। আজ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। আজ মুক্তিবাহিনীর উপর বিমান হামলা হয়নি, হয়েছে হানাদারদের উপর। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহিনী হিসাবে নিজেদের দাবী করলেও একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এটা প্রমাণ করে দিয়েছে, পাকিস্তান বাহিনী অজেয় নয়, দুর্দান্ত পাল্টা মারের মুখে তারা ভীরু ও দুর্বল। তারা নিরপরাধ নিরস্ত্রের সাথে সাহস দেখাতেই বেশী ওস্তাদ। আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের নানা স্থানে নিরীহ জনগণও অসংগঠিত প্রশিক্ষনহীন মুক্তিযোদ্ধাদের উপর বীরত্ব দেখাতে পারলেও, আগস্টের পর থেকে আর খুব বেশী পারেনি। আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন টাংগাইল, পাবনা, ময়মনসিংহ ও ঢাকার কিছু জায়গায় জুলাই মাস থেকেই হানাদাররা দাঁত বসাতে বা, কোন কেরামতি দেখাতে পারেনি। অক্টোবরের পর তো মারের গতিটাই সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তখন মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ কৌশল আক্রমণাত্মক আর হানাদারদের ভূমিকা হয়ে পড়ে আত্মরক্ষামূলক। প্রথমতঃ হানাদাররা তড়পাতো। টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর উত্তরোত্তর আক্রমণাত্মক ভূমিকায় সফলতা অর্জনে তাদের সেই তড়পানিও বন্ধ হয়ে যায়। জান বাঁচানোই তখন হানাদারদের প্রথম, প্রধান ও শেষ লক্ষ্য হয়ে পরে। হানাদার বিমান বাহিনীর ক্ষেত্রেও কথাটা সমভাবে প্রযোজ্য। প্রতিরোধহীন ও পাল্টা হামলার আশংকামুক্ত খোলা আকাশে তারা নির্বিচারে বাংলায় যত্রতত্র বোমা বর্ষণ করেছে। কিন্তু ভারতীয় বিমান বাহিনী যখন আঘাত হানলো তখন হানাদাররা একটি বিমানও আকাশে উড়াতে পারেনি। মিগ-১৯ ও স্যাবর জেট মিলিয়ে বাংলাদেশে হানাদারদের সাতাশ-আটাশটি যুদ্ধ বিমান ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যেই সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। মিত্র বাহিনীর বিমানকে বাঁধা দেবার মতো বিমান শক্তি আর হানাদারদের ছিলনা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনটি বিমান বিনা বাধায় আধ ঘণ্টা গোপালপুর ও ঘাটাইল থানায় স্ট্রাপিং ও বোমা বর্ষণ করে চলে গেল। বিমান হামলার বার্তা বেতারে ইন্টারসেপ্ট করে হানাদাররা গোপালপুর ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছিল। তবে তারা ঘাঁটি ছাড়লেও দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে পারেনি, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে যায়। এখানে রাজাকার, মিলিশিয়া ও নিয়মিত খান-সেনা সব মিলিয়ে মোট তিনশ' পঞ্চাশ জন হানাদার মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। বিমান আক্রমণে ঘাটাইল থানা হানাদার মুক্ত হয়ে গেলেও তখনই আমরা থানায় গিয়ে উঠলাম না। কারণ, ঐ সময় বানিয়াপাড়া সেতুর পাশে রাখা কয়েকশ' মণ পাট ভাঙা সেতুর নীচে

খাদে ফেলে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে হানাদাররা কোন রকমে গাড়ী পার করে। আমাদের সামনে দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছিল। কচ্ছপ গতিতে গাড়ির বহর টাংগাইলের দিকে যাচ্ছে। গাড়িতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রতিটি গাড়ির পেছনে কুড়ি-পঁচিশ জন, আবার কোন কোন গাড়ির পেছনে আরো বেশী লোক হেঁটে যাচ্ছে। এদের বেশীরভাগই রাজাকার অথবা হানাদারদের সহযোগী মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য দলের দালাল। রক্ষা কর্তা প্রভুরা প্রাণভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। এতদিন তারা খুঁটির জোরে যৎকিঞ্চিত হলেও বানর নাচ নেচেছে। এমনিতেই করুণ অবস্থা, তার উপর হানাদাররা চলে গেলে তাদের যে কি নিদারুণ ভয়াবহ পরিণতি হবে, ভেবে 'যেতে নাহি দিব' নয়, 'আমরাও যাবো', প্রাণে বাঁচার ক্ষীণ আশার গোঁ ধরে তারাও হেঁটে সাথে চলেছে।

তখন হানাদারদের ভাবখানা এই, 'নিজেরাই বাঁচিনা, নিজেদেরই জায়গা হচ্ছেনা, তোমাদের নেব কি করে? তোমাদের কাজ তো শেষ। এখন আর দরকার কী? যাও, মুক্তিবাহিনীর হাতে মর গিয়ে। অপকর্মের সিংহভাগ তো তোমরাই করেছ।'

চলার পথে দু'একবার এও দেখা গেল, কোন রাজাকার গাড়িতে উঠার চেষ্টা করছে অমনি পাকিস্তানী হানাদাররা লাথি মেরে গাড়ি থেকে ফেলে দিচ্ছে। ১১ই ডিসেম্বর সকাল থেকে টাংগাইল শহরেও এই ধরনের শত শত ঘটনা ঘটে। হানাদাররা প্রাণ বাঁচাতে বাসে, ট্রাকে, ট্যাক্সি-জীপে ঢাকার দিকে পালাচ্ছে আর 'পুরাতন ভৃত্য' রাজাকার, আলবদর, আলসামস ও দালালের দল সাথে যাবার জন্য। গাড়িতে উঠার চেষ্টা করছে। খান-সেনারা তাদের ঘাড় ধরে লাথি মেরে বন্দুকের বাট দিয়ে গুঁতিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে। এত কিছুর পরও পিছু চলা ও গাড়িতে উঠার প্রাণান্তকর প্রয়াসের বিরাম নেই। অনেক কুখ্যাত বাঘা বাঘা দালালদেরও হানাদাররা এমনি ছিবড়ানো আঁখের মত ছুঁড়ে ফেলে গিয়েছিল।

বিকাল চারটায় বেতারে বার্তা এলো। সেই বিশেষ বার্তা, ছত্রীসেনা আসছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তারা টাংগাইলের আকাশে ছড়িয়ে পড়বে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে মেজর হাকিমকে শেষ বারের মতো সতর্ক করে দিলাম, 'তৈরী হয়ে যাও। তারা আসছেন। যে ভাবেই হোক তাঁদের এক ঘণ্টা নিরাপদে রাখতে হবে।' এদিকে তখন হানাদারদের সর্বশেষ গাড়িটি শোলাকুরা পেরিয়ে আরো দক্ষিণে চলে গেছে। টাংগাইলের আকাশে এক ঝাঁক বিমান দেখা গেল। টাংগাইল, কালিহাতী, ঘাটাইলের উপর দিয়ে দুটি মিগ-২১ তিন-চার বার চক্কর দিল। বিমানগুলো প্রতিবারই নীচু হয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দেখিয়ে যাচ্ছিল। এর অর্থ বুঝতে আমাদের দেরী হলোনা। আমরা ধোঁয়ার কুণ্ডলী জ্বালিয়ে বিমান দুটিকে সংকেত দিলাম। সংকেত বুঝার পর সে দুটি অনেক উপরে উঠে গেলে অনেক উঁচুতে চক্কর

ছত্রীসেনা অবতরণ

মারা বিমানের ঝাঁকগুলো নীচে নেমে এলো। বিমানগুলোকে খুব ধীর গতির মনে হচ্ছিল। নীচ দিয়ে দুই-তিন বার চক্কর দিয়ে দশ-বারোটি বিমানের ঝাঁক একদল ছত্রীসেনা নামিয়ে দিল। হুট্ করে বিমান থেকে বেরিয়ে আসা ছত্রীসেনাদের ঐ এলাকার মানুষ প্রথমে লিফলেট বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের ধারণা অল্পক্ষণের মধ্যে বদলে যায়। উড়তে থাকা

কাগজের টুকরোগুলো যেন ক্রমশঃ বড় হয়ে বিভিন্ন রং-এর ফুল, একটু পরে আবার ছাতার আকার নিতে লাগলো। প্রথম ঝাঁক বিমান একদল ছত্রীসেনাকে ছেড়ে সরতে না সরতে আর এক ঝাঁক এসে আরেক দল সেনাকে নামিয়ে দিল। এমনিভাবে এক ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে তারা ছত্রীসেনাদের ছাড়তে লাগলো। কালিহাতী পুংলির মাঝামাঝি, আকাশ তখন ছত্রীসেনায় ছেয়ে গেছে। তাঁরা আস্তে আস্তে হেলেদুলে নীচে নামছেন। ছত্রীসেনারা যতই নীচে আসছেন, তাঁদের প্যারাসুটগুলো ততই বড় দেখা যাচ্ছে। আকাশে তখন অন্য কোন বিমানের আনাগোনা নেই। শুধু ভারতীয় বিমান বাহিনীর দুটো ফাইটার কয়েক হাজার ফুট উঁচু দিয়ে চক্কর মারছে। সন্ধ্যার একটু আগে ছত্রীসেনারা একে একে টাংগাইলের মাটিতে নামতে থাকে। ছত্রীসেনা অবতরণের পর দেখা গেল, আমার সন্দেহই সঠিক হয়েছে। চিহ্নিত তৃতীয় স্থানের কিছু পশ্চিম-দক্ষিণেই ছত্রীবাহিনীর বেশী অংশটা নেমেছে। অল্প-সংখ্যক ছত্রীসেনা প্রায় আধ মাইলের ব্যবধানে পড়েছে। তৃতীয় চিহ্নিত স্থান থেকে দু'মাইল সোজা দক্ষিণে সত্তর-আশি জনের একটি দল পড়েছে। যদিও দ্বিতীয় চিহ্নিত স্থানের পশ্চিম প্রান্তে অবতরণ করা ছত্রীসেনাদের মুক্তিযোদ্ধারা সাথে সাথে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয় কিন্তু অন্য স্থানে অবতরণ করা ছত্রীসেনাদের সাথে মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ ঘটতে ঘটতে অনেক রাত হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর ক্যাপ্টেন পিটারকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ক্যাপ্টেন পিটার এবং ছত্রীসেনা কর্নেল দু'জনেরই মত, 'স্থান চিহ্নিতকরণ ঠিকই ছিল, ছত্রীসেনাও ঠিক স্থানে ফেলা হয়েছিল কিন্তু প্রবল বাতাস থাকার কারণে নির্দিষ্ট স্থান থেকে তাঁরা কোন জায়গায় এক মাইল, কোন জায়গায় আধমাইল দূরে গিয়ে পালিয়ে যাওয়া শত্রুদের একেবারে ঘাড়ের উপর পড়ে। এতে যদিও ছত্রীসেনাদের পনের-কুড়ি জন নিহত হন তবু যুদ্ধের জন্য এটা শাপে বর হয়েছিল।'

ছত্রীসেনা অবতরণের সাথে সাথে দক্ষিণে এগুতে লাগলাম। আমার প্রথম ও প্রধান কাজ ছত্রীসেনাদলের মূল নেতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন। কারণ পূর্বেই জানানো হয়েছিল আমার সাথে যোগাযোগের জন্য ছত্রীসেনারা অপেক্ষা করবেন। রাত আটটায় দীঘলকান্দি এসে পেঁছিলাম। এখানে আগে থেকেই নুরুন্নবী ও ক্যাপ্টেন পিটার অবস্থান করেছিলেন। ক্যাপ্টেন পিটার একেবারে পাগলের মতো বারংবার বলতে লাগলেন, 'স্যার, এখন প্রতিটা মিনিট যারপর নাই মূল্যবান। আমাকে কর্তৃপক্ষ বার বার জানিয়েছেন, আপনার সাথে ছত্রীসেনা দলের নেতার তাৎক্ষণিক যোগাযোগ হওয়া দরকার। আপনি তাড়াতাড়ি লোক পাঠান। আমাদের সাথে ছত্রীসেনার যে ফ্রিকোয়েন্সি দেয়া হয়েছিল, তা কাজ করছেনা।' পিটারকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'যোগাযোগের সমস্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমার ধারণা গভীর রাতে ছত্রীবাহিনীর মূল নেতাকে পেয়ে যাব।'

মধুপুর, গোপালপুর, কালিহাতী থানাসহ শোলাকুরা পর্যন্ত পাকা সড়ক মুক্তিবাহিনীর সম্পূর্ণ দখলে। পলায়ন পর হানাদাররা পুংলি থেকে ফুলতলার মাঝামাঝি অবস্থান নিয়েছিল। হানাদাররা ময়মনসিংহ জামালপুর থেকে বিধ্বস্ত হয়ে পিছিয়ে আসার সময় ১০ই ডিসেম্বর সারাদিন মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে

তাদের পিছনে বার বার হামলা করেছে। মধুপুর থেকে শোলাকুরা পর্যন্ত পৌঁছাতেই মুক্তিবাহিনীর লাগাতার চোর-গুণ্ডা হামলায় হানাদাররা প্রায় কুড়িটি গাড়ি ও শতাধিক নিয়মিত সেনা খুইয়েছে। তিন ইঞ্চি মর্টার রকেট লাঞ্চার, ব্লান্ডার সাইট ও মেশিনগানের পুনঃ পুনঃ আঘাতে শত্রুরা অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। ভীত, সন্ত্রস্ত হানাদারদের মনে হতে থাকে রাস্তার প্রতি ঝোপে, প্রতি বাঁকে মুক্তিযোদ্ধারা শিকারী নেকড়ের মতো ওৎ পেতে আছে। যে কোন মুহূর্তে, যে কোন সময় মুক্তিবাহিনী তাদের ঘাড় মটকে দিতে পারে। পশ্চাদাপসরনে ব্যস্ত খান-সেনাদের মানসিক, বিপর্যয়ের দিকটা আমাদের বুঝতে বাকী রইলোনা। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, আর একটু চাপ দিতে পারলেই সব হানাদারদের ধরা যাবে। সেই মতই দুপুরের পর যখন টাংগাইল-ময়মনসিংহ রাস্তার উপর মুক্তিবাহিনীর চাপ আরো বাড়ানো হয়েছিল, তখন ছত্রীসেনা অবতরণের খবর আসে। খবর আসার সাথে সাথে মুক্তিবাহিনীর মর্টার আক্রমণ বন্ধ করে দেয়া হলো। ছত্রীসেনা নামিয়ে নিয়ে বিমানগুলো চলে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরও হানাদারদের উপর আর মর্টার হামলা করা সম্ভব হলোনা। আমাদের তখনও সঠিক জানা নেই, ছত্রীসেনারা কোথায় কোথায় অবতরণ করেছেন। তাই আমরা চাইছিলাম না আমাদের মর্টারের গোলার আঘাতে কোনও ছত্রীসেনার ক্ষতি হোক। ঐ কারণে বিকেল সাড়ে চারটার পর থেকে মর্টার ফায়ার বন্ধ রাখা হলো এবং তা বন্ধ থাকলো পরদিন সকাল সাতটা পর্যন্ত।

জামালপুর-ময়মনসিংহের উপর দিয়ে মিত্রবাহিনীর দুটো ব্রিগেড ঢাকার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। আমার দল নিয়ে ৯ তারিখ জামালপুর না গিয়ে ধনবাড়ীর কাছাকাছি থেকে ফিরে এসেছিলাম। ৮ তারিখ মাঝরাতে জামালপুর থেকে মধুপুর পিছিয়ে এসে এক ব্যাটেলিয়ন হানাদার সেনা পশ্চাৎরক্ষার জন্য অবস্থান নেয়। বেশ কিছু হানাদার আবার জামালপুরের দক্ষিণে সমস্ত এলাকাটা জুড়ে একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এতে হানাদারদের উত্তর দিকের প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী পিছন থেকে আক্রমণ করছে এটা জানার পর তারা বেশ শংকিতও বোধ করছিল। ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লেরের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় ব্রিগেড ৩রা ডিসেম্বর কামালপুরের পাশ দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে। কামালপুরে দীর্ঘ লড়াই চালাবার পরও যখন হানাদার ঘাটির পতন ঘটলোনা, তখন কামালপুর ঘাটি মুক্তিবাহিনী ও বি. এস. এফ দিয়ে ঘিরে রেখে ব্রিগেডিয়ার ক্লেরের ব্রিগেড বক্সীগঞ্জের দিকে এগোতে থাকে। বক্সীগঞ্জ, শ্রীবর্দী ও শেরপুরে ছোট-খাটো যুদ্ধ করে তারা ৮ তারিখ দুপুরে জামালপুরের ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারে এসে পৌঁছে। জামালপুরের পাশে ব্রহ্মপুত্র প্রায় এক মাইল প্রশস্ত। অন্যদিকে দক্ষিণ পারে শত্রুর সুদৃঢ় ঘাটি। ব্রহ্মপুত্র, ভারতীয় বাহিনীর সামনে তখন বিরাট বাধা। এই সময় মেজর জেনারেল গিল হানাদারদের পিছনের দিক থেকে আঘাত হানার জন্য বেতারে বার্তা পাঠাতে তুরা ঘাটিকে নির্দেশ দেন। সেইমতো আমার সাথে তুরা ঘাটির যোগাযোগ হয়। ৮ তারিখ রাতে জামালপুরে হানাদার ঘাটির উপর বার বার আঘাত হেনেও ভারতীয়

জামালপুরের পতন

বাহিনী বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। ৯ই ডিসেম্বর পূর্ণোদ্যোগে আঘাত হানার পরিকল্পনা নিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জের রিয়ার বেস থেকে মেজর জেনারেল গিল ও ব্রিগেডিয়ার ক্লের একটি জীপে জামালপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। গাড়ীটি মেজর জেনারেল গিল নিজে চালাচ্ছিলেন। কামালপুর ও বক্সীগঞ্জের মাঝে দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটি এ্যান্টি ট্যাংক মাইনের বিস্ফোরণে তাদের গাড়ি উল্টে-পাল্টে যায়। জীপের ডান অংশ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেজর জেনারেল গিল দারুণভাবে আহত হন। মাইনের আঘাতে তার দুটি পায়ের পাতার সমস্ত মাংস উড়ে যায় এবং হাড় বেরিয়ে পড়ে। শিরা ও ধমনী কেটে যাওয়ায় মোটা ধারায় অনবরত রক্তক্ষরণ শুরু হয়। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে সাথে সাথে হেলিকপ্টারে প্রথমে তুরা ও পরে শিলং মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়ির অন্য আরোহী ব্রিগেডিয়ার ক্লের অত্যাশ্চর্যজনক ও অলৌকিকভাবে অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান।

৯ই ডিসেম্বর দুপুরের পর ভারতীয় বিগ্রেড জামালপুরের উপর আবার আক্রমণ চালান। এই সময় মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি কোম্পানী ও ভারতীয় বাহিনীর একটা অংশ জামালপুর থেকে ডাইনে ও বামে অনেকদূর সরে এসে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে দক্ষিণ পারে আসতে সক্ষম হয়। বিকালে ভারতীয় বিমান বাহিনী জামালপুর হানাদার ঘাঁটির উপর এক ঘণ্টা ধরে উপর্যুপরি আঘাত হানে। তারা জামালপুরে কয়েকখানা হাজার পাউণ্ডের বোমা ফেলেন। হাজার পাউণ্ডের বোমাগুলো হানাদারদের শক্ত ভিত্ নাড়িয়ে দেয়। বোমার আঘাতে কংক্রিটের বাংকারগুলোর অধিকাংশই গুড়িয়ে যায়। রাতে আরো বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় সেনা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে আসেন। ভারতীয় বাহিনীর বড় অংশটা নদী পেরিয়ে এলেও তাঁদের সমস্ত যানবাহন নদীর উত্তর পারেই পড়ে থাকে। গভীর রাতে দেখা গেল, জামালপুর হানাদার ঘাঁটিতে তেমন কোন সাড়াশব্দ নেই। উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ভারতীয় বাহিনী আস্তে আস্তে জামালপুর শহরে এসে দেখেন, শহর প্রায় ফাঁকা। গাড়ি, অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রতন্ত্র ফেলে পাক-হানাদাররা পালিয়েছে। ভারতীয় সেনারা জামালপুরে শত্রুর সাথে একটা বিরাট সংঘর্ষের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এগুচ্ছিলেন। অথচ জামালপুরে তাদের বড় সড় প্রতিরোধের মুখে পড়তে হলোনা। এতে তাঁরা খুশীই হলেন। তাঁরা ভাবলেন, চরম আঘাতের জন্য শক্তি সঞ্চিত রইলো। জামালপুর থেকে পালিয়ে যাবার সময় ভারত-বাংলা যৌথ বাহিনীর কাছে ছ'শ হানাদার সেনা ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই আহত।

টার্গেট টাংগাইল

উত্তর-দক্ষিণে চলে যাওয়া ময়মনসিংহ-টাংগাইল সড়কের পশ্চিম অংশে আমরা যখন হানাদারদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে চলছিলাম, তখন সড়কের পূর্ব অংশে অবস্থানরত সকল কোম্পানীকে রাস্তা অবরোধ করতে হেড-কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ দেয়া হলো। নির্দেশ পেয়ে পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ কমাণ্ডার তাদের কোম্পানী নিয়ে কালিহাতী থেকে টাংগাইল, টাংগাইল থেকে মির্জাপুর এই দীর্ঘ সড়কের স্থানে স্থানে হানাদারদের উপর পুনঃ পৌণিক আঘাত হানছিল, কোথাও বা ছিল আঘাতের প্রতীক্ষায়। ১০ই ডিসেম্বর সারাদিনের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে আমরা পর্যুদস্ত শত্রু সেনাদের কাছ থেকে তিনটি আর. আর., একটি তিন ইঞ্চি মর্টার, দুটো এম. জি. সহ পাঁচ-ছ'শ নানা ধরনের স্বয়ংক্রিয় চাইনীজ অস্ত্র ও লক্ষাধিক গুলি-গোলা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হলাম। এতগুলো আনকোরা নতুন অস্ত্র পেয়েও আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তা কাজে লাগাতে পারলামনা। কারণ হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা সমস্ত অস্ত্রই অকেজো। কোনটার ম্যাগাজিন নেই, কোনটার বোল্ট নেই, কোনটার ফায়ারিং পিন নেই, কোনটার আবার ব্রিজ ব্লক গ্রুপ নেই। ১০ তারিখের উদ্ধারকৃত অস্ত্রের কিছু চালু করার জন্য কয়েকজন লেগে গেল। তারা অনেক চেষ্টা করে সন্ধ্যার মধ্যে প্রায় সত্তর-আশিটি চাইনীজ রাইফেল ও স্টেনগান মেরামত করে ফেলে। রাত এগারোটায় হানাদারদের পরিত্যক্ত কয়েকটি গাড়ি থেকে মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা ও স্বেচ্ছাসেবকরা পনের-কুড়িটি সীল করা বাক্স ও সাত-আটটি বস্তা উদ্ধার করে দত্তগ্রাম স্কুলের সামনে নিয়ে এলো। আমি তক্ষুনি দত্তগ্রামে উদ্ধারকৃত মালামাল দেখতে গেলাম। সীলকরা বাক্সগুলো বিস্ফোরকের। মুক্তিযোদ্ধারা বস্তাগুলো খুললে, বস্তাগুলো থেকে কিছু অমূল্য সম্পদ বেরিয়ে এলো। দত্তগ্রাম স্কুলের সামনে বস্তাগুলো একটার পর একটা খালি করা হলো। সব ক'টি বস্তাই নানা ধরনের লোহা-লক্করে ভরা। অনেক অপ্রয়োজনীয় লোহা-লক্করের মধ্যে থেকে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত হাতিয়ারের ক্ষুদ্র অংশগুলো বাছতে থাকে। নানা ধরনের এক গাদা টুকরো লোহা খোঁজাখুঁজি করে আর. আর-এর পাঁচটি ব্রীজ ব্লক পাওয়া গেল। আমাদের দখলের তিনটি আর. আর-এর একটারও ব্রীজ ব্লক ছিল না। পাঁচখানা ব্রীজ ব্লক পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে আমি খুব আনন্দিত হলাম। কিন্তু একি! ব্রীজ ব্লক পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল প্রথমটাতে ফায়ারিং পিন নেই, দ্বিতীয়টিতেও না, তৃতীয়টিতেও না, চতুর্থটিতে ফায়ারিং পিন আছে, পঞ্চমটিতে নেই। একটি ভাল ব্রীজ ব্লক গ্রুপ পাওয়াতেই আমরা দারুন খুশী। টুকরো লোহার স্তুপ থেকে বেছে দুটি এম. জি-র প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করাও সম্ভব হলো। আর. আর-এর ব্রীজ ব্লক হাতে নিয়ে দু'চার বার নেড়েচেড়ে দেখে একজন সহযোদ্ধার হাতে দিয়ে টাংগাইল-ময়মনসিংহের পাকা সড়কের মোগলপাড়ার দিকে এগুলাম। এদিকে শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা টুকরো লোহা স্তুপের ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ খুঁজে বের করে রাতের মধ্যে নানা

ধরনের দু'শ চাইনীজ অস্ত্র সচল করে ফেললো। হানাদারদের কাছ থেকে দখল-করা একটি আর. আর. রাত দু'টায় দিগর ইউনিয়ন থেকে মুক্তিযোদ্ধারা মোগলপাড়ায় নিয়ে এলো। এই অকেজো হাল্কা কামান, ব্রীজ ব্লক লাগিয়ে ঠিক করা হলো। কামান ঠিক হলো কিন্তু তা চালাবে কে? কামাল চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন যোদ্ধা নেই। এই অসুবিধাটা অবশ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হলোনা। অন্য সময় নতুন আধুনিক অস্ত্র দখল নিতে পারলে যেভাবে তা চালানোর ব্যবস্থা হয়েছে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হলোনা। আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকার সময় এ্যাণ্টি ট্যাংক গান চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। এ্যাণ্টি ট্যাংক গান এবং চাইনীজ এই হাল্কা কামান চালনা প্রায় একই রকম। বরং একটু সোজা। আমি ছাড়া আরও দুই জনের সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। এদের মধ্যে একজন মেজর হাকিম, অন্য জন পাকিস্তান গোলন্দাজ বাহিনীর এক প্রাক্তন সৈনিক, এরা দুজন যদিও কখনও আর. আর. থেকে ফায়ার করেনি তবে তাদের প্রশিক্ষণ আছে, এমনকি তারা কয়েকবার কামানের ফায়ার দেখেছে। তিনজনে দেখেশুনে, পরামর্শ করে হাল্কা কামানে গোলা ভরলাম। মেজর হাকিমই প্রথম ফায়ার করতে এগিয়ে গেল। মেজর হাকিম অতি সহজেই আর. আর. থেকে প্রথম গোলা নিক্ষেপ করলো। সামনে শত্রু নেই। শুধু পরীক্ষা করার জন্য গোলা-ছোঁড়া, তাই একটু উঁচু জায়গা থেকে তিন-চারশ' গজ দূরে একটি খালের মধ্যে গোলা ছোঁড়া হলো। প্রাক্তন সৈনিকটিও পাঁচ-ছ'টি গোলা ছুঁড়লো। আমিও কয়েকটি গোলা ছুঁড়ে দেখলাম আর. আর থেকে গোলা ছোঁড়া অত্যন্ত সহজ। কোন ঝাঁকি নেই। কামানের নলের সাথে কামান চালকের কোন সংযোগ থাকছেনা। ব্যারেল থেকে প্রায় এক ফুট পাশে নিশানা মেলানোর ব্যবস্থা। শুধুমাত্র হাত এগিয়ে ট্রিগার টিপলেই ফায়ার। হাল্কা কামান থেকে পরীক্ষামূলকভাবে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকটি যখন গোলা ছুঁড়ছিল, তখন দুইজন মুক্তিযোদ্ধা কামান চালানোর জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো। এদের একজন ধনবাড়ী কলেজের ছাত্র, অন্যজন জোগারচরের মধ্যবয়সী কৃষক। এরা দু'জনেই রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করতো। তারা সোজাসুজি প্রস্তাব করে বসলো, 'স্যার, এই বড় অস্ত্রটা আমাদেরকে চালাতে দিন।' আমি গোলা ছুঁড়ে তাদেরকেও সুযোগ দিলাম। আন্তরিকতা থাকলে যে বাঙালীরা সব পারে, তা এই দুইজন মুহূর্তের মধ্যে দেখিয়ে দিলে। দুইজনই প্রথম দুইটি করে চারটি গোলা ছুঁড়লো। অতবড় একটি অস্ত্র, জীবনে এই প্রথম চালাতে তাদের বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। তারাও মেজর হাকিম ও প্রাক্তন সৈনিকটির মতোই অতি সহজে গোলা ছুঁড়লো। এর পর এদের দুইজনকে দিয়ে প্রায় দশ-বারোটি গোলা ছোঁড়ানো হলো। আমি চট করে একটি জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'ঐখানে গোলা ছোঁড়ো।' মুহূর্তের মধ্যে ছুঁড়তে হবে। তারা করলোও তাই। তাড়াহুড়োর মধ্যে পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও দেখিয়ে দেয়া নিশানার সাত-আট গজের বেশী দূরে তাদের কোন গোলাই পড়লোনা। দুইজনের মধ্যে কলেজের ছাত্রটির চাইতে চরের কৃষক যোদ্ধাটি সহজভাবে নিশানার কাছে গোলা ফেলতে পারছে। এদের দুইজনকেই মূল গানার করে, আরো পনের জনকে তাদের সহকারী হিসাবে দিয়ে রাতের মধ্যে একটা আর.

আর. সেকশন গঠন করা হলো।

রাত চারটায় মেজর হাবিবকে মোগলপাড়া থেকে উত্তরে এগিয়ে কালিদাসপাড়ায় অনুকূল অবস্থান দেখে রাস্তা অবরোধ করে থাকতে কড়া নির্দেশ দেয়া হলো। কোনক্রমে যেন একটা কাক পক্ষীও ময়মনসিংহ-টাংগাইল পাকা সড়ক ধরে টাংগাইলের দিকে আসতে না পারে। মেজর হাবিবের মূল দায়িত্ব আমার পশ্চাৎভাগ রক্ষা করা। ভোর পাঁচটায় আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধার এক বিশাল দল নিয়ে ময়মনসিংহ-টাংগাইল পাকা সড়ক ধরে টাংগাইলের দিকে এগুতে শুরু করলাম। মোগলপাড়া থেকে কদমতলী, আঠারদানা, হামিদপুর এবং কালিহাতী পর্যন্ত বিনা বাধায় এগিয়ে এলাম। কালিহাতীতে এসে দেখলাম, ক্যাপ্টেন রিয়াজ, মেজর নবীনেওয়াজ ও সামাদ গামা কালিহাতী থানা দখল করে বসে আছে। তাদের কাছে খবর পেলাম, কালিহাতী থেকে শোলাকুরা পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা মুক্তিবাহিনীর দখলে। খবর পেয়ে আমরা কালিহাতীতে না থেমে টাংগাইলের দিকে এগুতে লাগলাম। কালিহাতী থেকে শোলাকুরা, এই রাস্তাটুকু কমান্ডার মনি, গোলাম সরোয়ার ও চাঁনামুড়ার আবদুল হামিদ দখল করে রেখেছিল। আমরা শোলাকুরা সেতু পার হয়ে ইছাপুরের দিক থেকে শত্রুদের দ্বারা প্রথম বাধা পেলাম। আগের দিন, ময়মনসিংহ থেকে টাংগাইলের দিকে পালিয়ে আসা হানাদাররা পুংলি থেকে ইছাপুর পর্যন্ত রাস্তা জুড়ে শক্ত অবস্থান নিয়ে বসে ছিল। তারা অবশ্য ইচ্ছা করে এই অবস্থান নেয়নি। হানাদাররা টাংগাইলের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। তাদের গাড়ির সারি যখন শোলাকুরা থেকে টাংগাইল পর্যন্ত আস্তে আস্তে এগুচ্ছিল, তখনই গাড়ির সারির মাঝে, পুংলি নদীর পারে ও পাকা সড়কের উপর এক ব্যাটেলিয়ন ভারতীয় ছত্রীসেনা অবতরণ করে। এতে হানাদার দলের আদ্ধেক অংশ আটকা পড়ে যায়। তারা মরিয়া হয়ে পাগলা কুকুরের মত ছত্রীসেনার বেষ্টনী ভেঙে টাংগাইলের দিকে যাওয়ার শেষ চেষ্টা করে। প্রথম অবস্থায় আচমকা একেবারে শত্রুদের ঘাড়ের উপর অবতরণ করে যেমন ছত্রীসেনার একটা অংশ ভীষণ বেকায়দায় পড়ে যায়, তেমনি শত্রুপক্ষও ঘাবড়ে যায়। ছত্রীসেনাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হলেও পুংলীর পাকা সড়কের উভয় পাশে নেমে-পড়া ছত্রীসেনাদের অবস্থা সামলে উঠতে দেরী হলো না। মনোবলহীন, ক্লান্ত, পযুর্দস্ত হানাদাররা ভারতীয় ছত্রীবাহিনীর সামনে তোপের মুখে তুলার মত উড়ে যেতে লাগল। ছত্রীবাহিনীর অবতরণ দেখে আটকা পড়া স্বগোত্রীয়দের উদ্ধারে এগিয়ে না এসে হানাদাররা টাংগাইলের দিকে 'দে ছুট'। ছত্রীবাহিনীর সামনে পড়ে থাকা হানাদারদের একটা অংশ পাকা সড়ক ছেড়ে পশ্চিমে গ্রামের দিকে পালাতে শুরু করলো। এরপর ছত্রীবাহিনীর সাথে হানাদারদের সারারাত তুমুল যুদ্ধ হয়। পুংলি সেতু ও সড়কের উপর ছত্রীসেনাদের সেই রাতের লড়াই সত্যিই অবিস্মরণীয়। একেবারে শত্রুর মাঝে পড়েও তাঁরা যেভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। ছত্রীবাহিনীর গোলার আঘাতে পুংলি সড়কের উপর তিনশ' সত্তর জন হানাদার নিহত হয় ও শতাধিক আহত হয়। ছত্রীবাহিনীর ছ'জন বীর সৈনিক শহীদ ও পনের জন আহত হয়। পরদিন ১১ই ডিসেম্বর, সকালে ছত্রীসেনাদের হাতে ছ'শ হানাদার খান-সেনা ধরা পড়ে।

পিছনে দ্রুত ছুটে আসা মারমুখী মুক্তিবাহিনী, সামনে ভারতীয় ছত্রীবাহিনী। পালাবার পথ নেই, সব রাস্তা বন্ধ। এমনি অবস্থায় বিচ্ছিন্ন ও প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে হানাদাররা ১১ই ডিসেম্বর সকালে ইছাপুর থেকে মুক্তিবাহিনীর উপর গোলা-গুলি চালাচ্ছিল। তাদের মেশিনগান ও কামানগুলো তখনো গর্জে উঠছে। শোলাকুরা সেতুতে হঠাৎ বাধা পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দুর্বার হয়ে ওঠে। আমাদের হাতে তখন বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ। তার ওপর পালিয়ে যাওয়া বিপর্যস্ত হানাদারদের দেখে আমাদের মনোবল হাজার গুণ বেড়ে গেছে। হানাদাররা যেমন মেশিনগান ও হাল্কা কামান থেকে গোলা ছুঁড়ছিল, তেমনি আমার সহযোদ্ধারাও তিনটি ৩ ইঞ্চি মর্টার, একটি হাল্কা কামান ও ছ'খানা ভারী মেশিনগান থেকে হানাদারদের উপর অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি ঝরাচ্ছিল। আমি শোলাকুরা সেতুর দক্ষিণে দাঁড়িয়ে দলের তিনটি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আর. আর. এর অভাবনীয় গোলা ছোঁড়া দেখছিলাম। সেতুর উপরে দুইদিকে খানিকটা দূরে ২টি করে ভারী মেশিনগান পুরো এলাকাটা কাঁপিয়ে সমান তালে গর্জন করে চলেছে। পাকা সড়কে বাধা পেয়ে এক পাশে ক্যাপ্টেন সবুর, অন্য পাশে মেজর মোস্তফা, পাঁচশ' করে মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে ইছাপুরের দিকে এগিয়ে চললো। ক্যাপ্টেন ফজলুল হক, ক্যাপ্টেন মকবুল হোসেন খোকা ও ক্যাপ্টেন তমসের, প্রত্যেকে পঞ্চাশ জন করে তিনটি দল নিয়ে হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র সহ পাকা-রাস্তার কোল ঘেঁষে ইছাপুরের দিকে এগোতে লাগলো। আমাকে তেমন কিছুই করতে হলোনা। এমনকি কিভাবে সামনের বাধা অতিক্রম করতে হবে, সেই পরামর্শ পর্যন্ত দিতে হলোনা। মুক্তিবাহিনীর চাপে আধঘণ্টার মধ্যে হানাদাররা ইছাপুর থেকে ফুলতলা পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। আমরা ইছাপুর দখল নেয়ার পর ফুলতলায় পিছিয়ে যাওয়া হানাদারদের উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করতে লাগলাম। মোগলপাড়া থেকে প্রায় আট মাইল এসে শোলাকুরায়, পরে ইছাপুরে আটকে গেলাম। ইছাপুর থেকে ফুলতলা, মাঝখানের এক মাইল সম্পূর্ণ খোলা। কোন বাঁক নেই। আড়াল নেবার জায়গা নেই, রাস্তার ডাইনে-বামে বহুদূর পর্যন্ত খোলা প্রান্তর। হানাদারদের অবিরাম গোলা-গুলির বৃষ্টিধারা উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই এগুতে পারছেনা। দুই-তিনবার চেষ্টা করেও যখন খোলা জায়গাটা পার হওয়া গেল না, তখন আবার দুইটি টার্গেট দিয়ে সকাল আটটায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর সাহায্য চাইলাম।

টার্গেট দুটির একটি, টাংগাইল নতুন জেলা কম্পাউণ্ড এবং শহর থেকে ময়মনসিংহের দিকে দুই মাইল পর্যন্ত পাকা সড়কের উপর স্ট্রাপিং। দ্বিতীয়টি, এলেঙ্গা থেকে ফুলতলা পর্যন্ত এই আধমাইল রাস্তা, রাস্তার আশেপাশে স্ট্রাপিং ও রকেট বর্ষণ। অনুরোধ পাঠিয়েই ইছাপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের শোলাকুরা পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে নির্দেশ দিলাম। ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল রেখে ঠিক ন'টায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর চারটি ফাইটার টাংগাইলের আকাশে দেখা দিল। মুহূর্তের মধ্যেই ডাইনে-বামে দুই চক্কর দিয়ে দুইটি বিমান টাংগাইল জেলা সদরের উপর স্ট্রাপিং শুরু করে

দ্বিতীয়বার বিমান সাহায্য

দিল। অন্য দুটি এলেঙ্গা থেকে ফুলতলা, এই আধমাইল রাস্তার উপর নিখুঁতভাবে বার বার স্ট্রাপিং ও রকেট সেল নিক্ষেপ করলো। আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় যুদ্ধ বিমান প্রথম টার্গেট জিলা সদর হানাদার ঘাটির একশ' গজ বাইরে একটি বুলেটও ছোঁড়েনি। এর চাইতেও চমকপ্রদ হলো, এলেঙ্গা থেকে ফুলতলা, মাত্র আধমাইল জায়গার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ নিশানার উপর ভারতীয় ফাইটার দুটি অব্যর্থ নিশানায় স্ট্রাপিং ও রকেট সেল নিক্ষেপ করলো। এলেঙ্গার মাত্র এক মাইল দক্ষিণে পুংলিতে ভারতীয় ছত্রীসেনারা, ফুলতলার এক মাইল উত্তরে মুক্তিবাহিনী। মাঝখানের এই স্বল্প পরিসর জায়গায় শত্রুর অবস্থানের উপর অব্যর্থ লক্ষ্যে অন্য কোন বিমান বাহিনী এমন নিখুঁত ও নিপুণ আঘাত হানতে পেরেছে কিনা, আমাদের জানা নেই। ১১ই ডিসেম্বরের ঐ বিমান আক্রমণে সামান্য ভুল হলেই নিজেদের ছোঁড়া বুলেটে নিজেদের দলের অসংখ্য যোদ্ধা প্রাণ হারাতো।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর উপর্যুপরি হামলায় ডিসেম্বরের ৭ তারিখের মধ্যেই পাক হানাদার বাহিনীর বিমান শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ৭ তারিখের পর ভারতীয় বিমান বাহিনীর পক্ষে দেখে দেখে লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে আর কোন অসুবিধা ছিল না। সেই সময় বঙ্গভবনে (গভর্নর হাউস) ভারতীয় বিমানের নিখুঁত হামলায় তৎকালীন গভর্নর ডাঃ মালেক ভয়ে খাটের নীচে লুকিয়েছিলেন। হানাদার জেনারেল নিয়াজী বোমার ভয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে হাতির পুলের এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই বাড়িতেও ভারতীয় বিমান 'পিন্-পয়েন্ট' রকেট সেল নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়। তারপরই শুরু হয় নিয়াজীর এ-বাড়ি সে-বাড়ি আশ্রয় নেয়া। সে যে বাড়িতেই আশ্রয় নিচ্ছে সেই বাড়িতেই নিখুঁত অব্যর্থ লক্ষ্যে ভারতীয় বিমান রকেট সেল নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে। জনগণের নির্ভুল সংবাদ সরবরাহ, স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

১১ই ডিসেম্বর, ভারতীয় বিমান হামলায় পযুদস্ত হানাদাররা দিশেহারা ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এলেঙ্গা থেকে ফুলতলা, এইটুকুর দূরত্বের মধ্যে তাদের চল্লিশটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। কয়েক শত খানসেনা বিমান থেকে ছোঁড়া মেশিনগানের বুলেটে মারা যায়। বিমান আক্রমণের পর দেরী না করে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এই সময় একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে।

মৃত্যু যখন সুতোর ব্যবধানে

টাংগাইল মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় বীর ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর খান মরতে মরতে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল। ক্যাপ্টেন সবুর মাঠের মাঝ দিয়ে ফুলতলার দিকে এগোবার উদ্দেশে ইছাপুরের মীর আমজাদ হোসেনের পুরানো দালানবাড়ির পাশে, তার দলের যোদ্ধাদের সমবেত করে পরবর্তী আক্রমণের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে দূরবীন নিয়ে শেষবারের মত ফুলতলা ভালোভাবে দেখে নিচ্ছিলো। ভালো করে সামনের দিকটা দেখে ক্যাপ্টেন সবুর একটি পুরানো মসজিদের দেয়াল ঘেঁষে কেবল বসার জন্য সামান্য নীচু হয়েছে, তখনই তার মাথার এক-দেড় ফুট উপরে হানাদারদের কামানের একটি গোলা মসজিদের দেয়ালের অনেকটা ভেঙে বেরিয়ে যায়। গোলার হল্কা লাগার সাথে সাথে সবুর

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চার-পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। না, সবুরের গায়ে কোন আঘাত লাগেনি। তবে সে কিছু বলতে পারছেনা। আকস্মিক ঘটনায় সে বিমূঢ় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভাবলেশহীন চোখে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মুক্তিযোদ্ধারা সবুরকে ভালো করে মাটিতে শুইয়ে কেউ বাতাস করছে, কেউ বা কাপড় ভিজিয়ে তার চোখ-মুখ ও মাথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমি যে সময়ে ক্যাপ্টিন সবুরকে সর্বশেষ নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়ই অঘটনটি ঘটে। সবুর মাটিতে পড়ে যাওয়ার মিনিট খানেক পর সহযোদ্ধাদের কাছে খবর পেয়ে দৌড়ে তার কাছে গেলাম। সবুর তখনও মাটিতে পড়ে আছে। সবুরকে নাড়াচাড়া করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম,

—তোর কোথাও আঘাত লাগেনি তো?

সবুর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললো,

—স্যার, হায়, হায়, শালারা আমারে এহেবারে মাইর‍্যা ফালাইছিল। শালারা আমারে দেখলো কি কইর‍্যা? স্যার, আমার কিছু অয় নাই, কিন্তুক আমার কানের তালা ফাইট্যা গেছে! আমি খালি বোমার আওয়াজ পাইতাছি। ক্যাপ্টিন সবুরকে নিয়ে এই আকস্মিক বিপর্যয় ঘটায় আক্রমণ আধঘণ্টা পিছিয়ে গেল। এই সময় ছত্রীবাহিনীর একশ' জনের দুটি দল্‌কে স্বেচ্ছাসেবকরা ইছাপুর নিয়ে এলো। তারা মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এদের সঙ্গে মূল দলের বেতার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। দল দু'টিতে একজন ক্যাপ্টিন ও তিনজন সুবেদার রয়েছেন। ক্যাপ্টিনকে আমার কাছে আনা হলো। ক্যাপ্টিনের কাছে সব শুনে তাদেরকে ইছাপুরে কিছু সময় অপেক্ষা করে দুপুরের খাবার খেয়ে নিতে অনুরোধ করলাম এবং এও বললাম, 'আমাদের সঙ্গে মূল দলের যোগাযোগ রয়েছে। খাবার শেষে আপনাদের সেখানে পৌঁছে দেয়া হবে। এখান থেকে মূল দলের সাথে বেতারে যোগাযোগের চেষ্টা করুন।'

মুক্তিযোদ্ধারা ফুলতলার দিকে এগুচ্ছে দেখে, ছত্রীসেনারাও যুদ্ধে অংশ নিতে চাইলেন। কিন্তু আমি তাঁদের বার বার অনুরোধ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত করলাম। আমি তাঁদের বুঝালাম, 'সামনে যে শত্রুরা রয়েছে, তারা বলতে গেলে একেবারে পর্যুদস্ত, পরাজিত। আমাদের যে শক্তি আছে তাতে অতিরিক্ত সাহায্য না হলেও চলবে। আপনাদের বরং মূল দলের সাথে একত্রিত হয়ে পরবর্তীতে সম্মিলিত আঘাত হানার জন্য তৈরী হওয়া উচিত।' আমার পরামর্শে ছত্রীসেনারা খুশী হলেন।

ইছাপুর থেকে ফুলতলার দিকে এগুবার সময় হানাদারদের দিক থেকে প্রথম প্রথম বেশ বাধা আসলো। বিমান আক্রমণের পর দুর্বল হয়ে পড়লেও তারা যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, এটা বেশ বোঝা গেল। তবে তাদের মধ্যে কোন শৃংখলা নেই, সমন্বয় নেই। অন্যদিকে ইতিমধ্যে ইছাপুর থেকে ডান ও বাম, দুই পাশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ফুলতলাকে চেপে ধরার মত অবস্থানে পৌঁছে গেছে। এ অবস্থায় রাস্তার কোল ঘেঁষে এগুনো মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গুলি ছুঁড়ে হানাদারদের বিশেষ সুবিধা হবার কথা নয়। পুরো দলের বেশী অংশটাই রাস্তার দুই পাশে

অনেক দূর দিয়ে প্রায় দুই মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ফুলতলার কাছাকাছি পেঁাছে গেছে। ক্যাপ্টেন ফজলু, ক্যাপ্টেন খোকা ও ক্যাপ্টেন তমসেরের দলের তিনশ' মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি ইছাপুর থেকে ফুলতলা দখলে অংশ নিলাম। পাকা রাস্তার দুই কোল ঘেঁষে ত্বরিৎবেগে পুরো দল নিয়ে ফুলতলার উত্তরের সেতু পর্যন্ত নিরাপদে পেঁাছে গেলাম। আমি যখন দল নিয়ে এগুচ্ছিলাম, তখন পিছন থেকে মেজর হাকিম, সামাদ গামা ও তারেক তিনটি ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে অনবরত ফুলতলার উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। আমি ফুলতলা উত্তরের সেতুর উপর উঠে এক টুকরো লাল কাপড় তুলে সংকেত দেয়ার সাথে সাথে পিছন থেকে মর্টার ফায়ার বন্ধ হয়ে গেল। মর্টার ফায়ার বন্ধ হলে আমরা আবার এগোতে শুরু করলাম। হানাদারদের দিক থেকে এই সময় খুব একটা বাধা আসছিলনা। ৩ ইঞ্চি মর্টারের ফায়ার বন্ধ করলেও, তমসের ও আমি ২ ইঞ্চি মর্টার থেকে হানাদারদের উপর অনবরত গোলা ছুঁড়ে চলেছিলাম।

মুক্তিবাহিনীর প্রায় পুরোদলটা নিরাপদে সেতু পার হয়ে গেছে। মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ জনের পার হতে বাকী। তখনও আমাদের দিকে কোন হতাহত হয়নি। হঠাৎ আমার ছোঁড়া একটি ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে না গিয়ে মাত্র পনের-কুড়ি গজ সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে সেতুর উপর পড়লো। এই আকস্মিকতায় আমি প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়লাম। মাত্র ছ'সাত সেকেন্ডের মধ্যে গোলাটি ফাটবে। গোলাটি ফাটলে আমার কোন ক্ষতি হবেনা সত্য কিন্তু পুলের উপর গোলা ফাটলে দশ-পনের জন মুক্তিযোদ্ধা যে হতাহত হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কয়েক হাত পিছনে একটা ২ ইঞ্চি মর্টার সেল পড়তে দেখে জামালপুর-পিয়ারপুরের আবদুস সাত্তার বিদ্যুৎবেগে পিছিয়ে এসে সেলটি খাবলা মেরে ধরে পুলের নিচে ছুঁড়ে মারলো। অন্য মুক্তিযোদ্ধারা হঠাৎ ঘটে যাওয়া আকস্মিক ঘটনা জানার আগেই গোলাটি পুলের নীচে পানিতে পড়ে ফেটে গেল। সাত্তারের উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষীপ্রতা ও অসীম সাহসিকতা দেখে দৌড়ে গিয়ে তাকে জাপটে বুকে তুলে নিলাম। সাত্তার তখনও বুঝতে পারেনি গোলাটি কোন দিক থেকে এসেছিল।

সহযোদ্ধারা সেতু পার হয়ে ফুলতলা গ্রামের কাছে পেঁাছে গেছে। ডান এবং বামে চকের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া দলগুলোও গ্রামটির ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাদের আগে যেতে পারছিনা, পিছনে পড়ে থাকছি। মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে সামনের সহযোদ্ধাদের আস্তে আস্তে ও সতর্কভাবে এগুতে বলছি। মিনিট পনেরর মধ্যে গ্রামটিকে ঘিরে ফেলা হলো। তখন আর গ্রামের ভিতর থেকে তেমন গোলা-গুলি আসছেনা। আমরা যখন ইছাপুর থেকে ফুলতলার দিকে শেষবার খুব দ্রুত এগুচ্ছিলাম, তখন হানাদাররা প্রতিরোধ না করে সব কিছু ফেলে শুধু অস্ত্র ও কিছু গুলি নিয়ে পশ্চিমে গ্রামের দিকে সরে যেতে থাকে। আমরা ফুলতলা দখল নেয়ার পর দেখলাম পঞ্চাশ-ষাট জন হাত-পা কাটা আহত খান-সেনা রাস্তার এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, খান-সেনাদের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি গাড়ি তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। ফুলতলার সর্বত্র হানাদারদের সামরিক ও বেসামরিক গাড়ি এদিক-ওদিক পড়ে আছে।

ফুলতলা আসার কয়েক মিনিটের মধ্যে পুংলিতে অবস্থান নেয়া ছত্রীবাহিনীর সাথে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ হলো।

ব্রিগেডিয়ার ক্লের ১০ই ডিসেম্বর জামালপুর দখল নিয়ে সারাদিনে তার যানবাহন ব্রহ্মপুত্র পার করান। এবং মধুপুরের দিকে এগিয়ে আসার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ১১ই ডিসেম্বর ভোরে তারা মধুপুরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। খুব ধীরগতিতে বিনা বাধায় তারা মধুপুর হয়ে টাংগাইলের রাস্তা ধরেন। বেলা বারোটার দিকে তাঁরা ঘাটাইল থানা অতিক্রম করলেন। এতদূর এগিয়ে আসার পরও তাঁরা বাধা পাচ্ছেননা কেন তা হয়তো প্রথম অবস্থায় ব্রিগেডিয়ার ক্লের বুঝে উঠতে পারেননি। এই সময় আশপাশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁর এগিয়ে যাওয়া উচিত, এটাও হয়তো উত্তেজনার বশে ঠিক বুঝতে পারেননি। রাস্তার দুই পাশে দু'টি মেশিনগান, দু'টি রকেট লাঞ্চার ও একটি ব্লান্ডার সাইট বসিয়ে মেজর হাবিব কালিদাসপাড়ায় ময়মনসিংহ-টাংগাইল পাকা-সড়ক আগলে বসেছিল। মেজর হাবিব দীর্ঘ সারিতে আসা মিলিটারী কনভয় দেখে নির্ঘাত শত্রু ভেবে সহযোদ্ধাদের সতর্ক করে দেয়। হানাদাররা এ পথেই আগের দিন পালিয়েছে। গাড়ির বহর মিত্রবাহিনীর হলে অবশ্যই আগে যোগাযোগ হতো। যোগাযোগ যখন হয়নি, তখন নিশ্চয়ই হানাদাররা। তাই মুক্তিযোদ্ধারা জবরদস্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হলো। সামনের গাড়ি কালিদাসপাড়ার দু'শ গজের মধ্যে এলে রাস্তার দুই পাশ থেকে এম. জি. রকেট লাঞ্চার ও ব্লান্ডার সাইট এক সাথে এক তালে গর্জে উঠলো। ব্লান্ডার সাইটের গোলার আঘাতে কনভয়ের সামনের জীপ উল্টে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে গেল। বাধা পেয়ে মিত্রবাহিনীও এম. জি. থেকে মুষলধারে গুলি চালায়। ব্রিগেডিয়ার ক্লের দশ-বারোটি গাড়ির পিছনে ছিলেন। এতক্ষণ বিনা বাধায় আসার পর আকস্মিক বাধা পেয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছোড়ার ফাঁকে ফাঁকে উচ্চ স্বরে গগনবিদারী 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিচ্ছিল। মুক্তিবাহিনীর গুলির জবাবে মিত্রবাহিনীও মুহূর্তের মধ্যে কয়েক হাজার গুলি ছুঁড়েছিলেন। 'জয় বাংলা' শ্লোগান শুনে বিস্মিত হয়ে আর গুলি না চালিয়ে তাঁরাও সমস্বরে গলা ফাটিয়ে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে থাকেন এবং কনভয়ের উপর সাদা পতাকা উড়িয়ে দেন। এতক্ষণে উভয় দলই বুঝে যায়, তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে গুলি চালিয়েছে। উভয় পক্ষ থেকে গুলি থেমে গেলে, মিত্রবাহিনীর দিক থেকে দু'জন খালি হাতে কালিদাসপাড়ার দিকে এগিয়ে আসেন। মেজর হাবিবও একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সামান্য একটু এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। ভারতীয় সেনা দুইজন মুক্তিযোদ্ধার সামনে এসে বলেন, 'বন্ধুরা, আমরা মিত্রবাহিনী। আমাদের উপর গুলি চালাবেন না।' এ কথা শুনে ভারতীয় বাহিনীর দু'জনকে ওখানেই দাঁড় করিয়ে মুক্তিযোদ্ধাটি দৌড়ে কমান্ডারের কাছে এসে রিপোর্ট করে, সামনে শত্রু নয়, মিত্রবাহিনী।' মেজর হাবিব নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভারতীয় বাহিনীর দিক থেকে আরো কয়েক জনকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করে। ব্যাপারটা বুঝে ব্রিগেডিয়ার ক্লের তুরাতে প্রশিক্ষণ নেয়া গোপালপুর-ঘাটাইল এলাকার চার-পাঁচ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সামনে পাঠিয়ে

ট্রাজিক ঘটনা

দেন। ভারতীয় বাহিনীর কয়েকজন সৈনিকের সাথে তারা এগিয়ে এলে মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চিত হয় যে, 'সত্যিই এরা মিত্রবাহিনী'। বিশেষ করে মেজর হাবিব তুরাতে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত চার-পাঁচ জন এগিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দু'জনকে চিনতে পারে। কারণ সে যখন তুরাতে ছিল, তখন ঐ দু'জন সেখানে প্রশিক্ষন নিচ্ছিল। ভুল বুঝাবুঝি দূর হলে মিত্রবাহিনীকে রাস্তা ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু এর মধ্যে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর গোলা-গুলিতে মিত্র-বাহিনীর সাত জন নিহত ও সতের জন গুরুতর আহত হন। এদিকে মিত্র বাহিনীর গুলিতে মুক্তিবাহিনীর চার জন নিহত, এগারো জন আহত হয়। এই ভুল বুঝাবুঝির পর ঢাকার শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত টাংগাইলে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর মধ্যে আর কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়নি। ব্রিগেডিয়ার ক্লের ঢাকা দখলের যুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তা সত্ত্বেও একথা সত্যি, তিনি যদি সামান্য একটু সতর্ক ও যত্নবান হতেন, তাহলে হয়তো উভয় পক্ষের অমূল্য কয়েকটি প্রাণ বিসর্জন দিতে হতোনা।

মেজর হাবিবের সাথে যোগাযোগ হওয়ার পর মুক্তিবাহিনীই মিত্রবাহিনীকে রাস্তা দেখিয়ে টাংগাইলের দিকে নিয়ে আসতে থাকে। বেলা দেড়টায় তারা বাঘুটিয়া পর্যন্ত এগিয়ে আসেন। বাঘুটিয়াতে তাঁদের আবার মুক্তিবাহিনীর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হলো। তবে সামনে মুক্তিবাহিনী থাকায় গুলিতে চ্যালেঞ্জ নয়, শুধু থামিয়ে দেয়া হলো। বাঘুটিয়ায় একদল মুক্তিযোদ্ধাকে অবস্থানে রেখে মেজর হাবিবের মতই কড়া নির্দেশ দিয়েছিলাম, কোনভাবেই যেন পিছনের দিক থেকে শত্রু বোঝাই কোন গাড়ি এগোতে দেয়া না হয়। এগিয়ে আসা গাড়িতে শত্রু নেই, এটা জানার পরও বাঘুটিয়ার মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে একবার জিজ্ঞাসা না করে রাস্তা ছেড়ে দিতে নারাজ। ব্রিগেডিয়ার ক্লের একটু আগের আকস্মিক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই তিনি পীড়াপীড়ি না করে বাঘুটিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের আমার সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করলেন। ফুলতলায় আমাকে খবর দেওয়া হলো মিত্রবাহিনী বাঘুটিয়া পর্যন্ত এসে গেছেন। খবর পেয়ে বাঘুটিয়ার দিকে এগিয়ে গেলাম। এই সময় ব্রিগেডিয়ার ক্লের ছ-সাত জন সৈন্য নিয়ে পায়ে হেঁটে বাঘুটিয়া থেকে এক মাইল টাংগাইলের দিকে ধুনাইল সেতু পর্যন্ত এসে গিয়েছিলেন। ব্রিগেডিয়ার ক্লের সাথে ধুনাইল সেতুর পাশে আমার দেখা হলো। আমি ব্রিগেডিয়ারকে আগে থেকেই চিনতাম। ভারতে থাকার সময় ব্রিগেডিয়ারের সাথে আমার দুই-তিন বার দেখা হয়েছিল। দেখা মাত্র একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। উষ্ণ আলিঙ্গন শেষে ব্রিগেডিয়ার ক্লেরকে নিয়ে টাংগাইলের দিকে কিছুটা এগিয়ে বাংড়া ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে এসে বসলাম। এই সময় কালিদাসপাড়া থেকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে আসা মুক্তিবাহিনীর কোম্পানী কমাণ্ডার চাঁদ মিয়া কান্না জড়িত কণ্ঠে কালিদাসপাড়ার দুঃখজনক ঘটনা সবিস্তারে বললো। চাঁদ মিয়ার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হলাম। আমার চোখে পানি এসে গেল। শুধু শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নয়, মিত্রবাহিনীর সৈনিকদের জন্যেও। ক্ষুব্ধ হয়ে ব্রিগেডিয়ারকে বললাম, 'এটা কি ধরনের ব্যাপার? আপনার কর্তৃপক্ষ

ছত্রীসেনা নামানো থেকে শুরু করে সব ব্যাপারে আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারলেন, আপনারা একদিন আগেও আমার কাছে সাহায্য চাইতে পারলেন আর এই জায়গাটুকু আসার সময় সামান্য একটু খোঁজখবর রাখতে পারলেননা ?' লজ্জিত ব্রিগেডিয়ার ক্লের কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বলতে না দিয়ে আবার বললাম, 'এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। আমাকে পরিষ্কার জানানো হয়েছিল, আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার উপর দিয়ে কোন দল যাবার সময় তা অবশ্যই আমাদের জানানো হবে।' ব্রিগেডিয়ার ক্লের ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক ভদ্র ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন দক্ষ অফিসার। তিনি কোন ভনিতা না করে নিজের ভুলের কথা সরাসরি স্বীকার করে বললেন, 'দেখুন কাদের ভাই, ভুলটা আমারই হয়েছে। আপনার সাথে যোগাযোগ করে এগুনোর নির্দেশ আমার উপরও রয়েছে। কিন্তু আজ সকাল থেকে হেড-কোয়ার্টারের সাথে আমার বেতার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে আমাদের মধ্যে বেতার যোগাযোগ আবার স্থাপিত হয়েছে। আপনার সাথে আমার সরাসরি বেতার যোগাযোগ নেই। আমি হেড-কোয়ার্টারকেও জানাতে পারছিলাম না, অথচ অপেক্ষা করাও যাচ্ছিলনা।'

—এটা সত্যিই আশ্চর্যের, আমার সাথে আপনার হেড-কোয়ার্টারের যোগাযোগ রইলো, তা এক মুহূর্তের জন্যও ছিন্ন হলোনা, শুধু আপনার ব্রিগেডের সাথেই হেড-কোয়ার্টারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো, এর অর্থ ঠিক বুঝতে পারলামনা। এরপর ব্রিগেডিয়ার ক্লের খুবই আন্তরিকভাবে বললেন,

—দেখুন, যা হবার হয়ে গেছে। এর জন্য মন খারাপ করবেননা। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েও আমাদের এমন ক্ষতি হতে পারতো কিংবা এর চেয়েও আরো বেশী, তা হয়নি। চলুন, আমরা এগিয়ে যাই। এরপর আমার আর বলার কিছু রইলোনা। সত্যিকার অর্থে কালিদাসপাড়ায় ঘটে যাওয়া বিয়োগান্তক দুর্ঘটনা নিতান্তই আকস্মিক। এই ব্যাপারে ব্রিগেডিয়ার ক্লেরকে পুরোপুরি দায়ী করা চলেনা। আমরা এবার যৌথভাবে টাংগাইলের দিকে এগুতে লাগলাম।

আমরা উত্তর দিক থেকে সাড়ে তিনটায় পুংলি সেতুর কাছে ছত্রীসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হলাম। অন্যদিকে টাংগাইল শহরের আশেপাশে

বিপর্যস্ত হানাদার বাহিনী

যুদ্ধ করে চলেছিল, কর্নেল ফজলুর রহমান, মেজর মইনুদ্দিন, ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী, মেজর লোকমান হোসেন, মেজর মোকাদ্দেস আলী ও মেজর মতিয়ার। দক্ষিণে টাংগাইল-ঢাকা রাস্তার উপর একের পর এক অবরোধ সৃষ্টি করে চলেছিল ক্যাপ্টেন বায়েজিদ, ক্যাপ্টেন শামসুল হক, ক্যাপ্টেন সুলেমান, ক্যাপ্টেন গাজী লুৎফর রহমান। ক্যাপ্টেন লায়েক আলম, ক্যাপ্টেন আজাদ কামাল, ক্যাপ্টেন সুলতানের কোম্পানীসহ অন্যান্য কয়েকটি কোম্পানী। ১১ই ডিসেম্বর প্রত্যুষে যেমন কর্নেল ফজলুর রহমান, মেজর মইনুদ্দিন, ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী, ক্যাপ্টেন করিম টাংগাইলের উপর আঘাত হানতে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তেমনি মেজর লোকমান, মেজর মতিয়ার, মেজর মোকাদ্দেস পূর্বদিক থেকে টাংগাইল শহরে আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয়। মেজর লোকমান, তার দলের ৩ ইঞ্চি মর্টার ঘারিন্দার বসিয়ে ভোর পাঁচটা থেকে টাংগাইল

নতুন জেলা সদরের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। মর্টার চালক কায়েম উদ্দিন বিরামহীনভাবে সকাল দশটা পর্যন্ত অব্যর্থ লক্ষে মর্টারের গোলা ফেলেন। কায়েম উদ্দিনের বেশ সুবিধা হচ্ছিল, তার টার্গেটের এলাকা খুবই বিস্তৃত। জেলা সদরের এক বর্গমাইল জুড়ে হানাদাররা ঘাঁটি গেড়েছিল। সেখানে একজন সাধারণ মানুষও বাস করতেন না। তাই কায়েম উদ্দিন মনের আনন্দে পাঁচ ঘণ্টায় চারশ' রাউন্ড গোলা নিক্ষেপ করে। চতুর্দিক থেকে ক্রমশ মুক্তিবাহিনীর চাপ বাড়লে, অবস্থা বেগতিক দেখে হানাদাররা ১০ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই টাংগাইল শহর ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। দুপুরের পর ময়মনসিংহ-জামালপুরের দিকে ব্রিগেডিয়ার কাদের খান ও ব্রিগেডিয়ার আক্তার নেওয়াজের ব্রিগেডের অর্ধেক যখন পিছন থেকে মার ও তাড়া খেতে খেতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে টাংগাইল এসে পেঁছায়, তখন টাংগাইলের ব্রিগেডিয়ারটিও টাংগাইল থাকা আর নিরাপদ ও বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলোনা। তারাও পাততাড়ি গুটাতে শুরু করলো। কিন্তু ততক্ষণে পূব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে মুক্তিবাহিনীতে ছেয়ে গেছে, হানাদারদের টাংগাইল ছেড়ে যাওয়ার প্রায় সমস্ত পথই অবরুদ্ধ। তবু ১১ই ডিসেম্বর সকাল থেকে হানাদারদের টাংগাইল ছাড়ার হিড়িক লেগে গেল। তারা গাড়ীতে বোঝাই হয়ে ঢাকার দিকে পালাতে শুরু করলো। কিন্তু তাদের ঢাকা পর্যন্ত ফিরে যাওয়া হয়ে উঠলোনা। টাংগাইলের দক্ষিণ থেকে মির্জাপুর পর্যন্ত অবস্থান নেয়া মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার দিকে পলায়ন পর হানাদারদের সফলভাবে বাধা দিতে সক্ষম হয়। ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভাতকুরা পুলের বিকল্প রাস্তায় ক্যাপ্টেন বায়েজিদ কোম্পানীর পুঁতে রাখা মাইনের আঘাতে শত্রুদের এগারোটি গাড়ির কয়েকটি ধ্বংস ও বাকীগুলো বিকল হয়ে গেল, যার মধ্যে ব্রিগেডিয়ার কাদের খানের গাড়িও আছে। ব্রিগেডিয়ার কাদের খানকে বহনকারী বিরাট আকারের বুলেট প্রুফ শেভ্রোলেট কারটি মুক্তিবাহিনীর পুঁতে রাখা মাইনসের আঘাতে বিকল্প রাস্তা থেকে প্রায় দশ-বারো ফুট উঁচুতে উড়ে গিয়ে রাস্তার উপর উল্টে পড়ে। ইঞ্জিনটি গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ৫০ গজ দূরে ছিটকে পড়ে। কাদের খান এমনিতেই ধূর্ত, তদুপরি তার ভাগ্যও ভাল। সেতুর নীচে বিকল্প রাস্তা দিয়ে গাড়িগুলো পার হওয়ার আগেই সে কয়েকজনকে নিয়ে পায়ে হেঁটে বিকল্প রাস্তা পার হয়ে গিয়েছিল। তাই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এ যাত্রায় সে বেঁচে গেল। রাস্তা পরিষ্কার করতে হানাদারদের দুই ঘণ্টা লাগে। রাস্তা পরিষ্কারের সাজসরঞ্জাম তাদের সাথেই ছিল। ব্যবস্থাটি খুবই অভিনব। বুলডজার দিয়ে ধাক্কা মেরে, উল্টে-পাল্টে পড়ে থাকা গাড়িগুলো আরও একটু গভীর খাদে ঠেলে কোনরকমে যাওয়ার মত রাস্তা করে তারা রাত বারোটার পর আবার ঢাকার দিকে এগুতে লাগলো। আগেই মূল দলের কয়েকটি গাড়ি করটিয়া পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মটরা সেতুর বিকল্প রাস্তায় শামসু কোম্পানীর পোঁতা মাইনের আঘাতে হানাদারদের আরো তিনটি গাড়ি বিকল হয়ে গেল। এইখানে হানাদার বহনকারী টাংগাইলের ব্যবসায়ী অজিত হোমের বেডফোর্ড গাড়ির ইঞ্জিন মাইনসের আঘাতে গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুলের পাশে একটি বিরাট গাছের উপর গিয়ে আটকে পড়ে। সে এক দেখবার মত দৃশ্য! দেশ স্বাধীন

হবার পরও বেশ কয়েকদিন গাড়ির ইঞ্জিনটি গাছে লট্‌কে ছিল।

দু'টি হানাদার ব্রিগেড রাস্তা পরিষ্কার করে আবার এগোতে থাকে। কিন্তু, সর্বত্র মৃত্যু তাদের জন্য ওৎ পেতে বসে আছে। ২৫শে মার্চের পর কিছুদিন হানাদাররা যেমন স্বাধীনতাকামীদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। আজ মুক্তিবাহিনীও ঠিক তেমনি হানাদারদের তাড়িয়ে চলেছে। পালিয়ে যাওয়া হানাদার গাড়িগুলো জামুর্কী সেতুর বিকল্প রাস্তায় নামার সাথে সাথে পর পর কয়েকটি 'এ্যান্টি ট্যাংক' মাইনের বিস্ফোরণ ঘটলো। এতে এক গাড়ি অপর গাড়ির উপর গিয়ে ছিটকে পড়ে একটা এলোমেলো অবস্থার সৃষ্টি করলো। গাড়ির চালকরা এমনিতেই ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা কাঁচা মাটি দেখলেই ভয়ে আঁতকে উঠে কুঁকড়ে যেত। তিন-চারটি মাইনের বিস্ফোরণে ন'দশটি গাড়ি বিকল হয়ে গেল। তার মধ্যে দুইটি গাড়ি মাইনের প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে দলা পাকিয়ে গেল। তবুও হানাদারদের ঢাকার দিকে যাবার বিরাম নেই। তাদের পন, যে ক'জনই যাওয়া যায়, এমনকি যদি একজনও ঢাকা পৌঁছে, তাও অনেক লাভ। জামুর্কীতে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে সকাল হয়ে গেল। টাংগাইলের ব্রিগেডও যখন পালাতে শুরু করল, তখন সারা রাস্তায় এদিক-ওদিকে দুমড়ানো-মুচড়ানো বিধ্বস্ত গাড়ির বহর ছড়িয়ে পড়ে আছে। তারই ফাঁক দিয়ে হানাদারদের যেতে হচ্ছে। পিছনে এবং আশেপাশে মারমুখী মুক্তিবাহিনী ডাইনে-বামে চতুর্দিকে শুধু মুক্তিবাহিনী, আতংকগ্রস্ত হানাদাররা দিশেহারা। দ্রুত গাড়ি চালাতে গিয়ে পরিত্যক্ত বিকল গাড়িগুলোতে ধাক্কা খেয়ে চলন্ত কয়েকটা গাড়ি উল্টে-পাল্টে রাস্তায় বিরাট জট পাকিয়ে যেতে থাকে। অনেক হানাদার মরিয়া হয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টায় পাকা রাস্তা ছেড়ে ডাইনে-বামে গ্রামের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে ঢাকার দিকে এগুতে লাগলো। হানাদাররা রাস্তা ছেড়ে দেয়ায় মুক্তিবাহিনীর ভীষণ সুবিধা হলো। ঢাকার দিকে এগোনো গাড়িগুলো মির্জাপুর পর্যন্ত গিয়ে আটকে পড়ে। কোনক্রমেই আর সামনে এগোতে পারছেনা। বহরের প্রথম কয়েকটা গাড়ি মির্জাপুরে আটকে যাবার পর প্রায় সব হানাদাররা গাড়ি ছেড়ে হাঁটতে শুরু করলো। এর পরই শুরু হলো হানাদার পাকড়াও অভিযান। হানাদাররা গাড়ি থেকে নেমে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে এগোতে থাকে। তারা বোধহয় কিছু সময়ের জন্য ভুলে যায়, গুলি বোঝাই গাড়িগুলো আর তাদের সাথে নেই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই হানাদারদের সব গুলি ফুরিয়ে আসতে থাকে। উপরন্তু চরম অস্থিরতা নিয়ে প্রতিকুল অবস্থায় তিন-চার মাইল হাঁটার পর তারা একেবারে ভেঙে পড়ে। এই সময় শুরু হয়, তাদেরকে বিল সিঁচে মাছ ধরার মতো পাকড়াও করার মহা উল্লাস পর্ব। আমরা বিশাল বাহিনী নিয়ে ১১ই ডিসেম্বর সারাদিনে চারশ' জন নিয়মিত হানাদার খান-সেনা ধরতে পেরেছিলাম। ছাত্রীবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে ছ'শ জন। অন্যদিকে টাংগাইল-ঢাকা রাস্তা অবরোধ করে থাকা মুক্তিবাহিনীর অতি সাধারণ কোম্পানীগুলোও কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে বেশী শত্রুসেনাকে বন্দী করতে সক্ষম হয়। মির্জাপুরে ক্যাপ্টেন আজাদ কামাল কোম্পানী ১১ই ডিসেম্বর পাচশ'পঞ্চাশ জন হানাদারকে অক্ষত অবস্থায় ধরে ফেলে। কালিয়াকৈরের আশেপাশে মেজর আবদুল হাকিম দু'শ জনকে বন্দী

করে। ক্যাপ্টেন লায়েক আলম, ক্যাপ্টেন গাজী লুৎফর রহমান, ক্যাপ্টেন সুলতান, কমাণ্ডার এন. এ. খান আজাদ ও কুদ্দুর বাদশাহর কোম্পানী সম্মিলিতভাবে প্রায় চৌদ্দশ' হানাদারকে অক্ষত অবস্থায় ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। স্থানীয় জনগণ ও স্বেচ্ছাসেবকরা এই সময় খুব একটা পিছিয়ে থাকেননি। ১১ তারিখ সারাদিনে তারা নিজেরা নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রায় শ'তিনেক হানাদার পাকড়াও করে। হানাদাররা পালিয়ে যাওয়ার সময়, কালিয়াকৈর বলিয়াদী ও মির্জাপুর পাকুটিয়ার কাছে দুইটি বাজারে অসংখ্য লোককে গুলি করে হত্যা করেছিল। তবে এর পর তারা বেশীদূর সরে যেতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণ সম্মিলিতভাবে পিছু ধাওয়া করে সহজেই তাঁদের ধরে ফেলেন। জামুর্কীর কাছে হানাদাররা যখন গাড়ি ত্যাগ করতে থাকে তখন ক্যাপ্টেন গাজী লুৎফর কোম্পানীর যোদ্ধারা হানাদারদের গাড়ি থেকে শত শত গোলা-গুলির বাক্স ও অস্ত্র ত্বরিৎগতিতে নামিয়ে জমা করতে করতে জামুর্কী স্কুলের দুইটি বড় ঘর অস্ত্র ও গোলাবারুদে ভরে ফেলে।

১১ই ডিসেম্বর সকাল এগারোটার দিকে টাংগাইল পুরানো শহরের শেষ হানাদারটিও যখন ঢাকার দিকে পাড়ি দেয় তখন কর্নেল ফজলু, তার বিশাল বাহিনী নিয়ে টাংগাইল শহরের পূব-দক্ষিণ দিক দিয়ে পুরানো শহরে উঠে পড়েন। সকাল সাড়ে এগারোটায় পুরানো শহর মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে যায়। টাংগাইল দখল অভিযানে দান্যার ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী চাচা, ক্যাপ্টেন আবদুল করিম ও মেজর মইনুদ্দীনের কোম্পানীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রশংসনীয় অবদান রাখে। ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী চাচা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর বয়সী হলেও সেইদিন তাঁর গায়ে সিংহের তেজ এসেছিল। নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, টাংগাইল পুরানো শহর দখল অভিযানে কোম্পানী কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী চাচার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। দান্যার কাছে হানাদারদের সাথে সামনাসামনি লড়াইয়ে ক্যাপ্টেন নিয়ত আলীর কোম্পানীর বীর যোদ্ধা আবদুর রশিদ শহীদ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা টাংগাইল পুরানো শহরে উঠে পড়লে, টাংগাইলের নতুন জেলা সদরে প্রায় চার শত হানাদার আটকে পড়ে। টাংগাইলের পুরানো শহর থেকে নতুন জেলা শহরের দূরত্ব প্রায় এক মাইল। নতুন জেলা শহর থেকে পুরানো শহরের পাশ দিয়েই ঢাকা যেতে হয়। এছাড়া ভিন্ন কোন রাস্তা নেই। পুরানো শহর দখল হয়ে গেলে জেলা সদর থেকে বেরোবার কোন রাস্তাই আর হানাদারদের জন্য খোলা রইলোনা। কর্নেল ফজলু, মেজর মইনুদ্দীন, ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী চাচা ও ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহর কোম্পানীর হাতে আড়াইশ' হানাদার ধরা পড়লো।

টাংগাইল এবং টাংগাইলের দক্ষিণে, টাংগাইল-ঢাকা সড়কে যখন এই অবস্থা, তখন ব্রিগেডিয়ার ক্লের ও আমি বিশাল বাহিনী নিয়ে পুংলিতে অবস্থান করছিলাম। ব্রিগেডিয়ার ক্লের ও আমি পুংলি পুলের নীচে বসে পরবর্তী অভিযানের আলাপ-আলোচনা করছি। টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে গেছে, এইরকম একটা উড়ো খবর আসলেও তখনও আমাদের কাছে কোন প্রকৃত খবর পৌঁছায়নি। ব্রিগেডিয়ার ক্লের চাইছিলেন, তখনই টাংগাইল পর্যন্ত এগিয়ে যাবেন। কিন্তু আমি বললাম,

'ভালভাবে খোঁজখবর না নিয়ে সন্ধ্যায় আগে টাংগাইলের দিকে এগুনো বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা।' দুইজনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, শুধু মুক্তিবাহিনী হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রথমে টাংগাইল পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। তারপর তারা সংবাদ পাঠালে মিত্রবাহিনী এগুবেন। ব্রিগেডিয়ার ক্লের যখন শুনলেন, বিস্তীর্ণ এলাকা আমাদের কব্জায়, তখন তিনি খুশী হলেন। তিনি ধরে নিলেন, টাংগাইলের আশেপাশে প্রতিরোধ ভাঙতে তাঁর বাহিনীকে বড় রকমের কোন সংঘর্ষে জড়িত হতে হবেনা। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা ও কর্মক্ষমতা দেখে অভিজ্ঞ সেনানায়ক বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েন। টাংগাইল মুক্তিবাহিনী যে শৃংখল, যুদ্ধ তৎপরতা ও শক্তি সাহসে সুশিক্ষিত নিয়মিত বাহিনীর চাইতে কোন অংশেই কম নয়, তা তিনি বুঝে ফেলেন।

বিকেল চারটায় কয়েকটা খোলা জীপে এম. জি. উঁচিয়ে একশ' জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ক্যাপ্টিন সবুর খুব ধীরে ধীরে টাংগাইলের দিকে এগুলো। সবুর এগিয়ে যাবার মিনিট পাঁচেক পর তিনটি জীপ ও তিনটি লরিতে মেজর মোস্তফা আরো একশ' জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে এম. জি. উঁচিয়ে টাংগাইলের দিকে এগুতে থাকল। এর কয়েক মিনিট পর পাঁচটি জীপ ও লরিতে আশি জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা নিয়ে প্রতি গাড়ীতে একটি করে মেশিনগান বসিয়ে আমি নিজে টাংগাইলের দিকে এগিয়ে চললাম। যাবার সময় মেজর হাকিমকে নির্দেশ দিয়ে গেলাম, 'তোমরা তোমাদের মর্টার ও কামান নিয়ে দশ মিনিট পর টাংগাইলের দিকে এগুবে।' ফুলতলায় বিমান ও মুক্তিবাহিনীর হামলায় ছত্রভঙ্গ খান-সেনারা। সব ভারী অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তিনটি আর. আর., দুটি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও একটি ১২০ এম. এম. ভারী কামান সহ অসংখ্য অস্ত্র, গুলি-গোলা ও অক্ষত বেশ কয়েকটি গাড়ি আমাদেব দখলে এসেছিল।

ক্যাপ্টিন সবুর, মেজর মোস্তফা ও আমি পর পর নতুন জেলা সদরের দিকে এগুচ্ছিলাম। এই সময় টাংগাইলের কয়েকজন অত্যুৎসাহী যুবককে আমরা পেয়ে যাই। টাংগাইলের কয়েকজন যুবক হানাদারদের গুলির মাঝ দিয়েও একটি বাসে পুংলির দিকে এগিয়ে আসছিল। তাদের কাছে নাকি খবর ছিল, মুক্তিবাহিনী ও মিত্র-বাহিনী কালিহাতী পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তাই নিজেরা উদ্যোগী হয়ে টাংগাইলের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানোর জন্য একটি বাসে কালিহাতীর দিকে এগুচ্ছিল। আমরা যখন শিবপুর পুলের কাছাকাছি তখন টাংগাইলের দিক থেকে একটি বাস আসতে দেখে চট্ করে রাস্তার দুই পাশে অবস্থান নিলাম। অন্যদিকে রাস্তার দুই পাশে দুটি জীপ দাঁড় করিয়ে মেশিনগান উঁচিয়ে রাখা হলো। ক্যাপ্টিন সবুর দূরবীন দিয়ে বাসটিকে খুব ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো। তার বার বার মনে হলো, বাসটিতে চালক ছাড়া কোন আরোহী নেই। আমারও তাই মনে হলো। তাই দূরে থাকতো বাসটিকে গুলি করা হলোনা। বাসটি শিবপুর পুলের উপর এলে পুলের মুখে এম. জি. উঁচানো দুটি পাকিস্তানী মিলিটারী জীপ দেখে বাস চালক চমকে উঠে জোরে ব্রেক কষে বাসটি থামিয়ে ফেললো। বাসটি থামতেই পিছনের দিক থেকে ছ-সাত জন মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে এলো। প্রায় একই সময়ে বাসের চালক সহ চার জন

আরোহীও বাস থেকে নেমে পড়ল। তাদের প্রথম ধারণা হয়েছিল, সামনে হানাদার মিলিটারী। তারা হয়তো বলতে যাবে, আমরা আপনাদের গাড়িতে করে এগিয়ে আনতে যাচ্ছিলাম। এ সময় বিভিন্ন রকমের পোষাক পরা সশস্ত্র লোক দেখে তারা হকচকিয়ে যায়। মুহূর্তেই বুঝতে পারে, তারা ভুল শোনেনি। মুক্তিবাহিনী তাদের সামনে, তারা সোল্লাসে একের পর এক টাংগাইলের খবর দিতে থাকে। এদের কাছেই প্রথম জানতে পারলাম, টাংগাইলের পুরানো শহর মুক্ত। তবে জেলা সদরে তখনও হানাদার রয়েছে। এই অত্যুৎসাহী যুবকদের অন্যতম হলো, বল্লার আবদুল আলী সরকার বড় ছেলে আশারফ সরকার (আশু), অন্যজন টাংগাইল থানা এডুকেশন অফিসার জালাল মিঞার বড় ছেলে মন্টু। আমরা প্রথম এদের কথা বিশ্বাস করলামনা। গ্রেফতার করে এদের নিয়ে দেওলা পর্যন্ত এগুলাম। পনের-ষোলটা গাড়ির সারি দেওলা পর্যন্ত এলে জেলা সদরের দিক থেকে আমাদের উপর ব্যাপকভাবে মেশিনগানের গুলি আসতে লাগলো। মুহূর্তে আমাদের চার-পাঁচটি গাড়ি বিকল হয়ে গেল। পাকা রাস্তার উপর যেন অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলো। আমরা ঝড়ের বেগে লাফিয়ে পড়ে রাস্তার পুব পাশে অবস্থান নিলাম। এই সময় গ্রেফতার করা অত্যুৎসাহী যুবকদের 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা, তাদের হয়তো তখন এতদূরে আসার জন্য আপসোসের শেষ রইলোনা। এদের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা দেখে কিছুটা ব্যথিত হলাম। বেচারারা এর আগে এমন গুলির মুখে কখনো পড়েনি। তাই সামনে উঁচু রাস্তার আড়াল থাকলেও নীচে রাস্তার পারে যেভাবে গড়াগড়ি করে হামাগুড়ি দিয়ে বুক, হাঁটু ও হাতের ছাল তুলে ফেলছিল, তা দেখে যে-কেউই ব্যথিত হবেন। হানাদারদের আকস্মিক গুলিতে গাড়ির ক্ষতি হলেও আমাদের কারো কোন ক্ষতি হয়নি। আমরা প্রতি মুহূর্তে এমন একটি আক্রমণের জন্য তৈরী ছিলাম। অবস্থান নিতে তাই কোন বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু অবস্থান নেয়ার পরও হানাদারদের একটি মেশিনগান আমাদের খুব অসুবিধার ফেলে দিল। আট-দশ ফুট উঁচু রাস্তার আড়াল নিয়ে, রাস্তার কোল ঘেঁষে অবস্থান নেয়ার পরও হানাদারদের একটি মেশিনগানের দৃষ্টি এড়াতে পারলামনা। মেশিনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আমাদের আশপাশে এসে পড়ছিল। মেশিনগানের দৃষ্টি থেকে সরে যাবার জন্য ডানে-বামে গড়াগড়ি করতে করতে আমাদেরও ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। ক্যাপ্টেন সবুর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে কোন রকমে মাদার ডায়েরীর দেয়ালের আড়ালে গিয়ে কোথা থেকে গুলি আসছে, তা লক্ষ্য করছিল। আমিও সরে গিয়ে রাস্তার পাশে দশ-পনের হাত মোটা প্রকান্ড একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একই ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম। কোথা থেকে এমন দারুন নিশানায় গুলি আসছে, তা চিহ্নিত করতে আমাদের দশ মিনিট লেগে গেল। দশ মিনিট তীক্ষ্ন ভাবে নজর বুলিয়ে দেখতে পেলাম, জেলা সদরের পানির ট্যাংকের উপরে বালির বস্তা দিয়ে চতুর্দিকে ভাল আড়াল বানিয়ে তার মাঝখান থেকে একটি নয়, দুটি মেশিনগান অনবরত গুলি ছুঁড়ছে। হানদারদের অবস্থান আমাদের থেকে পঞ্চাশ-ষাট ফুট উপরে। তাই তারা আমাদের উপর গুলি ছুঁড়তে খুবই সুবিধা পাচ্ছিল। কোথা থেকে শত্রুর গুলি আসছে তা নির্দিষ্ট করা গেল, কিন্তু এর প্রতিকার

করা হবে কি করে ? আমাদের কাছে অস্ত্রের মধ্যে কেবল মেশিনগান। মেশিনগান দিয়ে নীচ থেকে গুলি ছুঁড়ে কোন কাজ হবেনা। কাজেই মেজর হাকিমের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় রইলোনা।

আমাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলোনা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেজর হাকিম তিনটি আর. আর., তিনটি তিন ইঞ্চি মর্টার, ছয়-সাতটি ব্লান্ডার সাইট ও রকেট লাঞ্চার সহ তার গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হলো। শত্রুর গুলি ছোঁড়া তখনও অব্যাহত রয়েছে। হাকিম এসে নিজেও একটু বিস্মিত হলো। কারণ সে যেদিকে যাচ্ছে মেশিনগানের গুলিও তাকে অনুসরন করছে। একি ব্যাপার ! রাস্তার আড়ালে এত নীচ দিয়ে চলার পরও শত্রুরা তাকে দেখছে কি করে ? আমি রহস্যটা ভেঙে দিলাম। মেজর হাকিমকে গাছের আড়ালে ডেকে আঙ্গুল উঁচিয়ে পানির ট্যাংক দেখিয়ে বললাম, 'ঐ যে, ওখান থেকে আসছে।' মেজর হাকিমকে নির্দেশ দেয়া হলো, দেওলা গ্রামের পূবদিক দিয়ে ঘুরে দক্ষিণে দেওলা ও কোদালিয়ার মাঝ থেকে হানাদারদের ঘাটির উপর গোলা ছুঁড়তে। এক রাতের প্রশিক্ষণ নেয়া আর. আর. চালকদের পানি ট্যাংকের উপর হানাদারদের দেখিয়ে নির্দেশ দিলাম, 'ঐ দুটি মেশিনগান সহ চালকদের কাগজের টুকরোর মত ওখান থেকে উড়িয়ে দিতে হবে।' আর. আর. চালকরা ভীষণ কষ্ট করে দেওলা গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রায় দুই মাইল ঘুরে দেওলা-কোদালিয়ার মাঝামাঝি এসে নিরাপদ অবস্থানে তাদের হাল্কা কামানগুলো বসালো। কামান বসানোর পর তারা দুই মিনিটও দেরী করলোনা। একজন গোলা ভরে দিচ্ছে, অন্যজন ফায়ার করছে। দু'তিন মিনিটের মধ্যে তারা দশ-বারোটি গোলা ছুঁড়লো। প্রথম দুটি গোলাতেই সিদ্ধিলাভ। কামানের গোলার আঘাতে পানি-ট্যাংকের উপরের বালির বস্তাগুলো হাল্কা শোলার মত উড়ে উড়ে ছিটকে পড়তে থাকে। গোলার আঘাতে হানাদাররা দলা পাকিয়ে নীচে পড়ে গেল। এর পর জেলা সদরের নানা জায়গায় —তিনটি আর. আর., তিনটি তিন ইঞ্চি মর্টার, সাত-আটটি মেশিনগান ও শ' দুই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এক সাথে গোলাগুলির বৃষ্টি করতে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে এলে ঘারিন্দার দিক থেকে মেজর লোকমান হোসেনের মর্টার প্লাটুনও কোদালিয়ায় আমাদের সাথে যোগ দেয়।

ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়া অন্ধকারে আমরা জেলা সদরের শামসুল হক গেটের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জনকে মুক্তিযোদ্ধারা বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এদের সারিতেই পুংলির দিকে যাওয়া অতি উৎসাহী যুবকদের মিলিয়ে দিয়ে সকলকে তখনই টাংগাইল জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। টাংগাইল জেলা সদরে তখনও তিন'শ হানাদার আত্মসমর্পণ করেনি। মুক্তিবাহিনী প্রস্তাব পাঠালে তারা আত্মসমর্পণে সম্মত হলো। তবে তাদের এক শর্ত, তারা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। নেহায়েত তা সম্ভব না হলে একমাত্র কাদের সিদ্দিকী নিজে এলে তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী। তাদেরকে বলা হলো, 'কাদের সিদ্দিকী নিজেই আসছেন। তারা যেন তাই বুদ্ধিমানের মত আত্মসমর্পণ করে।' দ্বিতীয়বার, কাদের সিদ্দিকী এসেছেন, এই খবর পাঠানো হলে ক্যাপ্টেন

মনোয়ার নামে একজন হানাদার এসে আমাকে দেখে এবং কথাবার্তা বলে নিঃসন্দেহ হয়ে তার মেজরের কাছে রিপোর্ট করলে হানাদাররা আর কোন গোলমাল না করে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আত্মসমর্পণ করলো। হানাদারদের নিরস্ত্র করে রাতের মত টাংগাইল কোর্টের পনের-কুড়িটি ঘরে সতর্ক পাহারায় আটকে রাখা হলো।

সন্ধ্যার পর নতুন জেলা সদর থেকে টাংগাইল-ময়মনসিংহ পাকা সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে পুরানো শহরের দিকে এগুতে লাগলাম। এই রাস্তার পাশেই আমাদের বহু দিনের বসত বাড়ি। কুমুদিনী কলেজের সামনে পাকা রাস্তা থেকে পঞ্চাশ গজ পশ্চিমে বহু পুরানো পোড়া বসত বাড়িটি এক নজর দেখে আবার শহরের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে তখন দু'শ মুক্তিযোদ্ধা নিচ্ছিদ্র পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন তখন তাদের হাতে বহু আদ্রিত বন্দী। সন্ধ্যা সাতটায় টাংগাইল জেলা আওয়ামী লীগ অফিসের বারান্দায় এসে উঠলাম। আমি ২৬শে মার্চ কারো অনুমতি না নিয়ে এখান থেকেই এক বক্তৃতা করেছিলাম। তারপর এই প্রথম এলাম। প্রায় পনের দিন পর কর্নেল ফজলুর সাথে দেখা হলো। কর্নেল ফজলু আমাকে দেখে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরলেন। কর্নেল ফজলু বজলুর রহমান কুতুব সহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের একে একে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দিত করলাম। অফিসের সামনের রাস্তা তখন লোকে লোকারণ্য। কাদের সিদ্দিকী এসেছে, এটা শোনামাত্র যেমন নিকটবর্তী লোকজন অফিসঘরের সামনে এসে ভেঙে পড়েন, তেমনি খবরটা সামান্য ছড়িয়ে পড়ার পর শহরের নানা দিক থেকে আওয়ামী লীগ অফিসের দিকে জনতার স্রোত বইতে থাকে। কর্নেল ফজলুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বেশীরভাগ মুক্তিযোদ্ধারাই তখন বিশেষ বিশেষ দালালদের ধরার কাজে ব্যস্ত ছিল। ইতিমধ্যে তারা বেশ কয়েকজন দালালকে ধরে এনে হাত-পা বেঁধে আওয়ামী লীগ অফিসের পিছনে বসিয়ে রেখেছে। আমি বেশী সময় দেরী করতে চাইলামনা। কর্নেলকে আদেশ দিলাম, 'সারা শহরে রাত আট-টা থেকে ভোর পাঁচ-টা পর্যন্ত কারফিউ জারী করে দিন। কাউকে যেন বাড়ির বাইরে দেখা না যায়।' আদেশ পালনে কর্নেল ফজলুর বেশী সময় লাগলোনা। দুইটি জীপে মাইক লাগিয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে কাজে নামিয়ে দিলেন। তারা আধঘণ্টার মধ্যে সারা শহর একবার চক্কর মেরে ঘোষণা করলো, 'মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে সারা শহরে আজ রাত আটটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ জারী করা হয়েছে। এই সময় কেউ বাড়িঘরের বাইরে বের হবেননা। কেউ রাস্তায় বেরোলে এবং তার গায়ে গুলি লাগলে মুক্তিবাহিনীকে দায়ী করা চলবেনা।' স্বাধীনতা পাবার অপার আগ্রহে তখন প্রতিটি বাঙালী আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। একবারের ঘোষণাতেই তাই কাজ হয়ে গেল। রাতে কেউ আর ঘর থেকে বেরোননি।

ভরা সাঝের অন্ধকার নামার পর পরই ভারতীয় বাহিনী টাংগাইলের পুরানো শহরের পাশ দিয়ে ঢাকার রাস্তা ধরলো। তাদের অনুরোধ করলাম, 'কোনক্রমেই রাতে ভাতকুরা সেতু পেরিয়ে যাবেননা।' মিত্র বাহিনী আমার অনুরোধ রক্ষ করলো।

নির্বাচনের পর নানা টালবাহানা দেখে দেশ-বিদেশের বহু মানুষ সামরিক

জন্টার বদ মতলব আঁচ করতে পেরেছিলেন। সারা দুনিয়া রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়েছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জির দিকে। বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের দৃষ্টি গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়েছিল বাংলাদেশের উপর।

মার্চের শুরুতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তেজনায় শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা ভাল করেই জানতেন কোন প্রতিবেশী দেশের উত্তেজক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁদেরও কিছু না কিছু স্পর্শ করবে, বিশেষ করে বাংলাদেশে ভয়াবহ কিছু ঘটলে ভারতে তার অশুভ প্রভাব পড়তে বাধ্য। সারাদেশে যখন বিস্ময়কর অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, তখন ভারতের বহু গান্ধীবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আহূত অসহযোগ আন্দোলনকে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করছিলেন। গান্ধীবাদী সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গান্ধীবাদী।

বাঙালীরা আন্দোলন অহিংস, শান্তিপূর্ণ রাখতে চাইলে কি হবে, পাকিস্তানী খানেরা পরিকল্পনা করে রেখে ছিল বাঙালীর রক্তে তারা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, শীতলক্ষ্যা, বুড়ি গঙ্গার জল রক্তাক্ত করে তুলবে। বাঙালীর জাতীয় সত্তা চিরতরে বিশ্বের মানসপট থেকে মুছে ফেলবে। সে উদ্দেশ্যেই পশ্চিমা হানাদাররা আদিম হিংস্র বর্বরতায় অতর্কিতে বাঙালী জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যদিও তাদের আশা পূর্ণ হয়নি।

হানাদারদের বর্বরতার হাত থেকে বাঁচার আশায় নিরাপত্তার খোঁজে ৯০ লক্ষ মানুষ ভারতে পাড়ি জমালেন। প্রায় দুই কোটি মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এ গ্রাম সে গ্রাম করে কাটাতে লাগলেন। সর্বস্বান্ত যে ৯০ লক্ষ মানুষ ভারতে আশ্রয় নিলেন তাদের অনেকে ছিলেন আহত, আবার কেউ কেউ মানসিক দিক থেকে ভারসাম্যহীন। কারণ, তাঁরা চোখের সামনে বাড়িঘর জ্বলতে এবং ভাইবোন, বাবা-মাকে প্রাণ হারাতে দেখে এসেছেন। স্বামীর সামনে স্ত্রী, মায়ের সামনে মেয়ে, ভাই-এর সামনে বোন ধর্ষিতা হয়েছে। সোনার বাংলায় দানবীয় পশুশক্তি পৃথিবীর সর্বকালের বর্বরতাকে হার মানিয়েছে।

ভারতে শরণার্থীর যে ঢল নামে, সে ঢল সামাল দিতে ভারতীয় জনসাধারণ হিমসিম খাচ্ছিলেন। প্রায় এক কোটি মানুষকে অন্নবস্ত্র দিয়ে বাঁচানো যে-সে কথা নয়। তাঁদের শুধু খেতে দিলেই চলবে না, সান্ত্বনা ও ভালবাসাও চাই। ভারতবাসীরা সেই ভালবাসাই উজাড় করে দিলেন।

ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসামে, প্রায় ৪০-৫০ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় নিলেন। এই তিনটি রাজ্যের দুর্গমতম এলাকায় শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে ভারতের মত বিশাল দেশের সরকারও হিমসিম খাচ্ছিলেন। বিশেষ করে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে না এলে হয়তো ভারত সরকারের পক্ষেও বিশেষ কিছু করা সম্ভব হতো না। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৪০-৫০ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় নিলেন, যার অর্ধেক কলকাতায়।

মহানগরী কলকাতা সম্পর্কে যাঁদেরই সামান্য ধারণা আছে, তাঁরা ভাল করেই

জানেন—কলকাতায় দু-বেলা দু-মুঠো আহার জুটলেও মাথা গোঁজার একচিলতে জায়গা পাওয়া কত দুরূহ। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধে সেই দুরূহ কাজই সম্ভব করলেন কলকাতাবাসীরা। লক্ষ লক্ষ গৃহহারা মানুষকে কলকাতাবাসী আপন করে নিলেন, আশ্রয় দিলেন নিজেদের ঘরে। এমনও দেখা গেল, কলকাতা শহরে যাঁর নিজেরই হয়তো স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে মাথা গোঁজবার তেমন ঠাঁই নেই, নিজেরাই কোন রকমে ছোট একটি ঘরে থাকেন, এঁদেরও কেউ কেউ হাজার অসুবিধার মধ্যেও বাংলাদেশ থেকে আসা ছিন্নমূলদের দু-একজনকে জায়গা দিয়ে, খেতে দিয়ে, নিজেদের পরিবারে শরিক করে নিলেন। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের সর্বত্র একই দৃশ্য, একই মানসিকতা। সমস্ত ভারতবাসী তাঁদের মনপ্রাণ ঢেলে শরণার্থীদের যে-যা পারলেন সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

এ সময় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা গেল ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ পথের বাঁকে, বাঁকে সময় সময় দেখা গেছে, নেতাদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রশ্নেও কিছু কিছু মতবিরোধ ঘটেছে। ২৫ বৎসর পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই প্রথম ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল এক সারিতে মিলিত হয়েছে।

জনসংঘের মত দলও বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বপক্ষে কাজ করেছে। দিল্লীতে তাঁরা তাঁদের সর্বকালের বৃহত্তম মিছিল ও সমাবেশ করেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশের প্রশ্নে নিঃশর্ত সমর্থন জানায়। অন্যদিকে সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসাবে ইউরোপ সহ দুনিয়ার প্রায় সব কটি দেশ সফর করে বাস্তব অবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে বাংলাদেশের স্বপক্ষে সমর্থন আদায় করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়প্রকাশ নারায়ণের ভূমিকা অতুলনীয় অন্য নেতারাও সরকারি অথবা, ব্যক্তিগত উদ্যোগে সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করেন।

আগস্টের পর শরণার্থীদের চাপ ভারতের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠে। তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। শুধু শরণার্থীদের জন্যই প্রতিদিন ভারতকে চার-সাড়ে চার কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছিল। এ ধরনের শরণার্থীর চাপ পৃথিবীর অনেক দেশের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়। শুধু টাকা খরচ করেই ভারতের নিস্তার ছিল না, শত চেষ্টার পরও আশ্রয় শিবিরে বহু শরণার্থী মহামারীতে প্রাণ হারাতে থাকেন। অন্যদিকে শরণার্থী সমস্যা ভারতের আইন শৃঙ্খলার উপর একটা হুমকি হিসাবে দেখা দেবার উপক্রম হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ভারতের অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু সহানুভূতি অর্জনে বিফল হন। সমস্ত ইউরোপে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে বহু দেশের জনসাধারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতার হাত বাড়ালেও সেই সব দেশের সরকার বিরোধিতা করতে থাকে।

এই সময়ের এক যুগান্তকারী ঘটনা "রুশ-ভারত শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি"। এতে ভারত নিজেকে অনেকটা শক্তিশালী অনুভব করে। ভারত বুঝে নিয়েছিল বাংলাদেশে যে হত্যাযজ্ঞ ও রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাচ্ছে তা, কিছুতেই

আলোচনায় বা আপসে সমাধান করা যাবে না। বাংলার দুর্জয় জনতা তা মেনে নেবে না। অন্যদিকে ভারতের ৬৫ কোটি মানুষও ততদিনে বাংলার নির্যাতিত বীর জনতার সংগে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন এবং সহযোগিতা না করা তখন ভারত সরকারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বাংলাদেশের মানুষের মত ভারতের কোটি কোটি মানুষও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, কখন বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে, স্বাধীন হবে। আর সেই সংগ্রামে ভারত কতটা আন্তরিকতা নিয়ে কতটুকু সাহায্য করছে তা দেখতে প্রতিটি বঙ্গ সন্তানের মত ভারতবাসীরাও অধীর অপেক্ষায় ছিলেন।

নানা দেশে ঘুরে ঘুরে সেই সমস্ত নেতাদের উদাসীন আচরণে ভারতের বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। রুশ-ভারত চুক্তি সম্পাদনের পর তিনিও প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তিনি বুঝে নিয়েছিলেন নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হবে। এ জন্য বাইরের তেমন সহানুভূতি পাওয়া যাবে না। সশস্ত্র সমাধানে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর উপর নির্ভর করতে হবে। সেই মতই প্রস্তুতি চললো। সারা দেশ তখন একটা ইস্যুর উপর এক আত্মা, এক প্রাণ। কোথাও কোন দলাদলি নেই, নেই কোন হানাহানি। বড় বিপদের মুখে কোন জাতি যখন এমন ঐক্যবদ্ধ হয় তখন কেউ তাকে পরাজিত করতে পারে না। মহান ভারতকেও পারেনি।

৩ ডিসেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংক্ষিপ্ত সফরে কলকাতা এলেন, ময়দানে একটি জনসভাও করলেন। '৭১-এর ৩ ডিসেম্বর কলকাতা ময়দানের জনসভাই সম্ভবতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জীবনে সব চাইতে বড় জনসভা। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এক সময় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়ালে জনতা স্লোগানে ফেটে পড়লেন। তাঁরা গভীর আকুলতা নিয়ে যে কথাটি শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন, এই বুঝি প্রধানমন্ত্রী জনতার মনের কথা প্রাণের দাবী "বাংলাদেশের স্বীকৃতি" ঘোষণা করেন। জনতা অধীর অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানালেন, দেশের চলমান নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ যে কথাটি শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বুক বেঁধে আছেন, সে কথাটি উচ্চারণ বা ঘোষণা করছেন না দেখে জনতা কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে দেখা গেল দায়িত্বশীল এক সরকারি কর্মচারী প্রধানমন্ত্রীর হাতে এক টুকরো কাগজ তুলে দিলেন। কাগজে এক পলক চোখ বুলিয়েই সুদর্শনা প্রধানমন্ত্রী যেন কেমন একটু বিবর্ণ হয়ে গেলেন। সেও মাত্র মুহূর্তের জন্য, তারপর আবার মাইক্রোফোনে দু-চার কথা বলে অকস্মাৎ সভা শেষ করে কলকাতা রাজভবনে চলে গেলেন। রাজভবনেই সাংবাদিকরা তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন। কি হয়েছে? কেন ওভাবে সভা ছেড়ে চলে এলেন?

সাংবাদিকদের চাপাচাপিতে আষাঢ়ের মেঘে ভরা আকাশের মত মুখে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'পাকিস্তান আমাদের বিমান ঘাঁটিগুলির উপর আঘাত হেনেছে।' শত পীড়াপীড়িতেও আর একটি কথাও বললেন না। ছয়টি যুদ্ধ বিমান পাহারা দিয়ে

তাঁকে দিল্লি নিয়ে গেল। রাজধানীতে পেঁছেই সব কিছুর খোঁজখবর নিলেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ঐ রাতে বিদেশ সফরে যাবার কথা ছিল। তিনি তার নির্ধারিত সফর বাতিল করলেন না। রাত বারটায় জাতির উদ্দেশে অনির্ধারিত বেতার ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, এই দুঃসময়ে তাকে বিদেশ যেতে হচ্ছে বলে খুব বেদনা অনুভব করছেন। কিন্তু তাঁর না গিয়েও উপায় নেই।

ভারতীয় বাহিনীকে পূর্ব-পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো। কোনক্রমেই নিজের ভূখণ্ডে লড়াই নয়, লড়াই যদি করতেই হয় তা পাকিস্তানের ভূখণ্ডে করতে হবে। পূর্ব রণাঙ্গনে আগেই যৌথকমাণ্ড গঠিত হয়েছিল, তাই মুক্তি ও মিত্রবাহিনী জোরকদমে এগিয়ে চললো। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনী তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখলো।

পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতীয় পদাতিক, বিমান, নৌবাহিনী এবং পূর্ব রণাঙ্গনে যৌথ বাহিনী যার যার এলাকায় দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করে চললো।

প্রধানমন্ত্রী দ্রুত বিদেশ সফর শেষ করে দেশে ফিরে ৬ ডিসেম্বর মধ্যরাতে পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিবেশন ডেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন। তার ঘোষণায় হাউসে আনন্দের ঢল নামলো। সেই ঢল পরদিন সারা ভারতকে ভাসিয়ে নেবার উপক্রম করলো। লক্ষ কোটি কণ্ঠে সবাই প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দিত করলেন। মহান ভারতের প্রধানমন্ত্রী এতদিনে তাঁদের মনের কথা, প্রাণের দাবীই নিজের কণ্ঠে উচ্চারিত করে দেশবাসীকে সম্মানিত করেছেন।

ঢাকা চলো

১২ই ডিসেম্বর সকালে আবার যৌথবাহিনী ঢাকার দিকে এগুতে লাগলো। ১১ই ডিসেম্বর রাত দশটায় শুরু করে ক্যাপ্টেন বায়েজিদ, ক্যাপ্টেন সোলেমান, ক্যাপ্টেন শামসুল হক, ক্যাপ্টেন গাজী লুৎফর রহমান ও ক্যাপ্টেন লায়েক আলমের কোম্পানীর যোদ্ধারা ভাতকুরা, করটিয়া, মটরা, জামুর্কী, শুভল্লা ও মির্জাপুরের বিকল্প রাস্তায় নিজেদের পোঁতা এ্যান্টি ট্যাংক মাইনস প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে ভোরের আগেই অপসারণ করতে সক্ষম হলো। মাইনস অপসারণ করতে আমাদের দুইজন আহত হলো। যৌথবাহিনী বিনা বাধায় সকাল আটটায় মির্জাপুর ও বেলা বারোটায় কালিয়াকৈর পৌঁছে গেল। ১২ই ডিসেম্বর সারাদিন যৌথবাহিনী কালিয়াকৈরে ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান করলো। ১৩ই ডিসেম্বর সকাল দশটায় ব্রিগেডিয়ার ক্লেরর নেতৃত্বে যৌথবাহিনীর পাঁচ হাজার সদস্য কড্ডা-মৌচাক পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সক্ষম হলো।

অন্যদিকে সান সিংয়ের ব্রিগেডটি ১১ই ডিসেম্বর হালুয়াঘাট হয়ে ১১ই ডিসেম্বর সকালে শম্ভুগঞ্জ খেয়াঘাট পার হয়ে ময়মনসিংহ পৌঁছে যায়। শুধু হালুয়াঘাট ছাড়া আর কোথাও তাদের পাক-হানাদারদের সাথে মোকাবেলা করতে হয়নি। ব্রিগেডিয়ার সান সিং বাবাজীর ব্রিগেড ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় টাংগাইল এসে পৌঁছে। টাংগাইলে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে রাত দশটার মধ্যে তারা কালিয়াকৈর পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

১৩ই ডিসেম্বর রাত নটায় মেজর জেনারেল নাগরা টাংগাইল এলেন। ব্রিগেডিয়ার ক্লের ও ব্রিগেডিয়ার সান সিং সন্ধ্যা থেকে টাংগাইলে অবস্থান করছিলেন। রাত সাড়ে নটায় টাংগাইল ওয়াপদা রেস্ট হাউসে মেজর জেনারেল নাগরা ব্রিগেডিয়ার ক্লের, ব্রিগেডিয়ার সান সিং ও আমাকে নিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা আলোচনায় বসলেন। আলোচনার শুরুতে মেজর জেনারেল নাগরা মুক্তিবাহিনী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বার বার ধন্যবাদ দিলেন। তিনি আন্তরিকভাবে বললেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা যদি আমাদের বিনা বাধায় এতটা পথ পাড়ি দিতে সাহায্য না করতেন, তাহলে আমাদের বাহিনী দীর্ঘ রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো। রাস্তাতেই আমাদের অনেক শক্তি ক্ষয় হয়ে যেতো।'

১৪ই ডিসেম্বর সকালে মৌচাকের ঠেঙ্গারবান্দের কাছে একত্রিশ জন খান-সেনাসহ হানাদার ব্রিগেডিয়ার কাদের খান যৌথবাহিনীর হাতে বন্দী হলো। ব্রিগেডিয়ার কাদের খান সহ বন্দী পাক-হানাদারদের কয়েকদিন মুক্তিবাহিনীর হেফাজতে রাখা হলো। ব্রিগেডিয়ার ক্লের নেতৃত্বে যৌথবাহিনীকে কড্ডায় হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হতে হলো। কড্ডা সেতুর দক্ষিণ পারে বংশাই নদীর পার ঘেঁষে হানাদাররা সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ঢাকার দিক থেকে এক ব্যাটেলিয়ন পাক-সেনা পূর্বেই কড্ডায় অবস্থানে ছিল। উপরন্তু ময়মনসিংহ,

জামালপুর ও টাংগাইল থেকে পলায়নপর হাজার দুই সৈন্য কড্ডা পর্যন্ত গিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে। ১৪ই ডিসেম্বর, কড্ডায় যৌথ-বাহিনীর সাথে পাক-হানাদারদের এক মরনপণ যুদ্ধ হলো। ব্রিগেডিয়ার ক্লেরের সাথে হানাদারদের মত ভারী অস্ত্র না থাকায় প্রথম অবস্থায় যৌথবাহিনী তেমন সুবিধা করতে পারছিলোনা। ব্রিগেডিয়ার ক্লেরও বেশী ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে চাইছিলেননা। তিনি সম্মুখ সমরে বেশী জোর না দিয়ে ডাইনে-বামে তার বাহিনীকে ভাগ করে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ছোট ছোট নৌকায় প্রায় অর্ধেক সৈন্যকে নদী পার করে দিতে সক্ষম হন। নৌকা সংগ্রহ এবং নদী পার করা, এই দুই ক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এই যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর মধ্যে একটা আবেগপ্রবণ ভাব লক্ষ্য করা যায়। তুমুল লড়াইয়ের আশংকায় সম্মুখ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কিছুতেই যেতে দিতে চাইছিলেননা। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মিত্রবাহিনীর অনুরোধ, 'আপনারা এখন পিছনে থাকুন। পিছন থেকে সাহায্য করুন। আমরা ওদের সাথে আগে সামনাসামনি লড়ে দেখি, কত শক্তি রাখে।' যদিও মুক্তিযোদ্ধারা সব সময় মিত্রবাহিনীর অনুরোধ রক্ষা করেননি। তারা প্রায় সর্বদা মিত্রবাহিনীর সাথে সাথেই থেকেছে। এমনকি কোন কোন জায়গায় মিত্রবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে ডাইনে-বামে ঘুরে আগে চলে গেছে। তাঁদের এটা করার সুযোগও ছিল। কারণ, সমস্ত রাস্তাঘাট, গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিত ছিল। ব্রিগেডিয়ার ক্লের অর্ধেক সৈন্য নদী পার করে দিয়ে দুই পাশ থেকে হানাদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। হানাদাররা দুই পাশ থেকে আক্রান্ত হয়ে কড্ডায় বেশী সময় অবস্থান না করে কড্ডা পুলের অর্ধেকাংশ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে জয়দেবপুর বোর্ড বাজার পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। যৌথবাহিনী কড্ডার দক্ষিণে আর অগ্রসর না হয়ে রাতের মত সেখানেই ঘাঁটি গাড়ে।

১৪ই ডিসেম্বর বিকাল চারটায় টাংগাইল বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে মুক্তিবাহিনী এক জনসভা আহবান করলো। সভার কাজ দুই ভাগে ভাগ করা হলো। প্রথমার্ধে যৌথবাহিনীর মেজর জেনারেল নাগরাকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো, দ্বিতীয়ার্ধে আনুষ্ঠানিক জনসভা। মুক্তিবাহিনীর সম্বর্ধনার জবাবে মেজর জেনারেল নাগরা বললেন, 'এখানকার মুক্তিবাহিনী যে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে, তার তুলনা হয়না। আমরা শুধু মুক্তিবাহিনীর জন্যই এত সহজে ঢাকার প্রান্ত সীমায় পেঁছে যেতে পেরেছি। আমি মুক্তিবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মুক্তিবাহিনীর নেতা কাদের সিদ্দিকীকে ছালাম ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মুক্তিবাহিনীর এই বীরত্বের ইতিহাস আগামী দিনের মানুষেরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।' এরপর তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ভারত সরকার, ভারতীয় সেনাবাহিনী আপনাদের বন্ধু। আপনারা এতদিন যে কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেছেন, আমাদের বিশ্বাস, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আপনাদের সেই কষ্ট দূর হয়ে যাবে। পাকিস্তানীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, বাংলাদেশের আশি ভাগ এখন যৌথবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ঢাকার উপর আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মরণাঘাত হানবো। আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আর বেশী

বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে জনসভা

দূরে নয়। আপনারা ধৈর্য ধরে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখুন। যৌথবাহিনীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করুন।

জয় বাংলা, জয় হিন্দ, জয় যৌথবাহিনী, ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ।'

তিনি খুব ধীরে ধীরে হিন্দিতে বক্তৃতা করলেন। মাঠের আশপাশের দালান কোঠা, গাছপালা মানুষে ঠাসা। সমবেত লাখ-দেড় লাখ মানুষ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে মেজর জেনারেল নাগরার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্লোগান দিলেন। সম্বর্ধনা শেষে মেজর জেনারেল নাগরা ও লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল কুলকার্নিকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আবার সভামঞ্চে এলাম। বিন্দুবাসিনী স্কুলের ছাদে সভামঞ্চ, ছাদে উঠার জন্যে বাঁশ দিয়ে ছোট একখানা মই তৈরী করা হয়েছে। মই বেয়েই কর্মকর্তাদের সভামঞ্চে উঠতে ও নামতে হচ্ছে। আনোয়ার উল আলম শহীদ সদর দপ্তরের দায়িত্বভার হামিদুল হকের হাতে দিয়ে ১৩ই ডিসেম্বর সকালে চলে এসেছিলেন। গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী ও বাসেত সিদ্দিকী সাহেবও এসেছেন। ১৪ই ডিসেম্বরের সভার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন, টাংগাইল বাস এসোসিয়েশনের চালক, এসোসিয়েশনের সম্পাদক হাবিবুর রহমান (হাবি মিঞা)। সভা শুরুর আগে মুন্থা তালুকদারের ছেলে জঘন্যতম রাজাকার কমান্ডার খোকাকে হাজির করা হলো। টাংগাইলের ঘৃণ্য রাজাকার সংগঠক ও কয়েক হাজার রাজাকারের নেতা খোকা, একদিন আগে পালিয়ে যাওয়ার সময় জোগনীচরে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে হানাদারদের হাতে টাংগাইল জেলার যত লোক মারা গেছেন, তার অর্ধেকেরও বেশী অধ্যাপক খালেক ও এই জল্লাদ খোকার নির্দেশেই মরেছে। সভামঞ্চে হাত বাঁধা খোকাকে দেখে হাজার হাজার মানুষ তাকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করতে থাকেন। জনতা বার বার দাবী করতে থাকেন, জল্লাদ রাজাকার সংগঠকের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। জনতাকে শান্ত হতে অনুরোধ জানিয়ে বলা হলো, 'আমরা আপনাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছি। আপনাদের ইচ্ছা ও নির্দেশ মতই কাজ করা হবে। মুক্তিবাহিনী এই হানাদার জল্লাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছে এবং তা এখনই কার্যকরী করা হবে।' ঘোষণা শেষ হতে না হতেই তিন জন মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার জল্লাদ খোকার পেটে বেয়নেট বসিয়ে দিলে। দেহটি জনতার সামনে দেয়ার সাথে সাথে দেহের ওপর হাজার মানুষ ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফেটে পড়েন। মৃত খোকাকেই তারা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার চেষ্টা করেন। জনতার এই অবস্থা দেখে কয়েক জন মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবক সভাস্থল থেকে দেহটি সরিয়ে নিয়ে কবর দিয়ে দেয়।

বিচার শেষে কোরান, গীতা পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হলো। প্রথম বক্তৃতা করলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ। এর পর একে একে গণ-পরিষদ সদস্য বাসেত সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী তাঁদের সারগর্ভ বক্তব্য রাখলেন। বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে '৭১-র ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর বাহান্নতম জন্মদিনে টাংগাইল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পতাকা দিবস উদ্‌যাপন করেছিল। পতাকা দিবসের উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন টাংগাইল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম স্তম্ভ

আহ্বায়ক আলমগীর খান মেনু। সভা পরিচালনা করেছিলাম আমি নিজে, শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছিলেন লতিফ সিদ্দিকী। সেই দিনের সেই পতাকা দিবসে বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠ কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী বিনা প্রস্তুতিতে ভাষায় অনিন্দ্য সুন্দর সুললিত, সংগ্রামী প্রত্যয়ে প্রজ্বলিত যে ঐতিহাসিক শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন তা টাংগাইলের প্রতিটি মানুষের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকবে। লতিফ সিদ্দিকীর রাজনৈতিক জীবনে হয়তো সেই শপথবাক্য পাঠই সব চাইতে অনন্য ও অবিস্মরণীয় ঘটনা।

আনোয়ার উল আলম শহীদ, বাসেত সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী বার বার জনতাকে সর্বশক্তি দিয়ে হানাদারদের মোকাবেলায় আরও কঠিন মনোবল নিয়ে অগ্রসর হতে আহ্বান জানালেন। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় সভার সকলে উদ্বেলিত ও উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। হানাদারদের চরম নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে অসীম ত্যাগ ও অসম সাহসিকতার সাথে লড়াই করে মুক্তিযোদ্ধারা এত তাড়াতাড়ি মুক্তির আনন্দ উপহার দিতে পারবে তা দেশবাসী যেন কল্পনাও করতে পারছিলেননা। যাদেরকে একদিন হানাদাররা সর্বস্বান্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারাই আজ সিংহের তেজে বিজয়ীর বেশে উপস্থিত। এতে জনগণ স্বভাবতঃই আনন্দে ফেটে পড়ছিলেন। লতিফ সিদ্দিকীর বক্তৃতার পর আমাকে আহ্বান জানানো হলো। আমি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালাম। ২৬শে মার্চের পর এই প্রথম বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে জনসভায় বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়েছি। একদিকে যেমন আমার বুক যুগপৎ আনন্দ ও গৌরবে ফুলে উঠছিল, অন্যদিকে দখলদার বাহিনীর অত্যাচারে শত শত সহকর্মী ও হাজার হাজার স্বাধীনতা প্রিয় সাধারণ মানুষকে হারানোর ব্যথায় হুঃ হুঃ করে কাঁদছিল। দীর্ঘ ন'মাসের যুদ্ধে অনেক কিছু হারিয়েও সব পাওয়ার চরম পাওয়া প্রিয়তম স্বাধীনতার স্পর্শ পেয়েও পাকিস্তানের কারাগারে তখনও বন্দী বঙ্গবন্ধুর জন্য আমার মন বিষাদ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল।

'আপনারা আমার ছালাম গ্রহণ করুন। আপনাদের দোয়া ও পরম করুণাময়ের মেহেরবানীতে আবার আপনাদের সামনে আসতে পেরেছি। আমাদের বাহিনী ঢাকার দিকে এগিয়ে চলেছে। এটা বক্তৃতার মুহূর্তও নয়। তবু আপনাদের অনুরোধে দু'চার কথা বলছি। আমাদের স্বাধীনতা আর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। ইনশাল্লাহু অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা আমাদের দখলে এসে যাবে। আজ আমার যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি কষ্টও হচ্ছে। এই পর্যন্ত আমাদের একশ' চল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছে, পাঁচ শ'র উপর আহত হয়েছে। শান্ত প্রকৃতির সরল প্রাণ বাংলার ছাত্র, তরুণ, কৃষক, শ্রমিকরা যে এত দুর্বার, এত দুঃসাহসী হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমি যেমন আপনাদেরকে সালাম জানাচ্ছি, তেমনি প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবককে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সালাম জানাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু এখনও হানাদারদের কারাগারে বন্দী। স্বাধীনতার সাথে সাথে আমরা বঙ্গবন্ধুকেও চাই। ঢাকা দখলের পর শুরু হবে বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম। আপনারা ভয় পাবেননা। আমরা যেভাবে হানাদারদের মোকাবেলা করে সফলতা

লাভ করেছি, করছি, সেইভাবেই বঙ্গবন্ধুকেও ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবো। "ভাইয়েরা, আজ আপনাদের সামনে যাকে দেখছেন, সে কাদের সিদ্দিকী নয়, কাদের সিদ্দিকী ধলাপাড়া-মাকড়াই যুদ্ধে মারা গেছে। আজ যাকে দেখছেন, সে শুধু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তাঁর নির্দেশ।" শক্তি ও সাহসের সাথে আপনারা মোকাবেলা করুন। মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর নিহত সাথীদের আত্মার শান্তি, আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় হিন্দ,

জয় যৌথবাহিনী, ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী অমর হউক।'

যৌথবাহিনীতে সামিল হয়ে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর ছয় হাজার যোদ্ধা ঢাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৫ই ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার ক্লের ব্রিগেড যখন কড্ডায় অবস্থান নিয়েছিলেন, তখন নবী-নগর-সাভারের রাস্তা ধরে ব্রিগেডিয়ার সান সিংয়ের নেতৃত্বে যৌথবাহিনী ঢাকার দিকে এগুচ্ছিল। সন্ধ্যায় তারা নবী-নগর-ঢাকা-যশোহর রোডের সংযোগ স্থলে পেঁছে যায়। এই সময় সাভারের জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে (রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প) এক ব্যাটেলিয়ন হানাদার অবস্থান করছিল। ব্রিগেডিয়ার সান সিং এখানে হানাদারদের চরম বাধার সম্মুখীন হন।

ব্রিগেডিয়ার সান সিং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বাবাজী নামেই পরিচিত। ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে হয়তো তিনিই মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে প্রিয়। মুক্তিবাহিনীতে ছিল, অথচ বাবাজীকে চিনেনা অথবা নাম শুনেনি এমন মুক্তিযোদ্ধা খুব কম পাওয়া যাবে। ব্রিগেডিয়ার বাবাজী মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন। মেঘালয় সহ পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবির সরাসরি তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি তুরার যে ক্যাম্পে থাকতেন, সেই রওশন আরা প্রশিক্ষণ শিবির থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। ঢাকা অভিযানের সময় রওশন আরা ক্যাম্পে ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুই হাজার আর আমার দলের তিন হাজার মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার বাবাজীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনীতে সামিল হয়েছিল। উপরন্তু ভারতীয় নিয়মিত বাহিনীর আটাশ'শ সৈন্য তখন তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন। শত্রুর চাইতে বাবাজীর বাহিনীর শক্তি সামর্থ অনেক বেশী হওয়ার পরও হানাদাররা দুর্দান্ত লড়াই করলো। ব্রিগেডিয়ার বাবাজীর বাহিনীর বেশীরভাগ সাভার বিশ্ববিদ্যালয় ও পাকা সড়কের পশ্চিম পাশের কাঁচা রাস্তা দিয়ে সাভার বাজার পেরিয়ে ঢাকার দিকে যেতে সক্ষম হলো। চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়েও তারা আত্মসমর্পণে নারাজ। ব্রিগেডিয়ার বাবাজীও শত্রুকে ঢাকার এত কাছে পিছনে ফেলে এগোতে রাজী নন। তাই, একদিকে তিনি যেমন শত্রু ঘাঁটি পতন ঘটানোর জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, অন্যদিকে তেমনি হানাদাররাও ঘাঁটি কামড়ে থাকার নীতি অবলম্বন করলো। বাবাজীর নেতৃত্বে তিনহাজার নিয়মিত ও অনিয়মিত যৌথবাহিনীর যোদ্ধা হানাদারদের ঘাঁটি চতুর্দিক থেকে ঘিরে আস্তে আস্তে তাদের ঘেরাওয়ের ফাঁস ছোট করে আনতে লাগলেন। রাত তিনটায় চরম সময় ঘনিয়ে এলো। যৌথবাহিনী হানাদার ঘাঁটির পঞ্চাশ গজের মধ্যে পেঁছে গেল। হানাদারদের সত্তর-আশিটি লাশ যৌথবাহিনীর

হাতে এসে গেছে। তব্ হানাদাররা আত্মসমর্পণ করছেনা। এই সময় ব্রিগেডিয়ার বাবাজী হানাদার ঘাঁটির একশ' গজের মধ্যে একটি দু'তিন ফুট উ'চু দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, 'ডাইনে যাও, বাঁয়ে যাও, দেখ ডান পাশের বাংকার থেকে শত্রু গুলি ছুঁড়ছে, পিছনে দশ-বারো জন ভাগছে, ধর ওদের এই ধরনের নানা নির্দেশ দিচ্ছিলেন। হানাদারদের গুলি, বাবাজীর আশেপাশে এসে পড়ছিল। ব্রিগেডিয়ার বাবাজীকে দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেয়ার দৃশ্যটি ছোট্ট এক মুক্তিযোদ্ধা অনেকক্ষণ ধরে অবাক বিস্ময়ে দেখছিল। গুলি এদিক-ওদিক পড়ছে, অথচ বাবাজীর গায়ে লাগছেনা দেখে ছোট্ট মুক্তিযোদ্ধাটি দৌড়ে বাবাজীর কাছে গিয়ে তাঁকে এক হে'চকা টানে নীচে নামিয়ে অবাক বিস্ময় ও অপার কৌতুহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই বাবাজী, আপ কেয়া হৈতা হ্যায়! আপ ভুত হ্যায়? আপ্কো কি'উ গুলি লাগতা নেহী পারতা হ্যায়? বাবাজী প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে বাচ্চা মুক্তিযোদ্ধাটিকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'না, আমি ভুত না, তবে গুলি ফেরানোর মন্ত্র জানি।' ব্রিগেডিয়ার বাবাজীর কথা বাচ্চা মুক্তিযোদ্ধাটির বিশ্বাস হলো। সে বাবাজীকে জোরে চেপে ধরে আরো আশ্চর্য হয়ে বললো, 'এই জন্যই তো অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আপনার গায়ে একটা গুলিও লাগছে না!' রাত সাড়ে তিন-চারটায় সাভারের হানাদার ঘাঁটির পতন ঘটলো। এখানে একশ' চল্লিশ জন নিহত ও একশ' সত্তর জন আহত হলো। যৌথবাহিনীর পক্ষে বার জন শহিদ ও পাঁচ জন সামান্য আহত হয়। বার জন শহিদের মধ্যে দশ জনই ভারতীয় নিয়মিত বাহিনীর। কড়ার মত, এখানেও মিত্রবাহিনী আঘাত হানতে মুক্তিযোদ্ধাদের আগে যেতে দিতে চাননি। মুক্তিবাহিনীকে পিছনে রাখা মিত্রবাহিনীর কোন কৌশল বা উচ্চ নেতৃত্বের কোন নির্দেশও ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর নিয়মিত যোদ্ধারাই অল্প বয়সের মুক্তিযোদ্ধাদের স্নেহ, মমতা আর ভালবাসার টানে শত্রুর সামনে আগে যেতে বারন করেছেন।

১৩ই ডিসেম্বর রাতে মেজর জেনারেল নাগরা দুই ব্রিগেডিয়ার ও আমাকে নিয়ে যে আলোচনায় বসেছিলেন, সেখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে পরিকল্পনা অনুযায়ী ময়মনসিংহ টাংগাইলের দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া যৌথবাহিনীর উপর ঢাকা দখলের দায়িত্ব নেই। এই বাহিনীর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব, ঢাকার উত্তরে টঙ্গী পর্যন্ত পে'ছে যাওয়া এবং পশ্চিম-উত্তরে যশোহর রাস্তা ধরে সাভার পর্যন্ত এগিয়ে অবস্থান নেয়া। সম্ভব হলে ঢাকার কাছে মীরপুর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে পশ্চিম-উত্তর দিক থেকে হানাদারদের ঘিরে রাখা। বিশেষ করে যশোহর রোড ধরে উত্তর বঙ্গের দিক থেকে কোন হানাদার যাতে পিছিয়ে এসে ঢাকা রক্ষায় সাহায্য করতে না পারে, এটা লক্ষ্য রাখা। এই আলোচনাতে আমি একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম, সম্ভব হলে আমাদের বাহিনী ঢাকা দখলে এগিয়ে যেতে পারে কিনা? মেজর জেনারেল নাগরা বলেছিলেন, 'এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আমাদের উপর নেই। এই প্রশ্নটা, পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আমাদের মাথায় ছিল না। আপনার মতই দিন দুই ধরে প্রশ্নটা আমার মাথায় ঘুরছে। মূল প্লান যখন হয়, তখন আমাদের ধারণা ছিল, ময়মনসিংহ জামালপুর ও টাংগাইল হয়ে ঢাকা পে'ছনো কষ্টসাধ্য, দুরূহ

বেশী। তাই আমাদেরকে ঢাকা দখলের দায়িত্ব না দিয়ে ঢাকা চেপে ধরার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার দুইটি ব্রিগেড যখন অতি সামান্য ক্ষয়ক্ষতিতে ঢাকার পনের-কুড়ি মাইলের মধ্যে পেঁছে গেছে তখন হাই কমাণ্ডের কাছে এই ব্যাপারে জানতে চেয়েছি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা পরবর্তী নির্দেশ পেয়ে যাবো। 'হ্যাঁ, যৌথবাহিনী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরবর্তী নির্দেশ পেয়েছিল। নির্দেশ না বলে এটাকে পরামর্শ বলাই ঠিক হবে। হাইকমাণ্ড পরামর্শ দেন, 'উত্তর থেকে এগিয়ে যাওয়া বাহিনী ঢাকার পনেরো মাইলের মধ্যে পেঁছে গেলে তারা পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে বলে ধরে নেয়া হবে। উত্তরের বাহিনী যদি আরও এগিয়ে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে কোন আপত্তি নেই। এই ব্যাপারে যা ভালো হয়, সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ অধিকার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সেনাপতিদের দেয়া হলো।'

পরিকল্পনা মত ঢাকা দখলের দায়িত্ব না থাকায় অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় উত্তর দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া মিত্রবাহিনীর যেমন সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল না, তেমনি ভারী অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। যশোহর, খুলনা, বগুড়া, রংপুর এই সমস্ত সেক্টরের প্রতিটি ভারতীয় পদাতিক বাহিনীকে গোলন্দাজ ও ট্যাংক স্কোয়াড দিয়ে সাজানো হয়েছিল। চট্টগ্রাম নোয়াখালী সেক্টরের মিত্রবাহিনীর সাথেও গোলন্দাজ ও ট্যাংক স্কোয়াড ছিল। আখাউড়ার দিক থেকে এগিয়ে আসা যৌথবাহিনী ঢাকা দখল নেবেন, এটাই ছিল মূল পরিকল্পনা। আবার কোন কোন জেনারেল বলেছেন, ঢাকা দখল তাঁদের প্রথম পরিকল্পনায় ছিলনা। এজন্য কোন কোন সমর নায়ক একেবারে শুরুতেই এই পরিকল্পনাকে 'ফল্টি প্ল্যান' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে চীন সীমান্ত থেকে একটা মাউণ্টেন ডিভিশনকে উত্তরে তুরা নিয়ে আসা হবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দিল্লীর মনে হয় চীন গোলমাল করতে পারে। তাই চীন-সীমান্ত থেকে মাউণ্টেন ডিভিশন সরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তাই হাল্কা অস্ত্র মাত্র দুই ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে কোন রকমে উত্তর থেকে মিত্রবাহিনীর একটি কলাম এগিয়ে আসে। টাংগাইলে ছত্রীবাহিনী নেমে এই বাহিনীর সামান্য শক্তি বৃদ্ধি করে।

আখাউড়া হয়ে ঢাকা দখলে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা যে বাহিনীর আছে, সেই বাহিনীকে সবচেয়ে শক্তিশালী করে গঠন করা হয়েছে। এই বাহিনীর কাছে গোলন্দাজ ও ট্যাংক স্কোয়াড সহ বিশাল আকারের অনেকগুলো যুদ্ধ হেলিকপ্টার রয়েছে। আখাউড়া হয়ে যৌথবাহিনী ঢাকার দিকে এগিয়েও আসে। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা উলট্-পালট্ করে দিয়ে উত্তর দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া ঝটিকা বাহিনী, আখাউড়ার দিক থেকে এগিয়ে আসা বাহিনীর ঢাকা পেঁছার নির্ধারিত সময়ের ত্রিশ-চল্লিশ ঘণ্টা আগে ঢাকার প্রান্ত সীমায় পেঁছে যায়। মিত্রবাহিনী ও বাংলাদেশের বড় বড় যুদ্ধ বিশারদদের সম্মিলিত সযত্নে রচিত পরিকল্পনা উলট্-পালট্ হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ কি? বাংলাদেশের উত্তরে তুরা ও ময়মনসিংহ সীমান্ত থেকে ঢাকার দূরত্ব প্রায় দুশ মাইল। গ্রামগঞ্জের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগোতে দূরত্ব আরো বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অন্যদিকে আখাউড়া থেকে ঢাকা মাত্র সত্তর-আশি মাইল। ঘোরা পথে তা কোনক্রমেই এক'শ মাইলের বেশী হবেনা। তাই ঢাকা অভিযানে, এই কম দূরত্বের রাস্তাটাই বেছে নেয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধের সময় দেখা গেল

অস্ত্রশস্ত্র, নিয়মিত সৈন্যবল কম এবং দূরত্ব বেশী হওয়া সত্ত্বেও উত্তর দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া যৌথবাহিনী সবার আগে ঢাকার পাদদেশে পৌঁছে গেল। এর অন্তর্নিহিত একমাত্র কারণ, আমরা ঢাকার ত্রিশ মাইল উত্তর থেকে ময়মনসিংহ-জামালপুর রাস্তার প্রায় ষাট মাইল মিত্রবাহিনী আসার আগেই মুক্ত করে ফেলেছিলাম। ঢাকার রাস্তায় উনিশটি নাগরপুরের তিনটি, কন্দুছনগরের চারটি, টাংগাইল-ময়মনসিংহ রাস্তায় পাঁচটি ও গোপালপুর রাস্তায় একটি বড় পাকা সেতু ধ্বংস করে হানাদারদের চলার পথ একেবারে বন্ধ করে ফেলা হয়েছিল। এছাড়া ময়মনসিংহ-জামালপুর থেকে পালিয়ে আসা সাত হাজার, টাংগাইলের তিন হাজার মোট দশ হাজার নিয়মিত হানাদারদের দুই হাজারের বেশী ঢাকা পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে পারেনি। যারা পিছিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, তারাও অক্ষত ছিল না। ছিল নেতৃত্ব ও মনোবলহীন, ভীত-সন্ত্রস্ত। মিত্রবাহিনীকে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, শেরপুর, কামালপুর, জামালপুর, কড্ডা ও সাভার ছাড়া আর কোথাও হানাদারদের সাথে বড় রকমের লড়াই করতে হয়নি, আগেই আমরা হানাদারদের মেরুদণ্ড ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিলাম। টাংগাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকের স্বাধীনতার পর আপসোস ছিল, হানাদারদের কাছ থেকে দখল করা বড় বড় অস্ত্রগুলো হানাদারদের উপর ব্যবহার করার সুযোগ তারা পেল না।

চারদিন হলো টাংগাইল মুক্ত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর প্রশাসনিক দপ্তরের বৃহৎ অংশ টাংগাইলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত হাজার পাক-হানাদার ও চৌদ্দ হাজার পাঁচশ' রাজাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী। শত শত অস্ত্র নানা দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বন্দীদের ঠিকমত রাখা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও প্রশাসনিক অন্যান্য কাজ সারার জন্য ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে টাংগাইল ফিরেছি।

অন্যদিকে মেজর জেনারেল নাগরা ১৫ই ডিসেম্বর টাংগাইল সার্কিট হাউসে রাত কাটানো স্থির করেন। রাত এগারোটা, টাংগাইল পুরানো কোর্ট বিল্ডিংয়ের জিলা পরিষদ অফিসে বসে নিবিষ্ট মনে কাজ করছি। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। অপর প্রান্তে যৌথবাহিনীর নেতা মেজর জেনারেল নাগরা। জেনারেল নাগরা প্রথমেই শুভেচ্ছা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন? আমি একটা প্রয়োজনে আপনাকে ফোন করছি, কিন্তু আপনাকে বলাটা ঠিক হবে কিনা, বুঝে উঠতে পারছিনা।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমার অনুরোধ রক্ষায় আপনার যদি কোন অসুবিধা হয়, নিঃসংকোচে না করে দিতে পারেন।'

মেজর জেনারেল নাগরার কথা শুনে খুব আগ্রহভরে বললাম, 'পারা না পারা তো পরের কথা। বলুন না, আপনার অনুরোধটা কি?'

এরপরও তিনি একটু সংকোচের সাথেই বললেন,

—দেখুন, দায়িত্বটা পুরোপুরি আমার, তাই আমার দায়িত্বের বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপাতে সংকোচ হচ্ছে। ব্যাপারটা যে যুদ্ধের চেয়েও কঠিন। আপনার যদি কষ্ট হয়, আপনি আমাকে সাফ না করে দেবেন।

জেনারেল নাগরার কথাতে দ্বিধা-সংকোচের আভাস পেয়ে বললাম,

—ফোনে জানাতে কি কোন অসুবিধা আছে ? তাহলে আমি এখনই আসছি।

—না, না, আপনাকে আসতে হবেনা। ফোনে বলায় কোন অসুবিধা নেই। আমার অনুরোধ, যদি সম্ভব হয়, আগামীকাল সকালের নাস্তার ব্যবস্থাটা আপনি করে দিন। আমার এখানে অত লোকজন নেই। তাই হাজার বারো সৈনিকের নাস্তা সকালের মধ্যে করতে পারবোনা। সানন্দে জেনারেল নাগরার অনুরোধে রাজী হলাম। মেজর জেনারেল নাগরা শেষবারের মত আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,

—বারো হাজার সৈনিকের নাস্তা চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করা যে সে ব্যাপার নয়। আপনি একটু ভেবে দেখুন।

—নাস্তা তো হয়ে যাবে। এ নিয়ে ভাববেননা। যেহেতু আমরা একবার নাস্তা দেয়ার সুযোগ পেয়েছি, মেনুটা কি হলে ভাল হয়, বলুন !

নাগরার সহজ উত্তর,

—রুটি-হালুয়াই যথেষ্ট। রুটির সাথে সবজি হলে খুবই ভাল হতো। নাস্তার সাথে চা অবশ্যই চাই কিন্তু এতদূর থেকে চা নিয়ে খাওয়ায় অসুবিধা আছে। চায়ের ব্যবস্থা ওখানে করা যাবে। নাস্তার জন্য শুধু রুটি-হালুয়ার ব্যবস্থা যদি করেন, তাতেই চলে যাবে। ঠিক সময়েই নাস্তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে আশ্বাস দিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম।

শুরু হলো যৌথবাহিনীর জন্য নাস্তা তৈরীর কাজ। সবকিছু প্রায় প্রস্তুতেই ছিল। বিশাল বিশাল ডেকচি, কড়াই ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যা লাগে আধঘণ্টার মধ্যেই সব সংগ্রহ হয়ে গেল। টাংগাইল আওয়ামী লীগ অফিসের পিছনে মাটি খুঁড়ে মস্ত বড় বড় কুড়ি খানা চুল্লী তৈরী করে নাস্তা তৈরী শুরু হলো। নাস্তা তৈরীর মূল দায়িত্ব নিলেন সকল কাজে পারদর্শী মোয়াজ্জেম হোসেন খান হবি মিয়া, কমান্ডার খোরশেদ আলম ও কর্নেল ফজলুর রহমান। নাস্তা প্রস্তুতে অপরিসীম অবদান রাখল মেজর আলী হোসেন ও ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী চাচা। যৌথবাহিনীর জন্য নাস্তা প্রস্তুতের দায়িত্ব পেয়ে মোয়াজ্জেম হোসেন খান হবি মিয়া, খোরশেদ আলম, ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী ও কর্নেল ফজলুর রহমান আমার কাছে প্রস্তাব রাখলেন, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে খাবার পাঠাচ্ছি, খাবার খেয়ে যোদ্ধা ভাইয়েরা যদি কিছুই মনে না রাখলো, তাহলে আমাদের খাবার পাঠানোর কোন অর্থ হয় না। আমরা শুধু সাদা রুটি আর হালুয়া অথবা সবজি ফ্রন্ট লাইনে পাঠাতে পারবোনা। আমাদের ইচ্ছামত খাবার তৈরীর অনুমতি দিন। —আপনারা যা খুশী করুন। আমি শুধু ঠিক সময়ে প্রত্যেকের জন্য পরিমাণ মত নাস্তা চাই।

কর্নেল ফজলু, ক্যাপ্টেন নিয়ত আলী, ক্যাপ্টেন খোরশেদ ও মোয়াজ্জেম হোসেন প্রায় দু'শ মুক্তিযোদ্ধা ও দু'শ স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে দুঃসাধ্য সাধন করলেন। কুড়ি হাজার শুকনো রুটি, কুড়ি হাজার পরটা, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার পাউরুটি স্লাইস, বিশাল বিশাল দশ ডেকচি বুটের ডাল, বড় বড় আট-ন' ডেকচি খাসির মাংস, পনের ডেকচি সবজির বিপুল পরিমাণ নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। এ ছাড়া জারিকেনে চা পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। ভোর পাঁচটার মধ্যে টাংগাইল সার্কিট হাউসের সামনের মাঠে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিলেন। আমিও তৈরী হয়ে

ভোর সাড়ে পাঁচটায় সার্কিট হাউস মাঠে হাজির হলাম। ছটায় ময়মনসিংহের দিক থেকে একটি হেলিকপ্টার এসে টাংগাইল সার্কিট হাউসের সামনের মাঠে অবতরণ করলো। অর্ধেক নাস্তা হেলিকপ্টারে তুলে দেয়া হলো। মেজর জেনারেল নাগরা হেলিকপ্টারে গিয়ে উঠলে বাসির আজাহার ও দেওয়ানগঞ্জের বাবলুকে নিয়ে আমিও হেলিকপ্টারে উঠলাম। হেলিকপ্টার পাখা মেলে ঢাকার দিকে উড়ে চললো। ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে ছয়টায়, ঠিক তখন হেলিকপ্টারটি কড়ডার মৌচাকের স্কাউট প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের পাশে অবতরণ করলো। ব্রিগেডিয়ার ক্লের ওখানেই তার অস্থায়ী ব্রিগেড সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। তিনি দৌড়ে এসে খুব উত্তেজিতভাবে জেনারেল নাগরাকে বললেন,

—নিয়াজী খুব সম্ভবতঃ আত্মসমর্পণ করবে। আমাদের বেতারে বেশ কয়েকবার ওদের কথাবার্তা ধরা পড়েছে। আমার দিকে গতকাল বিকাল থেকে ওদের কোন তৎপরতা নেই। তবে সান সিং-এর সাথে সারারাত প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। রাত তিনটার পর অবশ্য সান সিংয়ের দিকে গোলাগুলির আওয়াজ কমে এসেছে। ব্রিগেডিয়ার ক্লেরের কথা শুনে জেনারেল নাগরা বললেন,

—ঠিক আছে। তুমি আমাদের সঙ্গে চল। আমরা সান সিং-এর খবর নিয়ে দেখি।

মৌচাকে অর্ধেক নাস্তা নামিয়ে দিয়ে হেলিকপ্টার আবার উড়ে চললো পশ্চিম-দক্ষিণে। সাভারের জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়কে পশ্চিমে রেখে ঢাকা-যশোহর রাস্তার উপর দিয়ে ঢাকার দিকে চললাম। সাভার ও মীরপুরের মাঝামাঝি রাস্তার বাঁকে হেলিকপ্টার নামলো। নাস্তা নামিয়ে দিয়ে আবার টাংগাইল থেকে দ্বিতীয়বার নাস্তা আনতে হেলিকপ্টার উড়ে গেল। আমাদের নিয়ে জেনারেল নাগরা পাকা সড়কের একটি সেতুর উপর দাঁড়ালেন। মীরপুরের দূরত্ব এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল। ব্রিগেডিয়ার সান সিং জেনারেল নাগরাও আমাদের সাথে মিলিত হয়ে রাতে তার সাথে হানাদারদের তুমুল লড়াইয়ের বর্ণনা দিলেন। জেনারেল নাগরা দূরবীন দিয়ে খুব ভাল করে বার বার ঢাকা দেখে নিলেন। সেতু থেকে শেরে বাংলা নগরের নতুন সংসদ ভবনের উপরের অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। যৌথবাহিনীর দুইটি কোম্পানী রাস্তার দুই কোল ঘেঁষে খুব ধীরে ধীরে মীরপুরের দিকে এগুতে লাগল। আমরা পায়ে হেঁটে আরো সামনে এগিয়ে চললাম। আধ মাইল সামনে আর একটি ছোট্ট পুল। তার কাছে যেতেই বাম দিকে চকের মাঝ দিয়ে চার-পাঁচ জনকে ছুটে আসতে দেখা গেল। আমরা চারজনই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। হাত উপরে তুলে নাড়াচাড়া করে চার-পাঁচ জন দ্রুত দৌড়ে আসছে। ওরা কারা? ওরা কি হানাদারদের কেউ? না গ্রামবাসী? কাছে আসতেই দেখা গেল, ওরা হানাদার নয়, গ্রামবাসীও না, মুক্তিবাহিনীর বিখ্যাত ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর খান ও মেজর গোলাম মোস্তফা তিন জন সহযোদ্ধা নিয়ে দৌড়ে এসেছে। সবুর ও মোস্তফাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—কি ব্যাপার? তোমরা এইভাবে চকের (মাঠের) মাঝ দিয়ে দৌড়ে আসছ? সবুর হাঁপাতে হাঁপাতে বললো,

—স্যার, আমরা মীরপুরের কাছে পেঁছে গেছি। পিছন থাইক্যা যাতে

আপনেরা গুলি না ছাড়েন তাই-ই খবর দিবার আইছি।

ব্রিগেডিয়ার সান সিং তো অবাক! বাবাজী বেঁটেখাটো সবুরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—তোমরা তো মাঝরাতেও আমাদের সাথে ছিলে। কি করে এতদূর এগিয়ে গেলে?'

সবুর হাসতে হাসতে বললো,

—ঐ তো, ঐ জন্যই তো আমরা মুক্তি। গ্রামের মধ্য দিয়া সকাল সকাল পৌঁছা গেছি।

মেজর মোস্তফা, ক্যাপ্টেন সবুর, ক্যাপ্টেন বকুল, ক্যাপ্টেন মোজাম্মেলের চার কোম্পানীর এক হাজার মুক্তিযোদ্ধা মীরপুর পুলের বাম পাশ (বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধ) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এ খবর পেয়ে আমরা যেমন বিস্মিত হলাম, তেমনি আনন্দিতও হলাম। যৌথবাহিনীকে রাস্তা ধরে আরও দ্রুত মীরপুর সেতুর কাছাকাছি এগিয়ে যেতে বলা হলো। কারণ, মুক্তিবাহিনী মীরপুর সেতুর একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে। তাই মীরপুর সেতু পর্যন্ত খুব দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি মীরপুর সেতুর পুব-উত্তরে মুক্তিবাহিনীর শুধু এককভাবে আলাদা থাকাটাও নিরাপদ নয়। মুক্তিবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া উচিত।

ব্যারেলের মুখে ঢাকা

সকাল আটটায় রাজধানী ঢাকা শহরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে ঢাকা-মীরপুর সড়কের হেমায়েতপুর সেতুর উপর দাঁড়িয়ে মেজর জেনারেল নাগরা এক টুকরো কাগজ জীপের বনেটে রেখে শত্রুপক্ষের কমাণ্ডার আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজীকে যৌথবাহিনীর পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের জন্য লিখলেন,

আত্মসমর্পণের আহবান

প্রিয় আবদুল্লাহ,

আমরা এসে গেছি। তোমার সব ভেল্কি খতম হয়ে গিয়েছে। আমরা তোমাকে চার পাশ থেকে ঘিরে ফেলেছি। বুদ্ধিমানের মত আত্মসমর্পণ কর। না হলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। আমরা কথা দিচ্ছি, আত্মসমর্পণ করলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তোমাদের সাথে আচরণ করা হবে। তোমাকে বিশেষভাবে লিখছি, আত্মসমর্পণ করলে তোমার জীবনের নিশ্চয়তা দেয়া হবে।

তোমার
মেজর জেনারেল নাগরা
১৬/১২/৭১ ইং
০৮-৩০ মিনিট।

যৌথবাহিনীর চার সদস্য তিনজন মিত্রসেনা ও একজন মুক্তিযোদ্ধা নাগরার লেখা বার্তা নিয়ে সাদা পতাকা না থাকায় একটি সাদা জামা উড়িয়ে শত্রু অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর দিকে দুটি জীপে ছুটলো। আত্মসমর্পণের আহবান বার্তা নিয়ে চার সাহসী যোদ্ধা চলে যাবার পর আমরা আমিন বাজার স্কুলের পাশের পুল পর্যন্ত

এগিয়ে যেতে শুরু করলাম।

আমি আগেই বলেছি, ব্রিগেডিয়ার ক্লেরের বেতারে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের ইঙ্গিতসূচক কিছু বার্তা রাত চারটার দিকে ধরা পড়েছিল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করতে পারে, এই ধরনের আভাস-ইঙ্গিত ভারতীয় হাইকমান্ড নাকি পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের কাছে এই সম্পর্কে তখনও হাইকমান্ডের কোন পরিষ্কার বার্তা ছিল না। উত্তর দিক থেকে ঢাকার উপকণ্ঠে এগিয়ে যাওয়া যৌথ বাহিনীর কাছে কেবলমাত্র খবর ছিল, ১৬ই ডিসেম্বর সকাল এগারোটার পর যৌথবাহিনী ঢাকার উপর মরণ আঘাত হানবে। এই আক্রমণে সাহায্যের জন্য ঠিক এগারটায় বিমান বাহিনী ঢাকার উপর বোমাবর্ষণ করবে। অন্যদিকে মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্য জেনারেল মানেক শ পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে আহবান জানাচ্ছিলেন। আকাশবাণীতে মানেক শর আহবান বার বার প্রচার করা হচ্ছিল। ঢাকার আকাশে লক্ষ লক্ষ লিফলেট এই মর্মে ছাড়া হয়। মানেক শর আহবান 'হাতিয়ার ঢাল দো,' আণবিক বোমার মত কাজ করছিল। আমরাও বেতারে বার বার এই আহবানই শুনছিলাম। আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে নিয়াজী আমেরিকার দূতাবাস কিংবা জাতিসংঘের সাথে যোগাযোগ করেছে কিনা, করলে কি ধরনের যোগাযোগ করেছে, লিফলেট ছড়ানো ও মরণ আঘাত হানা ছাড়া হাইকমান্ড শত্রুর আত্মসমর্পণের অন্য কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন কিনা তা মেজর জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে অগ্রসর যৌথবাহিনীর জানা ছিল না। নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতিতে প্রায় পরাভূত শত্রুর মানসিক অবস্থা আঁচ করে এবং উত্তরোত্তর বিজয়ে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে ঢাকায় দূত পাঠাই।

হরিষে বিষাদ

দূত পাঠানোর এক ঘণ্টা পর ঠিক সাড়ে ন'টায় মীরপুর সেতুর দিক থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসা গাড়ীর গর্জন শোনা গেল। দ্রুত ধেয়ে আসা গাড়ীর গর্জন শুনে আমাদের সৈনিকরা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই মাটি কাঁপিয়ে কয়েক ঝাঁক গুলির শব্দ ভেসে এলো। চার-পাঁচটি মেশিনগান একসাথে বিকট শব্দে গর্জে উঠে থেমে গেল। চকিতে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর আবার থমথমে নীরবতা। ছুটে আসা গাড়ীর উপর গুলি ছুঁড়তেই দ্রুত অগ্রসরমান দুটি গাড়ীই নিশ্চল হয়ে গেল। আমাদেরও ভুল ভাঙলো। গাড়ী দুটো শত্রুর নয়, আমাদের গাড়ীই ফিরে আসছিল। গাড়ীর উপর কোন সাদা পতাকা বা কাপড় না থাকায় শত্রুরা ধেয়ে আসছে ভেবে অগ্রবর্তী দলের সৈন্যরা গুলি ছুঁড়েছে।

প্রতিনিধি দল নিয়াজীর কাছে নাগরার চিঠি পৌঁছে দিলে, নিয়াজী আত্মসমর্পণে রাজী আছে বলে জানিয়ে দেয়। সামনে রক্তক্ষয়ী বিরাট যুদ্ধ হচ্ছেনা এবং পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করছে জেনে আনন্দে প্রতিনিধি দল নিজেদের সেনাপতিদের কাছে এই দারুণ সুখবরটি পৌঁছে দিতে হাওয়ার বেগে ছুটে আসছিল। আসার পথে আনন্দ-উদ্বেল আবেশে আনমনা হয়ে গাড়ীতে লটকানো সাদা জামাটি কখন যে প্রচণ্ড বাতাসে উড়ে গেছে তা তারা জানতেই পারেন নি।

তাই এই বিভ্রাট। ভুল যখন ভাঙল, তখন যা হবার হয়ে গেছে। তিনজন সাথে সাথে নিহত হলো। আমরা ঘটনাস্থল আমিন বাজার স্কুলের পাশে দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, দুটি জীপই বিকল হয়ে থেমে রয়েছে। একটিতে তিনজনের মৃতদেহ। রক্তে সমস্ত জীপটা ভেসে গেছে। তখনও তাদের দেহ থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। এত দুঃখের মাঝেও অন্যজন আহত অবস্থায় জীপের স্টিয়ারিং ধরে বসেছিলেন। দারুণ সুখবরটা যত তাড়াতাড়ি দিতে পারবেন, তত তাড়াতাড়িই যেন সহযোদ্ধা হারানোর দুঃখ ও গুলিতে আহত হওয়ার নিদারুণ যন্ত্রণার উপশম হবে। আহত অবস্থায় গলার স্বর জড়িয়ে আসা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব স্পষ্টভাবে প্রত্যয় মেশানো কণ্ঠে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, 'শত্রুরা আত্মসমর্পণে রাজী হয়েছে। তাদের দিক থেকে এখনই কোন জেনারেল আত্মসমর্পণের প্রথম পর্ব সারতে আসছেন।' যে মিত্রসেনা এই সংবাদ দিলেন, তার হাঁটুর নীচের অংশ বুলেট বিদ্ধ হয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। তিনি তার ক্ষতস্থান দুহাতে চেপে ধরে আমাদের সর্বশেষ সংবাদ দিলেন। কয়েক হাজার বছর আগের ইতিহাস যেন ভিন্ন প্রেক্ষিত ও ভিন্ন পটভূমিকায় জীবন্ত হয়ে উঠলো। ম্যারাথন থেকে এথেন্স নয়, ঢাকা থেকে মীরপুরে গৌরবোজ্জ্বল মনপ্রাণ অথচ গুলিবিদ্ধ যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহের দ্রুত নিঃশেষিত শক্তি শেষবারের মত জড়ো করে শত্রু সেনাদের আত্মসমর্পণ তথা পূর্ণ বিজয়ের দারুণ সংবাদ দিলেন এযুগের বীর সেনানী, এই শতাব্দীর ফিডি পাইডিস।

যৌথবাহিনীর সদস্যদের রক্তে তখন গাড়ী আর পীচঢালা কালো পথ পিচ্ছিল ও লাল হয়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশে অজস্র কৃষ্ণচূড়া গাছে মৌসুমের প্রথম ফুল গুচ্ছের লাল টকটকে রঙকে ম্লান করে দিয়ে। নীচে পীচঢাকা কালো পথে বয়ে চললো মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রসেনার মিলিত তাজা শোনিত ধারা, প্রস্ফুটিত হলো শান্তি, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও বিশ্ব মানবতার লাল গোলাপ।

আহত ও নিহতদের সরিয়ে নেয়ার জন্য হেলিকপ্টার আনা হলো। হেলিকপ্টার আমিন বাজার স্কুলের পাশে মসজিদআলা পাকা বাড়ীর সামনে অবতরন করলে, তাতে আহত ও নিহতদের উঠিয়ে দেয়া হলো। হেলিকপ্টার মির্জাপুর হাসপাতালের উদ্দেশে উড়ে যাবার কয়েক মিনিট পর ঢাকার দিক থেকে একটি মার্সিডিস বেন্জ ও দুইটি জীপে দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর একজন মেজর জেনারেল, দুইজন লেঃ কর্নেল, একজন মেজর, দুইজন ক্যাপ্টিন ও কয়েকজন সিপাই আত্মসমর্পণের প্রথম আনুষ্ঠানিক পর্ব সারতে এলো। হানাদারদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ দখলদার বাহিনীর সি. এ. এফ. প্রধান মেজর জেনারেল জামশেদ আত্মসমর্পণের প্রথম পর্ব সারতে এসেছে। আমরা যথারীতি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। মেজর জেনারেল নাগরার বামে ব্রিগেডিয়ার সান সিং, তার বামে ব্রিগেডিয়ার ক্লের ও সর্বশেষে আমি। মেজর জেনারেল জামশেদ যৌথবাহিনীর সেনানায়কদের সামনে দাঁড়িয়ে সামরিক অভিবাদন করার পর নাগরার সামনে এসে, কোমর থেকে রিভলবার বের করে প্রসারিত দুই হাতে নাগরার সামনে বাড়িয়ে দিল। মেজর জেনারেল নাগরা ছ'টি বুলেট খুলে রেখে রিভলবারটি আবার জামশেদের হাতে ফেরত দিলেন। এরপর জামশেদ আগের মত দুই প্রসারিত হাতে তার সামরিক

আত্মসমর্পণের প্রথম সামরিক পর্ব

টুপিটি নাগরার হাতে অর্পণ করলো। মেজর জেনারেল নাগরা লাইন থেকে বেরিয়ে জামশেদের টুপিটি আমার হাতে তুলে দিলেন। জামশেদ তার গাড়ীর 'জেনারেল ফ্ল্যাগ' এনে নাগরার হাতে তুলে দিল। নাগরা জেনারেল ফ্ল্যাগটি ব্রিগেডিয়ার সান সিংয়ের হাতে অর্পণ করলেন। মেজর জেনারেল জামশেদ সবশেষে তার কোমর থেকে বেল্ট খুলে নাগরার হাতে দিল। নাগরা তা ব্রিগেডিয়ার ক্লেরকে দিলো। তিনি সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য জামশেদকে বেল্টটি ফিরিয়ে দিলেন। মেজর জেনারেল নাগরার গাড়ী থেকে যৌথবাহিনীর জেনারেল ফ্ল্যাগ (যৌথবাহিনীর ফ্ল্যাগ ছিল না। ভারতীয় বাহিনীর ফ্ল্যাগকে সাময়িকভাবে যৌথবাহিনীর জেনারেল ফ্ল্যাগ ধরা হতো) খুলে তা আত্মসমর্পিত পাকিস্তান বাহিনীর মার্সিডিস বেন্জে লাগিয়ে জামশেদকে সাথে নিয়ে আমরা অবরুদ্ধ শত্রুঘাঁটির দিকে এগুলাম।

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে জামশেদ, পিছনের সিটে আমরা চারজন। যৌথবাহিনী তখনও মীরপুর সেতু পার হয়নি অথচ আমরা ঢাকার দিকে যাচ্ছি, এ খবরও তাৎক্ষণিকভাবে সদর দপ্তরে পাঠানো গেল না। রওনা হওয়ার আগে শুধু নাগরা লেঃ কর্নেল কুলকার্নিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি আমাদের খবর সদর দপ্তরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে থাক।' মীরপুর পুলের ঢাকার পারে এসে মেজর জেনারেল নাগরা নিয়াজীর সাথে টেলিফোনে প্রথম যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফোন তুলতেই দেখা গেল, সেটি মৃত। মীরপুর থেকে নিয়াজীর সাথে যোগাযোগ করা গেল না, তাই বাধ্য হয়ে আরো এগুতে হলো! মীরপুর সড়কে মোহাম্মদপুর রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে জামশেদের সি. এ. এফ সদর দপ্তর। জামশেদের সদর দপ্তরে এসেও জেনারেল নাগরা নিয়াজীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হলেন। দপ্তরে দশ-বারটি ফোন অথচ প্রত্যেকটিই অচল। এ দেখে আমাদের মনে প্রশ্ন এলো—ব্যাপার কি ? সব ফোনই মৃত কেন ? তবে কি ওদের কোন দুরভিসন্ধি আছে ? আমরা চারজন পাশের ঘরে গেলাম। নাগরা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার ? নিয়াজীর সংগে কথা না বলে আমাদের এতদূরে আসাটা কি ঠিক হলো ? ওদের কি বিশ্বাস করা যায় ?' আমি বললাম, 'দেখুন, আমি প্রায় তিন বছর পাক-সেনা বাহিনীতে কাজ করেছি। এই যুদ্ধকালীন সময়টাতেও ওদের দেখেছি। আমি ওদেরকে শয়তানের সমান বিশ্বাসও করতে পারিনা।' আমার কথা শুনে নাগরা দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন, আমাদের জন্য তো তেমন চিন্তা করছিনা। চিন্তা আপনাকে নিয়ে। ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের যদি হত্যা করে, তাহলে আমাদের দলের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। ঢাকা দখল বিলম্বিত হবে।' আমি নাগরার সাথে একমত হতে পারলামনা। বললাম, 'আমাদের হত্যা করলে আর কিছু না হোক, ঢাকা দখল কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে যাবে। আর এখন ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও নেই। তাই চলুন বাঘের ঘরে গিয়েই দেখি।' জামশেদকে নিয়ে চারজনে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

যৌথবাহিনীর জেনারেল ফ্ল্যাগ উড়িয়ে মার্সিডিস বেন্জ সকাল দশটা পাঁচ মিনিটে নিয়াজী ১৪তম ডিভিশন সদর দপ্তরের সামনে এসে দাঁড়ালো। জামশেদ আমাদের নিয়াজীর দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল, আমরা চারজনই দাঁড়িয়ে।

নিয়াজীর এ. ডি. সি. এক ক্যাপ্টেন এসে বললো, 'জেনারেল এখনই আসছেন। আপনারা বসুন।' বসতে যেয়ে একটু অসুবিধা হলো। নিয়াজীর টেবিলের সামনে একই রকম তিনটি চেয়ার। আর দুটি ঘরের দুই কোণে, লোক চারজন। তিন চেয়ারে বসি কি করে? আমি ঘরের কোণ থেকে একটি চেয়ার আনতে পা বাড়িয়েছি অমনি ব্রিগেডিয়ার ক্লের দৌড়ে এলেন। বলতে গেলে হাল্কা চেয়ারখানা দুইজনে ধরাধরি করে তিনটির পাশে এসে বসালাম। এরপর আগের মত পাশাপাশি বসলাম।

সকাল দশটা দশ মিনিট। নিয়াজী তার অফিস ঘরে এলো। অফিসে ঢুকে তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বিজয়ী সেনাপতিদের সামরিক অভিবাদন জানালো। নিয়াজীর অফিসকক্ষে প্রবেশের সাথে সাথে সৌজন্যমূলকভাবে সবাই উঠে দাঁড়ালাম।

আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের আলোচনা

নিয়াজীর অভিবাদন শেষে সবাই আবার বসলাম। আত্মসমর্পণ করার জন্য নিয়াজীকে নাগরা প্রথমেই ধন্যবাদ দিলেন এবং তাকে বুদ্ধিমান সেনানায়ক হিসাবে অভিহিত করে ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপর নিয়াজীর ছেলেমেয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মেজর জেনারেল নাগরা ও লেঃ জেনারেল নিয়াজী ব্রিটিশ আর্মিতে একসাথে কমিশন পাওয়ার পর একই একাডেমীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পাকিস্তান আর্মিতে থাকায় নিয়াজী লেঃ জেনারেল হয়েছে। নাগরা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে থাকায় এখনও মেজর জেনারেল। ধন্যবাদ ও পারিবারিক কথা শেষ করে নাগরা নিয়াজীকে তার সাথীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রথম ব্রিগেডিয়ার সান সিং বাবাজী, তারপর ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লের এবং সবশেষে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার। আমার পরিচয় দিতে গিয়ে মেজর জেনারেল নাগরা বললেন,

—ইনিই এখন মুক্তিবাহিনীর একমাত্র প্রতিনিধি। ইনিই তোমার পরম বন্ধু, সেই বিখ্যাত কাদের সিদ্দিকী।

কাদের সিদ্দিকী নামটা শুনে নিয়াজী আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার সামরিক অভিবাদন করলো এবং হাত এগিয়ে দিল। নিয়াজী উঠার সাথে সাথে আমরাও সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নিয়াজী হাত বাড়িয়ে দিলেও আমার দিক থেকে কোন সাড়া ছিল না। মুহূর্তে আমার কপাল এবং হাতে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো। প্রায় আধমিনিট নিয়াজী হাত এগিয়ে দিয়ে রেখেছে অথচ আমি হাত মিলাচ্ছি না; এটা দেখে বিচক্ষণ নাগরার ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হলোনা। তিনি আমাকে বললেন,

—আপনি কি করছেন? হাত মিলান। আপনার সামনে পরাজিত সেনাপতি। পরাজিতের সাথে হাত না মিলানো বীরত্বের অবমাননা।

এর পরও হাত এগিয়ে দিতে দশ-পনের সেকেন্ড লেগে গেল। আমার মনে হচ্ছিল, এই ঘৃণ্য লক্ষ লক্ষ বাঙালীর হত্যাকারী পাপিষ্ঠের সাথে হাত মেলাবো কোন অধিকারে? একদিন আগেও যে হাত আমাকে সুযোগ পেলেই হত্যা করতো—যে হাত আমার স্ব-জাতির রক্তে রাঙানো—ধর্ষিতা মা-বোনের ইজ্জতের আবরুকে ছিন্নভিন্ন করার কলঙ্কের দায় থেকে যে হাত মুক্ত নয় নরপশু ঘাতকের সেই হাতে হাত মিলানোর অধিকার কে আমায় দিয়েছে। নয় মাসের যুদ্ধে ব্যাপক জয়লাভ

করেও আমি ১৬ই ডিসেম্বর সকাল দশটা এগারো কি বারো মিনিটে চরম পরাজিত হলাম। অথবা তখনই হলো সত্যিকার বাঙালী জাতির চরম ও পরম বিজয়। নাগরার আহ্বানে আমার দ্বিধায় তন্ময়তা কাটল। আমি আমার ঘামে ভেজা হাত বাড়িয়ে দিলাম। মানুষ যে মুহূর্তে অতো ঘামতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

নিয়াজীর সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হলো। স্থির হলো, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেঃ জেনারেল অরোরা স্বয়ং উপস্থিত হবেন। বিকাল সাড়ে চারটায় অরোরা ঢাকা আসবেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ পর্ব সম্পন্ন হবে। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তাবে নিয়াজী প্রথম আপত্তি তুললো, কিন্তু তার আপত্তি শোনা হলো না। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানেই আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কারণ ওখান থেকেই বঙ্গবন্ধু বাঙালীর উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। নিয়াজীর রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। পরাজিতকে বিজয়ীদের শর্ত মানতেই হয়। নিয়াজীকেও মানতে হলো। নিয়াজীর দপ্তর থেকেই যৌথবাহিনীর হাই-কমান্ডের কাছে সব খবর পাঠানো হলো।

নরপশু হানাদাররা আত্মসমর্পণ করেছে, এই খবর যেন কি করে সারা ঢাকায় বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়লো। রেডিও টি. ভি. সব বন্ধ। তবুও খবর জানতে ঢাকার অধিবাসীদের দেরী হলোনা। যদিও সেই সময় ঢাকা শহরে লোকজন খুব একটা ছিল না। ঢাকার বাসিন্দারা পাঁচ-ছয় দিন আগে থেকেই রক্তক্ষয়ী তুমুল যুদ্ধের আশংকায় যে যেদিকে পারছিলেন, ঢাকার বাইরে চলে যাচ্ছিলেন। ঢাকার

ঢাকা আমাদের কব্জায়

শতকরা আশি ভাগ লোকই তখন শহরের বাইরে। যে কুড়ি ভাগ ছিলেন, তারাই স্বাধীনতার আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ঢাকা মাতিয়ে তুললেন। অবরুদ্ধ নগরীর ভীত ও বিষন্ন নীরব কান্নার পরিবেশ বদলে গিয়ে মুক্তির উল্লাসদৃপ্ত ঝলমল হাসিতে ভরে উঠলো। অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা ঢেলে প্রত্যয় ভরে সগর্বে দিক-বিদিক কাঁপিয়ে ঢাকাবাসী বার বার বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করছেন, অখণ্ড ও সুসংহত জাতীয় অনুভূতি "জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।"

নিয়াজীর সাথে কথা শেষে আমার দলের সাথে মিলিত হতে মীরপুর ফিরে যাওয়া স্থির করলাম। ব্রিগেডিয়ার বাবাজীকে একটি গাড়ী চেয়ে দিতে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, 'তোমার জন্য আমার গাড়ী চেয়ে দিতে হবেনা। তুমি বললেই ঢের হবে।' বাবাজীকে আর কিছু না বলে নিয়াজীর অফিসের সামনে চকচকে ঝকমকে গাড়ীর সারিতে জেনারেল ফ্ল্যাগ লাগানো একটি টয়োটা জীপকে ইশারা করতেই, জীপ চালক সারি থেকে গাড়ী বের করে নিয়ে এলো। জেনারেল ফ্ল্যাগ খুলে তাতে উঠলাম। গাড়ী এগিয়ে চলল, কিন্তু একি! আধমাইলও এগোইনি, চালক আর গাড়ী চালাতে পারছেনা। গাড়ী রাস্তার এদিক-ওদিক যাচ্ছে। হানাদার ড্রাইভারের হাত কাঁপছে। আজ তাদের হাত কাঁপবারই কথা। অথচ একদিন আগেও এই সমস্ত হাত নিরীহ বাঙালীদের নির্মম ও নির্বিচারে হত্যা করতে মোটেই কাঁপতোনা। আজ পরাজিত হয়ে বড় সুবোধ হয়েছে। তবে এটা

ঠিক, সত্যিই আমাকে নিয়ে ড্রাইভার ভয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছিল। ভনিতা নয়, সত্যিকার অর্থেই সে কাঁপছিল। এটা লক্ষ্য করে ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বললাম। আমি ড্রাইভিং সিটে বসে ড্রাইভারকে পাশে বসতে বললাম। পাকিস্তানী পাঞ্জাবী ড্রাইভার কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'স্যার, আপনি যান। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকছি।' এরপর আমি একাই গাড়ী নিয়ে চললাম। শেরে বাংলা নগরের মাঝ দিয়ে মীরপুরের রাস্তায় পড়ার একটু আগে যৌথবাহিনীর কয়েকটি গাড়ী দেখলাম। তাঁরা বাসে ট্রাকে গাদাগাদি হয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে এগুচ্ছে।

মীরপুরের কাছে এসে থমকে গেলাম। মীরপুর বিউটি সিনেমা হল থেকে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, এই রাস্তার মাঝে প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছে। যৌথবাহিনীর সৈন্যরা দুইভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে। মীরপুর বেতার কেন্দ্রের সামনে গাড়ী থেকে নামলাম। মিত্রবাহিনীর একজন মেজর দৌড়ে এসে জানালেন, 'মীরপুর কলোনীর দিক থেকে গুলি আসছে। আমাদের দু-তিনজন আহত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীও কলোনীর উপর গুলি ছুঁড়ছে। আমাদের এক অংশ পুলের ওপরে আটকে গেছে। আমাদের গুলি ছোঁড়ার কোন নির্দেশ নেই। এখন কি করি?'

—আপনি অপেক্ষা করুন। মুক্তিবাহিনী যদি থেকে থাকে, অল্পক্ষণের মধ্যে রাস্তা বাধা মুক্ত করা যাবে।

গাড়ী রেখে পায়ে হেঁটে কিছুদূর এগুলাম। প্রচণ্ড গুলি আসছে, বেশীদূর এগুনো গেল না। বাধ্য হয়ে মিত্রবাহিনীর সাথের এক মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের পিছন দিয়ে বিউটি সিনেমা হলেরদিকে এগুতে লাগলাম। সামান্য এগুতেই কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখলাম। চিৎকার করে অনেক ডাকাডাকির পর একজন মুক্তিযোদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলাম। সে দৌড়ে এসে আমাকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরে বললো,

—স্যার, আপনি এখানে? আমরা আইজই ঢাকা দখল কইরা ফেলুম।'

মুক্তিযোদ্ধাটিকে আরো জোরে চেপে ধরে তার চাইতেও আনন্দ, উৎসাহ, উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে বললাম,

—তোমরা তো ঢাকা দখল কইরাই ফেলাইছ।

আমার কথা শুনে সে আকাশ থেকে পড়ল। অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল,

—এঁ্যা, আমরা মীরপুর আইতে আইতেই ঢাকা দখল হইয়া গেল। স্যার কনতো, কারা কারা দখল করল?

তার পিঠ চাপড়ে বললাম,

—বলছি তো, তোমরাই দখল করেছ। এখন তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তোমার কমাণ্ডারকে ডেকে আন। মুক্তিযোদ্ধাটি রাস্তার পাশ দিয়ে এক দৌড়ে তার কমাণ্ডারের কাছে ছুটে গেল। দু'তিন মিনিট পর ক্যাপ্টেন সবুর এসে হাজির। আমাকে দেখে সেও যারপর নাই বিস্মিত হলো। গোলাগুলি হচ্ছে কেন, জিজ্ঞেস করতেই সবুর উত্তেজিতভাবে বলল,

—স্যার, মীরপুর কলোনী থেইক্যা শালারা আমাগোর উপর গুলি চালাইছে। আমরাও ওগোর উলুর বাসা ভাইংগ্যা দিছি।

—ওরা সারেন্ডার করেছে। ওদের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো ঠিক হবেনা।

—সারেন্ডার করছে? তাইলে ওরা যে আমাগোর উপর গুলি চালাইল।

—ওরা যদি চালায় তাহলে তোমরা অবশ্যই দু'একটা চালাতে পারো। তবে ওদের উপর যত কম গুলি চালানো যায় ততই ভাল।

ইতিমধ্যেই মুক্তিবাহিনী গুলি আসা স্থানগুলো দখল করে নিয়েছে। সবুরকে আর গুলি না চালিয়ে শেরে বাংলা নগর পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতে বললে। আমি আবার টাংগাইলের দিকে গাড়ী ছুটালাম।

আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ

মীরপুর থেকে চার-পাঁচ সহযোদ্ধা নিয়ে টাংগাইলের দিকে আমার জীপ যখন ঝড়ের বেগে নবীনগর কালিয়াকৈর রাস্তার মোড়ে এলো তখন দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা একদল যৌথবাহিনী গাড়ী থামানোর সংকেত দিল। গাড়ী থামালে আগ্রহভরে কাছে এসে ঢাকার খবর জানতে চাইল। কারণ তারা তখনও ঢাকার সর্বশেষ খবরের কিছুই জানেননা। আমি অত্যন্ত উল্লাসে তাদেরকে ঢাকা দখলের খবর জানালাম। আবার গাড়ী ছুটাবো, এমন সময় ফুলপ্যান্ট পরা হাফহাতা সার্ট গায়ে পূর্ণবয়সী সুদর্শন একজন লোক কাগজ কলম হাতে দৌড়ে এলেন। কোন ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলেন,

—আপনি কি ঢাকা থেকে ফিরছেন ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা বলুনতো, এখন আপনার কেমন লাগছে ?

—আপনার বাড়ী ডাকাতরা দখল করে নিলে, পরে ডাকাতদের যদি আপনি বন্দীও বিতাড়িত করতে পারতেন, আপনার যেমন লাগতো বা লাগবে, আমার তেমন লাগছে।

—আচ্ছা আপনার কি খুব আনন্দ হচ্ছে ? কেমন আনন্দ হচ্ছে ?

—আমার খুব ভাল লাগছে তবে ভাষা দিয়ে আমার অনুভূতি বোঝাতে পারবোনা।

—আচ্ছা আপনার নামটা বলবেন কি ?

—আমার নাম কাদের সিদ্দিকী।

—ওহ্, আপনিই কাদের সিদ্দিকী ? পরে দয়া করে আমাকে একটু সময় দেবেন তো ? আমি আপনার সাথে দেখা করব।

—নিশ্চয়ই যখন খুশী আপনি আসবেন। আমরা সাদরে আপনাকে গ্রহণ করবো। আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আমায় ছেড়ে দিন।

আবার টাংগাইলের দিকে জীপ ছুটালাম। মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজে (বর্তমানে টাংগাইল ক্যাডেট কলেজ) এসে দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে সাথে সাথে ঢাকায় রওনা করিয়ে দিলাম। বেতারে টাংগাইলের সাথে যোগাযোগ হলো। গণপরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী, বাসেত সিদ্দিকী ও বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদকে ঢাকা দখলের খবর জানালাম।

বিকাল তিনটায় ছ'সাতটি জীপসহ টাংগাইল ক-৯ টয়োটা কারে আবার ঢাকা রওনা হলাম। চারটা দশ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। ঢাকা বিমান বন্দরে মেজর জেনারেল নাগরা ব্রিগেডিয়ার সান সিং বাবাজী ব্রিগেডিয়ার ক্লের ও মিত্রবাহিনীর আরও দু'তিন জন মেজর জেনারেলের সাথে পরিচয় ও কথাবার্তা হলো। এর আগে বিমানবন্দরের প্রবেশ পথে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন আমার গতিরোধ করেছিলেন। বিমান বন্দরে তাদের কমাণ্ডার অবতরণ

করবেন সেই হেতু অননুমোদিত কাউকে তিনি বিমান বন্দরে ঢুকতে দিতে রাজী নন। চ্যালেঞ্জের জবাবে ক্যাপ্টিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,

—আপনি কোন ব্রিগেডের? আপনার ব্রিগেড কমান্ডারকে মেহেরবানী করে আমার নাম বলুন। ক্যাপ্টিন নাম জানে, ছুটে গিয়ে নাম জানানোর সাথে সাথে তাঁর ব্রিগেড কমান্ডার তাঁকে বলেছিলেন,

—'তুমি করেছ কি? উনাদের সবাইকে আসতে দাও।' ব্রিগেডিয়ারের এই আদেশের পর ক্যাপ্টিন ভদ্রলোক শুধু একবার আমার কাছাকাছি এসে বিমান বন্দরে ঢুকার অনুমতি দিয়েই সরে গিয়েছিলেন।

বিজয়ী সেনাপতি জগজিদ সিং অরোরার জন্য পরাজিত বাহিনীর লেঃ জেনারেল নিয়াজী, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল জামশেদ, এবং বিজয়ী বাহিনীর মেজর জেনারেল স্বগত সিং, মেজর জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সান সিং, ব্রিগেডিয়ার ক্লের, মেজর হায়দার, ফ্লাইট লেঃ ইউসুফ (কর্নেল তাহেরের বড় ভাই) সহ অন্যান্যদের খুব বেশী অপেক্ষা করতে হলোনা। বিকাল চারটা চল্লিশ মিনিটে পঁচিশ-ছাব্বিশটি ভারতীয় চৈতক হেলিকপ্টার একটার পর একটা ঢাকার তেজগাঁ ঐতিহাসিক বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। পরাজিত সেনাপতি নিয়াজী যৌথবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় বিজয়ী প্রধান সেনাপতি অরোরাকে প্রথম স্বাগত জানাল। এর পর বিজয়ী বাহিনীর মেজর জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সান সিং, ব্রিগেডিয়ার ক্লের এবং আমি জেনারেল অরোরাকে স্বাগত জানালাম। লেঃ জেনারেল অরোরার সাথে কোলকাতা থেকে প্রায় ষাট-সত্তর জন দেশী-বিদেশী সাংবাদিক এসেছেন। এ ছাড়া ভারতীয় কারগো বিমানে ইতিপূর্বেই আরও কিছু বিদেশী সাংবাদিক ঢাকায় এসে হাজির হয়েছিলেন। জেনারেল অরোরা হেলিকপ্টার থেকে নামার পর ঢাকা বিমান বন্দরে জনতার ঢল নামলো। ভিড় উপচে পড়লো। তিল পরিমাণ জায়গা নেই। সর্বত্র মানুষ আর মানুষ। বিমান বন্দর নয়, এ যেন এক জন সমুদ্র, সবাই আনন্দে উচ্ছ্বাসে বিহ্বল, উল্লাসে আত্মহারা। অরোরার সাথে অনেকের মধ্যে তার স্ত্রী এবং বাংলাদেশ বাহিনীর উপপ্রধান এয়ার কমোডর এ. কে. খোন্দকার এসেছেন। ঢাকা বিমান বন্দরে আমাকে দেখে জেনারেল অরোরা বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ে বললেন,

—তুমিও এসে গেছ! আমার ধারণা তা হলে সত্য হলো। অরোরার স্ত্রী আমাকে দেখে ছুটে এসে জাপটে ধরে মহিলা সুলভ উচ্ছ্বসিত সুরে বললেন,

—আমি জানতাম, তুমি আসবে! এখন আমার কাজ, সেই ওয়াদা পূরণ করা। 'আমি এ যাত্রায়ই তোমার জন্য ভাল সুন্দরী পাত্রী দেখে যাবো।'

তেজগাঁ বিমান বন্দরে তখন উচ্ছ্বসিত-উদ্বেলিত জনতার চাপাচাপি, ঠেলাঠেলিতে টেকা মুস্কিল। ফটোগ্রাফার ও সাংবাদিকরা যার যার কাজে ব্যস্ত। ফটোগ্রাফাররা ঠেলাঠেলিতে সবার উপরে, কনুই মেরে ফটো তোলার প্রয়োজনীয় অপেক্ষাকৃত ভাল জায়গা করে নিচ্ছেন, কেউ কেউ এমনকি কারো ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়েও ফটো তোলার চেষ্টায় দ্বিধা বা কোন কুণ্ঠা বোধ করছেননা। টি. ভি. ও চলচ্চিত্র ফটোগ্রাফাররা ভারী ভারী মুভি ক্যামেরা নিয়ে সময় সময় ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কির

চোটে টাল সামলাতে না পেরে উল্টে-পাল্টে পড়লেও, তাদের উৎসাহের ভাটা নেই। সাংবাদিকরা কাগজ কলম নিয়ে ভিড়ের চাপে টাল-মাটাল। বারে বারে হুমড়ি খেয়েও সেনা-নায়কদের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছেন। যারা শত চেষ্টা করেও কাছে যেতে পারছেননা, তারা দূরে থেকেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন এবং জবাব কোন প্রকারে কাগজে আঁকিঝুঁকি দিয়ে টুকে নিচ্ছেন। প্রায় পনের মিনিট প্রচণ্ড দমবন্ধ করা ভিড়ের মধ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টায় কোনরকমে হেঁটে যাওয়ার মত রাস্তা করে পরাজিত সেনাপতি নিয়াজীকে নিয়ে অরোরা বিমান বন্দরের বাইরে এলেন। নিয়াজীর গাড়ীতেই অরোরা উঠলেন। গাড়ীর পিছনের নিয়াজী ও অরোরা, সামনের সিটে অরোরার স্ত্রী। অরোরার গাড়ীকে অনুসরণ করে টাংগাইল ক-৯ গাড়ীটি। মূল সড়কে বাঁধ ভাঙা বন্যার মত জনতার প্লাবন জেগেছে। জনস্রোতের প্রবল চাপে সব কটি গাড়ী প্রথমে মন্থর পরে প্রায় থেমে যাওয়ার উপক্রম হলো। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতন জনগণ সেনানায়কদের এক নজর দেখতে গাড়ীর উপর ভেঙে পড়ছেন। এমন সময় কিছু বুঝার আগেই আমার গাড়ীর সামনের দরোজা খুলে অকস্মাৎ এক অপরিচিত ভদ্রলোক গাড়ীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লোকটিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে পিছনের সিটের দুইজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে জাপটে ধরল। লোকটি গাড়ীর মধ্যে হুড়মুড়িয়ে পড়ে টাল সামলাতে সামলাতে ইংরেজী, হিন্দি এবং অঙ্গভঙ্গি করে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, তিনি কোন খারাপ লোক নন, তিনি একজন সাংবাদিক এবং পশ্চিম জার্মানী থেকে এসেছেন। তাঁকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত নিয়ে গেলে তাঁর পরম উপকার হবে। রাস্তার ভিড় সরানো গেছে এবং গাড়ীগুলো আবার চলতে শুরু করেছে। আমি নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলাম। গাড়ী চালানো অবস্থাতেই সাংবাদিক ভদ্রলোক আমার আট-দশটি ছবি তুলে নিলেন। বিমান বন্দরের সামনের মূল রাস্তায় পরার পর আর কোথাও লোকের ভিড়ে গাড়ীর গতি পুরোপুরি থেমে যায়নি। যদিও বিমান বন্দর থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে অগণিত মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা যেই নিয়াজীর মার্কামারা গাড়ীটি ও গাড়ীর ভিতর নিয়াজীকে দেখছেন, অমনি মনের ঝাল মিটিয়ে অবোধ্য ও অশ্রাব্য গালি ছুঁড়ে মারছেন এবং চিৎকার করে বলছেন,

—নিয়াজীকে আমাদের হাতে দাও। ও খুনী। ও আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক মেরেছে, আমরা ওর বিচার করব। অরোরা ও নিয়াজীকে বহনকরা গাড়ীর আগে পিছে প্রায় শতাধিক জীপ ও কার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সীমানায় মুক্তির আনন্দ সংগীত গেয়ে মিলিত হওয়া লক্ষ লক্ষ জনতার প্রবল চাপে শেষবারের মত থেমে গেল। এই সময় ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত জনতা একবার নিয়াজীকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। অনেক কষ্ট করে জনতার রোষানল থেকে নিয়াজীকে রক্ষা করা হলো।

বিকেল পাঁচটা পাঁচ মিনিটে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুনিয়ার জঘন্যতম কলঙ্কিত নরঘাতক বাহিনীর দলপতি নিয়াজী বিষন্ন পাংশু মুখে কাঁপা হাতে আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষর করল। স্বাক্ষর কালে তাদের নিদারুণ পরাজয় ও নিঃশেষিত দম্ভের সাথে মিল রেখে কলমের কালিও সরছিল না, তাই তাকে অন্য একটি কলম দেয়া হলো। এই প্রথম তারা পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ হিসাবে স্বীকার করে

নিল। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন এয়ার কমান্ডার এ. কে. খোন্দকার, বেসরকারীভাবে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করলাম আমি। উপস্থিত ছিলেন মেজর হায়দার, ফ্লাইট লেঃ ইউসুফ।

নিয়াজীর আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষর দান শেষ হতেই এক'শ জন দখলদার অফিসার ও এক'শ জন জোয়ান আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসাবে তাদের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখল।

আমার নেতৃত্বে ছ'হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও নাগরার দুই ব্রিগেড তখন কেবল ঢাকায় প্রবেশ করেছে। নারায়ণগঞ্জ দিয়ে এক ব্রিগেড মিত্রবাহিনী পুরানো ঢাকায় সবেমাত্র এসে হাজির হয়েছিলেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্ব পড়ল মেজর জেনারেল নাগরার দুইটি ব্রিগেড ও আমার উপর। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের সময় মেজর জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সান সিং, ব্রিগেডিয়ার ক্লের ও আমি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে খুবই উৎকণ্ঠায় ছিলাম। লক্ষ লক্ষ লোকের বিশৃঙ্খলার মাঝে যে কোন মুহূর্তে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় আমরা এক মুহূর্তও স্বস্তি বোধ করছিলাম না। বিশেষ করে আমার মনে দারুণ অবিশ্বাসের ঝড় বইছিল। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ছবি তুলতে দাঁড়ানো হয়ে উঠলোনা। এমনিতেই ঢাকাতে দখলদারদের সংখ্যা পূর্ব অনুমানের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। যৌথবাহিনীর অনুমান ছিল, ঢাকায় বড়জোর পঁচিশ-ত্রিশ হাজার হানাদার থাকতে পারে। কিন্তু ঢাকা পতনের পর দেখা গেল, ঢাকায় হানাদারদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চান্ন হাজার। অন্যদিকে সর্বসাকুল্যে কুড়ি হাজারের বেশী যৌথবাহিনী তখনও ঢাকায় ঢুকতে পারেননি। এমন চরম অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। এ ভাবনাতে আমরা চারজন খুবই চিন্তিত ছিলাম।

আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ পর্ব শেষে অরোরা সোজা ১৪তম ডিভিশনের হেড-কোয়ার্টারে চললেন। আমিও তার সাথে গেলাম। লেঃ জেনারেল অরোরা, মেজর জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সান সিং ও ব্রিগেডিয়ার ক্লেরের সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দেশ স্বাধীন হয়েছে। হানাদাররা আত্মসমর্পণ করেছে। সর্বত্র আনন্দের প্লাবন বইতে শুরু করেছে। উপচে পড়া উচ্ছ্বলতার মাঝেও আমার বুকটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছিল। বুকের গভীর থেকে হু হু করে উঠে আসা শূন্যতা বোধ চেপে রাখতে পারছিলাম না, চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে আসছিল। মা, ভাই-বোনরা সেই আগস্ট মাস থেকে বিচ্ছিন্ন। মাকে দেখতে মনটা খুব ব্যাকুল হয়ে উঠছে। সব কিছু ছাপিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কথা বার বার মনে পড়ছে। উৎসব মুখরিত জনারণ্যেও নিজেকে ভীষণ একা, বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতির বেদনা বুকটা দুমড়ে মুষড়ে ভেঙে দিচ্ছিল।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মীণীর সাথে দেখা করতে বহু

দুর্ঘটনা

ইতিহাসের নীরব সাক্ষী ধানমণ্ডীর ৩২ নং রোডের বাড়ীর গেটে এলাম। কিন্তু গেট তালাবন্ধ। কেউ নেই। সবকিছু নীরব, নিঝুম। শীতের অবসন্ন গোধূলী সন্ধ্যায় নির্জনতা যেন আরো বিষণ্ণ দুর্বিসহ

হয়ে উঠল। আমার কিছুই ভাল লাগছিল না। একটা যন্ত্রণাকর অস্থিরতা নিয়ে গেটের সামনে ছটফট করছিলাম। দু'এক মিনিট গেটের সামনে হাঁটাহাঁটি করতেই একজন বৃদ্ধ এসে জিজ্ঞেস করলেন,

—আপনারা কি চান?

—আমরা বঙ্গবন্ধুর পরিবারের লোকজনদের সাথে দেখা করতে চাই।

—তারা তো এখানে থাকেন না।

—কোথায় থাকেন?

—তা তো জানিনা, বাবা।

কথোপকথনের সময় সাদা রঙের একটি ডাটশান গাড়ী এসে থামল। গাড়ী থেকে দু'জন লাফিয়ে পড়ে বললেন,

—আপনারা এখানে কেন এসেছেন? বঙ্গবন্ধুর পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা করবেন? উনারা এখন ১৯নং রোডে থাকেন। চলুন আমাদের সাথে। আমরা রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

এরা কারা? শত্রু না মিত্র? ঢাকা তখনও যৌথবাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ওদের সাথে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? এদের কোন কুমতলব কোন খারাপ অভিসন্ধি নেই তো?

এত কিছুর ভাববার মত তখন আমার মনের অবস্থা ছিল না। বঙ্গবন্ধুর জন্য আমার মন তখন খুব চঞ্চল ও উতলা। বঙ্গবন্ধুর পরিবার পরিজনদের দেখা গেলেও দুঃসহ শূন্যতা ও অবসাদগ্রস্ত বিষণ্ণতা থেকে অনেকটা মুক্তি পাবো। এমন উদগ্র আশা ও বিশ্বাস নিয়ে সাত পাঁচ না ভেবে তাদের কথাতেই রাজী হয়ে গেলাম। সাদা ডাটশান আগে আগে চলল। পিছনে ষাট-সত্তর জন মুক্তিযোদ্ধা বোঝাই একটি কার ও ছ'টি জীপ। নিজে কার চালিয়ে ডাটশানের পিছু নিলাম। আমার পিছনে ছটি জীপ। গাড়ীগুলো ১৯নং রোডের মোড় ঘুরতেই, বঙ্গবন্ধুর পরিবার পরিজন যে বাড়ীতে বন্দী, সেই বাড়ীর ছাদ থেকে আচমকা সামনের সাদা ডাটশান ও আমাদের গাড়ীর সারির উপর মুষলধারে মেশিনগানের গুলি আসতে লাগল। পথ দেখিয়ে নেয়া ভদ্রলোকদের গাড়ীটি গেটের সামনে পেঁছে গিয়েছিল। হানাদারদের গুলিতে গাড়ীর আরোহী তিনজনই ঘটনাস্থলে মারা যায়। আমার গাড়ী দেওয়ালের সামান্য আড়ালে ছিল। তা সত্ত্বেও হানাদারদের ছোঁড়া অসংখ্য গুলির একটি গাড়ীর ইঞ্জিনে, অন্যটি মাথার দুই-তিন ইঞ্চি উপর গাড়ীর দরজা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আমরা ঝড়ের বেগে গাড়ী থেকে বাইরে ঝাঁপিয়ে পরে দেয়ালের আড়ালে নিরাপদ অবস্থান নিলাম। কিন্তু গাড়ীগুলো পিছিয়ে নেয়া যাচ্ছিলনা। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে পিছন থেকে একটি একটি করে গাড়ী ঠেলে পিছনে সরিয়ে নেয়া হলো। কিন্তু আমার গাড়ীর কাছে যাওয়া গেল না। গাড়ী ওখানে রেখেই পিছিয়ে এলাম। একবুক আশা নিয়ে বেগম মুজিবকে দেখতে গেলেও পরিস্থিতির নিদারুণ প্রতিকূলতার কারণে দেখা হলোনা।

১৯নং রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াতেই মিত্রবাহিনীর একজন মেজর এগিয়ে এসে বললেন,

—এমন বেকুব সৈন্য আমরা আর দেখিনি। সেই বিকাল থেকে ওদের কতভাবে বুঝাতে চেষ্টা করছি, তোমাদের সবাই সারেণ্ডার করেছে। তোমরা আত্মসমর্পণ কর। কিন্তু তারা নিয়াজীর সারেণ্ডার মানতে রাজী নয়। ওরা এই ক'জনেই নাকি যুদ্ধ করবে।

১৬ই ডিসেম্বর রাতে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, ১৮ই ডিসেম্বর বিকালে পল্টন ময়দানে এক জনসভা করা হবে। এই সভায় দেশবাসীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হবে। বাংলাদেশ সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত ঢাকায় এসে না পেঁৗছে, ততক্ষণ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে জনগণকে অনুরোধ করা হবে এবং যারা বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, তাদের প্রতিহত করতে হবে। ১৭ই ডিসেম্বর দুপুর থেকে মুক্তিবাহিনীর উদ্যোগে ঢাকার পল্টনে জনসভার প্রচার শুরু হলো। এই জনসভার প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিল সৈয়দ নুরু, ফারুক আহমেদ, দাউদ খান, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, আজিজ বাঙাল, শওকত মোমেন শাজাহান, সোহরাওয়ার্দী এবং মুক্তিবাহিনীর প্রচার বিভাগের আরও বেশ কয়েকজন সদস্য।

শত্রুমুক্ত ঢাকায় প্রথম জনসভা

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ শনিবার দুপুর। গণপরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ, বাসেত সিদ্দিকী, বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদ ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে স্বাধীন বাংলায় ঢাকার পল্টনে প্রথম জনসভা করতে রওনা হলাম। টাংগাইল থেকে মীরপুর, মোহাম্মদপুর হয়ে আমরা প্রথমে ধানমন্ডিতে এলাম। ধানমণ্ডীর ১৯নং রোডের বাড়ীতে বঙ্গমাতা শেখ লুৎফুন্নেসা, বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা, দুই ছেলে জামাল ও রাসেল, বঙ্গবন্ধুর নাতি জয় ও পরিবারের অন্যান্যদের সাথে দেখা হলো। বেগম মুজিব আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ডুকরে ডুকরে বললেন, 'তোমরা বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আন।' আমরা তাঁকে ওয়াদা দিলাম, স্বাধীন বাংলায় বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেনই। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই বঙ্গপিতাকে আটকে রাখতে পারে। কঠিন ওয়াদা দিয়ে বঙ্গপিতার কনিষ্ঠ সন্তান রাসেলকে কোলে তুলে নিলাম। গণপরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী, বাসেত সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ ও মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদ সহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গপিতার পরিবারের সকলের সাথে কথা বলতে গিয়ে গভীর আবেগে অভিভূত হলো। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বার বার আমাকে বললেন, 'ভাই, বাবাকে ফিরিয়ে আনুন। আজ আপনাদের দেখে কত খুশী লাগছে। বাবা উপস্থিত থাকলে আজকের এই খুশী আরো ভাল করে অনুভব করতে পারতাম।' বেরিয়ে আসার আগে বেগম মুজিবকে বললাম, 'একটু পরে পল্টন ময়দানে মুক্তিবাহিনীর উদ্যোগে জনসভা হবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি জামালকে নিয়ে যেতে চাই। ওকে আবার নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে যাবো।' তিনি অনুমতি দিলেন। জামালকে নিয়ে পনের-কুড়িটি গাড়ীতে আমরা পল্টনের দিকে এগুলাম। মুক্তিবাহিনীর গাড়ীর সারি যখন ডানে সচিবালয়, বামে জি. পি. ওর মাঝ দিয়ে পল্টনের দিকে এগোচ্ছিল তখন আমাদের বাম পাশ দিয়ে খুব দ্রুত দুইটি ডাটশান অতিক্রম করে যাচ্ছিল। গাড়ী দুইটি পার হয়ে যাবার সময় আমরা নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেলাম। এতে আমাদের সন্দেহ জাগলো। একেতো উল্কাবেগে ট্রাফিক আইন ভেঙে বাম পাশ দিয়ে গাড়ী দুইটি অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তদুপরি গাড়ীর ভিতর থেকে চিৎকার আসার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা গাড়ী দুইটি আটকে ফেলল। একটি গাড়ীর দুইজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। তের-চৌদ্দ বৎসরের দুইটি মেয়ে ও চারজন যুবক মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ল। মেয়ে দুইটির কাছ থেকে জানা গেল, তাঁদের বাসা মগবাজারের কাছে। তাঁদেরকে জোর করে ধরে আনা হয়েছে। তাঁদের বাবাকেও লুটেরারা হাত-পা-মুখ বেঁধে গাড়ীর পিছনে বনেটের ভিতরে পুরে রেখেছে। মুক্তিযোদ্ধারা দৌড়ে গিয়ে গাড়ীর পিছনের বনেট খুলে সত্যিই একজন পূর্ণবয়স্ক লোককে আধমরা অবস্থায়

বেগম মুজিব সকাশে

বের করে নিয়ে এলো। লোকটি একজন অবাঙালী মোটর মেকানিক। ছয়জন দুষ্কৃতকারী তাকে বাড়ী থেকে তার দুই মেয়েসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে তাঁরই গাড়ীতে পালাচ্ছিল। তাকে হয়তো তাঁরা একটু পরেই খুন করতো এবং মেয়ে দুইটির সম্মান-সম্ভ্রম নষ্ট করতো। মুক্তিযোদ্ধারা এই অন্যায় কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেনা। দুষ্কৃতকারীরা যে ভদ্রলোককে ধরে এনেছে, তিনি অবাঙালী হলেও তার প্রতি ন্যায়বিচার না করে উপায় নেই। হাতে তেমন সময় ছিল না। তাই চারজন দুষ্কৃতকারীকেই পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে পল্টন ময়দানে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলাম।

পল্টনের প্রধান গেট দিয়ে আমাদের গাড়ী প্রবেশ করল। স্টেডিয়ামের গা ঘেঁষে গাড়ী থেকে নামলাম। আনোয়ার উল আলম শহীদ ও আমি পাশাপাশি হেঁটে পল্টনের নির্দিষ্ট মঞ্চে গিয়ে উঠলাম। গণ-পরিষদ সদস্য ও অন্যান্যরাও মঞ্চে উঠে বসলেন। সভায় অসংখ্য লোক হয়েছে, পরদিন ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর কারোর মতে দুই লাখ, কারো মতে তিন লাখ, কোন পত্রিকা আবার জনসমাগমের পরিমাণ দেড় লাখ বলে মন্তব্য করল। পল্টন ময়দান কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল।

স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা ঃ সেই পল্টনে

পল্টনের চার পাশে দোকানঘরগুলোর ছাদে জমায়েত হয়েছে প্রচুর লোক। মাথা নীচু করে সভামঞ্চে বসে আছি। বামে বঙ্গপিতার দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল, ডানে মুক্তিযুদ্ধে আমার দক্ষিণ হস্ত আনোয়ার উল আলম শহীদ ও গণ-পরিষদ সদস্যবৃন্দ। কোরান ও গীতার অংশ বিশেষ পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হলো। সভা পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ। সভায় বক্তব্য রাখলেন তিন গণ-পরিষদ সদস্য, আবদুল বাসেত সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ ও আবদুল লতিফ সিদ্দিকী। এরপর আনোয়ার উল আলম শহীদ তাঁর বক্তব্য শেষ করে আমাকে বক্তব্য পেশ করতে আহবান জানালেন।

স্বাধীন বাংলায় ঢাকার প্রথম জনসভায় গণ-পরিষদ সদস্য বাসেত সিদ্দিকী তাঁর বক্তৃতায় বললেন, দশ লক্ষ প্রাণ ও নব্বই লক্ষ মানুষের গৃহত্যাগের বিনিময়ে আমরা মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু আমার দুঃখ, আজ আমাদের মাঝে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত নেই। আমরা কাদেরিয়া বাহিনী শপথ নিচ্ছি, যতদিন সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করতে না পারবো ততদিন আমরা অস্ত্রত্যাগ করবোনা।

গণ-পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে ঘোষণা করেন, 'সাড়ে সাত কোটি মানুষ শহীদ হবে তবুও বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনবে।'

গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী তাঁর বক্তৃতায় তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'পল্টনেই বাংলাদেশের সকল সংগ্রামের ডাক উঠেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের আহবান সার্থক হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে আপন সমুজ্জ্বল মহিমা নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আন্তরিক সমর্থন, অতুলনীয় সমবেদনা ও সহযোগিতা, ভারতীয় মহান জনগণের মহৎ

আত্মত্যাগ ও রক্তের দামে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন রচনা করলেন যে মিত্রবাহিনী, আমি তাঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।' তিনি শপথ করে বললেন, '২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে মুক্তি না দিলে মুক্তিবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করবে। আমরা অবশ্যই মুক্তিবাহিনীর এই আক্রমণ সর্বতোভাবে সমর্থন করবো।'

আনোয়ার উল আলম শহীদ আমাকে বক্তৃতা করার আহ্বান জানানোর আগে বললেন, 'আমরা বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিলাম। আমরা প্রমাণ করেছি, বাঙালীরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধ থামবেনা। যুদ্ধ চলতেই থাকবে।'

সকলের বক্তৃতার শেষে এলো আমার পালা। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার দেখে নিলাম। তারপর বললাম, 'করুণাময় আল্লাহ্‌তালা আপনাদের সহায় হউন। আমরা দীর্ঘ নয় মাস হানাদারদের সঙ্গে অবিরাম অবিচ্ছিন্ন মরণজয়ী যুদ্ধ করে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নের মণি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এখনও হানাদারদের কারাগারে বন্দী। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত না করা পর্যন্ত স্বাধীনতার পূর্ণস্বাদ আমরা অনুভব করতে পারছিনা। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল আমার পাশেই বসে রয়েছে। মুক্তির আনন্দে যখন বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বেলিত, তখন লক্ষ লক্ষ পিতা, পুত্র ও ভাইবোন হারা মানুষের মত জামালের প্রাণও পিতার অভাবে কাঁদছে। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিটি স্বাধীনতাকামী বাঙালী জামালের মতই পিতার অনুপস্থিতিতে আজ শোকাহত।'

আমার বক্তৃতার শুরুতে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউয়ের দিক থেকে কয়েকটি গুলি এসে মঞ্চের উপরে বাঁশে লেগে প্যাণ্ডেলের কিছু অংশ ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। আমি বক্তৃতার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে কঠোরভাবে বললাম,

'কারা সভাস্থলে গুলি ছুঁড়ছে তা আমরা বুঝি। হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, কারো লুটের রাজত্ব কায়েম করতে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দেয় নাই। আর একটি গুলিও যদি এদিকে আসে এবং সেই গুলিতে কারো সামান্য ক্ষতি হয়, তাহলে যারা গুলি ছুঁড়ছে তাদের আমরা আস্ত রাখবোনা, গুঁড়িয়ে দেব।'

এই হুঁশিয়ারীর পর গুলি থেমে গেল। আবার স্বাভাবিকভাবে সভার কাজ চলতে লাগল। আমি পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললাম,

'আমাদের সংগ্রাম ছিল হানাদারদের কামানের মুখ থেকে লাখো লাখো মা, বোন ও ভাইকে রক্ষা করা। বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করা। সে কাজ শেষ হয়েছে। আমাদের অপর কাজ, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাগার ভেঙে বের করে আনা। ইয়াহিয়ার জেনারেলরা, তোমাদের মনে রাখা উচিত, বাংলার মুক্তিবাহিনী কোন ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ শেখেনি। তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেই তারা যুদ্ধ শিখেছে। তোমরা এখনও আমাদের নেতাকে আটকে রেখেছ। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনককে আটকে রাখার কোন অধিকার তোমাদের নেই। মুক্তিবাহিনীর অধিকার

আছে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে নেতাকে মুক্ত করে আনার। ঘাতকরা মনে রেখো, আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তেজগাঁ বিমান বন্দরে সসম্মানে পৌঁছে দিয়ে না গেলে আমরা পাকিস্তান আক্রমণ করবো এবং বিশ্বের মানচিত্র থেকে পাকিস্তানের নাম-নিশানা মুছে দেব। মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা, পিতাহীন স্বাধীনতা অর্থহীন। জীবন দিয়ে সর্বস্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে এনে স্বাধীনতা অর্থবহ করতে হবে। তোমরা প্রস্তুত হও।'

'ভাইয়েরা বোনেরা, মুক্তিবাহিনী এমন বাংলাদেশ গড়তে চায়, যেখানে ধনী দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ থাকবেনা। আর এই সোনার বাংলা গঠনে যে বাঁধা আসবে তা আমরা সর্ব শক্তি দিয়ে রুখবো। বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার যতক্ষণ না ঢাকায় আসছে ততক্ষণ যা যেভাবে আছে, সেইভাবেই থাকবে। কোন নড়চড় করা চলবেনা। আইন কারো হাতে তুলে নিলে মুক্তিবাহিনী তা বরদাস্ত করবেনা। বন্ধুগণ, আপনারা সাহসের সাথে সব কিছুর মোকাবিলা করুন। আমি বাংলার সাড়ে সাতকোটি মানুষকে সালাম জানাচ্ছি। মুক্তিবাহিনীর হাতে শুধু অস্ত্রই ছিল না, ছিল জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও আশীর্বাদ। বাংলার জনগণ যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বের যে কোনো স্বাধীনতার ইতিহাসে তা এক অনন্য, অতুলনীয় সংযোজন।'

'মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা, কোন বিজাতীয় দখলদার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জয়লাভ করলেই মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায়না, শেষ হয়ে যেতে পারেনা। আমাদের সামনে আরো বড় যুদ্ধ পড়ে রয়েছে। সেখানে আমাদের হাতের এই অস্ত্র কোন কাজ দেবেনা, হানাদার বিতাড়িত দেশগড়ার যুদ্ধে আমাদেরকে দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। আন্তরিকতা, দেশপ্রেম ও নিরলস কর্মশক্তিই হবে আমাদের আগামী দিনের হাতিয়ার। নিষ্ঠা, সততা, ন্যায়পরায়নতা, সুষ্ঠ সংগঠন ও সংগঠিত শ্রম ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারেনা। আমরা যে ওয়াদা দিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম সেই ওয়াদা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে গেলে চলবেনা। ভুখা-নাঙ্গা সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে আমাদের এই রক্তের দামে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মা আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেনা।

পাকিস্তানী জান্তারা তোমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যুদ্ধে আমাদের কাছে তোমরা নিদারুণভাবে পরাজিত হয়েছ। অনতিবিলম্বে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দাও। মনে রেখ, আমরা কথার বর খেলাপ করতে জানিনা। বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখলে পাকিস্তানের নাম-নিশানাও থাকবেনা। আর এও ভেবে দেখ, তোমাদের পঁচানব্বই হাজার নরঘাতক আমাদের হাতে বন্দী। বঙ্গবন্ধুকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখলে আমরা অন্য কিছু বিবেচনা করবো কিনা বলতে পারিনা। পাকিস্তানের শান্তি-প্রিয় জনগণের কাছে আমার আবেদন—মদ্যপ, লম্পট, খুনী ইয়াহিয়াকে আপনারা কাঠগড়ায় দাঁড় করান। বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে লম্পটটাকে বাধ্য করুন। তা না হলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাকী অংশের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। বিশ্বের নেতৃবৃন্দের কাছে আমার আহ্বান আপনারা ইয়াহিয়া ও তার চেলাচামুণ্ডাদের বুঝান, বাধ্য

করুন, বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে। তা না হলে এই উপমহাদেশের তো নয়ই, সারা বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় জনগণকে গভীর শ্রদ্ধা ও সালাম জানাচ্ছি। লড়ায়ে যে সকল ভারতীয় সেনা ও মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আল্লাহ্‌ আহতদের আরোগ্য করুন।

ভাই ও বোনেরা, আপনারা কি শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নকারীদের সহ্য করবেন? আপনারা কি লুটেরাদের প্রশ্রয় দেবেন?

লক্ষ কণ্ঠে জনতা উত্তর দিল, 'না, না।'

আমরা যখন সভায় আসছিলাম, তখন এই চার জন এই দুইটি মেয়ে ও পঞ্চাশ হাজার টাকা লুঠ করে এদের বাবাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। এই দুষ্কৃতকারীরা আমাদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। এই যে, আমার হাতে দুষ্কৃতকারীদের লুঠ করা পঞ্চাশ হাজার টাকা। আপনারাই বলুন, এদের কি করা উচিত? আপনারা এদের কি করতে চান?

জনতা উত্তেজিত হয়ে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল,

'নারী হরনকারী লুটেরাদের আমরা মৃত্যুদণ্ড চাই।'

হাজার হাজার লোক চিৎকার করে বললেন,

'ওদের গুলি করে মারা হউক।'

আপনাদের নির্দেশ মুক্তিবাহিনী অবশ্যই পালন করবে। মুক্তিবাহিনী জনগণেরই আজ্ঞাবহ স্বেচ্ছাবাহিনী। এই চার দুষ্কৃতকারীকে সভাশেষে সভাস্থলে চারটি গুলি ও বেয়নেট বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে। এই চার জনের ভয়ানক শাস্তি দেখে অন্যান্য দুষ্কৃতকারীরা যাতে আর অপকর্ম করতে সাহস না পায়, তারই জন্য এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেয়া হবে।'

দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড

আমি আবার আপনাদের সালাম জানাই, ভারতীয় বাহিনীর যে ১৪ হাজার বীর যোদ্ধা বুকের রক্ত ঢেলেছেন, শহীদ হয়েছেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করছি। প্রতিটি বীর মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক ও জনগণকে আমি সালাম, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা ওয়াদা করছি, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে ফিরিয়ে আনবোই আনবো। আপনারা মুক্তিবাহিনীর সফলতা কামনা করে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করুন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তিকামনা করে আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করুন। আপনারা আমাকে দোয়া করুন, যেন লোভ, লালসা ও বিপদের মুখে মাথা উঁচু করে লড়ে যেতে পারি। আল্লাহ্‌ আপনাদের সহায় হউন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হিন্দ,
ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ, বাংলা-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবি হউক,
জয় যৌথবাহিনী।'

মোনাজাত শেষে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হলো। সভাশেষে স্তম্ভের উত্তরে চার জন

দুষ্কৃতকারীর প্রত্যেককে একটি করে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হলো। দেশ বিদেশের রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের শতাধিক সাংবাদিক পল্টন ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের ক্যামেরা এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরনের ছবি তুললো। সভাশেষে সাংবাদিকরা আমাকে ছেঁকে ধরলেন। তাদের নানা প্রশ্ন, মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে লড়লো? কেন পাকিস্তানীরা হারলো? বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে না দিলে মুক্তিবাহিনী কি ঠিকই পাকিস্তান আক্রমণ করবে? যে চার জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো, তারা কি সত্যিই মৃত্যুদণ্ড পাবার মত অপরাধ করেছিল? এমনি অনেক প্রশ্নের মাঝে ১৮ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসভা শেষ হলো। সভাশেষে অবাঙালী ভদ্রলোকটিকে তার দুই মেয়ে ও পঞ্চাশ হাজার টাকা সহ বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হলো।

সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ঢাকা বেতারের কর্মীরা টেপ-রেকর্ডার নিয়ে দৌড়ে এলেন। তাদের অনুরোধ, 'বেতারে প্রচারের জন্য একটি বাণী দিন' বেতার কর্মীদের প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখান করে বললাম, 'বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় আসার আগে কেউ বেতার ভাষন দিন, তা আমরা আদৌ চাই না।'

বেতার কর্মীদের টেপ-রেকর্ডার সহ ছুটে আসার করাণ হলো, ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্র আমার নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বেতার কেন্দ্রের দায়িত্বে তখন ছিল কর্নেল নাজিবুর রহমান পিন্টু ও নজরুল ইসলাম। কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর বেতার কর্মীদের খুঁজে বের করে ১৯ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তারা ঢাকা বেতার কেন্দ্র চালু করে।

১৯ শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রতিটি জাতীয় সংবাদপত্র ও বিদেশের অসংখ্য সংবাদপত্রে ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর আহুত জনসভার খবর ব্যানার হরফে ছাপা হয়। কোন কোন পত্রিকা আমাকে ব্রিগেডিয়ার, আবার কোন পত্রিকা মেজর জেনারেল হিসাবে আখ্যায়িত করে খবর ছাপেন।

পত্র-পত্রিকার প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ভুয়সী প্রশংসা করে আমার বক্তৃতার মূল অংশ ছাপা হয়। বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত 'দৈনিক পূর্বদেশে' ১৯ শে ডিসেম্বর রবিবারের সংখ্যায় পল্টন জনসভায় বক্তৃতার বিরাট ছবিসহ এই ভাবে খবর ছাপালে "পল্টন ময়দানে মুক্তিবাহিনীর ঐতিহাসিক জনসভা, পাকিস্তানের প্রতি চরম পত্র।" মস্ত বড় বড় লাল হরফে এর নীচে তারা ছাপলেন, "শেখ মুজিবকে মুক্তি দাও।" স্টাফ রিপোর্টারের খবর আমি হুবহু তুলে ধরছি 'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য শপথ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে গতকাল শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত জনসভায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল ও পাবনা এলাকার মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদের সিদ্দিকী পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে চরম হুঁশিয়ারী দিয়ে উপরোক্ত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিয়ে তেজগাঁ বিমান বন্দরে অবতরন করানোর আহ্বান জানিয়েছেন। টাংগাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, পাবনা এলাকার মুক্তিবাহিনীর উদ্যোগে

আয়োজিত উক্ত জনসভায় বক্তৃতাকালে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক জবাব কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আমার সংগ্রাম ছিল কামানের মুখ থেকে বাংলার লাখো লাখো মা, বোন, ভাইকে রক্ষা করা। সেই কাজ শেষ হয়েছে। আমার অপর সংগ্রাম হচ্ছে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে কারাগার থেকে বের করে আনা।' পূর্বদেশ এমনিভাবে তিন গণপরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ, বাসেত সিদ্দিকী ও আনোয়ার উল আলম শহীদের বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে ছবিসহ পুরো প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে খবর ছাপেন।

১৯ শে ডিসেম্বর টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন উৎসাহী সদস্য মীরপুর বেতার কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ দুই কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সচল ট্রান্সমিটার টাংগাইলে নিয়ে আসে। তাদের ইচ্ছে, ঐ ট্রান্সমিটার টাংগাইলে বসানো হবে। তাদের ইচ্ছার রূপ দিয়ে ট্রান্সমিটার বসানোর সবকিছু পাকাপাকি হলেও এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ট্রান্সমিটারটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে সম্মত হলেও ২৪ শে জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু যখন টাংগাইল ঐতিহাসিক অস্ত্রগ্রহণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন, তখন ট্রান্সমিটারে সামান্য গোলযোগ দেখা দেওয়ায় তা বঙ্গবন্ধুর হাতে চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে কয়েক মাস পর ট্রান্সমিটারটি আবার ঢাকায় ফিরিয়ে নেয়া হয়।

১৯ শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের পত্রিকাগুলির মতো বিদেশী পত্রিকাগুলিও মুক্তিবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে খবর ছাপে। বেশী সংখ্যক পশ্চিমি পত্রিকাগুলি মুক্তিবাহিনীর তীব্র সমালোচনা করে বড় বড় হরফে খবর প্রকাশ করে। মধ্য প্রাচ্যের অধিকাংশ পত্রিকাগুলোতে ১৮ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে নারীহরনকারী ও লুটেরাদের মুক্তিবাহিনীর গুলি ও বেয়নেটে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার ছবি প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপে বড় বড় হরফে প্রচার করে যে, 'বাংলাদেশে অবাঙালী মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে।' কোন কোন পত্রিকা এও বলল যে, 'আত্মসমর্পণকারীদের এইভাবে হত্যা করা হচ্ছে।' তারা মুক্তিবাহিনী ও আমাকে পৃথিবীর নির্মম ও জঘন্যতম ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করতেও পিছপা হলো না। বৃটেন, আমেরিকা ও ইউরোপের বহুল প্রচারিত অসংখ্য পত্রিকা একই ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত খবর প্রচার করা হয়। তারা একবারও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে এ সত্যটা তুলে ধরার চেষ্টা করেনি যে, ছাপানো ছবিতে মুক্তিবাহিনী যাদের গুলি করছে, তাদেরকে আদৌ আত্মসমর্পণকারী অথবা অবাঙালী মুসলমান কিংবা বাঙালী রাজাকার বা অন্য কিছুর জন্য শাস্তি দেয়া হয়নি। শাস্তি দেয়া হয়েছে লুটতরাজ ও নারী হরণের প্রমাণিত অপরাধে। এর পর থেকেই সারা পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমার বিরুদ্ধে একটা সুপরিকল্পিত অপপ্রচার চালাতে থাকে। অনেকাংশে এই অপপ্রচারের কল্যাণে মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বীকৃতি আমি সারা পৃথিবীর প্রগতিশীলদের কাছ থেকে পাই। স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল মানুষ ঐ মিথ্যা বিভ্রান্ত না হয়ে বরং প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ থেকে আমার সত্যিকারের চরিত্র ও মানসিকতার খোঁজে বের করতে সক্ষম হন।

এই দিনের আর একটি বিশেষ ঘটনা হলো, ১৯ শে ডিসেম্বর সকালে আমাদের

আকুর টাকুর পাড়ার বিধ্বস্ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাব এমন সময় দুটি কার থেকে মা-ভাইবোনদের নামতে দেখে চমকে উঠলাম। সেই আগস্টের পর মা-ভাই-বোনদের সাথে এই প্রথম দেখা। ঢাকার

মায়ের মনে

১০৩ শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দায় শারাখালার যে বাসায় মা-ভাই-বোনেরা সাময়িকভাবে ছিল, সেখানে ১৬ই ডিসেম্বর রাতে লোক পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু মা ও ভাই-বোনদের নারিন্দার বাসায় পাওয়া যায়নি। ঢাকার শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রচণ্ড যুদ্ধের আশংকায় তারা ৯ই ডিসেম্বর সকাল ৮টায় নারিন্দা থেকে বেরিয়ে পড়েন। নারিন্দা থেকে রিকসায় জিঞ্জিরা, তারপর পায়ে হেঁটে শুকনো বুড়িগঙ্গা পার হয়ে দশ বার মাইল দক্ষিণে গিয়ে একটি লঞ্চে ওঠেন।

আমাদের দলের সদস্য ঢাকার সেলিম ও শাহ আলম আগের থেকেই লঞ্চের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। মার সঙ্গে তখন ছোটমা হেনা সিদ্দিকী, বোন রহিমা, শুশুমা, শাহানা, ছোটভাই মুরাদ, আজাদ, ইদ্রিস মামার মেয়ে পারভীন, ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী, ডাঃ লায়লা চৌধুরী ও তাঁর সাত-আট মাসের ছোট্ট মেয়ে। লঞ্চে আরিচা, তারপর শিবালয়, সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে মানিকগঞ্জের তরার ঘাট। সেখান থেকে আবার নৌকায় তাঁদের নাগরপুর নিয়ে আসা হয়। তাঁরা নাগরপুরের এক চেয়ারম্যানের বাড়ীতে ওঠেন। চেয়ারম্যান পরম যত্নে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ঢাকা থেকে নাগরপুর আসতে তাঁদের আট দিন লেগে গেছে।

১৬ই ডিসেম্বর যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন তাঁরা ঐ চেয়ারম্যানের বাড়ীতে। ১৭ তারিখ সন্ধ্যা থেকে মা টাংগাইল আসার জন্য ছটফট করছিলেন। ১৮ তারিখ সকাল থেকে মাকে আর কেউ আটকে রাখতে পারছিলেন না। নাগরপুর থেকে চারটা ঘোড়ার গাড়ীতে ১৮ তারিখ দুপুরে সবাইকে এলাসিন নিয়ে আসা হয়। এলাসিন ঘাটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমাণ্ডার চারানের ফরিদ মা, ভাই-বোন ও অন্যান্যদের পরম সমাদরে গ্রহণ করল। এলাসিন থেকে সিলিমপুর পর্যন্ত আসতে রাত হয়ে গেল। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাকে সিলিমপুর বাজারের কাছে এক বাড়ীতে থাকতে হয়। কমাণ্ডার ফরিদই মাকে টাংগাইলের খবরাখবর দেয়। যদিও তখন পর্যন্ত আমি মার কোন খবর জানতাম না। ১৯শে ডিসেম্বর ভোরে কর্নেল ফজলুর রহমানের দলের কয়েকজন মার সিলিমপুরে আসার খবর পেয়ে একটা বাসে মা ও ভাইবোনসহ অন্যান্যদের সযত্নে টাংগাইল সার্কিট হাউসে নিয়ে আসে। মা সার্কিট হাউসে একমুহূর্তও অপেক্ষা করতে না চাইলে সেখান থেকে মোটর কারে আমাদের টাংগাইলের আকুর-টাকুর পাড়ায় বিধ্বস্ত বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়। মাকে পেয়ে মুহূর্তে সব পাওয়ার আনন্দে ভরে উঠলাম। মা-ভাই-বোনদের সাথে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দুপুরে এসে একসাথে খাবো বলে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘড়ির কাঁটা যেমন বার বার একই জায়গায় ঘুরে আসে। ইতিহাসের চাকাও তেমনি একই তালে ঘুরে ফিরে পুরানো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যারা আত্মবলি দিয়েছেন, যারা জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছেন তারাও

প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

অনেকেই প্রাপ্য মর্যাদা পাননি। ভারতের অন্যতম প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রামী

নেতাজী সুভাষ বসুর সঠিক মূল্যায়নই বা কতটুকু হয়েছে। পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হককে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের নায়ক বা পাকিস্তান সৃষ্টির দুই তিন বছর যেতে না যেতেই পাকিস্তানের প্রধান দুশমন আখ্যায়িত করেছিল। মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে দেয়া হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের আর এক পুরোধা শামসুল হককে পাকিস্তানের দুশমন বলে আখ্যায়িত করে নানা ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। চল্লিশ বছর বয়সেই কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। একদিকে যেমন স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মহল নিরন্তর ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে, অন্যদিকে তেমনি ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করে জীবনের অবিচ্ছিন্ন ধারার মত ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় প্রগতির চাকা অবিরাম সামনের দিকে এগিয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চূড়ান্ত বাধা-বিপত্তির গহীন খাদ পেরিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে চরম ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে বাঙালী জাতিকে আমরা যারা বেশী সাহায্য করেছি স্বাধীনতার পর প্রথম খড়্গ নেমে এলো সেই আমাদের উপরই। শুধু অবস্থার চাপে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হইনি, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই বাঙালীর মুক্তির সংগ্রামে ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছাত্র রাজনীতি করেছি। স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত এগিয়ে নেয়ার সংগ্রামে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছি। স্বাধীনতার মাত্র দুই দিন পর বাংলাদেশ সরকার সেই আমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে কিছুটা চমক দিতে পারলেও অভিনবত্ব কিছুই দেখাতে পারলেন না। আমার বিরুদ্ধে ওদের অভিযোগ, আমি নাকি আইন হাতে তুলে নিয়েছি। অতীতের অনেক দেশপ্রেমিকের মতোই আমার গায়েও আইনভঙ্গকারীর লেবেল এঁটে দেয়া হলো। অতীতের অনেকের মতই আমিও হলাম কুচক্রী মহলের আর এক নতুন শিকার। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ধারা অব্যাহত রইল।

২০শে ডিসেম্বর ভারতের বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা আমার গ্রেফতারী পরোয়ানার খবর ছাপালো। যদিও বাংলাদেশের কোন পত্রিকা আমার গ্রেফতার সম্পর্কে কোন খবর ছাপেনি। কারণ, গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী সম্পর্কে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার বিশেষ কিছু জানা ছিল না। বাংলাদেশ সরকার তখনও মুজিবনগরে। ভারতীয় পত্রিকাগুলো আমার গ্রেফতারের খবর ছেপে সাথে সাথে এর তীব্র সমালোচনা করল। তারা বাংলাদেশ সরকারের শুভ বুদ্ধি জাগায় ও দেশকে আরো একটা গৃহযুদ্ধে ঠেলে না দেয়ার পরামর্শ দিল।

কোলকাতায় যখন এতো ঘটনা ঘটছে আমি তখন টাংগাইলে। এই ব্যাপারে তখনও বিন্দু বিসর্গ জানি না। রাত ন-টায় ব্রিগেডিয়ার সান সিং-এর ফোন এলো। তিনি পরদিন সকালে টাংগাইল আসবেন অথবা আমি ময়মনসিংহ যেতে পারবো কিনা, এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা হলো। আমি সান সিংকে জানিয়ে দিলাম, পরদিন দুপুরে ময়মনসিংহ টাউন হলের সামনে এক সম্বর্ধনা সভা আছে। সেখানে অতি অবশ্যই উপস্থিত থাকবো। প্রয়োজন হলে সকালেও ময়মনসিংহ পৌঁছে যেতে

পারি। সান সিংয়ের টেলিফোনের ঘণ্টা খানেক পর টেলিভিশনের উপস্থাপক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত নাট্যকার ও প্রতিবেদক সহযোদ্ধা মামুনুর রশিদ ও নুরুন্নবী উদ্‌ভ্রান্তের মত ঢাকা থেকে ছুটে এলো। তারা কোলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রও নিয়ে এসেছে। এদের দু'জনের কাছ থেকেই প্রথম গ্রেফতারী পরোয়ানা সম্পর্কে জানলাম, কিছু অর্থ ও ঈর্ষাপরায়ন কুচক্রীর প্ররোচনায় যদিও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আগষ্ট থেকেই শুরু হয়েছিল কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের সেই ষড়যন্ত্র জমে উঠল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই।

বাংলাদেশ সরকার ১৯শে ডিসেম্বর আমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী ক'রে ২০শে ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ কার্যকর করতে ভারতীয় সেনাপতি মেজর জেনারেল বি. এন. সরকারকে নির্দেশ দেন। বি. এন. সরকার লেঃ জেনারেল অরোরার নির্দেশ পেয়ে প্রথমাবস্থায় একেবারে হতভম্ব হয়ে যান এবং তিনি অরোরাকে বলেন, 'কাদের সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করা এখন সময়োচিত হবে না।

মিত্রবাহিনীর প্রতিক্রিয়া

আর তার কাজের জন্য গ্রেফতার তো নয়ই বরং তাকে প্রশংসা করা উচিত।' কিন্তু এরপরও অরোরা বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ কার্যকর করতে বলেন। ঢাকার কর্তা এই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে ব্রিগেডিয়ার সান সিং-এর শরণাপন্ন হন। টেলিফোনে তিনি সান সিংকে সমস্ত ঘটনা জানান। সব কিছু শুনে সান সিং বিস্মিত হয়ে বলেন, 'কাদের সিদ্দিকীকে আমি ছ'-সাত মাস যাবত জানি। তার ভূমিকা ও ক্ষমতার জন্য তাকে গ্রেফতার করার কোন প্রশ্নই উঠে না।' এর পরেও ঢাকার কর্তাটি যখন অরোরার মতই বললেন, 'কাদের সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করার দুঃসাধ্য কাজটি তোমাকেই করতে হবে।' তখন ব্রিগেডিয়ার সান সিং উত্তেজনায় সামরিক বাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে বলে উঠেন, 'আমার পক্ষে কাদের সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করা মোটেই সম্ভব নয়। আমাকে তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলে আমি সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করব।' তিনি এই বলে ক্ষান্ত হলেন না, কর্তাটিকে বলে দিলেন, 'একজন সৎ নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে আমার উচিত হবে আরেকজন কৃতি দায়িত্বশীলের সাথে সততার আচরণ করা। আমি তাকে তার গ্রেফতার সম্পর্কে জানিয়ে দেব।' সান সিং ঢাকার কর্তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর যে পরিমাণ অস্ত্র ও সৈন্যবল রয়েছে, কাদের সিদ্দিকী রুখে দাঁড়ালে তাকে গ্রেফতার করা দুঃসাধ্য না হলেও প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ হবে। মনে রাখা দরকার, তার সহযোদ্ধারা বেতনভোগী সৈন্য নয়, স্বেচ্ছাসৈনিক। কাদের সিদ্দিকীর প্রতি তার সহযোদ্ধাদের যে ধরনের শ্রদ্ধা, মমত্ববোধ ও ভালবাসা আমরা লক্ষ্য করেছি, তাতে তাকে গ্রেফতার করতে যাওয়া ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে খুব একটা সুখের অভিজ্ঞতা হবে না।' সান সিং-এর কথা শুনে ঢাকার কর্তা বললেন, 'গ্রেফতার পরে দেখা যাবে। আমি তোমার সাথে পুরোপুরি একমত। আমিও অরোরাকে তোমার মতই একই কথা বলেছি। কাদের সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করতে যাওয়া আমাদের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তোমার সঙ্গে তার ভাল সম্পর্ক আছে, সেইজন্য তুমি তার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বল। পরে

দেখা যাবে, কি করা যায় ?' দুই সেনাপতির মধ্যে এই ধরনের কতাবার্তার পরেই সান সিং আমাকে ফোন করেছিলেন। সত্যিকার অর্থে আমি তখন পর্যন্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কিন্তু সান সিংয়ের টেলিফোন পাওয়ার একটু পরই গ্রেফতারের ব্যাপারে সব জেনে যাই। মামুন ও নুরুন্নবীর কাছ থেকে গ্রেফতার সম্পর্কে জেনে সান সিংকে টেলিফোন করলাম। ব্রিগেডিয়ার সান সিং আমার দিক থেকে ফোন পাওয়ার কথা ভাবছিলেন। ফোন ধরেই সান সিং জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার ? কোন নতুন খবর আছে কি ?' হাসিমিশ্রিত কণ্ঠে সান সিংকে বললাম, 'হ্যাঁ, আছে। আপনি যা জানেন, আমিও তা জানি। এইজন্য আপনার সাথে দেখা করতে আমি ময়মনসিংহ যাবো না। তবে কাল অবশ্যই ময়মনসিংহ যাবো। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা করতে হলে তা টাংগাইলে এসেই করতে হবে। সান সিং তাঁর মনোভাব পরিষ্কার জানিয়ে বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে সকালে আসতে পার অথবা আমি সকালে আসব। তুমি যদি চাও, ময়মনসিংহ আসার জন্য যে কোন সময় আমাদের হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পার।'

—'এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে হলে আপনাকেই আসতে হবে।'

গ্রেফতারী পরোয়ানার খবর অল্পক্ষণের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর শিবিরে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। মুক্তিবাহিনীর অনেকেই শিবির ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। প্রায় সব কোম্পানী কমান্ডাররা নানা দিক থেকে উল্কার বেগে ছুটে এলো। কমান্ডাররা সবাই উত্তেজিত। কর্নেল ফজলু, মেজর হাবিব, মেজর হাকিম, ক্যাপ্টিন সবুর ও অন্যান্য কয়েকজন রাগ, অভিমান ও আক্রোশে ফেটে পড়ে বলল, 'আমরা সরকার-টরকার মানিনা। আমরা ঢাকার দিকের রাস্তা বন্ধ করে দেব। গ্রেফতারী পরোয়ানা তো দূরের কথা, এজন্য সরকার ভুল স্বীকার করলেও আমরা নিরস্ত্র হবোনা।

টাংগাইল ওয়াপদা ডাক বাংলোর সামনে সমবেত কমান্ডারদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, "সব সময় একই প্রক্রিয়ায় লড়াই করা যায় না, উচিতও নয়। দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধাতে আমরা নিশ্চয়ই অস্ত্র ধারণ করি নাই। সরকারকে আমাদের মানতেই হবে। সরকারের ভুল ভ্রান্তির প্রতিবাদ করার ন্যায্য ও বৈধ পন্থা রয়েছে। উত্তেজনার বশে হটকারীতা করার কোন সুযোগ নেই। পরাজিত শত্রুরা সব সময় চাইবে আমরা যাতে বিশৃংখল হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করি। তোমরা আমাকে কতখানি ভালোবাস তা যুদ্ধের ময়দানে অসংখ্যবার দেখেছি। আমিও প্রাতটি মুক্তিযোদ্ধাকে যে আমার সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসি ও বিশ্বাস করি তার প্রমাণও তোমরা পেয়েছ। আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছি। আজ এই মুহূর্তে আমার উপর যে আঘাত এসেছে তা আমাকে মোকাবিলা করার সুযোগ দাও। আমি যদি পরাজিত হই তা হলে অবশ্য তোমরা সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবে। আমি তোমাদের শান্ত ও স্বাভাবিক থাকতে নির্দেশ দিচ্ছি। আমাদের সমস্ত কাজ পূর্ব পরিকল্পনামত অব্যাহত থাকবে। আমি এই ব্যাপারে সবাইর সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা করে ২৪শে ডিসেম্বর বিন্দুবাসিনী স্কুল ময়দানে প্রকাশ্য জনসভায় আমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব। তোমরা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে

উত্তেজনা ছড়াতে দিওনা। তোমরা গিয়ে সবাইকে শান্ত কর। মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ফসল যেন কিছুতেই বিনষ্ট না হয়।' কমান্ডাররা উদ্বিগ্ন মনে যার যার শিবিরে চলে গেল। তারা এরপরও যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। মামুনুর রশিদ ও নুরুন্নবী ঢাকা থেকে বিশেষ খবর নিয়ে এসেছে, এই কথা শুনে গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী, গণ-পরিষদ সদস্য বাসেত সিদ্দিকী ও অন্যান্যরা ওয়াপদা ডাক বাংলোয় এসে হাজির হলেন। কমান্ডাররা চলে গেলে বেসামরিক প্রশাসনে জড়িত প্রায় সবাই আমাকে ঘিরে ধরলেন। বাসেত সিদ্দিকী সাহেব উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,

—স্যার, এ আবার কি ধরনের ব্যাপার? আমাকে নির্দেশ দিন। আমি কালকেই ঢাকা যাবো। আমি সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করব। বড়ভাই বাসেত সিদ্দিকী সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে ঘৃণাভরে বললেন,

—না কক্ষনো না, যারা যুদ্ধ করেছে, যারা স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, তাদের সম্পর্কে এই ধরনের অপমানকর আচরণ দরবারে সমাধান হতে পারেনা। আমরা কেউ সরকারের কাছে যেতে পারিনা। দরকার পড়লে সরকার অথবা সরকারের প্রতিনিধি এখানে এসে কথা বলবেন। আমরা এখানকার গণ-প্রতিনিধি। আমাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না করে সরকার কিভাবে এই ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ করল, তা ভেবে পাই না। পল্টন ময়দানে দুই-আড়াই লাখ মানুষের মত নিয়ে চারজন দুষ্কৃতিকারীকে উত্তম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সেই সভায় আমরাও বক্তৃতা করেছি। সেখানে আমরাও উপস্থিত ছিলাম। মুক্তিবাহিনীর সাথে আমরা সবাই জড়িত। গ্রেফতারী পরোয়ানা একা কেন কাদের সিদ্দিকীর নামে আসবে? আমাদের সবার নাম বাদ পড়ল কেন? অপরাধ যদি হয়ে থাকে, তাহলে তা আমরা সকলে করেছি। আর ন্যায় হলেও আমরা সবাই তার কৃতিত্বের দাবীদার। এই জন্য আমরা সরকারের কাছে কৈফিয়ত চাইবো।'

আনোয়ার উল আলম শহীদ এই সময় নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনেকের মধ্যে ক্রোধের ভাব লক্ষ্য করা গেলেও ছোট থেকে বড় মুক্তিযোদ্ধাদের একজনের মধ্যেও ভীতির লেশমাত্র ছিল না। আনোয়ার উল আলম শহীদের নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ, দীর্ঘ সাত মাস নানা ধরনের প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে আমাকে দেখেছেন। তিনি ভাল করে জানতেন, আমার কাছে ঐ সামান্য জটিলতা কোন ব্যাপারই নয়। এই জটিলতা কাটিয়ে উঠার জন্য কি পরিকল্পনা নেব, সেটাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য শহীদ সাহেব মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই সময় অধ্যাপক রফিক আজাদ, অধ্যাপক মাহবুব সাদিক, আলী হোসেন, দাউদ খান, সোহরাব আলী খান আরজু, এনায়েত করিম, মোঃ সোহরাওয়ার্দী, ফারুক আহমেদ, বুলবুল খান মাহবুব ও অন্যান্যরা পৃথিবীর বিপ্লবী ইতিহাস থেকে অনেক নজীর তুলে ধরে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়ে এই সমস্ত ন্যাক্কারজনক ঘটনার যথাযথ ফয়সালা করতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তাদের একমাত্র ফয়সালা হলো, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। শক্তি প্রয়োগ করা। টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব "চাপায় বাংলা" মোয়াজ্জেম হোসেন খান ভীষণ চড়া গলায় চিৎকার করে বার বার বলছিলেন,

'এই ধরনের অসম্মানজনক আচরণের উপযুক্ত জবাব আমরা দেবোই। সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। সাম্রাজ্যবাদের দালালরা আমাদের মধ্যে আছে। তারাই এই রকম ঘটনা ঘটাচ্ছে।'

তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন,

'কাদের সিদ্দিকীর পিছনে শুধু টাংগাইলের সতের হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও সত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবক নয়, বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণ তার সাথে রয়েছে। বিশ্বের প্রগতিশীল কোটি কোটি মানুষ কাদের সিদ্দিকীকে নিজের ভাই বন্ধু মনে করেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের আচরণের যোগ্য জবাব আমরা দেবোই।'

২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের দপ্তর মুজিবনগর থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হলো। মেজর জেনারল বি. এন. সরকার ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের নিয়ে আসেন। বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীমহোদয়গণ ও উচ্চ পদস্থ অফিসাররা ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করলে হাজার হাজার মুক্তিপাগল জনতা স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সিপাহসালারদের প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানান। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টিন মনসুর আলী, মুস্তাফ আহমেদ, উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আবদুল মান্নান, মীজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুস সামাদ আজাদ, এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান, জেনারেল এ. জি. ওসমানী প্রমুখ।

ঢাকায় বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার

২১শে ডিসেম্বর সকালে ব্রিগেডিয়ার সান সিং হেলিকপ্টারে ময়মনসিংহ থেকে টাংগাইলে উড়ে এলেন। তিনি আমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে ময়মনসিংহে ফিরে গেলে আমরা দুপুর বারোটায় রওনা হয়ে দু'টায় ময়মনসিংহ পে'ছিলাম। ময়মনসিংহের মুক্তিযোদ্ধারা টাউন হল ময়দানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। ২০শে ডিসেম্বর রাতে আওয়ামী লীগ নেতা গণ-পরিষদ সদস্য রফিক উদ্দিন ভুইঞা, সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছেলে ছাত্রনেতা সৈয়দ আশরাফ ও অন্যান্যরা ২১শে ডিসেম্বর আমার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান যাতে না হয় তার জন্য তৎপর হন। আমি যখন ময়মনসিংহে পে'ছেছি তখন টাউন হল ময়দানে দুই ধরনের মতাবলম্বীদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতি দেখে সোজা কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম। সেখান থেকে ফোনে রফিক ভুইঞা ও অন্যান্যদের সাথে কথা বললাম। যে মুক্তিযোদ্ধারা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনে উঠে পড়ে লেগেছিল তাদেরকে ডেকে সম্বর্ধনা অনুষ্টান না করার অনুরোধ জানালাম। ব্রিগেডিয়ার সান সিংয়ের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়ে বিকাল পাঁচটায় ময়মনসিংহ থেকে টাংগাইলে রওনা হলাম। ফিরে আসার পথে মুক্তাগাছা, গাবতলী ও আরো একটি জায়গায় সভা করতে হলো। সভা না করে ময়মনসিংহ থেকে ফিরে আসার জন্য লতিফ সিদ্দিকী সহ অনেকে আমার

ময়মনসিংহে বৈরীতা

সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন। তারা যে কোন মূল্যে সভা করার পক্ষপাতি ছিলেন। সভা না করে ফেরায় বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী আমাকে পশ্চাদাপসরণকারী বলে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধা করলেন না। বড় ভাইকে বললাম, 'আমি যে পশ্চাদাপসরণ করতে জানি না, তা তো অনেকেই জানেন। ঢাকা ওদিকে নয়, ঢাকা অন্যদিকে। আমার আজকের সিদ্ধান্ত হয়তো একদিন বুদ্ধিমানের কাজ ও নির্ভুল হিসাবে আপনার প্রশংসা পাবে।

টাংগাইলে জেনারেল অরোরা

২২শে ডিসেম্বর সকালে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা কোলকাতা থেকে বিমানে ঢাকা এলেন। ১৪তম ডিভিশনের অফিসার মেসে ভারতীয় সেনাপতিদের সাথে আমার ব্যাপারে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললেন। তার অধীনস্থ সেনাপতিদের প্রতি কিছুটা অনুযোগ করলেন, 'বাংলাদেশ সরকার যে আদেশ দিয়েছেন তা তাদের সততার সাথে পালন করা উচিত। তা না করলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।'

জেনারেল অরোরাকে সেইদিন আমার প্রতি বেশ ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছিল। আগস্টে পরিচয় হবার পর থেকে সর্বদাই তিনি আমার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ২০শে ডিসেম্বর থেকে অরোরার মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘ সময় সেনাপতিদের সাথে আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয়, জেনারেল অরোরা নিজে টাংগাইল গিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হবেন। তিনি নিজে আমার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলবেন। তারপর যে পদক্ষেপ নেয়ার তা নেয়া হবে। অরোরা প্রথম প্রথম টাংগাইল আসার প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু সব সেনাপতিদের অনুরোধে তিনি সম্মত হলেন। জেনারেলদের সম্মিলিত অনুরোধে ব্রিগেডিয়ার সান সিংকে নিয়ে টাংগাইলের প্রোগ্রাম করেন।

লেঃ জেনারেল অরোরার টাংগাইল আসার খবর ২২শে ডিসেম্বর সকাল ন'টায় আমাকে জানানো হলো। অরোরা টাংগাইল আসার আগে ১২ই থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর কয়েকজন জেনারেল টাংগাইল এসেছেন। তাদেরকে যথাযথ আদর-আপ্যায়ন ও মর্যাদা সহকারে অভ্যর্থনা করাও হয়েছিল। টাংগাইলে আসা জেনারেলদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, জেনারেল ওভান, জেনারেল জেকব ও মেজর জেনারেল নাগরা। ২২শে ডিসেম্বর সাড়ে এগারটায় ভারতীয় একটি চৈতক হেলিকপ্টার লেঃ জেনারেল অরোরাকে নিয়ে টাংগাইল সার্কিট হাউসের সামনে অবতরণ করল। অরোরার এই প্রথম টাংগাইলে পদার্পণ। হেলিকপ্টারের এক পাশে ভারতীয় ষষ্ঠ বিহার রেজিমেন্টের অফিসারবৃন্দ এবং অন্য পাশে আমরা কয়েকজন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। হেলিকপ্টারের দরজা খুলে লেঃ জেনারেল অরোরা ও ব্রিগেডিয়ার সান সিং বেরিয়ে এলেন। ষষ্ঠ বিহার রেজিমেন্টের কর্নেলকে নিয়ে আমরা চার-পাঁচ জন অরোরাকে স্বাগত জানাতে হেলিকপ্টারের কাছে এগিয়ে গেলাম। অরোরা আমাদের সাথে করমর্দন করে নির্দিষ্ট গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে কমান্ডার লেখা টাংগাইল ক-২৫ জাপানী টয়োটা করোনা গাড়ীতে উঠলাম। সার্কিট হাউসে অবতরণের পর থেকে অরোরার সম্বর্ধনায় নির্মিত বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠের অভিবাদন মঞ্চ পর্যন্ত প্রায় দেড় মাইল পথে আমাদের একটি বাক্যও বিনিময় হলোনা।

অরোরাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য ছ'শ মুক্তিযোদ্ধা বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে

দাঁড়িয়ে ছিল। অল্প সময়ের ঘোষণায় প্রায় পনের-কুড়ি হাজার লোক বিজয়ী সেনাপতিকে স্বাগত জানাতে বিন্দুবাসিনী স্কুল ময়দানে জমায়েত হয়েছেন। অরোরা ও আমাকে বহনকারী গাড়ী টাংগাইল পৌরসভা অফিসের সামনে থামলে আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম গাড়ীর দরজা খুলে লেঃ জেনারেল অরোরাকে স্বাগত জানালেন। মাঠের মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি পাতা লাল কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে অরোরা অভিবাদন মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। হেলিকপ্টার অবতরণ করার পর একবার করমর্দন ছাড়া তখন পর্যন্ত আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন বাক্য বিনিময় হয়নি। এমনকি স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক কুশল বিনিময়ও নয়। অভিবাদন মঞ্চের সামনে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে অরোরা প্রথম অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

—এরা কারা? এরা কি বেঙ্গল রেজিমেণ্টের লোক?

'সামনে দাঁড়ানো শতকরা নিরানব্বই জনই স্কুল-কলেজের ছাত্র, শ্রমিক, রিকশাওয়ালা বা কৃষক। তাদের একজনেরও যুদ্ধ শুরু পর্যন্ত কোন সামরিক অভিজ্ঞতা অথবা সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না। হয়তো দু'একজন আছে, যারা আগে সেনাবাহিনীতে কাজ করেছে।' আমার কথা শুনে অরোরা কিছুটা অবাক হলেন। সামনে সটান দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর সুবিন্যস্ত পোষাকে সজ্জিত বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে তেজোদীপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে হয়তো অভিজ্ঞ জেনারেলের মনে হলো কোন সেনাবাহিনীকে এত সুন্দরভাবে পোষাক পড়তে ও সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়ানো শিখতেই দু'তিন বৎসরের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। মাত্র আট-ন'মাস সময়ের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কি করে এত সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও সুসংগঠিত হওয়া যায়? এই প্রশ্ন তাকে, তার মনকে টাংগাইলে পদার্পণের পর প্রথম আঘাত হানলো। বিখ্যাত জাহাজ মারা কমাণ্ডার মেজর হাবিবের নেতৃত্বে ছ'শ মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল অরোরাকে অভিবাদন জানালো। মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র অভিবাদন প্রদান দেখে অরোরা আরও মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। সশস্ত্র অভিবাদনের এমন অনুপম ছন্দিত মধুর তাড়নায় ও শব্দের সমাহার লেঃ জেনারেল অরোরা অনেকদিন মনে রাখবেন। অভিবাদন শেষে মেজর হাবিব প্যারেড পরিদর্শনে লেঃ জেনারেল অরোরাকে আহবান জানাল। জেনারেল অরোরা মেজর হাবিবের সাথে সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিদর্শনে এগিয়ে গেলেন। অরোরা এবং হাবিব আগে আগে, আমি এবং এনায়েত করিম তাদের পিছনে। অরোরা পনের মিনিট ধরে সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যেককে ঘুরে ঘুরে দেখলেন ও নানা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। এই সময় ধীর গতিতে জাতীয় সংগীতের সুর ব্যাণ্ডে বাজানো হচ্ছিল এবং তা মুক্তিযোদ্ধারাই বাজাচ্ছিল। পরিদর্শন শেষে অরোরার সাথে মঞ্চে ফিরে এলাম। সামনের মুক্তিযোদ্ধারা মঞ্চের অনেকটা কাছে এসে তাদের আয়তন ছোট করে মাটিতে বসে পড়ল। স্থানীয় জনগণ তখন মাঠে প্রবেশ করে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে অরোরার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। টাংগাইলবাসী ও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে অরোরাকে অভিনন্দন জানিয়ে পনের মিনিট বক্তব্য রাখলাম। বক্তৃতায় লেঃ জেনারেল অরোরা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা করলাম। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ জয়ের মতই দেশ গঠনের আন্দোলনেও পিছপা হবে না, এ ঘোষণায় সমবেত জনতা মুহুর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়লেন। আমার বক্তৃতা শেষে লেঃ জেনারেল অরোরাকে কিছু বলার জন্য আহ্বান জানালাম। জেনারেল অরোরা বক্তৃতার দ্রুত বাংলা বুঝতে না পারলেও গত নয় মাস সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর বাঙালীদের সাথে মেলামেশা করার সুযোগে কিছু কিছু বাংলা বুঝতেন। আর শব্দে না হলেও অভিজ্ঞতা ও ধারণ ক্ষমতার জোরে হাবভাব দেখে তিনি ভাল-মন্দের অনেকটা আন্দাজ করতে পারতেন। বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে বক্তৃতার সময় সমবেত জনতার উচ্ছ্বাসিত করতালি এবং আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত চোখমুখ অরোরাকে আমার সম্পর্কে আবার ভাবিয়ে তুলল। অরোরা তার বক্তৃতার শুরুতেই টাংগাইলবাসীকে সালাম জানিয়ে বললেন, 'আপনাদের গর্ব, কাদের সিদ্দিকীর মত একজন অনন্য সাধারণ বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্ম এই জেলাতেই হয়েছে। টাংগাইলের মত বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে কাদের সিদ্দিকী জন্ম নিলে পাকিস্তানী হানাদারদের পরাজিত ও বাংলাদেশ ছাড়া করতে ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে প্রবেশের কোনই প্রয়োজনই হতো না। আমার বহুদিনের আশা ছিল, ইচ্ছে ছিল, আপনাদের সামনে এসে হাজির হব। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে আহত কাদের সিদ্দিকীকে যখন প্রথম দেখি তখনই আমার প্রগাঢ় ইচ্ছে হয়েছিল, যে জায়গা এই ধরনের সন্তানের জন্ম দিয়েছে সেই জায়গা আমি দেখবো। আজ আমার সেই সাধ, সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। আপনাদের প্রত্যেককে, আমার একজন করে কাদের সিদ্দিকী মনে হচ্ছে। আমি আপনাদের এই বীর সন্তানকে তুরাতে প্রথম সাক্ষাতে বলেছিলাম, আপনি যে অবস্থানে আছেন, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বেঁচে থাকলে আপনিই প্রথম ঢাকায় যাবেন। আমার সেই অনুমান মিথ্যে হয়নি, আপনাদের সুযোগ্য সন্তান ঢাকার বুকে প্রথম পা রেখেছেন। আজ আপনাদেরকে আমি দেখলাম, দীর্ঘদিন আপনাদের সম্পর্কে যে ধারণা করেছি, আপনাদের যে ভাবে ভেবেছি, আপনারা তার চাইতে অনেক বড়, অনেক মহৎ। আমরা চিরকাল আপনাদের বন্ধু হয়ে থাকবো। আমাকে আপনারা যে সম্মান দিলেন, যে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছেন, তা আমি আজীবন মনে রাখবো।'

আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন।

জয় বাংলা, জয় হিন্দ, জয় বঙ্গবন্ধু।
জয় মুক্তিবাহিনী, ভারত-বাংলা মৈত্রী অমর হউক।
জয় যৌথবাহিনী, ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ।'

বক্তৃতা শেষে অরোরা আমাকে জড়িয়ে ধরলে সমবেত জনতা দুই বিজয়ী সেনাপতির আলিঙ্গনে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন। চারদিক মুক্তি ও মিত্রবাহিনী জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী অমর হউক, ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হিন্দ শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল। সভাশেষে অরোরা গাড়ীর কাছে এলে, সমবেত জনতা তার সাথে আলিঙ্গন ও করমর্দনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। আমার অনুরোধে তক্ষুনি গাড়ীতে না উঠে পৌরসভা অফিসের সামনে থেকে ঘ্যাগের দালানের পুল পর্যন্ত হেঁটে এলেন। শত শত মানুষ জেনারেল

অরোরা ও আমার সাথে আলিঙ্গন ও করমর্দন করতে লাগলেন। এই সময় আমি ইচ্ছা করে সামান্য একটু পিছিয়ে পড়লাম। জেনারেল অরোরাকে একা পেয়ে জনতা আরো উত্তাল হয়ে উঠলেন। কার আগে কে অরোরাকে স্পর্শ করবেন। হাত মিলাবেন, বুকে বুক মেলাবেন, এই নিয়ে হুড়োহুড়ির তীব্র প্রতিযোগিতা লেগে গেল। চারদিকের জনতার চাপে অরোরার প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে উঠলেন। এতেও জনতার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই, ক্লান্তি নেই, উৎসাহের তিল পরিমাণ ভাটা নেই। তারা মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতির সাথে হাত মেলাবেনই। আলিঙ্গন করবেনই। তাতে যে দশাই হউক। মিনিট দশেক আন্তরিকতার উষ্ণ আতিশয্যের অত্যাচারে অরোরার কাহিল অবস্থা দেখে আবার আস্তে আস্তে তার কাছাকাছি গেলাম। আমি তার কাছে এলে চাপ অনেকটা কমে এলো। অনেকটা শৃংখলা ফিরে এলো। আমরা আরও দশ মিনিট পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে জনতার উষ্ণ আন্তরিক প্রাণঢালা স্পর্শ লাভ করলাম। এরপর আবার গাড়ীতে সার্কিট হাউসের দিকে ছুটলাম।

লেঃ জেনারেল অরোরা গাড়ীতে উঠেই বললেন, 'আমি শুনেছি, এই শহরেই আপনার বাড়ী। আমি আপনাদের বাড়ী যেতে চাই। আপনার মা-বাবাকে দেখতে চাই।'

অরোরার অনুরোধে আমাদের পোড়াবাড়ীতে তাঁকে নিয়ে এলাম। জেনারেল গাড়ী থেকে নেমে কাউকে পথ দেখানোর সুযোগ না দিয়েই আমাদের বিধ্বস্ত বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়লেন। আমি দৌড়ে তাঁর সাথী হলাম। বাড়ীর ভিতর এসেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা কোথায় ?'

গাড়ীর শব্দ শুনে মা ভাঙা টিনের ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

'ঐ যে মা।' অরোরা দৌড়ে গিয়ে মা'র পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। মায়ের পাশে বাবাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিতেই বাবাকে জড়িয়ে ধরে বার বার পিঠ চাপড়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, 'আপনার ছেলে অনেক বড় আছে।'

অরোরা বাড়ীটা ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। বোনদের পরিবেশিত টাংগাইলের পোড়াবাড়ীর প্রসিদ্ধ চমচম দাঁড়িয়ে খেয়ে আমাকে নিয়ে সোজা সার্কিট হাউসের সামনে এলেন। বিদায় করমর্দন করে তাড়াহুড়ো করে হেলিকপ্টারে গিয়ে উঠলেন। কারও সাথে কোন কথা না বলে দ্রুত হেলিকপ্টারে উঠা দেখে ষষ্ঠ বিহার রেজিমেন্টের অন্যান্য অফিসার ও জোয়ানদের মত আমিও খুবই বিস্মিত হলাম। এটা সত্য, সেইদিন অরোরা টাংগাইল মুক্তিবাহিনী ও জনতার প্রাণ-মন মুগ্ধকর অকৃত্রিম আচরণে এতই মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, যত তাড়াতাড়ি পারেন ঢাকা, এবং সেখান থেকে কোলকাতায় ফিরে আসার সম্পর্কিত উদ্ভূত অনর্থক জটিল ব্যাপারটা ফয়সালা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

মাত্র তিন ঘণ্টার টাংগাইল সফর শেষে ঢাকায় ফিরে তিনি এক ভিন্ন চেহারায় আবির্ভূত হলেন। দুপুরে খেতে খেতে শুধু টাংগাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের ও আমার সম্পর্কে বার বার নানা ভাবে নানা ধরনের প্রশংসা করছিলেন। জেনারেল আরোরার

প্রশংসার চোটে তার অধীনস্থ দু'একজন সেনাপতি মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'স্যার, এত অল্প সময়ে কাদের সিদ্দিকী আপনাকে এত বড় যাদু কি করে করল?'

অরোরা নিঃসংকোচে প্রাণখোলা হাসি হেসে তাদেরকে জানান, 'যাদু সম্রাট পি. সি. সরকারের দেশের মানুষ ত! সিদ্দিকীও একটি জীবন্ত যাদু।'

এই সময় জেনারেল অরোরা তাদেরকে বার বার ধন্যবাদ দেন, যাঁরা আমার গ্রেফতারের ব্যাপারে অসম্মতি জানিয়ে তাকে সরজমিনে তদন্ত করতে অনুরোধ করেছিলেন। শোনা যায়, ঐ দিনই অরোরা ঢাকা থেকে কোলকাতা, কোলকাতা থেকে সোজা দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন এবং পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করেন। সব শুনে প্রধান মন্ত্রী নাকি বলেছিলেন, 'আপনি উত্তম কাজই করেছেন। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও প্রশাসন চালানোয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বেশী ভূমিকা নেয়া মোটেই কল্যাণকর হবে না। এই ব্যাপারে দরকার পড়লে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলা হবে।'

২৪শে ডিসেম্বর বিকাল তিনটা। বিন্দুবাসিনী স্কুল ময়দানে মুক্তিবাহিনী আহুত ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় লোক সমাগম হয়েছে আশাতীত। মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ। তিল ধারনের স্থান পর্যন্ত নেই। মাঠের আশপাশের দালান কোঠার ছাদ ভর্তি মানুষ আর মানুষ। মাঠের চারপাশে ও কাছেপিছের

সান সিং সম্বর্ধিত

গাছগুলোও যেন মানুষের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। এই সভাতে আমি মার পাশে বসেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার সান সিং মুক্তিবাহিনীর বিশেষ আমন্ত্রণে হাজির হয়েছেন। সভাটি দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হলো। প্রথম পর্ব ব্রিগেডিয়ার সান সিং সম্বর্ধনা এবং দ্বিতীয় পর্ব ব্রিগেডিয়ার সান সিং চলে যাওয়ার পর জনসভা।

ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল রেখে তিনটায় ব্রিগেডিয়ার সান সিং বিন্দুবাসিনী স্কুলমাঠে এলেন। আনোয়ার উল আলম শহীদ ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমি সান সিংকে স্বাগত জানালাম। গণ-পরিষদ সদস্যরা সভামঞ্চে বসে রইলেন। সান সিং সভামঞ্চে এলে কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সমবেত জনতাকে ব্রিগেডিয়ার সান সিংয়ের সাথে আমার পরিচয়, মুক্তিযুদ্ধে তিনি কিভাবে সাহায্য করেছেন, সমস্ত কিছু তুলে ধরে টাংগাইলবাসী ও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। এরপর সান সিংকে উদগ্রীব জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলাম। ব্রিগেডিয়ার সান সিং বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই লক্ষ জনতার সামনে আমার মা'র পা স্পর্শ করে সালাম করলেন। মা সামান্য অস্বস্তিবোধ করলেও সান সিং মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে অত্যন্ত সহজ, সরল বোধগম্য হিন্দিতে বললেন,

'কাদের সিদ্দিকীর মত বীর সন্তানের যিনি জন্মদায়িনী, তাঁর চরণ স্পর্শে আজ আমি ধন্য। আপনারা কাদের সিদ্দিকীর জেলার লোক। আপনাদের কাছে আসতে পেরে আমি গর্বিত। জুন মাসের শুরুতে যখন আমরা টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর প্রথম খবর পাই, তখন থেকে টাংগাইলবাসী ও টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর প্রতি আমার এবং আমাদের একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ গড়ে ওঠে। প্রথম প্রথম, ঢাকার এত কাছে

এত বড় একটা দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা শুনে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারলেও, আগস্ট মাসে যখন কাদের সিদ্দিকীকে দেখি তখন আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। টাংগাইল মুক্তিবাহিনী ও কাদের সিদ্দিকীর ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে প্রতিদিনই আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থাবোধ বেড়ে চলেছিল। আমার দীর্ঘদিনের সৈনিক জীবনে এত দ্রুত সুদক্ষ, সুসংহত ও সুসংগঠিত স্বেচ্ছাসৈনিক গড়ে তোলার মত ক্ষমতাসম্পন্ন এমন সুযোগ্য সংগঠক আর দেখিনি। স্বাভাবিক অনুকূল অবস্থার মধ্যেও এত বড় একটা সুশৃংখল সংগঠন এত অল্প সময়ে গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও কাদের সিদ্দিকী যা করেছেন, আগামী দিনে তা কারো পক্ষে করা সম্ভব হবে কি না, আমার জানা নেই। আপনারা কাদের সিদ্দিকীর জেলার লোক, আমি আপনাদেরকে নমস্কার জানাই, সালাম জানাই। আপনাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা আমার বাকী সৈনিক জীবনের আনন্দ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

জয় বাংলা, জয় হিন্দ, জয় মুক্তিবাহিনী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ।'

সম্বর্ধনা শেষে ব্রিগেডিয়ার সান সিংকে আমরা সবাই রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কোরাণ ও গীতা পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হলো। সভায় কোন আনুষ্ঠানিক সভাপতি নেই। সভা শুরু হতে যাবে, ঠিক এমন সময় সভামঞ্চের সোজাসুজি সামনে এক মহিলাকে উন্মাদের মত ছুটে আসতে দেখা গেল। সহযোদ্ধাদের বললাম, 'দেখ, মহিলাটির কি হয়েছে? উনি কি বলতে চান? নিশ্চয়ই উনার কিছু বলার আছে।'

মাইক্রোফোন সামনে ছিল। কথাগুলো মাইক্রোফোনে ছড়িয়ে পড়লো, সভার লাখো মানুষের কানে। দায়িত্বশীল কয়েকজন সহযোদ্ধা দৌড়ে গিয়ে ভদ্রমহিলাটিকে সভাস্থল থেকে সরিয়ে নিল। পরে জানলাম, ঐ ভদ্রমহিলা বাসাইল থানার গণ-পরিষদ সদস্য শামসুদ্দীন আহমেদ বালু মোক্তারের স্ত্রী। তার উন্মাদিনীর মত ছুটে আসার কারণ, কয়েকদিন আগে তার স্বামীকে পাকিস্তানীদের সাথে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সভা পরিচালনা করছিলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ। ২৪শে ডিসেম্বরের সভার প্রায় সমস্ত আয়োজনের তত্বাবধানে ছিলেন বাস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী হবি মিঞা ও মোয়াজ্জেম হোসেন খান। সভার শুরুতে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে বক্তৃতা করলেন গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল বাসেত সিদ্দিকী। আবদুল বাসেত সিদ্দিকী তার চিরাচরিত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গণ-পরিষদ সদস্যের চাইতে নিজেকে বার বার মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচয় দিয়ে বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি নিখুঁতভাবে যুদ্ধকালীন সময়ে আমার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সাহসিকতার ঘটনা এক এক করে জন সমক্ষে তুলে ধরলেন। উপরন্তু বাংলাদেশ সরকারের বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করলেন।

দ্বিতীয় বক্তা গণ-পরিষদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী। তিনি বললেন,

'আমি টাংগাইল মুক্তি বাহিনীর সূচনা করেছিলাম বটে কিন্তু আমি যা পারিনি,

তা আমার ছোটভাই কাদের সিদ্দিকী পেরেছে। সেজন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। নেতা হয়ে আমরা যা শুরু করেছিলাম, কর্মী হয়ে কাদের সেই আরব্ধ কাজ নিষ্ঠা, সততা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে সুসম্পন্ন করেছে বলেই আজ সে নেতার আসনে আসীন হয়েছে। তাই তাকে নেতা বলে মেনে নিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই বরং আমি গর্ববোধ করি, কাদেরের মত যোগ্য নেতারই আজ আমাদের দেশে প্রয়োজন। দেশ স্বাধীন হয়েছে সত্য, এতে মুক্তিবাহিনীর কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে, একথা ভাবলে ভুল করা হবে। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে ছিনিয়ে না আনা পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হতে পারে না। তাই মুক্তিবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত না করা পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগও করতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের স্বপক্ষে মুক্তিবাহিনী অস্ত্রধারণ করেছে। স্বাধীন বাংলায় আজ যদি পূর্বের অন্যায় অত্যাচার চলে, আর মুক্তিবাহিনীর তা নীরবে সহ্য করে, তা হলে মুক্তিবাহিনী আর রাজাকারের মধ্যে আমি অন্তত কোন পার্থক্য খুঁজে পাবোনা। বঙ্গবন্ধুকে হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতেই হবে। মুক্তিবাহিনীকে পূর্বের চেয়ে আরো বেশী সুসংহত ও সুসংগঠিত থেকে সামাজিক সকল দুর্নীতি, অনাচার, অবিচারের মূলোৎপাটন করতে হবে।'

এরপর গণ-পরিষদ সদস্য হাতেম আলী তালুকদার ও গণ-পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ বক্তৃতা করলেন। হাতেম আলী তালুকদার মুক্তিবাহিনীর প্রতি বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন,

'আমাদের পিঠের চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দিলেও মুক্তিবাহিনীর প্রতি পূর্ণ দায়িত্ব পালন করা হবে না।'

অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ পিঠের চামড়াকে বুকের চামড়ায় পরিবর্তন করে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন,

"পিঠ কেন, আমরা বুকের চামড়া দিয়েও যদি মুক্তিবাহিনীকে জুতা বানিয়ে দিই, তাও তাদের ঋণ পরিশোধ হবে না।'

এরপর টাংগাইল-ময়মনসিংহ জোনাল কাউন্সিলের সভাপতি গণ-পরিষদ সদস্য শামসুর রহমান খান শাজাহান বক্তব্য রাখলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, সুললিত কণ্ঠস্বর, সংযত ও নিয়ন্ত্রিত নাটকীয় মুদ্রাভঙ্গির যাদুতে তার পূর্বের অনেক বক্তৃতার মতই এবারও জনতাকে মাতিয়ে তুললেন। তিনি পুনঃ পুনঃ মুক্তিবাহিনীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিশেষ করে আমার প্রশংসায় তিনি তাঁর অভিধানের তূণ থেকে সমস্ত সুন্দর সুন্দর বিশেষণগুলো একের পর এক প্রয়োগ করলেন। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে টাংগাইলে এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছিল যে, আমার নামোল্লেখের সাথে জনতা হাততালিতে ফেটে পড়তেন। জনতাকে মাতিয়ে-নাচিয়ে শামসুর রহমান খান শাজাহান তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। সব শেষে আমি বক্তৃতা করতে দাঁড়ালাম,

'উপস্থিত আমার মা, ভাই ও বোনেরা, আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি বিশেষ কয়েকটি সিদ্ধান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরতে। দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা মাননীয় নেতাদের বক্তৃতা শুনেছেন। আমি তাই বক্তৃতা করতে চাই না। দেশ

স্বাধীন হয়েছে। প্রতিটি মানুষের দ্বারপ্রান্তে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দেয়া আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। রাজনৈতিক নেতারাই এই দায়িত্ব সুষ্ঠ এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করতে সক্ষম বলেআমর বিশ্বাস করি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই বেসামরিক প্রশাসন চালানোয় সবচাইতে উপযুক্ত। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আজ এই মুহূর্ত থেকে বেসামরিক প্রশাসনের সমস্ত দায়িত্ব গণ-পরিষদ সদস্যদের হাতে তুলে দেয়া হবে। যেহেতু যুদ্ধকালীন অবস্থায় টাংগাইল ময়মনসিংহ নিয়ে একটি জোন গঠিত হয়েছিল এবং যার সভাপতি স্বনামধন্য গণ-পরিষদ সদস্য শামসুর রহমান খান শাজাহান। তাঁর উপরই টাংগাইলের বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। আমরা গণ-পরিষদ সদস্যদের সাথে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এটা ঠিক করেছি। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে, সাধারণ যে কোন আদেশ ও নির্দেশ গণ-পরিষদ সদস্যদের নেতা হিসাবে শামসুর রহমান খান শাজাহান দিলে মুক্তিবাহিনীসহ অন্যান্য সমস্ত প্রশাসন যন্ত্র তা নির্দ্বিধায় পালন করবে। তবে বিশেষ কোন নির্দেশনামা হলে, তা অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ গণ-পরিষদ সদস্যদের অনুমোদিত ও লিখিত হতে হবে। নীতি সংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে গণ-পরিষদ সদস্য এবং সমসংখ্যক মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বশীল ব্যক্তি একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কোন লিখিত নির্দেশ প্রদান করলে তা কার্যকরী করা হবে। কাউকে গ্রেফতার ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মুক্তি, এ সমস্তই গণ-পরিষদ সদস্যদের ক্ষমতার আওতাভুক্ত। তবে দালাল ও রাজাকার হিসাবে কাউকে গ্রেফতার করতে বা গ্রেফতার করার তালিকা প্রস্তুতে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। গণ-পরিষদ সদস্যদের কাউন্সিল, তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা মুক্তিবাহিনীর মাধ্যমে কার্যকরী করবেন। বিধিবদ্ধ যে কোন নির্দেশ, আদেশ বা অনুরোধ পালনে মুক্তিবাহিনী বাধ্য থাকবে।

বেসামরিক প্রশাসন হস্তান্তর

যুদ্ধশেষে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর হাতে যে ষোল হাজার রাজাকার ও দালাল ধরা পড়েছে, তাদের এই মুহূর্তে মুক্তির আদেশ দেয়া হলো। পরবর্তীতে এদের কাউকে গ্রেফতারের প্রয়োজন দেখা দিলে অবশ্যই তা করা হবে।

টাংগাইলবাসীর কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, শুধু রাজাকার ছিল বা পাকিস্তানীদের সাথে থেকেছে, এই অপরাধে যেন কাউকে গ্রেফতার করা না হয়। যারা বাংলাদেশ চায়নি, তাদেরও স্বাধীন বাংলায় সুনাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাই হত্যা, লুট, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রত্যক্ষ অভিযোগ ও প্রমাণ যাদের বিরুদ্ধে আছে, তাদেরকেই শুধু বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করান। জনগণ এবং মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার শান্তি এবং আহতদের আসু সুস্থতা কামনা করি। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনাদের আমার ছালাম জানিয়ে শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় মুক্তিবাহিনী, জয় যৌথবাহিনী
ভারত-বাংলা মৈত্রী অমর হউক।'

২৪শে ডিসেম্বর বিকাল চারটা ত্রিশ মিনিট, বিশেষ করে টাংগাইলে বন্দী রাজাকারদের জন্য একটি স্মরণীয় মুহূর্তে আমি যখন বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে বক্তৃতা করছিলাম, তখন সেই বক্তৃতা ওয়ারলেসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিগুলোতে প্রচারিত হচ্ছিল। ২৪শে ডিসেম্বর সভা শুরুর আগেই রাজাকারদের আটকে রাখা শিবির-গুলোর কমাণ্ডারদের লিখিত নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সভায় ঘোষণার সাথে সাথে যেন সমস্ত বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়। হলোও তাই। টাংগাইল বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে যখন ঘোষণা করলাম, সমস্ত রাজাকার ও দালালদের নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হলো। ঘোষণার সাথে সাথে প্রতিটি বন্দী শিবিরের বন্ধ কপাট খুলে দেয়া হলো, অবরোধ তুলে নেয়া হলো। টাংগাইল জেলখানার তালা খুলে গেলো। বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠের বক্তৃতা বন্দী শিবিরের প্রতিটি রাজাকার-দালালরাও শুনেছিল। তারা এ ঘোষণায় আনন্দে ফেটে পড়ল। তাদের জীবনের কোন আশাই ছিল না, বাঁচার ক্ষীণতম আলোটুকুও ছিল না। মুক্তির এমন আকস্মিক ঘোষণায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। এ কি স্বপ্ন! এ কি সত্য। ভাবনার ঘন তন্দ্রা কাটলে শরীরের সব শক্তি জড়ো করে গলা ফাটিয়ে পাগলের মত জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় কাদের সিদ্দিকী শ্লোগান দিতে লাগলো। ২৪শে ডিসেম্বর গভীর রাত পর্যন্ত রাজাকারদের দিগন্ত কাঁপানো বিরামহীন শ্লোগান শোনা গেল। পরবর্তী পর্যায় নিয়ে কোন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় যাবো না বলে আমি এর শুভ ও অশুভ কোন দিক আলোচনা করছিনা। তবে এটুকু সত্য, মুক্তি দেয়া শতকরা আশি জন রাজাকার ছিল পরিবেশের চাপে বাধ্য। আর এও দেখা গেছে, মুক্তিপ্রাপ্ত রাজাকারদের আশি ভাগ পরবর্তী পর্যায়ে দেশ গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

বন্দী রাজাকারদের মুক্তি

২২শে ডিসেম্বরের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে লেফটেনেণ্ট জেনারেল অরোরার মত আমিও ২৪শে ডিসেম্বরের জনসভায় গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রসঙ্গে একটি শব্দও উচ্চারণ করলামনা। এই ব্যাপারে আমাদের দুইজনের মধ্যে খুব মিল ছিল।

২৪শে ডিসেম্বর বেসামরিক প্রশাসন গণ-পরিষদ সদস্যদের হাতে তুলে দেয়ার আগে কর্নেল ফজলুর রহমানকে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত করা হয়।

পরের দিনগুলো খুব দ্রুততার সাথে এগুতে থাকলো। বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব গণ-পরিষদ সদস্যদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা অনেকটা হাল্কা হলাম। মুক্তিবাহিনীকে ভালভাবে সুসংগঠিত করে তুলতে ও তাদের মানসিকতা খুঁটিয়ে দেখতে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার সাথে মিলিত হলাম। এই সময় কিছু মুক্তিযোদ্ধার মনে দুঃখবোধ লক্ষ্য করলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃখ হলো, তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হতে না হতেই মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। তাদের আক্ষেপ, দেশের জন্য কিছুই করতে পারলোনা। বিশেষ করে তুরাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় দেড় হাজার মুক্তিযোদ্ধা ১২-১৩ই ডিসেম্বর টাংগাইলে পেঁাছে। সত্যিকার অর্থেই সামর্থ্য ও আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা কোন যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। তবে অনেক মুক্তিযোদ্ধার ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করতে তাদের হয়তো আর একবার লড়াই করতে হবে। এই নতুন সহযোদ্ধাদের বেশী বেশী সান্নিধ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, যুদ্ধ শুধু অস্ত্র দিয়ে নয়, কাস্তে-হাতুড়ী লাঙ্গল-কোদাল নিয়েও করা যায়। দেশ মুক্ত

করার যুদ্ধের চেয়ে দেশ গঠনের যুদ্ধ কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং বেশী। তোমরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওনি বলে নিজেদের ছোট ভাবার কোন কারণ নেই। সুখী সমৃদ্ধি, শোষণহীন রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের সংগ্রামে তোমাদের সামনে খোলা রয়েছে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র।

২৮শে ডিসেম্বর দুপুর। একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার টাংগাইল সার্কিট হাউসের সামনে অবতরণ করল। একটু পরেই আমাকে নিয়ে হেলিকপ্টার আবার দক্ষিণে ঢাকার দিকে উড়ে চলল। টাংগাইলের অনেক মুক্তিযোদ্ধা জানতে পারলোনা, আমি কোথায় যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি? ভারতীয় হেলিকপ্টার তেজগাঁ সামরিক বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করলে, মেজর জেনারেল বি. এন সরকার, মেজর জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সান সিং এবং একমাত্র সহযোদ্ধা মাসুদ সহ হেলিকপ্টার থেকে বের হলাম। প্রথমে আমরা ১৪তম ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার অফিসার মেসে খাবার খেলাম। খাওয়া শেষে বেইলী রোডের সেণ্ট্রাল সার্কিট হাউসে এলাম। সেণ্ট্রাল সার্কিট হাউসে আমার এই প্রথম পদার্পণ।

প্রধানমন্ত্রী সকাশে

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকা এলেই বেইলী রোডের সেণ্ট্রাল সার্কিট হাউসেই থাকতেন। বেছে বেছে কেন যেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সবচেয়ে পছন্দের ও বেশী ব্যবহৃত দুইটি রুমই আমাকে দেয়া হলো।

বিকেল চারটা ত্রিশ মিনিটে জেনারেলরা আমার সাথে মিলিত হলেন। পরবর্তী কর্মসূচী বাংলাদেশ সরকারের উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ। বেইলী রোডের সেণ্ট্রাল সার্কিট হাউস থেকে আমাদের নিয়ে নৌবাহিনীর মস্ত বড় সাদা একখানা শেভ্রলেট কার কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের দিকে এগিয়ে চলল। সচিবালয়ের প্রধান ফটকে গাড়ী থামলো। গাড়ী থামতেই চার-পাঁচ জন বেসামরিক অফিসার আমাদের স্বাগত জানালেন এবং সাথে সাথে দোতলায় প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘরে নিয়ে গেলেন। ভারতীয় বাহিনীর তিন সেনাপতি ও আমি প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন করলাম। প্রধানমন্ত্রী চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদনের জবাব দিলেন এবং আমাদের বসতে বললেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর ঘরে আরো একজন বসেছিলেন। আমরা বসলে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দীন আহমেদ অন্য লোকটির সাথে মিনিট দুইয়েক কথা শেষ করে বিদায় নিলে ভারতীয় সেনাপতিদেরও একটু বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। তারা বাইরে গেলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার নিভৃতে কথা হলো।

প্রধানমন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলে চার-পাঁচ জন সাংবাদিক আমাকে ঘিরে ধরলেন। কারণ, আমার গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে এত হৈ চৈ, এত ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল যে, প্রায় সারা দেশেই প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। 'তাজুদ্দীন সাহেবই ষড়যন্ত্র করে কাদের সিদ্দিকীকে গ্রেফতারের চেষ্টা করেছেন।' সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন,

—প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার কি বিষয়ে কথা হলো?

—অনেক বিষয়েই তাজুদ্দীন ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে।

—আলোচনার পরিবেশ কেমন ছিল?

—সৌহার্দ্যপূর্ণ।

—আপনি কি প্রধানমন্ত্রীকে আপনার গ্রেফতারী পরোয়ানা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

—না।

—কেন ?

—আমি মনে করি, এভাবে জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন নেই।

—প্রধানমন্ত্রী আপনাকে কেন গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন ? তার সঙ্গে আপনার দেখা হলো অথচ জিজ্ঞেস করলেন না বা উনিও আপনাকে কিছু বললেন না, এটা কি করে সম্ভব ?

—প্রধানমন্ত্রীই যে আমাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আমরা জানি, পরাজিত শত্রুরা সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করতে সক্রিয় হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চায় আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করি, যাতে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ধ্বংস হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী যদি আমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেও থাকেন, তবুও আমি মনে করবো, শত্রুরা তাকে ভুল বুঝিয়েছিল। গ্রেফতার সম্পর্কে এখন কোন কথাই উঠতে পারে না। ব্যাপারটার উদ্ভব যেমন আকস্মিক, তেমনি তার তাৎক্ষণিক ফয়সালাও হয়ে গেছে।

—তবে কি আপনি মনে করেন, একজন কৃতি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আপনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীতে প্রধানমন্ত্রীর কোন দায়-দায়িত্ব নেই ?

—নিশ্চয়ই আছে। তবে এই ব্যাপারে আমি তাজুদ্দীন ভাইকে মোটেই দায়ী করবোনা।

—আচ্ছা, আপনারা নাকি তাজুদ্দীন সাহেবের হাতে অস্ত্র জমা দেবেন না ?

—অস্ত্র জমা দেয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার কোন কথা হয়নি।

—তবে কি আপনারা অস্ত্র জমা দেবেন না।

—সব সময় সব যুদ্ধে অস্ত্রের দরকার পড়েনা।

সচিবালয় থেকে সোজা বঙ্গভবন। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। পৌঁছানোর সাথে সাথে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারদের উপরাষ্ট্রপতি বার বার বললেন, 'আমার দাদুভাই কত বড় হয়ে গেছে।' উষ্ণ আলিঙ্গন শেষে মিত্রবাহিনীর সেনানায়কদের সামনেই আমাদের অনেক কথাবার্তা হলো। নজরুল ইসলাম সাহেব বার বার বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতির কথা বললেন এবং যুদ্ধকালীন নয় মাসের প্রবাসী সরকারের কিছু কিছু মধুর স্মৃতিচারণ করলেন। আলাপের শেষ পর্যায়ে তিনি আমাকে অন্দরমহলে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করতে বললেন।

বঙ্গভবনে

সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের স্ত্রী এমন এক ধার্মিক, বিদুষী ও স্নেহপ্রবণা মহিলা, যিনি যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিদিন নামাজ পড়ে তার স্বামী ও ছেলেমেয়েদের যতবার মঙ্গল কামনা করতেন ঠিক ততবারই বোধহয় আমার মঙ্গল কামনা করেছেন। আমি তাঁকে দাদী বলে ডাকি। দাদী উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে

বলতেন, 'তোমরা কোলকাতায় নিরাপদে আছো। আর আমার নাতিটাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ। ওকে আমার কাছে এনে দাও।' আমাদের পরিবারের সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের পরিবারের কোন আত্মীয়তা নেই। অনাত্মীয় যে আত্মীয়ের বেশী হতে পারে, এটা তার জ্বলন্ত নিদর্শন। বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দাদীকে পা ছুঁয়ে ছালাম করলাম। সৈয়দ নজরুল ইসলামের স্ত্রী ছোটো-খাটো খুব সুন্দর পুতুলের মত নিরীহ নিষ্পাপ, সাদাসিদে মহিলা। আনন্দে, খুশীতে, উচ্ছ্বাসে ছয় ফুট লম্বা নাতিকে কোলে নিতে চাইলেন। এত আনন্দের মাঝেও তিনি বার বার কেঁদে ফেললেন। নজরুল সাহেবের ছোট দুই মেয়ে রূপা ও লিলি। তারাও মায়ের আঁচল ধরে মাঝে-মধ্যে আমাকে ধরে নাচানাচি করতে লাগলো। বহুদিন পর দেখা হওয়াতে অনেক মধুর স্মৃতিচারণ হলো। দাদী রাতের খাবার খেতে বললেন। রাতের খাবার খেতে রাজী হয়ে বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে এলাম। মেজর জেনারেল বি. এন. সরকার, মেজর জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সান সিং ও আমি বঙ্গভবন থেকে বেরোতেই প্রচণ্ড গতিতে তিন-চারটি জীপ ভয়ংকর শব্দ করে আমাদের সামনে থেমে গেল। কিছু বুঝবার আগেই খোলা জীপ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ জন লাফিয়ে পড়লো। মিত্রবাহিনীর সেনানায়করা ও আমি নিজেও কিছুটা বিস্মিত হয়ে গেলাম। ভালো করে দেখে বুঝতে পারলাম এরা আমার দলেরই যোদ্ধা। গাড়ীর দরোজা খুলে বের হতেই ক্যাপ্টেন সবুর, মেজর হাবিব, আনোয়ার উল আলম শহীদ, নুরুন্নবী ও অধ্যাপক রফিক আজাদ দৌড়ে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম,

'তোমরা এখানে কেন? আর এভাবে হুড়মুড়িয়ে এসে গাড়ীর সামনে দাঁড়ালে কেন?

সবুর কাঁদো কাঁদো ভাবে বললো,

'স্যার, আমাগোর কোন দোষ নাই। আমরা খবর পাইলাম, আপনারে ঢাকায় নিয়া আইছে, আটকাইয়া রাখছে। তাই আমি দল নিয়া আইস্যা পড়ছি।'

এ সময় আনোয়ার উল আলম শহীদ বললেন, হ্যাঁ, ওরা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গাড়ী বোঝাই হয়ে টাংগাইল থেকে ছুটে এসেছে। এদিক-ওদিক ঘুরছিল। পথে আমার সাথে দেখা। সবুরের কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, মিলিটারী হেড-কোয়ার্টার ও বঙ্গভবনে ফোনে খবর নিই। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে জানানো হয়, আপনি সেখানে গিয়েছিলেন, তবে বেরিয়ে গেছেন। এরপর সবুরকে তার দলবল শেরে বাংলা নগরের পাশে রাখতে বলে আরো খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করি। বঙ্গভবনে ফোন করলে তারা জানালো, আপনি উপরাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলছেন। খবর পেয়ে সবুরকে নিয়ে আমিই এখানে এসেছি।

এরপর আর রাস্তায় কোন কথা হলোনা। সবাই গিয়ে সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসে এলাম। সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসে পৌঁছে দিয়ে ভারতীয় সেনাপতিরা চলে গেলেন। যোদ্ধাদের সবাইর জন্য মিষ্টি ও কিছু হাল্কা খাবারের ব্যবস্থা করলাম। এই সময় টি. ভি. কেন্দ্র থেকে মামুনুর রশিদ ও তার ভগ্নিপতি মোয়াজ্জেম হোসেন খান এসে হাজির হলেন। মোয়াজ্জেম হোসেন খানের সেই একই কথা,

'স্যার, বার বার এই সমস্ত কি শুনি? এর একটা বিহিত অবশ্যই করতে হবে।'

সবাইকে বেশ জোরের সাথে বললাম,

'সব সময় সন্দেহ নিয়ে থাকলে হয় না। আমাদের প্রচুর শত্রু আছে। তারা গুজব ছড়াবেই। গুজবে এত তাড়িত হলে আমাদের খুবই ক্ষতি হবে। সবুরকেও নানাভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়া হলো। সবাইকে খাবার খাইয়ে নিজে শেরে বাংলা নগরে গিয়ে অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সাথে দেখা করে তাদের টাংগাইল ফিরে যেতে বললাম।

খন্দকার আবদুল বাতেনের লোকদের সাথে মুক্তিবাহিনীর আরও একবার বিরোধ হলো। টাংগাইল মুক্ত হলে স্বাভাবিক কারণে বেশীসংখ্যক মুক্তিবাহিনীর কোম্পানীগুলো টাংগাইল শহর, শহরের আশে-পাশে এবং থানাগুলোতে অবস্থান করছিল, মুক্তিবাহিনীর ছোট ছোট কিছু দল তখনও তাদের পুরানো অবস্থানগুলোতে ছিল। এমনি একটি ষাট-সত্তর জনের ছোট দল লাউহাটিতে অবস্থান করছিল। ২৮শে ডিসেম্বর রাতে খন্দকার আবদুল বাতেনের সহযোগী কয়েকজন যুবক টাংগাইল লাউহাটির পথে মুক্তিবাহিনীর নিরস্ত্র তিনজন দূতের উপর আচমকা সশস্ত্র হামলা করে। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর একজন দূত মারা যায় এবং দুইজন গুরুতর আহত হয়। লাউহাটিতে তখন বড়চওনার ক্যাপ্টেন ইদ্রিস মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে ছিল। নিহত যোদ্ধাটি ও সেখানে অবস্থানরত অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ী পাহাড় অঞ্চলে হওয়ায় অসন্তোষ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস সেই রাতে কেদারপুর, ফতেপুর, ফাজিলহাটি, দেলদুয়ার ও নাগরপুরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের জরুরী ভিত্তিতে লাউহাটিতে সমবেত করে। গভীর রাতে লাউহাটির এ খবর টাংগাইল এলে, ক্যাপ্টেন আবদুস সবুর খান ও আরো বেশ কয়েকজন দুর্ধর্ষ দুঃসাহসী কমাণ্ডার এবং প্রায় দু' হাজার মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান রাতারাতি লাউহাটি পেঁছেন এবং বাতেনের দলের অবস্থান সন্দেহ করে কেদারপুরের দক্ষিণে বেশ কয়েকটি গ্রাম ঘিরে ফেলে।

আবার ষড়যন্ত্র ঃ মুক্তিযোদ্ধা খুন

২৯শে ডিসেম্বর সকালে মিত্রবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই উদ্বেগজনক খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ঢাকা থেকে টাংগাইল ফিরে এলাম। মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান ও অন্যান্য কমাণ্ডারদের সাথে বেতারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। মিত্রবাহিনীকে অনুরোধ করে দুই কোম্পানী সৈন্য লাউহাটির ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দিলাম। অনেক চেষ্টার পর ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমানের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ হলে তাকে কঠোর নির্দেশ দিলাম, যে যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় যেন তাৎক্ষণিকভাবে টাংগাইল ফিরে আসে। কোনক্রমেই যেন একটি গুলিও না চলে। জবাবে ব্রিগেডিয়ার ফজলু জানালেন, 'আমাদের দুইজন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। একজন মারা গেছে। এর আগেও এরা লাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এদের যদি শায়েস্তা করা না হয়, তাহলে এরা আরো অসংখ্য অঘটন ঘটাবে এবং তার শিকার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদেরকেই হতে হবে।'

এর পরও ব্রিগেডিয়ারকে টাংগাইলে ফিরে আসতে নির্দেশ দিলাম। মিত্রবাহিনীর দুইটি কোম্পানী লাউহাটি-কেদারপুর পৌঁছলে, সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা টাংগাইল ফিরে এলো।

লাউহাটি থেকে ফিরে আসা মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় সবাই রাগে, ক্ষোভে ও উত্তেজনায় ফেটে পড়ে নিহত বন্ধুর লাশ দেখিয়ে আমাকে বলল, 'আপনি এর বিহিত করতে না দিলে, পরিণতি ভয়াবহ হবে। আমরা দিনের পর দিন এমনি অন্যায় গুপ্তহত্যার শিকার হতে পারবোনা, নির্মম গুপ্তহত্যা আমরা সহ্য করবোনা।'

সহযোদ্ধাদের মনোভাব উপলব্ধি করে দৃঢ়তার সাথে বললাম, 'যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও অপূর্ব সাহসিকতার জন্য আমি তোমাদের সব সময় প্রশংসা করেছি এবং করবও। তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি তোমরা যেভাবে মোকাবেলা করতে চাইছো, তা মোটেই সমর্থন করতে পারবোনা। একজন সহযোদ্ধার মৃত্যু ও দুইজন গুরুতর আহত হওয়ায় তোমাদের মত আমিও ব্যথিত। এই সমস্ত ঘৃণ্য লোকদের প্রতি ঘৃণায় আমার অন্তরও ভরে আছে। কিন্তু উপায় নেই। ক্ষমতা হাতে পেয়ে আমরা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারিনা। ২৪শে ডিসেম্বর বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব গণ-পরিষদ সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়ার পর ইচ্ছা করলেই আমরা যত্রতত্র অভিযান পরিচালনা করতে পারিনা। আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে, আমরা নিয়মনীতি ন্যায়সঙ্গত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করলে পরিণাম মারাত্মক হবে। আমরা চেষ্টা করব, যেকোন ভাবেই হউক সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এই সমস্যার সমাধান করতে।

যদিও আমার কথাগুলো মুক্তিযোদ্ধারা আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারলোনা। তবুও আমার অনুরোধ তারা হাসিমুখে মেনে নিল।

এই সময় টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর এক উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঘটনা হলো, দৈনিক পূর্বদেশে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর উপর একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ। ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য অধ্যাপক রফিক আজাদ, অধ্যাপক মাহবুব সাদিক, অধ্যাপক আতোয়ার কাজী, বুলবুল খান মাহবুব, অধ্যাপক মুশফিকুর রহমান, ফারুক আহমেদ, সৈয়দ নূরু, সোহরাব আলী খান আরজু, মামুনুর রশিদ, ছোট রফিক ও আরো বেশ কয়েকজন পুরো এক সপ্তাহ নিরলসভাবে কাজ করেন।

আশা–আশঙ্কায় নতুন বছর

সত্তর দশকের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য উজ্জ্বল ঘটনাবহুল একটি বছর, এক নদী রক্তে একটি স্বাধীন জাতির অভ্যুদয়ের বছর আপন মহিমা, ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য নিয়ে সংযোজিত হলো ইতিহাসের পাতায়। মহাকাল অতীতের অনেক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক অধ্যায়ের মতই '৭১ সালকেও তার বুকে ঠাঁই করে দিল, আর তাঁর অনন্ত-অসীম গর্ভ থেকে উপহার দিল মানবজাতির জন্য একটি সম্ভাবনাময় নতুন বছর, '৭২' সাল। বাংলার প্রতিটি মানুষের মনে '৭২' সাল শুভ হওয়ার শুভ প্রার্থনা। একাত্তরের মত নিষ্পাপ শিশুর ক্রন্দনরোল যেন আর কোনদিন বাংলার আকাশ-বাতাস ব্যথিত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ না হয়, অবলা-অসহায়া নারী যেন আর কোনদিন কোন দেশে কোন বাহিনীর সংঘবদ্ধ পাশবিক অত্যাচারের নির্মম শিকার না হয়, নিরীহ নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় জনগণের পবিত্র রক্তের সাগরে যেন কোনদিন আর কোন সংগঠিত খুনীদল পাশবিক উল্লাসে স্নান করতে না পারে। যে নারকীয় ধ্বংস-যজ্ঞ বাংলাদেশের বুকের পাঁজর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, সেই কালরাত্রি যেন আর কখনও বিশ্বের কোন জাতির জীবনে ফিরে না আসে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। আমাদের দেয়া সময়-সীমাও পেরিয়ে গেল অথচ কোন শুভ সূচনা পরিলক্ষিত হলো না, আমি উদ্বিগ্ন ও কিছুটা শঙ্কিত। মনে প্রশ্ন '৭২ সালকে স্বাগত জানাবো কোন ভাষায়?

'৭১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ডিসেম্বরের শেষ দিন পর্যন্ত সারা বিশ্বের অসংখ্য সাংবাদিকের কাছে আলাদা আলাদা সাক্ষাৎকার দিয়েছি। প্রত্যেকের কাছে বলেছি, 'আপনারা পাকিস্তানের শাসক ও পাকিস্তানের মুরুব্বীদের বুঝান, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে এক মুহূর্ত আটকে রাখার কোন নৈতিক অধিকার তাদের নেই। বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখলে বা তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।'

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দেবার দাবী জানাল। ফলাও করে প্রচার করল বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে না দেয়ার প্রতিক্রিয়া কি হবে। এতো কিছুর পরও পাক-শাসকদের শুভবুদ্ধির উদয় হলোনা। পরিবর্তন যে হলোনা তাও নয়। রক্তপিপাসু জল্লাদ ইয়াহিয়া পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েছে, স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বাংলার গণ-হত্যার অন্যতম খল-নায়ক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

নতুন বছরের প্রথম তিন-চার দিন ব্যতিক্রমহীনভাবেই কাটলো। টেলিফোনে ঢাকায় মেজর জেনারেল বি. এন. সরকার ও কোলকাতায় জেনারেল অরোরার সাথে যোগাযোগ রাখছিলাম। নুরুন্নবী, মামুনুর রশিদ, নাজির হোসেন পিন্টু ও আরো কুড়ি-পঁচিশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ঢাকায় রাখা হলো। তাদের দায়িত্ব প্রতিটি বিদেশী সাংবাদিক ও বিদেশী সংবাদ সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখা এবং বঙ্গবন্ধুর

সর্বশেষ খবর জানার চেষ্টা করা। '৭১ সালের ২০ শে ডিসেম্বর থেকে '৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী, এমন কোনদিন যায়নি যে কোন বিদেশী সাংবাদিক অথবা সংবাদ সংস্থাকে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর তথ্য বিভাগের সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর সর্বশেষ সংবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেনি। অনেক সময় সাংবাদিকরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশ্ন শুনে হতবাক হয়েছেন। তারা এসেছেন খবর সংগ্রহ করতে, আর বিমানবন্দরে নামার সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধারাই তাদের কাছে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করছে। এ-রকম ব্যতিক্রম পৃথিবীতে খুব কমই ঘটে।

৫ই জানুয়ারী টাংগাইল নিরালার মোড়ে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো। বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী দুইদিন ধরে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ত্রিশ হাজার টাকা চাইছিলেন।

বড় ভাইয়ের দুঃখ-জনক আচরণ

টাকা দেয়ার ইচ্ছা ছিল না বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। টাকা দেয়ার অসুবিধাও ছিল। মাত্র চার-পাঁচ দিন আগে চাহিদা মত বড় ভাইকে মুক্তিবাহিনীর তহবিল থেকে কুড়ি হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল। এর পরও যখন তিনি পরে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরো ত্রিশ হাজার টাকা চান, তখন কিছুটা অস্বস্তিতে পড়লাম। এসময় লতিফ সিদ্দিকী কেন, কোন সিদ্দিকীই যে টাকা ফেরত দেবেন না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। লিখিত নির্দেশ ছাড়া এক পয়সাও মুক্তিবাহিনীর তহবিল থেকে বের করার কোন উপায় ছিল না। বড় ভাইকে আবো টাকা দিতে পারি কিনা এ নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। আমি চাইছিলাম, যেহেতু সরাসরি না করতে পারবোনা, সেইহেতু তার কাছে ধরাও দেবোনা। ৫ই জানুয়ারী সকাল সাড়ে দশটায় ভিক্টোরিয়া রোডে মুক্তিবাহিনীর প্রশাসনিক দপ্তরে গেলাম। অফিসে প্রবেশের কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি ফোন এলো। ফোনটি ধরল হামিদুল হক মোহন। অপর প্রান্তে গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী বললেন,

—কাদের কি ওখানে আছে?

মোহন ফোনের রিসিভার চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'গণ-পরিষদ সদস্য সাহেবকে কি উত্তর দেব?' এড়িয়ে যাবার উদ্দেশে মোহনকে বললাম, 'আপনি বলে দিন, তিনি নেই।' মোহন বলে দিল,

—তিনি নেই।

নেই বললে কি হবে? আমি যখন ঢুকছিলাম তখন গণ-পরিষদ সদস্য বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী জোনাল কাউন্সিলের দোতলা থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। মোহনের কাছে জবাব পেয়ে, সোজা দোতলা থেকে নেমে মুক্তিবাহিনীর প্রশাসনিক অফিসের দিকে পা বাড়ালেন। আমিও কাগমারী কলেজে যাবার জন্য অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাব, ঠিক এ-সময় বড়ভাই আহত বাঘের মত হুংকার ছেড়ে এসে পড়লেন। তিনি সংযম, শালীনতা ও পরিমিতিবোধ হারিয়ে ফেলে উন্মাদের মত চিৎকার করে বললেন, 'তোমরা দালাল, দালাল পুষছ। মোহনের মত দালালকে তোমরা জায়গা দিয়েছ। তোমাদের চেয়ে রাজাকারও ঢের ভাল।'

গালাগালির মাত্রা ও ভাষা এর চাইতে হাজার গুণ অসংযত, অশ্লীল ও কঠোর ছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সামনাসামনি এই পর্যন্ত কেউ এইভাবে

আমাকে গালাগাল করতে পারেনি। সহযোদ্ধারা কল্পনাতেই আনতে পারেনি, আমাকে কেউ গালি দিতে পারে, তাও এ-ভাবে! কিন্তু না, আমাকে লোল-চর্মসার একটি অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ কুকুর জ্ঞান করে এক নাগাড়ে প্রায় আধঘণ্টা বিকার-গ্রস্তের মত গালাগালি করে গেলেন। দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমান-অপমানে থরথর করে কাঁপলেও, চোখ দিয়ে পানি এসে গেলেও, নিজেকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখলাম। পাশে কুড়ি-পঁচিশ জন সশস্ত্র যোদ্ধা। যারা আমার জন্য যেকোন মুহূর্তে যেকোন পরিস্থিতিতে যেকোন শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়ে জীবন দিতে পারে। তারাও মারণাস্ত্র হাতে মাথা নীচু করে অসহায়ের মতো নীরবে কাঁদল। তারা বুঝল, সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে অস্ত্রই শক্তির একমাত্র উৎস নয়। দীর্ঘ সময় একতরফা গালিগালাজ করে বড় ভাইয়ের ক্রোধানল স্তিমিত হলে ক্ষোভে-অভিমানে কান্না-জড়িত কণ্ঠে বললাম, 'আপনার আজকের আচরণ গুরুতর অশোভন। আমরা রক্তের দামে স্বাধীনতা কিনেছি। দালালদের জায়গা আমাদের ঘরে নয়। যাদের স্বাধীনতা অর্জনে কোন অবদান নেই, বিন্দুমাত্র ত্যাগ নেই, দালাল-রাজাকারদের স্থান তাদের ঘরে। মোহনকে অন্য কিছুতে আখ্যায়িত করলে হয়তো বিকাবে, কিন্তু দালাল বলে নয়। মোহন বাংলা ছাত্র-ইউনিয়নের টাংগাইল জেলার সভাপতি। আন্দোলনের শুরুতে যেমন আমাদের পক্ষে কাজ করেছে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের শেষের তিন-চার মাস সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আমাকে গালাগালির জন্য আমি অসন্তুষ্ট না হলেও, একজন মুক্তিযোদ্ধাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপমানিত করায় আমি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। আপনি ভবিষ্যতে এই ধরনের আচরণ করলে, নিয়মমত ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

লতিফ সিদ্দিকীও দমবার পাত্র নন। তিনি এর পরও নানা ধরনের উচ্চারণের অযোগ্য ভাষ্য ব্যবহার করে রাগে গরগর করতে করতে তার অস্থায়ী আবাসস্থল টাংগাইল জেলা কাউন্সিল বাংলোর দিকে চলে গেলেন। এই অপ্রীতিকর দুঃখ-জনক ঘটনার পর থেকে বড় ভাই দীর্ঘদিন মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ডের সংস্পর্শ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন।

কোন কাজে তাকে না ডাকলে তিনি আসা-যাওয়া ছেড়ে দিলেন। অনেক সময় এই ক্ষোভের কারণে তিনি অযৌক্তিকভাবে আমার কোন অবদানই স্বীকার করতেন না। যদিও কোনদিন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি বা অন্য কেউ মুক্তিযুদ্ধকে খাটো করে দেখতে চাইলে তা মোটেই সহ্য করেননি। টাংগাইল ও দেশের অনেক মানুষই বড় ভাইয়ের বেমানান অসুন্দর আচরণের মধ্যে আমার প্রতি তার হিংসা আবিষ্কার করতে এবং ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের বহিঃপ্রকাশ বলে ব্যাখ্যা দিতে পিছপা হননি। অনেকে আবার প্রকাশ্যেই বলা শুরু করেন, 'নিজে যা পারেননি, ছোট ভাই হয়ে কাদের সিদ্দিকী তা করেছে বলে লতিফ সিদ্দিকী সহ্য করতে পারছেননা।'

কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে, সে অন্য কথা, অন্য বিশ্লেষণ, অন্য আঙ্গিকে তা দেখা যাবে।

বড় ভাই চলে গেলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে টাংগাইল ওয়াপদা ডাকবাংলোয় ফিরে

এলাম। ঘরের দরোজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। অন্যদিকে কিছুক্ষণ আগে ঘটে-যাওয়া ঘটনার খবর দ্বিগুণ রং ও আকার নিয়ে ততক্ষণে সারা টাংগাইলে ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তিবাহিনীর কারও ঘটনাটি জানতে বাকী নেই। সকাল সাড়ে এগারটায় কাগমারী কলেজে যাওয়ার কথা ছিল। কাগমারী কলেজে তখন প্রায় আঠারশ' মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটি গেড়ে ছিল। এরা সবাই ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে এবং অধিকাংশই বড় কোন যুদ্ধে অংশ নেয়ার সুযোগ পায়নি। এই আঠারশ' মুক্তিযোদ্ধারা বড় তিনটি কোম্পানীতে বিভক্ত ছিল। তিনটি দলের নেতৃত্বে ছিল যথাক্রমে টাংগাইল থানা পাড়ার আনোয়ার উল হক তালুকদার সেলিম, মহেলার দুদুর ভাই তোফাজ্জল ও লাউহাটির একজন কোম্পানী কমাণ্ডার। কাগমারী কলেজে মুক্তিযোদ্ধারা আমার সেখানে যাওয়ার প্রত্যাশায় রয়েছে। কথা ছিল তারা আমাকে সশস্ত্র অভিবাদন জানাবে এবং একসাথে দুপুরের খাবার খাবে। সব কিছু প্রস্তুত, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু নিমন্ত্রিত ও প্রত্যাশিত অতিথির দেখা নেই। কিছুটা অধৈর্য হয়ে তারা বার বার মুক্তিবাহিনীর প্রশাসনিক দপ্তর ও সামরিক সদর দপ্তরে টেলিফোনে খোঁজখবর নিচ্ছিল। একদিকে এনায়েত করিম, অন্যদিকে মোয়াজ্জেম হোসেন খান শত চেষ্টা করেও কাগমারীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমার সর্বশেষ সংবাদ জানাতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে সেখানকার মুক্তিযোদ্ধারাও নিরালার মোড়ের ঘটনা জেনে গেছে। তাই তারা আরো বেশী উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত। দেশ স্বাধীন হতে না হতেই নেতৃস্থানীয় একজন গণ-পরিষদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে অসৌজন্য-মূলক আচরণ ও অপমান করলেন। উপরন্তু হয়তো এই কারণে তারা আমার সান্নিধ্য লাভ থেকে বঞ্চিত হলো, তাদের সকল ব্যাকুলতা ও প্রস্তুতি বিফলে গেল। কিন্তু না, তাদেরকে বঞ্চিত হতে হয়নি।

আধঘণ্টা পর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দরোজা খুলতেই উপস্থিত সবাই সচকিত হয়ে গেল। শহীদ সাহেব প্রায় আধঘণ্টা ধরে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। শহীদ সাহেবকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার? আপনি এখানে?'

শহীদ সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। একটা কিছু লুকোতে গিয়ে হঠাৎ ধরা পড়েছেন এমনি একটি পরিস্থিতিতে তাড়াতাড়ি অজুহাত দেয়ার মত বললেন, 'আপনার কাগমারী কলেজে যাওয়ার কথা ছিল। আমিও সাথে যাব। তাই এসেছি।'

ঘড়ির দিকে তাকালাম। নির্ধারিত সময়ের পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। শহীদ সাহেবকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে ক্যাপ্টেন ফজলুল হককে গাড়ী চালাতে বললাম। এতক্ষণ যে অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর যন্ত্রণাদায়ক গভীর নীরবতা ও বিশ্রী থমথমে ভাব ছিল, তা ধীরে ধীরে কর্মচাঞ্চল্যের গতিতে ভেসে গেল, ফিরে এল স্বাভাবিকতা। নিত্য দিনের মত যার যার দায়িত্ব নিয়ে আমার সাথে নিত্য সহচর দল বেরিয়ে পড়ল। নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর কাগমারী কলেজের মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে সশস্ত্র অভিবাদন জানাল। সমবেত মুক্তিযোদ্ধা ও উপস্থিত প্রায় পনের হাজার জনসাধারণের উদ্দেশ্য উদাত্ত কণ্ঠে প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম ধৈর্য,

সংযম ও সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানালাম। কাগমারীতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের ভূয়সী প্রশংসা করলাম। প্রতিটি বড় বড় যুদ্ধে তাদের যে পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে তা বিভিন্ন উপমা দিয়ে বিশদভাবে তুলে ধরলাম। দুপুরে তাদের সাথে খাবার খেয়ে কাগমারী থেকে টাংগাইল হয়ে সোজা মির্জাপুর হাসপাতালে গেলাম। মির্জাপুর হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য রোগীদের দেখে বিকেল চারটায় মির্জাপুর স্কুল মাঠে বিরাট এক জনসভায় ভাষণ দিতে হলো। জনসভার মূল উদ্যাক্তা ছিল আমার সহপাঠী বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মির্জাপুরের পুলক সরকার ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা।

এই সময় মুক্তিবাহিনীর উদ্যোগে সর্বত্র প্রায় প্রতিদিনই সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সভার যেন বিরাম নেই এবং প্রতিটি সভাতে আমার উপস্থিতি যেন আবশ্যিক অলংকার। ১লা জানুয়ারী থেকে ৭ই জানুয়ারী মির্জাপুর, করটিয়া, কালিহাতী, মধুপুর, কস্দুসনগর, বাসাইল, নাগরপুর ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি স্থানে মুক্তিবাহিনীর উদ্যোগে জনসভা হলো।

প্রকৃতিতে অনন্য, বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, তাৎপর্যে মহিমান্বিত এমন দুটি—বল্লা ও বাসাইল জনসভার বিশেষ কিছু দিক তুলে ধরছি। নির্ধারিত দিন বাসাইল স্কুলের সামনে খোলা মাঠে লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়েছে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি গাড়ী আমাদের টাংগাইল থেকে বাসাইল জনসভায় নিয়ে চলেছে। সামনের তিন-চারটা গাড়ীর পর আমি। মুক্তিবাহিনীর গাড়ীর বহর করটিয়া থেকে পাকা রাস্তা ছেড়ে বাসাইলের কাঁচা রাস্তার মাইল খানেক এগুতেই বাংড়ার পাশে জনতা ফুল, ফুলমালা ও তোড়া দিয়ে আমাদের অভিনন্দিত ও সম্মানিত করলেন। বাংড়া থেকে বাসাইল পর্যন্ত পুরো রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাসে আগ্রহে ভালবাসার প্রাণঢালা ডালি সাজিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ীর বহর কামুটিয়া খেয়া পেরোবার পর আর গাড়ীতে উঠার কোন সুযোগ পেলামনা। বাসাইল পর্যন্ত উৎসাহিত উদ্বেলিত বাঁধনহারা স্বতঃস্ফূর্ত জনস্রোতে খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে তিন মাইল পথ অতিক্রম করলাম।

বল্লা ও বাসাইলে অভূতপূর্ব জনসভা

যুদ্ধের শুরু থেকেই গলায় মালা নেয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। ব্যাপারটা মোটেই ধর্মীয় বা অন্য কারণ নয়। কেউ মালা দিতে এলে মালা প্রদানকারীর গলায় সে মালা পরিয়ে দিয়ে বহুবার বলেছি, 'আমার এখনও মালা নেবার যোগ্যতা হয়নি।' জনতার আনন্দ, আবেগ, উচ্ছ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে নাঙ্গুলিয়া খালের পারে এলাম। খালের পারে এক অশীতিপর বৃদ্ধা মালা হাতে অপেক্ষা করছিলেন। মালা হাতে এগিয়ে এলে বৃদ্ধাকে বললাম, 'মা, মালা নেবার যোগ্যতা আমার হয়নি।'

বৃদ্ধার হাত থেকে মালাটি নিয়ে তারই গলায় পরিয়ে দেব এমন সময় বৃদ্ধা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করলেন। অভিমানাহত জিদ নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'তোমার মালা নেবার যোগ্যতা না হইলে, এদেশে কার হেই যোগ্যতা হইছে? আমি তোমারে মালা পরামুই। না হইলে এই যে, আমি তোমার সামনে খাড়াইলাম, তুমি আমারে পাড়াইয়া যাও।'

বয়সের ভারে বৃদ্ধার দেহ নুইয়ে পড়েছে। পরনের মলিন বস্ত্রের তালি, দারিদ্রতা, শোষণ-বঞ্চনা আর অত্যাচারের চিহ্ন বৃদ্ধার শরীরে শুকনো খালের গভীরতা নিয়ে এঁকেবেঁকে রয়েছে। তার কোটরাগত দুটি চোখে অতীতের তিক্ত বিস্বাদময় জীবনের ছাপ। যে বৃদ্ধা কিছুক্ষণ আগেও অপাংক্তেয় অবাঞ্ছিত ও লাইন থেকে বিতাড়িত হবার ভয়ে সংকোচে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, মালা হাতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই বৃদ্ধার শীর্ণ দেহে এত শক্তি এত তেজ এলো কোথা থেকে? শোষণে, বঞ্চনায় দারিদ্রতার নিষ্ঠুর আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত ন্যুব্জ হয়ে আসা মনে এত আশ্চর্য সুন্দর জিদ, কঠিন কোমল অধিকার এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল? অনেক বুঝানোর পরও বৃদ্ধা সংকল্পে অটল রইলেন। কামুটিয়া থেকে হাজার জনকে নিরাশ করেছি। মালা হাতে প্রতীক্ষমানদের গলাতেই তাদের মালা পরিয়ে দিয়ে এতটা পথ পার পেলেও, বৃদ্ধার হাত থেকে কোন মতেই নিষ্কৃতি পেলামনা। বৃদ্ধার হাতে ছোট্ট একটি মালা। সব ফুল এক রঙের নয়, এক জাতিভুক্তও নয়। এক এক জায়গা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে পরিশ্রম, ধৈর্য ও নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে মালাটি গাঁথা হয়েছে। ক্ষুদ্র মালা অথচ স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও মানবিকতার জোরে সারা পৃথিবীর মানুষকে একসূত্রে গাঁথার জন্য যেন মালাটি যথেষ্ঠ বড়। বৃদ্ধার সামনে মাথা নীচু করলাম। বৃদ্ধা গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে আনন্দে আমাকে জাপটে ধরলেন। অনায়াসে স্বচ্ছন্দে দুটি শীর্ণ হাতে বন্দী হয়ে গেলাম। হারিয়ে গেলাম ফেলে আসা সোনালী শৈশবে। অতি প্রত্যুষে পালিয়ে দূর গ্রামে মেলা দেখা শেষে ধূসর গোধূলিতে নীড়ে ফেরা পাখীদের কাকলির সুর বন্ধুর কাছ থেকে নেয়া ভেঁপো বাঁশিতে সুর মেলাতে মেলাতে খেই হারানো আনন্দে প্রদীপ জ্বলা সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা, ঘরে ফিরেই চিন্তিত মায়ের বকুনি, খুঁজে খুঁজে হয়রান ক্রোধান্বিত বাবার পিটুনি খেয়ে স্নেহশীলা দাদীর কোলে মুখ গুঁজে অঝোর ধারার নীরব নিষ্পাপ কান্না, দাদীর পরম আদরে মাথায় হাত বুলানো, অকৃপণ মমতায় আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের পানি মুছে দেয়ার সোহাগপূর্ণ স্বর্গীয় মুহূর্তগুলি আবার যেন মুহূর্তের জন্য ফিরে এসেছে। নিজেকে সংযত রাখতে পারলামনা। অব্যক্ত আবেগে চোখের দু'কোণ বেয়ে ঝরঝরিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। চোখে-মুখে-কপালে স্নেহ-চুম্বন এঁকে দিয়ে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, তুমি কাঁদছো কেন?'

অনুভূতির গভীর ভাষা কাউকে বলা যায় না, বুঝানো যায় না।

সে শুধু উপলব্ধির। বৃদ্ধাকে বললাম, 'মা, আমি জানিনা।'

কামুটিয়া থেকে বাসাইল পর্যন্ত কম করেও পঁচিশ-ত্রিশ হাজার মানুষ আমাদের আন্তরিক সম্বর্ধনা জানালেন। অর্ধেকের বেশী লোক কেউ খালি হাতে দাঁড়াননি। বাসাইল এসে দেখা গেল, আর্মার কার ও নিত্য সহচর দলের দুইটি জীপ শুধু মালা আর ফুলে ফুলে ভরে গেছে। পিছনের আরও দুটি জীপ পেপে, বেল, কলা, ডালিম ও অন্যান্য ফলে ভর্তি। রাস্তায় জনসাধারণ প্রায় দু'শ মানপত্র দিয়েছেন। যার যেমন খুশী, কেউ ছাপিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন, কেউ ছাপানো মানপত্র বাঁধানো ছাড়াই দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ হাতে লিখে দিয়েছেন। দু'তিনটা মানপত্র কুলার উপর

খুব সুন্দর করে লেখা। মানপত্রের শ্রেণীবিভাগও বিভিন্ন, কোনটা দিয়েছেন ছাত্ররা, কোনটা গ্রামবাসীরা, কেউ আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে। বাসাইলের তিন শহীদ তোফাজ্জল, দুলাল মিঞা ও মোহাম্মদ সোহরাবের কবর জিয়ারত করে সোজা স্কুলের সামনে, সভাস্থলে এলাম।

সভায় বাসাইল থানাবাসীদের পক্ষ থেকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও আমাকে পৃথক পৃথকভাবে সোনার মেডেল উপহার দেয়া হলো। এখানে খুব সুন্দর দু'টি মানপত্রও দেয়া হলো। এই সভাতে মোয়াজ্জেম হোসেন খান আমার সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতার কথা তুলে ধরে বিশ্বের দরবারে টাংগাইল তথা টাংগাইল মুক্তি-বাহিনীর স্বীকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বাসাইলের জনসাধারণকে অবহিত করলেন। আমি বাসাইল থানার অধিবাসীদের বার বার সালাম জানিয়ে তাদের কৃতিত্ব ও প্রশংসনীয় অবদানের উল্লেখ করলাম। টাংগাইল মুক্তিবাহিনীতে বাসাইল থানার সদস্য সংখ্যাই খুব সম্ভবতঃ বেশী হবে বলে মন্তব্য করলাম এবং বললাম, 'মুক্তিবাহিনীর প্রথম অভিযান হয়েছিল বাসাইল থানারই সংগ্রামপুরে। দ্বিতীয় অভিযানও বাসাইলকে কেন্দ্র করে হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাসাইলের মানুষ, বাসাইলের মুক্তিযোদ্ধারা যে ত্যাগ ও গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করেছে, তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

আরও একটি স্মরণীয় জনসভা হয় কালিহাতী থানার বল্লাতে। মুক্তিবাহিনীর প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ এই বল্লাতেই হয়েছিল। বল্লার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে টাংগাইল জেলা কাউন্সিলের ডাকবাংলোয় অপেক্ষা করছিলাম। কারণ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি দল টাংগাইল আসার কথা ছিল। টি. ভি. দল পোড়াবাড়ী, ধ্বংসস্তূপ, অত্যাচারিত মা-বোনদের সাক্ষাৎকার, দখলদারদের নির্মম নির্যাতনে হাসপাতালের শয্যায় শায়িত মারাত্মকভাবে আহত সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র, ক্যামেরা ও বাণীযন্ত্রে আবদ্ধ করবেন। বল্লা জনসভায় যোগদানের জন্য মুক্তিবাহিনীর এক অংশ ইতিমধ্যেই ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে রওনা হয়ে গিয়েছে। মেজর হাবিব ও ক্যাপ্টেন সবুর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আমার সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। বেলা তিনটায় বাংলাদেশ টি. ভি. দল দুইটি হেলিকপ্টারে টাংগাইল বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে অবতরণ করলো। আমার সাথে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে অনুরোধ করলেন, 'আপনি যদি দয়া করে আমাদেরকে হানাদারদের ধ্বংসকৃত বাড়ীঘর এবং তাদের পৈশাচিকতার কিছু নিদর্শন দেখাতে নিয়ে যান, তাহলে আমরা ছবি তুলবো।' বল্লাতে জনসভা থাকার কারণে তাদের সাথে যাওয়া সম্ভব নয়, এটা জানালে তারা বলতে গেলে প্রায় হতাশ হয়ে পড়লেন। এরপর তারা প্রস্তাব রাখলেন, 'আপনি দয়া করে কালিহাতী ও বল্লার আশেপাশে কয়েকটি স্থান দেখিয়ে দিন। অন্য হেলিকপ্টারে আরও জনা দুই দায়িত্বশীল লোক দিন, যারা অন্যান্য জায়গাগুলো দেখিয়ে দিতে পারবেন।' সবুরকে তাদের দল নিয়ে কালিহাতী স্কুলমাঠে অপেক্ষা করতে বললাম। একটি হেলিকপ্টারে টি. ভি. দলের একাংশের সাথে আনোয়ার উল আলম শহীদ ও একজন সহযোদ্ধা, অন্য হেলিকপ্টারটিতে আমি একজন সহযোগী নিয়ে উঠলাম। হেলিকপ্টার দুটি

পর পর আকাশে উড়ল। হেলিকপ্টার থেকে প্রথমে হানাদারদের পোরানো সয়া পালিমা গ্রামের ধ্বংসাবশেষের ছবি তোলা হলো। তারপর হেলিকপ্টারটি সোজা চলে এলো ব্রাহ্মণশাসন ও কালিদাসপাড়ার আকাশে। কালিদাসপাড়া সেতুর দুই পাশে পর পর প্রায় একশ'টি বাড়ী হানাদাররা পশ্চাদপসারনের সময় ১০ই ডিসেম্বর জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, যে ধ্বংসাবশেষ নমরুদ বাহিনীর শেষ অত্যাচারের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। হেলিকপ্টার থেকে ছবি তুলতে গিয়ে ক্যামেরাম্যান, বার বার বললেন, 'এই রকম বীভৎস পোড়ার ছবি জীবনে এই প্রথম তুলছি।' কালিদাসপাড়া থেকে টি. ভি দলকে সোজা নিয়ে গেলাম বল্লার আকাশে। বল্লাতেও একই অবস্থা। হানাদারদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া ধ্বংসস্তূপ থেকে নির্গত পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ যেন এখনও বল্লার বাতাসকে ভারী করে রেখেছে। অসংখ্য বার ধ্বংসপ্রাপ্ত বল্লার বাজার এর আগে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। ত্রাণ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছি কিন্তু আকাশ থেকে বল্লার ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামটি এত ভয়াবহ, এত বীভৎস যা আগে বুঝতে পারিনি। প্রায় দশ মিনিট নানাভাবে ঘুরে ফিরে নানা দিক থেকে খুব যত্নসহকারে টি. ভি. ক্যামেরাম্যানরা হানাদারদের 'পোড়ামাটি' নীতির জঘন্য নজীর ক্যামেরায় ধরলেন। বল্লার ছবি তোলা শেষ হলে কালিহাতী স্কুল মাঠে এসে নামলাম। টি. ভি. দল আরো কিছু ছবি তুলতে আবার আকাশে উড়ল।

আনোয়ার উল আলম শহীদ গোপালপুর, মধুপুর ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় হানাদারদের জ্বালানো-পোড়ানোর দগদগে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে বল্লার পাশে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করেন। তাঁদেরকে নামিয়ে দিয়ে হেলিকপ্টার অসমাপ্ত কাজ সারতে আবার আকাশে উড়ল। একটি জীপ শহীদ সাহেবকে বল্লা জনসভায় নিয়ে এলো।

বিকেল পাঁচটা। বল্লার সভাস্থলে উপস্থিত হলাম। সভায় লোকের ভিড় উপচে পড়ছে। একটি অস্ট্রেলিয়ান ও একটি যুগোশ্লাভিয়ান টি. ভি. দল বল্লা জনসভার সবাক চিত্র তুলতে এসেছেন। বল্লাতে অনুষ্ঠিত পূর্বেকার সকল জনসভাকে ম্লান করে রেকর্ড সংখ্যক জনতার জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় কাদের সিদ্দিকী, জয় মুক্তিবাহিনী জয়ধ্বনির মধ্যদিয়ে আমাকে সভামঞ্চে নিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসাল। শুরু হলো সভার কাজ। ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান, বল্লার নজরুল, আনোয়ার উল আলম শহীদ ও আমি পর্যায়ক্রমে এই সভায় বক্তৃতা করলাম। সভা পরিচালনা করল সৈয়দ নুরু। ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান, ক্যাপ্টেন রবি উল আলম, মেজর মোস্তফা দীর্ঘদিন বল্লার যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের শেষের ক'টি দিন বাদ দিলে বল্লার জনগণের অধিকাংশের অসহযোগিতা ও চরম প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তাদের বল্লাতে অবস্থান নিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। সেই কারণে বল্লার জনগণের উপর ফজলুর রহমান ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত। জনসভাতেও তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারলেননা। বক্তৃতা করতে উঠে সবাইকে সালাম জানিয়েই বল্লার লোকজনকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ শুরু করে দিলেন। সতর্ক করে দিলে উত্তেজনাবশত বেখেয়ালে মুখ মাইক্রোফোন থেকে না সরিয়ে আফসোস করে বললেন, 'স্যার, আপনি তো বলছেন, কিন্তু আমি

বল্লায় জনসভা

কি করমু, এই বল্লায় দাঁড়ালে আর বল্লার মানুষদের দেখলেই আমার মুখ দিয়ে আর ভাল কথা আসেনা। এই শালারা আমারে নয়টা মাস কি জ্বালানই না জ্বালাইছে, এ গ্রামের শালার সবাই দালাল।' খেদোক্তিগুলো বল্লার জনগণের উদ্দেশে বলা না হলেও মাইকে কথাগুলো ধরা পড়ায় জনতা স্পষ্ট শুনতে পেলেন। নজরুল ইসলাম ও তার পর আনোয়ার উল আলম শহীদ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করলেন। আমি সবাইকে সালাম ও অভিনন্দন জানিয়ে বললাম,

"নিঃসন্দেহে এটা ঠিক, বল্লার কিছু মানুষ ঘোরতর অপরাধ করেছে এবং তারা অতি অবশ্যই নিকৃষ্টতম মানুষ। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, বল্লার সমস্ত লোকই খারাপ। এই নজরুল, এই রশিদ, এই শহীদ, এরা নয়টা মাসই আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে প্রশংসনীয় কাজ করেছে। বল্লায় নিঃসন্দেহে কয়েক শত রাজাকার তৈরী হয়েছিল, আবার বল্লা থেকেই শতাধিক বীর, ত্যাগী, দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধার সৃষ্টি হয়েছিল। আমি বুঝি বল্লাতে অবস্থানের সময় ফজলু সাহেবকে খুবই বিরক্ত হতে হয়েছে। কিন্তু কিছু লোকের জন্য সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা, অপরাধী করা মোটেই সমীচীন ও যুক্তিসংগত হবেনা।' সবাইকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করলাম। জনসভা শেষে বল্লা-টাংগাইলের কাঁচা রাস্তা ধরে টাংগাইলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

৭ই জানুয়ারী টাংগাইলে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। রাত সাড়ে আটটায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির উড়ো খবরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং শূন্যে এলোপাথারী গুলি ছুঁড়তে লাগল। প্রথম অবস্থায় কি ঘটছে কেন ঘটছে বুঝতে না পেরে সাধারণ মানুষ কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলেন।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির গুজবে মুখরিত টাংগাইল

মুক্তিবাহিনীর নেতৃস্থানীয় অনেকে ও আমিও ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা উদ্বিগ্ন হলাম। কোম্পানী হেড-কোয়ার্টারগুলোতে বার বার ফোন করেও কোন যোগাযোগ স্থাপনে সদর দপ্তর ব্যর্থ হলো। প্রতিটি কোম্পানী হেড-কোয়ার্টারের ফোন অনবরত বেজে চলল অথচ ধরার কেউ নেই। প্রায় পনের মিনিট আপ্রাণ চেষ্টা করে সদর দপ্তরের বেতার বিভাগ দু'তিনটি শিবিরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সফল হলো। তাদের কাছ থেকে গোলাগুলির কিছুটা কারণ জানা গেল। আনোয়ার উল আলম শহীদ ও নুরুন্নবীকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসিয়ে ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান, মেজর হাবিব, ক্যাপ্টিন ফজলু ও ক্যাপ্টিন সবুর সহ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। শূন্যে ছোঁড়া অজস্র গুলি বৃষ্টির মত যত্রতত্র আকাশ থেকে মাটিতে পড়ছিল। গুলি-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র আচ্ছাদন মাথার হেলমেট। আমরা দ্রুত প্রতিটি শিবিরে যাচ্ছি এবং শূন্যে এলোপাথারী গুলি ছোঁড়া বন্ধ করছি। অনেক শিবিরে আবার এমনও হলো, গুলি বন্ধ করে আমরা কিছুদূর সরে যেতেই আনন্দ উদ্বেল দিশেহারা মুক্তিযোদ্ধারা আবার গুলি ছোঁড়া শুরু করে দিচ্ছে। অনেক কষ্টে রাত সাড়ে এগারটা-বারটা নাগাদ গুলি-বৃষ্টি সম্পূর্ণ বন্ধ করা গেল। কয়েক ঘন্টার জন্য টাংগাইলের মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংবাদে বিহ্বল দিশেহারা হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

ফেলেছিল। গভীর রাতে সকল কমান্ডারদের সদর দপ্তরে ডেকে কঠোরভাবে শাসানো হলো। তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হলো, 'উড়ো খবর তো দূরের কথা, সত্যি খবরেও আর শূন্যে এলোপাথারী গুলি চালাতে পারবেনা। একটি গুলি ছুঁড়তে হলেও উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হবে।' দৃঢ়তার সাথে কমান্ডারদের বললাম, 'স্বাধীনতা যুদ্ধে তোমাদের অপরিসীম অবদান থাকার কারণে ছোট-খাটো দু'একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির জবাবদিহি না চাইলেও পরবর্তীতে বিনা অনুমতিতে একটি গুলিও যদি ছোঁড়া হয়, তা'হলে তোমাদের প্রতি কঠোর হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবোনা।' কপাল ভাল, রাতে শূন্যে কয়েক লক্ষ গুলি ছোঁড়া হলেও কারো কোন ক্ষতি হয়নি।

আনন্দ-বিস্ফোরণ

৮ই জানুয়ারী দুপুর বারটার মধ্যে টাংগাইলের মুক্তিযোদ্ধারা জেনে গেল, প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশ সময় অপরাহ্ন দু'টায় আকাশবাণীর খবরে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের প্রিয় নেতার মুক্তির বার্তা শুনলেন। সারাদেশে একটা খুশীর বান ডেকে গেল। মুক্তি-যোদ্ধাদের মধ্যেও আনন্দের সীমা নেই। দেশ শত্রুমুক্ত স্বাধীন হওয়ার পর আনন্দঘন মুহূর্তগুলোর মাঝেও পুঞ্জীভূত শূন্যতা, অপরিপূর্ণতার বিষন্ন রাতের ঘন অন্ধকার অবসান হলো জাতির পিতার নিশ্চিত মুক্তির সংবাদে। মুক্তিযোদ্ধাদের মন বর্ষার জলে দুই কুল ভাসানো পূর্ণ যৌবনা উচ্ছ্বসিত নদীর মত বেগবান। বাংলা ও বাঙালীর অস্তিত্ব ও বাঁচার লড়াইয়ে ওতপ্রোতজড়িত শ্লোগান—'জয়বাংলা'র বজ্রধ্বনিতে সারা টাংগাইল প্রকম্পিত হলো, পরতে পরতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা নেতা বঙ্গবন্ধুর জয় নিনাদে ঘোষিত হলো নেতার মুক্তির শুভ সূচনার শুভবার্তা। ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখা ও আগামী দিনে দেশ গঠনে যে কোন শত্রুর মোকাবেলা করার সাহস ও প্রত্যয় ঘোষণার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা তোপধ্বনি করার ও প্রতিটি কোম্পানী থেকে একটি করে প্রতীকি গুলি ছোঁড়ার অনুমতি চাইল। সাময়িকভাবে প্রত্যেকের আবেদন অগ্রাহ্য করা হলো। বিকেলে সদর দপ্তরে কমান্ডারদের ডাকা হলো। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো রাত বারটা এক মিনিটে বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে ৩১ বার তোপধ্বনি করা হবে এবং প্রতিটি কোম্পানী, প্লাটুন ও যেখানেই মুক্তিযোদ্ধারা শিবির করে আছে, প্রতি ঘাঁটি থেকে একটি করে মেশিনগান চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গপিতার মুক্তির আনন্দ ধ্বনি করতে পারবে তবে গুলির পরিমাণ প্রতি মেশিনগান পিছু কিছুতেই এক হাজারের বেশী হতে পারবেনা এবং শূন্যেও গুলি ছোঁড়া যাবেনা। বাংকার খুঁড়ে মেশিনগানের নল বাংকারে ঢুকিয়ে তবে গুলি ছুঁড়তে হবে। এতেই মুক্তিযোদ্ধারা খুশী। পরিকল্পনা অনুযায়ী টাংগাইল বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠের উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বালম্বি সারিতে প্রতিটিতে দুই পাউন্ড ওজনের ৩১টি বিস্ফোরক দলা নির্দিষ্ট দূরত্বে পর পর রাখা হলো। পাঁচ সেকেন্ড অন্তর একের পর একটিতে অগ্নিসংযোগ করা হলো। একই সময়ে প্রায় তিনশ'টি শিবিরের মুক্তিযোদ্ধারা একসংগে মেশিনগান থেকে একনাগাড়ে গুলি ছুঁড়ে আনন্দ প্রকাশ করল। মুক্তিযোদ্ধাদের আনন্দ বিস্ফোরণের দোলায় সারা টাংগাইল কিছুক্ষণের জন্য কেঁপে কেঁপে উঠল।

৯ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে লন্ডনে পৌঁছলে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বাঙালী জাতির স্থপতি, সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত প্রাণপ্রিয় নেতাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানালেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘর আষাঢ়ের ভরা পুকুরের স্বচ্ছ পানির মত আনন্দ টলমল করছিল। আমার মনও ময়ূরের মত পেখম মেলে নাচছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর মাঝের

কটা দিনের অব্যবস্থা ও অনেক অশুভ শংকা মুহূর্তে আমার মন থেকে মুছে গেল। সকলের মত আমারও আগ্রহ, বঙ্গবন্ধু কখন বাংলার পূতঃপবিত্র শ্যামল মাটির স্পর্শ পাবেন।

১০ই জানুয়ারী ১৯৭২ সাল। ব্রিটিশ রাজকীয় বাহিনীর একটি বিমান বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে লণ্ডন থেকে ঢাকার পথে দিল্লীতে অবতরণ করলো। ষাট কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে দিল্লীর লাখো জনতা, ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ, সেনাবাহিনীর তিন প্রধান শীর্ষস্থানীয় নেতা ও বৈদেশিক কুটনৈতিক বৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে বিপুলভাবে স্বাগত জানালেন। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ অসুস্থতার জন্য দিল্লীতে ছিলেন না। তিনি বঙ্গবন্ধুকে এ যুগের সব চাইতে বড় অহিংস গান্ধীবাদী নেতা বলে আখ্যায়িত করে পালাম বিমান বন্দরে শুভেচ্ছা বার্তাসহ মালা দিয়ে তার রাজনৈতিক সচিব অমরেশ চন্দ্র সেনকে পাঠালেন। পরে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে সম্বর্ধনার জবাবে প্রথমে ইংরেজীতে দু'একটা কথা বলার পর জনতার আকুল আন্তরিক আবেদনে বঙ্গবন্ধু তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে উদাত্ত কণ্ঠে সহজ বাংলায় এক অবিস্মরণীয় বক্তব্য রাখলেন। এই সভায় এক পর্যায়ে তিনি বললেন, 'আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে ভারতের সাথে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার মতের এত মিল কেন? আমি বলি এ মিল আদর্শের মিল, গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের মিল। ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আমিও আজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি, তাই আমাদের মধ্যে এত মিল। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ভারতবাসীকে। তারা আমার এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, খাইয়ে-পরিয়ে-বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে আমি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। দুনিয়ার এমন কোন দেশ নাই, যেখানে তিনি যান নাই এবং সেই দেশের নেতাদের বলেন নাই যে, শেখ মুজিবকে মুক্তি দাও। আমাদের উভয় দেশের বন্ধুত্বের ফাটল ধরানোর চেষ্টা করা হবে। আমরা সেই চেষ্টা কিছুতেই সফল হতে দেবনা।' দিল্লী থেকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রাজকীয় বিমানটি আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কোলকাতার মানুষ দেশে ফেরার পথে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা স্বাধীন বাংলার স্রষ্টা শেখ মুজিবর রহমানকে কিছুক্ষণের জন্য পেতে চেয়েছিলেন। কোলকাতায় ব্রিগেড ময়দানে তারা একটা সম্বর্ধনার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা ও দেশের মাটিতে নাড়ীছেড়া টানে কোলকাতার মানুষ এদিন বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেলেননা। তবে বঙ্গবন্ধুর আবাল্য স্মৃতিবিজড়িত কোলকাতা ও কোলকাতার মানুষদের তার সান্নিধ্য পেতে বেশী সময় অপেক্ষা করতে হলোনা। ২রা ফেব্রুয়ারী '৭২ সাল কোলকাতায় একদিনের জন্য গিয়ে কোলকাতাবাসীর হৃদয়ের দাবী তিনি পূরণ করলেন। কোলকাতার বুকে অতীতকালে অত বড় জনসমাবেশ আর কখনও হয়নি। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সম্বর্ধনা সভাই ছিল কোলকাতায় স্মরণাতীত কালের বৃহৎ জনসমাবেশ। অনেকে বলেন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর সম্বর্ধনা সভার সমাবেশে তার চাইতেও বেশী জন সমাগম হয়েছিল।

দিল্লীতে বঙ্গবন্ধু

১০ই জানুয়ারী বিকেল তিনটায় ২৯২ দিন পাক-দস্যুদের কারাগারে বন্দী থেকে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা বাংলা ও বাঙালী জাতির গর্ব, বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষের প্রধান অলোকদিশারী বঙ্গপিতা শেখ মুজিবর রহমান তেজগাঁ বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন। তেজগাঁ বিমান বন্দরের উত্তাল উচ্ছ্বসিত বিশাল জনসমুদ্রের কোন বর্ণনা চলে না, তুলনা চলে না। সে একক, অতুলনীয় দৃশ্য। তেজগাঁ বিমান বন্দরে পূর্বে অসংখ্য বার বিভিন্ন উপলক্ষে বিপুল জনসমাবেশ হয়েছে। কিন্তু এ দিনের সমাবেশের কাছে অতীতের সকল ইতিহাস ম্লান হয়ে গেল। তেজগাঁ বিমান বন্দরে লাখো লাখো মানুষ সমস্ত নিয়ম-শৃংখলা ভুলে বাংলার পরম প্রিয় নেতাকে যেভাবে পারলেন সম্বর্ধনা জানালেন। বিমান থেকে অবতরণের সিঁড়ির মুখে সারিবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের উপেক্ষা আর অগ্রাহ্য করে কয়েকজন যুবক বিমানের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে বঙ্গবন্ধুকে জাপটে ধরে তাদের হৃদয়ের উত্তাপ প্রকাশ করলেন। কে নেতা, কে কর্মী, কে আপন, কে পর সব যেন একাকার হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুকে বিমান থেকে নামিয়ে অভিবাদন মঞ্চে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ল। ফুল, ফুলমালা, তোড়া দিয়ে, কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুকে স্পর্শ করে, কেউ বা আবার শুধু কাছ থেকে এক নজর দেখে লক্ষ লক্ষ জনতা হৃদয়ের ভালোবাসা আর অসীম শ্রদ্ধা জানালেন। ভিড় ঠেলে কোনক্রমে অভিবাদন মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো। তবে অবস্থার কোন উন্নতি হলোনা। উপচানো ভিড় সেখানেও। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সশস্ত্র অভিবাদন জানানোতে মিত্রবাহিনী, বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যে সমস্ত সৈনিক ও যোদ্ধারা দাঁড়িয়েছিলেন, ছাত্র, যুবক, জনতা তাদেরও ঠেলেঠুলে লাইনচ্যুত করে একাকার করে ফেললেন। অনেক কষ্টে ভিড় কোন-রকমে সরানো হলে গার্ড-অব-অনার দেয়া হলো। অভিবাদন পরিদর্শনের পর বঙ্গবন্ধুকে একটি খোলা ট্রাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হলো। তেজগাঁ বিমান বন্দর থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, মাত্র তিন-চার মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগল। পৌনে পাঁচটায় বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তার প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি খুব একটা স্বাভাবিক ছিলেন না, স্বাভাবিকভাবে বক্তৃতাও করতে পারছিলেননা। শুধু কাঁদছিলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কয়েক মিনিটের অবিস্মরণীয় বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন,

স্বদেশের মাটিতে

'যারা বাংলার স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে, আমি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি। সালাম জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যারা নয় মাস হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেছে। সালাম জানাই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে, যারা আমার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করেছেন। আমি সালাম জানাই বাংলার প্রতিটি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, মোক্তার, ডাক্তার ও মা-বোনদের, যারা নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছেন, অমূল্য অবদান রেখেছেন। দেশকে স্বাধীন করেছেন।' পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'ভুটো সাহেব সুখে থাকো। সব বাঁধন শেষ হয়ে গেছে। আমি তোমাদের

ব্যাপারে নাক গলাবোনা। তোমরাও আমাদের ব্যাপারে নাক গলানোর চেষ্টা করোনা।' শেখ মুজিব তাঁর প্রিয় কবিগুরুকে স্মরণ করে বললেন, কবিগুরু তোমার কথা মিথ্যা হয়ে গেছে, বাঙালীরা আজ মানুষ হয়েছে, তারা স্বাধীন হয়েছে।' তিনি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানালেন, 'হানাদার পাকিস্তানীরা নয় মাসে আমার দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আমার মানুষ আজ অসহায়। তারা না খেয়ে আছে। আপনারা আমাদের মানুষদের সাহায্য করুন। ভিক্ষা হিসাবে নয়, সংগ্রামী মানুষকে সংগ্রামী মানুষ হিসাবে আপনারা সাহায্য করুন। দেশবাসীকে শান্ত, সুশৃংখল ও ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। আপনারা শান্ত থাকুন। ধৈর্য ধারন করুন। যারা অন্যায় করেছে, যারা নারীধর্ষণ লুটতরাজ ও খুন-খারাপী করেছে, আমরা তাদের বিচার করবো। পচানব্বই হাজার পাকিস্তানী সেনা আমাদের হাতে বন্দী। তাদের যারাই যুদ্ধ অপরাধের সাথে জড়িত, পুংখানুপুংখ তদন্ত করে তাদের বিচার করা হবে। কারো উপর অন্যায় করা হবেনা। আমার সোনার বাংলার মূল কথাই হলো, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।'

বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এলেন, লাখো লাখো মানুষ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন, অথচ আমাকে সেখানে দেখা গেল না। ১০ই জানুয়ারী সকালে দিল্লী থেকে যখন সরাসরি বঙ্গবন্ধু ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা বেতারে সম্প্রসারিত হচ্ছিল, তখন আমি চারাবাড়ীর কাছে একটি গ্রামে একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। চারাবাড়ী থেকে ফিরলে বেশ কয়েকজন সহযোগী জিজ্ঞেস করলেন,

—স্যার, আপনি বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাতে তেজগাঁ বিমানবন্দরে যাবেননা ?

—আজ বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাবার লোকের অভাব হবেনা। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য নিবেদন করতে যাবো। তবে আজ নয়। আগামীকাল যেকোন সময় আমরা আমাদের প্রিয় নেতাকে দেখতে যাবো।'

দুপুরে কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে পাথরাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম একটি পূর্ব নির্ধারিত জনসভায় যোগ দিতে। এই সভাতেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ টেপ করে পরে তা সমবেত জনতাকে বাজিয়ে শোনানো হলো। পাথরাইল থেকে কদ্দুসের কবর জিয়ারত করতে কদ্দুছনগর গেলাম। কবর জিয়ারত করে শোকসন্তপ্ত বাবা-মাকে সান্ত্বনা দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে রাত দশটায় টাংগাইল ফিরলাম।

টাংগাইল ওয়াপদা ডাকবাংলোয় সত্তর-আশি জন সহকর্মীর সাথে বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার গুরুত্ব, বিশ্বরাজনীতিতে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ভূমিকা ইত্যাদি নানা আলাপ-আলোচনা করছিলাম। আলাপ-আলোচনায় কখন রাত

বঙ্গবন্ধুর ফোন

এগারোটা বেজে গেছে কেউ আন্দাজ করতে পারিনি। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। আমি তখন খুব কমই টেলিফোন ধরতাম। কিন্তু কেন যেন নিজেই টেলিফোন ধরলাম। টাংগাইলে তখনও স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ হয়নি।

টেলিফোন ধরতেই অপারেটর আমার ছেলেবেলার বন্ধু আবদুর রহমান লুলু শশব্যস্ত হয়ে বললো, 'স্যার, বঙ্গবন্ধু কথা বলবেন। বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে আছেন।'

'হ্যালো' বলতেই অপর প্রান্ত থেকে গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে এলো, 'হ্যালো, কাদের? তুই কেমন আছিস্?'

'ভালো আছি' বলার আগেই বঙ্গবন্ধু আবার বললেন, 'কি? আপনাকে যে সারাদিনে দেখতে পেলামনা! আপনি কি আসতে পারেন?'

আমার জীবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে টেলিফোনে এই প্রথম কথা। ভাবতে পারিনি বঙ্গবন্ধু নিজে ফোন করবেন। স্নেহময় পিতার ডাকে আনন্দে খুশীতে অভিভূত হয়ে বললাম, 'ভালো আছি। খুব ভালো আছি। এখন আরো ভাল লাগছে। যখন বলবেন তখনই আসতে পারি। বললে রাতেই আসতে পারি। তবে দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে। কারণ, টাংগাইল-ঢাকা রাস্তার বাইশ-তেইশটা পুল নেই।'

'না, তোকে রাতে আসতে হবেনা। তুই সকালে চলে আয়। তোকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তোর সম্পর্কে অনেক শুনেছি। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করবো।' বলেই বঙ্গবন্ধু টেলিফোন ছেড়ে দিলেন। টেলিফোনটি কার তা প্রথম বুঝতে না পারলেও, মিনিট দু'য়েকের কথায় সহযোদ্ধারা বুঝে নিল, স্বয়ং বঙ্গবন্ধু টেলিফোন করছেন। বঙ্গপিতা ঢাকায় এসেই আমাদের খোঁজ করেছেন, এ জেনে সহযোদ্ধারা আরও বেশী আনন্দিত, অনুপ্রাণিত ও গৌরবান্বিত বোধ করলো।

বঙ্গপিতার সান্নিধ্যে

রাতে কারো চোখে ঘুম এলো না। আনন্দ, উত্তেজনা, উদ্দীপনায় সবার রাত কাটলো। শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ভোর সাড়ে পাঁচটায় টাংগাইল থেকে রওনা হয়ে সাতটায় ঢাকা ধানমণ্ডীর ১৯ নম্বর রোডে পেঁছিলাম। গেটে পুলিশ প্রহরা। নিয়মমাফিক পুলিশের কাছে ভিতরে যাবার অনুমতি চাইবো, এমন সময় এক মধ্যবয়সী পুলিশ ইন্সপেক্টর দৌড়ে এসে প্রথমে সামরিক অভিবাদন ও পরে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। ভদ্রলোককে টেনে তুলে দেখি, আমাদের বাহিনীরই সদস্য। 'তুমি এখানে কি করে?'

'বঙ্গবন্ধু আসার পর তার বাসা পাহারায় থাকা উচিত। অথচ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাহারা দেওয়াটা খুব শোভনীয় নয়, এমন অবস্থায় আমরা যারা ঢাকায় ছিলাম, তাদের মধ্যে থেকে আমাকে সহ চল্লিশ জন গতকাল থেকে এখানে ডিউটি দেয়া হয়েছে।'

পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাথে কথা বলতে বলতেই বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। বারান্দার নীচে শতাধিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পরিচালকদের সাথে বঙ্গবন্ধু কথা বলে ভিতরে এসে বসলেন। এমন সময় ছাত্রদের মধ্যে দু'চার জন বার বার পিছনে তাকিয়ে একে অপরকে বললে, 'ঐ যে কাদের সিদ্দিকী এসেছে।' কাদের সিদ্দিকী এসেছে কথাটা মুখে মুখে এদিক-ওদিক হতেই বঙ্গবন্ধুও শুনলেন। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে ছাত্রবন্ধুদের ভিড় ঠেলে বঙ্গবন্ধুর সামনে গিয়ে প্রথমে সামরিক কায়দায় তারপর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে পর পর দুটো মালা একটি মুক্তিবাহিনী ও অন্যটি নিজের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর গলায় পরিয়ে দিলাম।

বঙ্গবন্ধু দুই হাতে জাপটে ধরে হারানো পুত্র ফিরে পাওয়ার মত আনন্দে কোলে তুলে এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতরে চলে এলেন। বাড়ীর ভিতর করিডোরে আমাকে একবার ছেড়ে দিয়ে আবার কোলে তুলে নিলেন। বাসেত সিদ্দিকী, আনোয়ার উল আলম শহীদ, নুরুন্নবী, সৈয়দ নুরু, ফারুক, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, এনায়েত করিম, সবুর, হাবিব, নুরুল ইসলাম ও অন্যান্যরা ততক্ষণে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বঙ্গবন্ধুর কাণ্ড দেখছে। বঙ্গবন্ধু স্নেহময় পিতার মত উচ্ছল, শিশুর মত প্রগলভ। তিনি যেন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলেননা। বার বার অস্ফুট স্বরে কি বলছেন, আর আমাকে একবার কোলে তুলছেন, আবার ছেড়ে দিচ্ছেন। তিন-চার বার এমনি করে এক সময় তাঁর গলা থেকে মালা দুটো খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিতে গেলে আমি আপত্তি করলাম।

—না, আমি মালা নিই না। মালা নেবার যোগ্যতা আমার হয়নি। এই মালা আমার জন্য নয়, আপনার জন্য।

বঙ্গবন্ধু আমার মাথায় আলতোভাবে থাপ্পড় মেরে বললেন, এই মালা দুটি আমি তোকে পরিয়ে দিলাম।'

এই সময় বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, কন্যা ও পুত্ররা এলে আমাকে দেখিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দেখ, আমার কাদের যুদ্ধ করেছে। এই দেখ, এরাই হচ্ছে কাদেরের সাথী।' বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী কৌতুকচ্ছলে বললেন, 'এ খবর নতুন নয়, আমি তোমার অনেক আগেই জানি।' বঙ্গবন্ধু প্রতিটি সহযোদ্ধার সাথে এক এক করে আলিঙ্গন করে অবাক বিস্ময়ে বার বার প্রশ্ন করলেন, 'তোরা কি করে দুর্দান্ত নরপশু সীমারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলি। সত্যি তোরাই বাংলার গৌরব। তোরা আমার আহ্বানের মর্যাদা রেখেছিস। এখন আমাদের দেশ গড়তে হবে।'

বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের পটভূমিকায় আমি সামান্য প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা করতে চাই। দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পল্টন ময়দানে আমরা প্রথম জনসভা করেছিলাম। স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম আমার নামে সরকারী গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল, যদিও তা কার্যকরী হয়নি। যে কোন কারণেই হোক, কিছু নেতাদের ধারণা হয়েছিল, আমি সহজে অস্ত্রত্যাগ করবোনা। অথচ আমার কোন আচরণে তেমন কিছু কস্মিনকালেও প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে হয় না। '৭১ এর শেষ দিনগুলোতে আমার সম্পর্কে কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতার ভুল বুঝাবুঝি চরমে উঠেছিল। '৭২এ বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ও পরবর্তী কয়েকটা দিনেও এর কোন নিরসন হলো না। বরং ভুল বুঝাবুঝির মাত্রা বেড়েই চললো। কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সত্যমিথ্যা নানা গুজব ছড়িয়ে, নানা কৌশলে, টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর কৃতিত্বকে ছোট করে দেখানোর অপচেষ্টায় মেতে উঠলেন। তাদের কেন জানি আমার সম্পর্কে অযৌক্তিক বিভ্রান্তি, অজানিত ভয়, অমূলক আশংকা ছিল। ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে আমাকে যখন ঢাকা বিমান বন্দরে দেখা গেল না, তখন গুজববাজরা আবার একতরফা নতুন গুজব ও অপপ্রচার ছড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ, মোক্ষম অজুহাত পেয়ে গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা দীর্ঘদিনের চর্চিত পরিশীলিত কুটকৌশলে কখনও বা নগ্নভাবে নানা ঘটনাকে উপমা করে আমার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর কান ভারী করার অপচেষ্টা করলেন। তারা অনুভূতিতে খোঁচা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে এও বুঝাতে চেষ্টা করলেন, 'সবাই আপনাকে শুভক্ষণে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে, শুধু সে (কাদের সিদ্দিকী) আসেনি—এর অর্থ কি? এর অর্থ একটাই, সে আপনাকেও মর্যাদা বা পাত্তা দিতে চায় না; আপনার উপস্থিতিও সে খুব একটা তোয়াক্কা করে না।' রাজনৈতিক তত্ত্বে অভিজ্ঞ অনেকে আবার মন্তব্য করলেন, 'অল্প বয়সে হাতে অস্ত্র এলে অনেকেই অমন উগ্র হয়, অত্যাচারীতে পরিণত হয়, ধরাকে সরা জ্ঞান করে।' নিরন্তর বানোয়াট অভিযোগ শুনতে শুনতে বঙ্গবন্ধুর মনেও হয়তো দু'চার বার প্রশ্ন জেগেছিল, 'কেন কাদের এলো না? লণ্ডনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকেরা গুলি করে দুষ্কৃতিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার ছবি দেখিয়ে বার বার বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কে এই কাদের সিদ্দিকী?' বঙ্গবন্ধু স্বাভাবিকভাবে বলেছিলেন, 'ও কাদের, আমার ছেলে।' দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও আমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কাদের সিদ্দিকীকে চেনেন কি?'

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক উত্তর দিয়েছিলেন, 'কাদের আমার ছেলে।'

পরবর্তীতে এই নিয়ে অনেকের ভুল ধারণা হয়েছিল, 'সত্যিকারের কাদের সিদ্দিকী কার ছেলে?' বঙ্গবন্ধুর 'আমারই ছেলে' কথাটার অর্থ হয়তো অনেকেই সেইদিন সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ না করা পর্যন্ত যেখানেই যাত্রার সাময়িক বিরতি দিয়েছেন, সেখানেই বঙ্গবন্ধু আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন এবং পিতৃসুলভ উত্তর দিয়েছেন, তারপরও তেজগাঁ বিমান বন্দরে আমার অনুপস্থিতি সম্ভবত বঙ্গবন্ধুর মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারে সাপ না খুঁজে পিতৃত্বের কর্তৃত্বে, নেতার অধিকারে, ভাইয়ের উদার ভালবাসায় রাত এগারোটায় তিনি সরাসরি আমাকে ফোন করেছিলেন।

আনন্দের আতিশয্যের অবসরে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত খোলাখুলি ও সরলভাবে বললেন, 'অনেকে অনেক কথা বলেছে। আমি বিশ্বাস করি নাই। তাই তোকে ফোন করেছিলাম। তোর কথা আমি জেল থেকে বেরিয়েই শুনেছি। লন্ডনে অনেক সাংবাদিক তোর কথা জিজ্ঞেস করেছে। তোর অস্ত্র হাতে দুর্দান্ত সব ছবি দেখিয়েছে। অসংখ্য পত্রিকা তোর বিরুদ্ধে বড় বড় হরফে সংবাদ পরিবেশন করেছে। তাতেই আমি বুঝেছিলাম, সত্যিই তুই কাজের মত কাজ করেছিস। ইন্দিরা গান্ধী তোর কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আমি সবাইকে বলেছি, 'কাদের আমার ছেলে'।'

এরপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহময় পিতার দরদ নিয়ে বললেন, 'তুই এখন বল্, আমি ভুল বলেছি?'

বঙ্গবন্ধুর নৈকট্যের পরশে আমি অভিভূত। আবেগজড়িত কণ্ঠে বললাম, 'মোটেই না। আপনি ভুল করলে আমরা স্বাধীনতা পেতামনা। আজও আপনি ভুল করেননি, ভবিষ্যতেও করবেননা বলে আমাদের বিশ্বাস।'

অনেক কথার পর বাড়ীর গেট পর্যন্ত এসে বঙ্গবন্ধু আমাদের বিদায় জানালেন। এই সময় মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা বীর সেনানী খালেদ মোশাররফ বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রথম সাক্ষাতের তিন দিন পর আবার ঢাকায় এলাম। উদ্দেশ্য, দৈনিক বাংলাদেশ অবজার্ভারে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর উপর একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ চার ছাত্রনেতা—নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুছ মাখনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করা। যদিও প্রথমত এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে জানানোর তেমন পক্ষপাতি ছিলামনা; তবুও সহকর্মীদের প্রবল চাপে শীর্ষস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে বাধ্য হলাম। বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলেও আমি এই ব্যাপারে মুখ খুললামনা। আনোয়ার উল আলম শহীদ, নুরুন্নবী, অধ্যাপক রফিক আজাদ, অধ্যাপক মাহবুব সাদিক, ফারুক আহমেদ, সৈয়দ নুরু, মোয়াজ্জেম হোসেন খান ও এনায়েত করিম বঙ্গবন্ধুর সামনে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেন। এখানে মোয়াজ্জেম হোসেন খানের চিরাচরিত স্বাভাবিক গমগমে গলার প্রাধান্য মোটেই কমলোনা। তাদের অভিযোগ, 'স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি। চার

ক্রোড়পত্র প্রকাশে বাধা

ছাত্রনেতা সংবাদপত্র অফিসে হুমকি দিয়ে টাংগাইল মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে ক্রোড়পত্র প্রকাশ বন্ধ করে চরম অন্যায় ও গর্হিত অপরাধ করেছে। নেতা হিসাবে আপনি এর ব্যবস্থা নিন।' বঙ্গবন্ধু নানা দেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত টেনে এবং বিবিধ যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, 'তোরা বুঝতে পারছিস্ না। স্বাধীনতার পর এমন দু-চারটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটে। এই জন্য উত্তেজিত হলে চলেনা। আমি নিশ্চয়ই একটা কিছু করবো।'

কিন্তু না, সহযোদ্ধাদের তাৎক্ষণিক একটা ফয়সালা চাই। আমি বঙ্গবন্ধুর পাশে মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকে দেখিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি কাদেরের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলব। তোরা এখন আমাকে অব্যাহতি দে।' তারপর আমাকে বললেন, 'তুই এদের শান্ত কর। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।' এরপর সবার উদ্দেশে বললেন, 'একটা ক্রোড়পত্র না বেরুনোয় তোদের দুঃখ হয়েছে। তোদের উপর যাতে একশ' ক্রোড়পত্র বের হয়, আমি তার ব্যবস্থা করব।' এরপরও সহযোদ্ধারা ক্ষোভ, উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'ক্রোড়পত্র না বেরোনোয় দুঃখ নাই। আমরা নামের কাঙাল নই। হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করে ক্রোড়পত্র প্রকাশে ছাত্রনেতারা হস্তক্ষেপ করে যে অন্যায় করেছেন, আমরা তার বিচার চাই।' আমি দীর্ঘ সময়ের নীরবতা ভেঙে সহযোদ্ধাদের বললাম, 'তোমাদের এর পর আর কথা বাড়ানো যুক্তিযুক্ত ও শোভন নয়। নেতাকে সময় দেয়া উচিত।'

মুখর সবাই এতে নীরব হলো। সহযোদ্ধাদের নিয়ে বেরিয়ে যাবো এ সময় বঙ্গবন্ধু আমাকে কিছু সময় থাকতে বললেন। সহযোদ্ধারা চলে গেল। কিছু পরেই বঙ্গবন্ধু বঙ্গভবনে গেলেন। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী ঃ রাষ্ট্রপতি আবু সাইদ চৌধুরী

১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাব শপথ গ্রহণ করলেন। একই দিনে টাংগাইলের কালিহাতী থানার নাগবাড়ী নিবাসী কট্টর মুসলীম লীগার মরাহুম আবদুল হামিদ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র আবু সাইদ চৌধুরী গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন।

১৬ই জানুয়ারী বেইলী রোডের গণভবনে (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হাউস) ডেকে নিয়ে অস্ত্র জমা দেয়া সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি সাদা মাটা, কোনরকম রাখঢাক না করে সরাসরি বললেন, 'নানা স্থানে অস্ত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ভাল নয়, নিরাপদও নয়। তোরা কি করবি।

আত্মসমর্পণের প্রাথমিক আলোচনা

নেতাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, 'আমাদের কাছে নেতার আদেশই শিরোধার্য।'

এর পর আর অস্ত্র জমা দেয়া সম্পর্কে তেমন কোন কথা হলোনা।

গণ-ভবন থেকে বেরিয়ে কেন জানিনা, কি ভেবে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী সাহেবের সাথে দেখা করতে

তার বাসভবনে গেলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ন্যূনতম সৌজন্যমূলক আচরণও করলেন না। ওসমানী সাহেবের ঘরে ঢুকতে আমাকে পাক্কা পাঁচ মিনিট বিনা কারণে ও কোন দর্শনার্থী না থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষা করতে হলো। ঘরে ঢুকে সামরিক অভিবাদন করার সময়ও সকল নিয়ম-শৃংখলা শিকেয় তুলে ভদ্রতার লেশটুকুও ভুলে ওসমানী সাহেব বসে রইলেন। উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দেয়া কিংবা বসতে বলার শিষ্টাচারটুকু দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেননা। অগত্যা অভিবাদন শেষে আহবান ছাড়াই অন্য একটি সোফায় বসে ওসমানী সাহেবের কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। এই সময় আগুনে ঘি ঢেলে দেয়ার মত ওসমানী সাহেবের রাগ দ্বিগুণ হওয়ার অনাকাঙ্ক্ষিত ও আকস্মিক একটি কারণ ঘটে গেল। ওসমানী সাহেবকে উপহার দেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের ছবি সম্বলিত একটি এ্যালবাম এনেছিলাম। ভুলক্রমে এ্যালবামটি গাড়ীতেই ছিল। কথা শুরু হতেই একজন সহযোদ্ধা এসে বললো, 'সি. ইন. সি. স্যার, ওটা যে গাড়ীতে ফেলে এসেছি। নিয়ে আসব কি?' আর যাবে কোথায়? অভিযোগ এখানেই প্রমাণিত হয়ে গেল। সহযোদ্ধাটির আর গাড়ী থেকে এ্যালবাম নিয়ে আসা হলোনা। ওসমানী সাহেব দাবানলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন। সামনের ছোট টেবিল বার বার সজোরে চাপড়ে তার বিখ্যাত মোছ নাড়িয়ে নাড়িয়ে চোখেমুখে গনগনে আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'একটা দেশে কয়টা সি. ইন. সি. থাকে? তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ কর? আমি অনেকবার শুনেছি, খুব একটা বিশ্বাস করিনি, আজকে আমার সামনেই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে?'

ওসমানী সকাশে

আগের থেকে ওসমানী সাহেবের বিরাগের কারণ কিছুটা জানতাম। রাগের পরিমাণ যে এত বড় বারুদ স্তূপে পরিণত হয়ে আছে, যাতে কণামাত্র উত্তাপ লাগলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তা অবশ্যই জানা ছিল না। ওসমানী সাহেব নিঃসন্দেহে একজন স্বনামধন্য বাঙালী সেনাপতি। যদিও মুক্তিযুদ্ধে তার সেনাপতিত্বের কৃতিত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। তার সফলতা ও ব্যর্থতারও সত্যিকার মূল্যায়ন হওয়া উচিত। আতাউল গণি ওসমানী, এই নামটা একদা নিঃসন্দেহে বাঙালীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। আবার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অথবা পরবর্তীতে অনেককে হতাশ ও বিরোধী করে তুলেছে। ১০ই জানুয়ারী ওসমানী সাহেব ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ. জলিলের মত একজন কৃতি মুক্তিযোদ্ধাকে গ্রেফতার করে স্বাধীন বাংলায় একটি অশুভ পদক্ষেপের সূচনা করেছিলেন। জিয়াউর রহমানকে তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেননা। আমাকে তিনি যারপর নাই অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে খুব কম সময়ে তিনি কোলকাতাস্থ বাসভবনের শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়েছেন। এইসব জানার পর ওসমানী সাহেবের হাম্বিতাম্বি উদ্ধতভাবে টেবিল চাপড়ানো বরদাস্ত করার কোন কারণ ছিল না, যৌক্তিকতাও ছিল না। তবু শান্তভাবে সৌজন্যের সাথে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে বললাম, 'দেখুন, আমি ভাল করে জানি একটা দেশে কয়টা সি. ইন. সি. থাকে। আমি তা শুনতে বা বলতে আপনার কাছে আসিনি। আপনি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ও

প্রধান সেনাপতি। আমি সেই যুদ্ধে এক সাধারণ সৈনিক মাত্র। তাই বিজয়ী সৈনিক হিসাবে সেনাপতির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে এসেছি। আমার বিশ্বাস, সেনাপতির কাছে সেনাপতি-সুলভ আচরণই পাব।'

এই রূঢ় সত্য কথায় ওসমানী সাহেবের মাথায় বাজ পড়লো। প্রবাদ আছে, শক্তের ভক্ত নরমের যম। এই দিনও তাই হলো। শিষ্টাচার বজায় রেখে পাল্টা প্রচ্ছন্ন মৃদু ভর্ৎসনায় ওসমানী সাহেব ভিন্ন চেহারার মানুষ হয়ে গেলেন। তার বদমেজাজ বেমালুম উবে গেল। লজ্জিত হয়েছেন এমনভাবে বললেন, 'না, না, তোমার উপর আমার খুবই বিশ্বাস আছে। তোমার মত ভাল ছেলে হয় না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি তোমার প্রধান সহকারী শহীদকেও তোমার সম্পর্কে আমার গভীর অনুভূতির কথা বলেছিলাম।'

এর পর আর উত্তপ্ত বাতাবরণ রইলনা। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনেক কথা, মিষ্টি ও চা খাওয়ানোর পর স্বাগত জানাতে যে ওসমানী সাহেব সোফা থেকে উঠে দাঁড়াননি, তিনিই এবার দোতলা থেকে নীচে নেমে আমাদের গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

এটা সর্বজনবিদিত যে, ২৪শে জানুয়ারী আমরা এক ঐতিহাসিক সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর হাতে অস্ত্র সমর্পণ করেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা যেমন উপস্থিত হননি, নিমন্ত্রিত হবার পরও তেমনি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ও প্রধান সিপাহ্‌শালার হওয়া সত্ত্বেও আতাউল গনি ওসমানী সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি।

১৬ই ডিসেম্বরের পরে বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধে অংশ নেয়া অসংখ্য যোদ্ধাদের সাথে টাংগাইল মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ ও আলাপ পরিচয় হয়। ২ নম্বর সেক্টরের মায়া, আজিজ, ৩ নম্বর সেক্টরের গিয়াস, সামাদ, আশেকুর রহমান, মাহবুব নজরুল, সিরাজ, আরো অনেকে। এরা ৩ নম্বর সেক্টরে আগরতলার ইছামতী ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়েছিল। এদের কমাণ্ডার ছিলেন মেজর হায়দার। এরা বেশ কয়েকবার ঢাকার নানা স্থানে সফল অপারেশন পরিচালনা করেছেন। ২৩শে মার্চ, সাভারে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উঠালে সাভারের জাতীয় পরিষদ সদস্য খন্দকার নুরুল ইসলাম, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ আনোয়ার জং বাড়াবাড়ি করার অভিযোগ এনে আবদুস সামাদ, মোজাম্মেল হক ও মোহম্মদ গিয়াস উদ্দীনকে প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার করে উম্মাদের মত গালিগালাজ করে। ২৬শে মার্চ পাকিস্তান বাহিনী বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে অনেকেই যখন প্রতিরোধের জন্য নানাদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে, তখন এই দুই—জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আশেপাশে আত্মগোপন করে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি দুই নেতাই যখন পাকিস্তানীদের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে আনে, তখন আগরতলার ইছামতি ক্যাম্প থেকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ বেনজির আহমেদ এসে এদেরকে আগরতলায় ইছামতি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে দুই নেতা দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত অতিথির মর্যাদায়

বিভিন্ন সেক্টরের মুক্তি-যোদ্ধাদের সাথে পরিচয়

ছিল। আমার সঙ্গে এদের ঢাকায় দেখা হলে এত আনন্দের মাঝেও মুক্তিযোদ্ধারা এ ক্ষোভ প্রকাশে ভোলেননি।

৪ নম্বর সেক্টরে লালা, বাবুল, এম. এ জলিল তোহা, প্রেমতোষ সহ অন্যান্যদের সঙ্গে আমার সহযোদ্ধাদের আলাপ পরিচয় হয়। এরা মেজর চিত্তরঞ্জন দত্তের নেতৃত্বে সিলেটের নানা জায়গায় সফল আক্রমণ পরিচালনা করেছেন। কানাইঘাটে এরা সবচেয়ে সফল আক্রমণ চালিয়ে প্রায় দুই কোম্পানী নিয়মিত পাক-হানাদারদের ধ্বংস করে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র দখল করেছিলেন।

৮ নম্বর সেক্টরের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আকস্মিকভাবে গণভবনে আমার সাক্ষাৎ হয়। এ'রা ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ'দের মধ্যে ছিলেন কুষ্টিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুর রহমান। এ'র নেতৃত্বে ছানা, আফতার, শামসুদ্দিন, পণ্টু, কাশেম, ইয়াকুব, ইউনুছ, জাফর, হামিদ, আশা, ছানোয়ার, কাজী কামাল, আরো অনেকে কাজ করছিলেন।

এদের ধর্মদহের যুদ্ধ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে এরা বীরবিক্রমে লড়াই করে হানাদারদের ত্রিশ জনের একটি শক্ত ঘাঁটি দখল করে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র হস্তগত করে। মুক্তিবাহিনীর প্রবল চাপে হানাদাররা টিকতে না পেরে পাঁচটি লাশ ও তিনজন আহতকে ফেলে পালিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীকেও এখানে প্রচুর মূল্য দিতে হয়। এই যুদ্ধে ছোট্ট ছেলে কাঁচ, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বাচ্চু, চাঁনদ, রকিব, নাজির নিহত হয়। কমাণ্ডার হাবিবুর রহমান সহ আরও তিনজন আহত হয়।

আমি সারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর আলোকপাত করছি না। হেতু সারা দেশে যে অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন, অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের কথা লিখতে পারলামনা। যাদের সঙ্গে কোন না কোনভাবে এই সময়ে যোগাযোগ হয়েছে তাঁদের কথাই শুধু সামান্য তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

১৬ থেকে ২০শে জানুয়ারী, এই কদিনে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার আরো অনেকবার দেখা ও কথা হলো। ২০শে জানুয়ারীর আলোচনায় স্থির হলো, টাংগাইল মুক্তিবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে ২৪শে জানুয়ারী শনিবার বঙ্গবন্ধুর হাতে অস্ত্র জমা দেবে। অস্ত্র জমা দেবার তারিখ স্থির হয়ে গেলে, কিভাবে কত সুন্দরভাবে অস্ত্র জমা দেয়ার অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করা যায়, তার পরিকল্পনা নিয়ে টাংগাইল মুক্তিযোদ্ধারা আরেকবার মেতে উঠলো। কর্মসূচী প্রণীত হলো,

অস্ত্র সমর্পণের দিন নির্ধারণ

এক, টাংগাইলের প্রান্তসীমায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তিবাহিনী সাদর সম্বর্ধনা জানাবে এবং টাংগাইলের মূল সভামঞ্চ পর্যন্ত চল্লিশটি মোটর সাইকেল ও একটি জীপে এসকর্ট করে নিয়ে আসবে।

দুই, টাংগাইল শহরে ঢোকার পথে শিবনাথ হাই স্কুল' ময়দানে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে সশস্ত্র অভিবাদন জানান হবে।

তিন, সশস্ত্র অভিবাদন শেষে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে বিন্দুবাসিনী হাই স্কুল মাঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দীর্ঘ ন' মাস মুক্তিযুদ্ধে আমার ব্যবহৃত অস্ত্র, স্টেনগান বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে অস্ত্র জমা পর্বের সূচনা করা হবে।

চার, বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠের অনুষ্ঠান শেষে জাতির জনককে নিয়ে যাওয়া হবে টাংগাইল পুলিশ প্যারেড ময়দানে। সেখানে তাঁর সাথে আমি যৌথভাবে শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবো।

পাঁচ, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন শেষে বঙ্গপিতাকে নিয়ে যাওয়া হবে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গঠিত সমবেত 'ভবিষ্যৎ বাহিনী'র সামনে। ভবিষ্যৎ বাহিনী তাঁকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করবে।

ছয়, মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে টাংগাইল পার্কে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন এবং সভাশেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করবেন।

পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেলে ২২শে জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু আর একবার আমাকে বেইলী রোডের গণভবনে ডেকে পাঠালেন। তিনি ২৪শে জানুয়ারী কর্মসূচী জানতে চাইলে সমস্ত কর্মসূচী পুংখানুপুংখ জানালাম। বঙ্গবন্ধু মাত্র একবার 'গার্ড-অব-অনার' না হলে চলতে পারে কি না, জানতে চাইলেন। আমি দৃঢ়তার সাথে বললাম, 'না, সশস্ত্র অভিবাদন ছাড়া চলতে পারেনা।' বঙ্গবন্ধু অস্ত্র জমা দেয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন ওজর আপত্তি তুললেননা। বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে আসার সময় আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোরা যেটা ভাল মনে করবি, তাই করিস। এই ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে জনসভা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে করবি। আমি রাজধানীর বাইরে এই প্রথম যাচ্ছি, তাই আওয়ামী লীগের জনসভা না হলে সেটা দৃষ্টিকটু দেখাবে। যে দল স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, সেই দল এবং দলীয় কর্মীরা অসহায়বোধ করবে।'

কোন আপত্তি না করে বঙ্গবন্ধুকে কথা দিলাম, বিকেলের জনসভা আওয়ামী লীগের নামেই হবে।

২২শে জানুয়ারী সন্ধ্যা থেকে জনসভা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে হবে, এই মর্মে মাইকে ঘোষণা শুরু হলো। এই ঘোষণার সাথে সাথে নতুন কিছু জটিলতা দেখা দিল। রাজনৈতিক দলের জনসভা হলে সেই দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকই সাধারণত উদ্যোক্তা হন। এইখানে উদ্যোক্তা মুক্তিবাহিনী অথচ জনসভা হবে আওয়ামী লীগের। ভুল বুঝাবুঝি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ঢাকা থেকে টাংগাইল পেঁছিবার আগেই আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা হওয়ার ঘোষণা শুরু হয়েছিল। ঢাকা থেকে মুক্তিবাহিনীর প্রচার বিভাগকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলাম, জনসভা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে হবে, ঘোষণা দিতে। সন্ধ্যার একটু পর টাংগাইল পেঁছিতেই মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীরা এবং আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অসংখ্য কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এলেন। তাদের প্রশ্ন—দুই দিন ধরে মুক্তিবাহিনীর উদ্যোগে জনসভা হবে প্রচারের পর হঠাৎ কি করে এবং কেন তা আওয়ামী লীগের জনসভা বলে প্রচারিত হচ্ছে। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভায় তাদের তেমন আপত্তি ছিল না। তবে এ সময় মুক্তিবাহিনী ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতা সমর্থক অন্যান্য দলের অনেক সদস্যের টাংগাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মান্নান সাহেবকে নিয়ে আপত্তি ছিল। মান্নান সাহেব খুব সম্ভবত টাংগাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি

সভাপতি জটিলতা

কখনও খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। এই অসন্তুষ্টি দেশ স্বাধীন হবার পর আরো ব্যাপক, আরো জঘন্য আকার ধারণ করে। জেলা আওয়ামী লীগের সমস্ত কর্মীরা এই সময় তাদের সভাপতির উপর যারপর নাই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাদের অভিযোগ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে আবদুল মান্নান সাহেব যুদ্ধের সময় কিছুই করেননি। এমনকি তার নিজের জেলার যারা ভারতে গিয়েছিলেন, তাদের প্রতিও ভালো আচরণ করেননি। অনেকের অভিযোগ কোলকাতায় তিনি নাকি পরিচিত কর্মীদেরও চিনতে চাইতেননা। এই সমস্ত কারণে জনসভা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে হবে মেনে নিলেও. মান্নান সাহেবকে সভাপতির আসন দিতে অনেকেই আপত্তি তুললেন। বঙ্গবন্ধু যখন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সভার কথা বলেন, তখন কিন্তু এই ব্যাপারটা মোটেই ভাবিনি। আওয়ামী লীগের জনসভা হলে মান্নান সাহেব সেই সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাধ সাধে মুক্তিবাহিনী, আওয়ামী লীগ ও অন্য দলের কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মান্নান সাহেবকে ভালো করে জানতেন. আমার অমতে ঐ সভায় তার সভাপতিত্ব করা অসম্ভব। মান্নান সাহেব দীর্ঘ সময় তার ভারতে অবস্থান এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ভুল বুঝাবুঝি ও ঘটনা প্রবাহের একটি চিত্র তুলে ধরলেন। মান্নান সাহেবের কথা শেষ হলে বললাম,

—আপনার অনুমান মত আমরা নিঃসন্দেহে খুবই ছোট, খুবই বাচ্চা। কিন্তু গত নয় মাসের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আমাদেরকেই মোকাবিলা করতে হয়েছে। সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার কৃতিত্ব যখন আপনি স্বীকার করতে পারেননা, তখন সকলের অমতে আমার মত দেয়া সত্যিই অসুবিধা।

—তোমাদের কাজের অস্বীকৃতি কোনদিন জানাইনি। আমি পুরোপুরি তোমাদের সমর্থন করি। কিছু দুষ্ট লোক মুক্তিবাহিনীর সাথে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর জন্য নানা কৌশলে উঠে পড়ে লেগেছে।

অনেক আলাপ-আলোচনার পর মান্নান সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হলোনা।

রাত দু'টায় আবার সভা বসলে জানিয়ে দিলাম, 'মান্নান সাহেব কিংবা অন্য কেউ ক'বার কাদের সিদ্দিকীর নাম নিল কি নিল না, মুক্তিবাহিনীকে সালাম জানাল কি কি জানাল না, সেটা আমাদের দেখার কথা নয়। আমি নেতাকে কথা দিয়ে এসেছি, জনসভা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে হবে। চিরাচরিত প্রথা আওয়ামী লীগের জনসভায় জেলা সভাপতি সভাপতিত্ব করেন। আর এই সভাতেও তাই করবেন, এর নড়চড় হবে না।' সমবেতরা নানা জল্পনা-কল্পনা করতে করতে একে একে চলে গেলেন। আমিও বেরিয়ে পড়লাম পরদিনের অনুষ্ঠানগুলির প্রস্তুতি পর্ব শেষবার স্বচক্ষে দেখার জন্য। যুদ্ধকালীন অনেক রাতের মত ২৩শে জানুয়ারীর রাতও বিনিদ্র কাটলো।

নব অধ্যায়ের সূচনা

শনিবার ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭২ সাল। শীতের কুয়াশার চাদর ছিন্ন করে সূর্য আলো ছড়াতে শুরু করেছে। শুরু হলো টাংগাইলের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের। সোনালী আশীর্বাদ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনে উন্মোচিত হলো আমৃত্যু স্মরণযোগ্য স্বর্ণময় একটি দিনের। উৎসবের আমেজে টাংগাইলের ঘুম ভাঙলো। কর্মচাঞ্চল্য সারা জেলায়। টাংগাইলের প্রান্তসীমানা থেকে জেলা শহরের অভ্যন্তরে ছাব্বিশ মাইল পথ নেতাকে নিয়ে আসার সমস্ত দায়-দায়িত্ব মুক্তি-বাহিনীর। স্বাগত তোরন তৈরী, রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জ্ঞাপন, রাস্তা ও সভা সমিতির নিরাপত্তা বিধান, সব কিছুই তাদের হাতে। তাই স্বাভাবিক কারণে মুক্তিবাহিনীর নেতৃস্থানীয়দের মত সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিনিদ্র কর্মব্যস্ত রজনী কেটেছে। তবুও তাদের কোন ক্লান্তি অবসাদ নেই। এমন একটি সুন্দর স্মরনীয় দিনের জন্য তারা শত রজনী তপস্যা করতে পারে, হাজারো ধকল অম্লান বদনে হাসিমুখে সইতে পারে। গোড়াই থেকে টাংগাইল পর্যন্ত দশ-পনের ফুট দূরে দূরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জ্ঞাপনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের সভাস্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাতের মধ্যেই দু'শ বাস ও ট্রাক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিয়ে ট্রাক ও বাসগুলো তাদের আবার নিয়ে যাবার জন্য রাস্তা থেকে দেখা না যায়, এমন স্থানে অপেক্ষা করছিল।

সকাল সাতটায় নেতাকে স্বাগত জানাতে টাংগাইলের প্রান্তসীমা গোড়াই রওনা হওয়ার আগে গণ-পরিষদ সদস্যদের ফোন করে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাতে গোড়াই কে কে যাবেন জানতে চাইলাম। ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করলাম, সবারই যাওয়া উচিত। আপনাদের গাড়ি তো আছেই, প্রয়োজনে যাতে অন্য গাড়ীতে আসতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও করা হবে। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সহযোদ্ধা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো মুক্তিযোদ্ধাদের নানা উপদেশ ও পরামর্শ দিতে দিতে সকাল আটটা পনের মিনিটে গোড়াই এলাম। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন গণ-পরিষদ সদস্যও এসে পেঁছিলেন। প্রথমে পেঁছিলেন শামসুর রহমান খান শাজাহান, হাতেম আলী তালুকদার ও অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ। লতিফ সিদ্দিকী, ফজলুর রহমান খান ফারুক দ্বিতীয় দলে গোড়াই এলেন। বাসেত সিদ্দিকী সাহেব আমাদের সাথেই এসেছিলেন।

সবাই অধীর আগ্রহে নেতার আগমনের অপেক্ষায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। মুক্তিবাহিনীর একটি জীপ বার বার ঢাকার দিকে এগিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিল। জয়দেবপুর ও কালিয়াকৈর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে মুক্তিবাহিনী লোক বসিয়ে রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর গাড়ী জয়দেবপুর পার হতেই যেন খবরটা গোড়াই চলে আসে। সকাল পৌনে ন'টায় প্রথম খবর এলো, বঙ্গবন্ধু চৌরাস্তা অতিক্রম করেছেন। সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধারা একটু তৎপর হয়ে উঠল। স্বাগত

তোরনের কয়েকশত গজ পিছে রাস্তার দুই পাশে ৪০টি মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে ছিল। মোটর সাইকেলগুলো বঙ্গবন্ধুকে এসকর্ট করে নিয়ে যাবে। একখানা হুড খোলা উইলী জীপ নিয়ে সবার আগে থাকবেন অপূর্ব সুন্দর সামরিক পোষাকে সজ্জিত ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান। তিনি কখনও পিছনে, কখনও সামনে, ডাইনে-বামে লক্ষ্য রেখে মোটর সাইকেল আরোহীদের সংকেত দেবেন। মোটর সাইকেল আরোহীদের পিছনে তাকানোর কোন প্রয়োজন হবে না। ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমানকে লক্ষ্য করলেই তারা অনায়াসে বুঝতে পারবে, কখন চলতে হবে, কখন থামতে হবে, আবার কখন গতি বাড়াতে বা কমাতে হবে। ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান গত দু'দিন ধরে মোটর সাইকেল আরোহীদের প্রয়োজনীয় সংকেতগুলো বার বার শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছেন। গোড়াই থেকে টাংগাইল শহর পর্যন্ত ইতিমধ্যেই তিনি ৪ বার মহড়া দিয়েছেন। সর্বশেষ মহড়া হয়েছে রাত চারটায়। ব্রিগেডিয়ার ফজলু তাঁর জীপ টাংগাইল জেলা স্বাগত তোরন থেকে প্রায় আধ মাইল সামনে রেখেছেন। ঠিক দশটায় শতাধিক গাড়ীর দীর্ঘ লাইনে বঙ্গবন্ধুর গাড়ী এসে স্বাগত তোরনের সামনে এসে থামলো। দৌড়ে গিয়ে গাড়ীর দরোজা খুলে দিলাম। বঙ্গবন্ধু গাড়ী থেকে নেমেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মালা দেবার কোন অবকাশ পেলাম না। বঙ্গবন্ধুকে খুব সুন্দর, সতেজ, উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। আমাকে আলিঙ্গন মুক্ত করে গণ-পরিষদ সদস্য ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একেরপর এক করমর্দন ও আলিঙ্গন করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কিভাবে যেতে হবে ? কারে না জীপে যাবো ?' গোড়াই থেকে বঙ্গবন্ধুকে খোলা জীপে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়া হলো।

'আপাতত কারে যাওয়াটাই ঠিক হবে। অসংখ্য পুল ভাঙা। তাই কারেই চলুন।'

বঙ্গবন্ধু কারে উঠে বসলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ডানে আমি বামে। সামনের সিটে গাড়ীর চালক ও বঙ্গবন্ধুর এক দেহরক্ষী। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট খোলা জীপটি কারের ঠিক পিছনে রাখা হলো। সামনে থেকে ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান সংকেত দেয়ার সাথে সাথে সাদা জুতো, মোজা, প্যান্ট, জামা, হাতে সাদা দস্তান, মাথায় সাদা টুপি পরিহিত চল্লিশ জন আরোহী তাঁদের মোটর সাইকেল আস্তে আস্তে, পরস্পর থেকে সমান দূরত্ব রেখে একই গতিতে চলতে শুরু করলো। দেখে মনে হচ্ছিল সোনালী রোদের সাথে এক ঝাঁক সাদা রোদ্দুর খেলতে খেলতে ঢেউয়ের মত দোল খেয়ে এগুচ্ছে। মোটর সাইকেলের সারির পরই বঙ্গবন্ধুর গাড়ী তাল মিল রেখে টাংগাইলের দিকে এগিয়ে চলল। গণ-পরিষদ সদস্যরা খোলা জীপের পরেই তাঁদের জন্য রাখা গাড়ীতে উঠলেন।

এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটল। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গাড়ীর সারি যখন ঢাকার দিক থেকে আসছিল তখন বঙ্গবন্ধুর গাড়ীর আগে পিছে পুলিশ এসকর্ট ছিল। পুলিশরা জীপে রাইফেল ও এল. এম. জি. উঁচিয়ে আসছিল। টাংগাইলের সীমানায় এসে বঙ্গবন্ধুর গাড়ী থামলে ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান বন্দুক উঁচিয়ে আসা পুলিশ ও পুলিশের জীপগুলোকে একেবারে পিছনে সরিয়ে দিয়ে ঝাঁঝের সাথে

পুলিশ দলের নেতা এক ডি. এস. পি-কে বললেন, 'টাংগাইলে বন্দুক উঁচিয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবেনা। রাইফেল, এল. এম. জি টাংগাইলের মানুষ বহু দেখেছে।' তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন—পিছনে গিয়েও তারা যাতে আর রাইফেল, এল. এম. জি না দেখান এমনটাই মুক্তিবাহিনী চায়। একে তো টাংগাইল মুক্তিবাহিনী নিয়ে নানা গুজব, নানা অপপ্রচারের অন্ত নেই, দ্বিতীয়ত বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর মন্ত্রীপরিষদের একজন সদস্যও আসেননি, এমনকি প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সিপাহ্‌সালার মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীও না। তার উপর টাংগাইলের সীমানায় আসতে না আসতেই পুলিশ এস্‌কর্টদের অমনভাবে তাড়িয়ে একেবারে পিছনে সরিয়ে দেয়াতে বঙ্গবন্ধুর সাথে আসা আমলাদের মনে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। যদিও পুলিশদের সরিয়ে দেওয়াটা বঙ্গবন্ধু লক্ষ্য করেননি। তিনি মুক্তিবাহিনীর সুশৃংখল সদস্যদের দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। সুশৃংখল, সুবিন্যস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিখুঁত তালমিল রেখে গার্ড করে নিয়ে যাওয়া দেখে তিনি যারপর নাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। গাড়ী চলা শুরু করতেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কারা ? ওরা কি মুক্তিবাহিনী ? তোর মুক্তিবাহিনী এত কিছু পারে কি করে ?' বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, খেয়াল করার কোন ফুসরত তার ছিল না। অনেক পরে এক আমলা যখন বঙ্গবন্ধুকে জানালো, 'পুলিশদের ঐভাবে পিছনে সরিয়ে দেয়া ঠিক কাজ হয়নি।' তখন অপরাহ্ন, এর পূর্বে মুক্তিবাহিনীর অভুতপূর্ব মনোমুগ্ধকর কর্মকান্ড দেখে তিনি মুগ্ধ, অভিভুত। স্মিত হেসে আমলাটিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা ঠিক কাজই করেছে। ওদের জায়গায় এসেছি, ওদের মতেই চলা উচিত।'

পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, কেন বঙ্গবন্ধু শুধু একা এলেন ? কোন সহকর্মী কেন তার সাথে এলেন না ? সত্যিকার অর্থেই দেশ স্বাধীন হবার পর গুজবে, অপপ্রচারে যে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে অন্যান্যদের না আসাটাই স্বাভাবিক। কারণ আর সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নন। অতীতে তাঁদের শক্তি, সাহস ও বুদ্ধিমত্তার অভাবের পরিচয়ও অসংখ্য বার পাওয়া গিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহকর্মীদের অনেকের ধারণা ছিল, ২৪ শে জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু টাংগাইল গেলে মুক্তিবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে জিম্মি বানাবে। তার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবে, এমন সব ভুতুড়ে লক্ষণও নাকি তাঁরা দেখেছেন। এমনকি কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর টাংগাইল আসার কর্মসূচী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বানচাল করতে চেষ্টা করেছিলেন। যাদের মন কলুষিত, অন্যদের মাঝেও তাঁরা কলুষতা খুঁজেন। বঙ্গবন্ধু যে কত সাহসী, কত মহান, কত নিটোল, নিশ্ছিদ্র তাঁর হিমালয় প্রমাণ আত্ম-প্রত্যয়—তা এখান থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এত উত্তেজনা ও গুজব, এত হৈ চৈ, ভুল বুঝাবুঝির মাঝেও বঙ্গবন্ধুর বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই, উদ্বেগ নেই। তিনি টাংগাইলে এমন আচরণ করলেন, যেন নিজের বাড়ীতে এসেছেন। নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এসেছেন এবং নিজের আত্মীয়স্বজনের মতই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিশে গিয়েছিলেন।

গোরাই থেকে এক মাইলও এগুনো গেলোনা। মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজের

(বর্তমানে টাংগাইল ক্যাডেট কলেজ) সামনে প্রায় দশ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে থামতে হলো। এক-দুই মিনিট ভাষণ দিয়ে আবার তিনি গাড়ীতে উঠে বসলেন। বঙ্গবন্ধুর গাড়ী থামতেই সামনের মোটর সাইকেলগুলো নিখুঁতভাবে সম দূরত্ব বজায় রেখে যেমন থেমে গিয়েছিল, তেমনি বঙ্গবন্ধু গাড়ীতে উঠতেই আবার মোটর সাইকেলগুলো সমান তালে আস্তে আস্তে চলা শুরু করল। ক্যাডেট কলেজ থেকে এক মাইল এগিয়ে গোড়াই কটন মিলের সামনে আবার নামলেন। ভাষণ দিলেন। এরপর মির্জাপুর। মির্জাপুর বাস স্ট্যান্ড লোকে লোকারণ্য। বঙ্গবন্ধু এখানেও বক্তৃতা করলেন। তারপর পাকুল্লা, জামুকী ও নাটিয়াপাড়ায় পথিপার্শ্বে তিনটি সভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। বঙ্গবন্ধু গোড়াই থেকে টাংগাইলের দিকে পার হয়ে যাওয়ার পর পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের জন্য রাখা গাড়ীগুলোতে একের পর এক উঠে পড়ল এবং চলমান গাড়ীর সারিতে মিশে গেল। জনসাধারণকেও টাংগাইল নিয়ে আসার জন্য চারশ' ট্রাক-বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর গাড়ী এগিয়ে যাচ্ছে আর জনতার যে অংশ পিছনে পড়ছেন, তাঁরা একের পর এক গাড়ী বোঝাই হয়ে টাংগাইলের দিকে এগুতে থাকলেন।

বঙ্গবন্ধুর গাড়ী মটরা সেতুর বিকল্প রাস্তা পেরিয়ে মূল রাস্তার উপরে উঠতেই আনোয়ার উল আলম শহীদ ও বিখ্যাত কমান্ডার আবদুস সবুর খান মালা হাতে স্বাগত জানালেন। বঙ্গবন্ধু গাড়ী থেকে নেমে এলে বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা টাংগাইল ক-১৫ খোলা জীপে তাকে তোলা হলো। গাড়ী এগিয়ে চললো। এবার বঙ্গবন্ধুর বাম পাশে জীপের পাদানিতে আমি, ডানে আনোয়ার উল আলম শহীদ। গাড়ীর চালক টাংগাইল রোড এন্ড হাইওয়েজের জীপ চালক নোয়াখালির নূরু। পিছনে টেপ-রেকর্ডার হাতে নাজিবুর রহমান পিণ্টু। বঙ্গবন্ধু জীপে বসে চলতে চলতে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি একদিকে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের তারুণ্য, কর্মস্পৃহা, নব উদ্দীপনা দেখে নতুন বাংলা গড়ায় আশান্বিত হয়ে উঠছিলেন, অন্যদিকে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত সোনার বাংলার শ্মশান রূপ দেখে মাঝে-মাঝে বিমর্ষ ও বেদনাহত হচ্ছিলেন। মটরা সেতু ও বটগাছের মাঝামাঝি একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'টাংগাইলে কি হবে?' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম, 'যা হবার তাই হবে এবং যা হওয়া উচিত।' এই নিয়ে আর কোন কথা হলোনা। করটিয়া সাদৎ কলেজের সামনে এলে বঙ্গবন্ধুকে আবার নামতে হলো। বহু সংগ্রামের পীঠস্থান এই সাদৎ কলেজ। শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধুর মর্যাদায় আসীন করার নিরলস নিরন্তর দীর্ঘ রক্তঝরা সংগ্রামে সারা বাংলার অন্যান্য স্থানের চেয়ে এই কলেজের ভূমিকা মোটেই গৌণ নয়। কলেজের সামনে একশ' গজ পায়ে হেঁটে বঙ্গবন্ধু আবার গাড়ীতে উঠলেন। কিন্তু মাত্র দু'তিনশ' গজ এগিয়ে করটিয়া বাজারের পাশে করটিয়া জমিদার বাড়ী ও বোর্ড অফিসের মাঝামাঝি একটা অস্থায়ী সভার মঞ্চ করা হয়েছিল। এইখানে বঙ্গবন্ধু টাংগাইল শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিপার্শ্বে সর্বশেষ ভাষণ দিলেন। করটিয়া এই সভামঞ্চের আশেপাশে বেশ কিছু সুযোগ-সন্ধানী অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদেরও দেখা গেল, যাদের মুক্তিযুদ্ধে কোন প্রশংসনীয় ভূমিকা নেই। এদের মধ্যে কে. কে পনির পুত্র টিপুকেও মঞ্চের আশে-পাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজাকার সংগঠক

খসরু খান পন্নী ও সেলিম খান পন্নীকে দেখা যায়নি। করটিয়া থেকে টাংগাইলের মাঝে ভাতকুরা গোরস্তানের পাশে বঙ্গবন্ধুকে নামানো হলো।

১২ই ডিসেম্বর যৌথ বাহিনীর বিরাট অংশ যখন ঢাকার দিকে কালিয়াকৈর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। এ সময় অধ্যাপক মুশফিকুর রহমান আবুর নেতৃত্বে পনের-কুড়িজন মুক্তিযোদ্ধা আট-নয় জন দল ছুট হানাদারকে পিছু ধাওয়া করতে করতে ভাতকুরা পর্যন্ত আসে। হানাদাররা কিছুতেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়। মুক্তিযোদ্ধারাও নাছোড় বান্দা। হানাদাররা ছুটে পালাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে পিছন ফিরে গুলি চালাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা তেমন ব্যাপক গুলি ছুঁড়ছেনা। তারা হানাদারদের জ্যান্ত ধরতে বদ্ধপরিকর। ভাতকুরার কাছে মুক্তিবাহিনী যখন হানাদারদের একেবারে ধরে ফেলার উপক্রম করে, তখন হানাদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের উপর ব্যাপক গুলি চালায়। সবাই পজিশন নিতে পারলেও কমান্ডার অধ্যাপক মুশফিকুর রহমানের ছাত্র সদ্যাগত শফি পজিশনে যাবার আগেই তার কণ্ঠনালী ভেদ করে হানাদারদের একটি বুলেট বেরিয়ে যায়। সে সাথে সাথে লুটিয়ে পড়ে। কমান্ডার অধ্যাপক মুশফিকুর রহমান আবু দৌড়ে সহযোদ্ধাটির কাছে গিয়ে দেখে, সব শেষ হয়ে গেছে। যদিও এর পর হানাদারদের ধরতে তাদের বেশী বেগ পেতে হয়নি। মেজর মোকাদ্দেসের কোম্পানীর সহায়তায় কয়েক মিনিট পরই ৮ জন হানাদার নমরুদকে তারা হাতে-নাতে জ্যান্ত ধরে ফেলে। শহীদ শফিকে ভাতকুরা গোরস্তানে যথাযোগ্য মর্যাদায় দাফন করা হয়েছিল। শহীদ মুক্তিযোদ্ধার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত শেষে বঙ্গবন্ধু আবার গাড়ীতে উঠলেন।

ঠিক সকাল এগারোটায় বঙ্গবন্ধু বহনকারী টাংগাইল ক-১৫ টয়োটা জীপ টাংগাইলের শিবনাথ হাই স্কুলের মাঠে প্রবেশ করল। প্রবেশের পথের দুই পাশে দুইটি এবং মাঠ থেকে বেরোবারে পথে দুইটি মোট চারটি সিক্স পাউন্ডার গান সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি অভিবাদন মঞ্চে দাঁড়াতেই এক হাজার সুসজ্জিত মুক্তিযোদ্ধা তাঁকে সশস্ত্র অভিবাদন জানাল। অভিবাদনের সময় একদল মুক্তিযোদ্ধা বাদ্যযন্ত্রে মৃদুলয়ে, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' সুর বাজালো। বঙ্গবন্ধু জড়তাহীনভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। আনোয়ার উল আলম শহীদ ও আমি বঙ্গবন্ধুর দের ফুট পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। সামরিক অভিবাদন শেষে প্যারেড কমান্ডার বিখ্যাত জাহাজ মারা কমান্ডার মেজর হাবিব এগিয়ে এসে বঙ্গবন্ধুকে প্যারেড পরিদর্শন করতে আমন্ত্রণ জানাল। মেজর হাবিবের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু প্যারেড পরিদর্শনে এগিয়ে গেলেন। তিন সারিতে দাঁড়ানো এক হাজার মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যেককে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। পরিদর্শন শেষে মঞ্চে ফিরে এসে দাঁড়াতেই তার সামনে মাইক্রোফোন এগিয়ে দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,'কি বলবো ?'

সশস্ত্র অভিবাদন

—আপনার যা ইচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দিত করে বললেন,

'আপনারা যা করেছেন, তার তুলনা হয়না। আমি আপনাদের দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আপনারা যুদ্ধ করেছেন, স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আজ দেশ গড়ার লড়াইয়ে আপনাদের যুদ্ধ সময়ের মন নিয়েই এগিয়ে আসতে হবে। আমি আপনাদের একজন হয়ে কাজ করব।'

বক্তৃতা শেষে আবার গাড়ীতে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন,

—এরা কারা? এরা কি বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক?

—না, বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন থাকলেও থাকতে পারে। তবে তা হাজারে চার-পাঁচ জনের বেশী হবেনা। এদের প্রায় সবাই কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক ও নানা পেশার লোক।'

বঙ্গবন্ধুকে আরও বললাম, 'আপনি কি করছেন? আপনি এদেরকে 'আপনি আপনি' করছেন! সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের আমি তুমি সম্বোধন করি। যদিও আলাদা আলাদাভাবে অনেককে আপনি বলি। আপনার 'আপনি' বলা শুনে এরা তো হাসবে!'

অস্ত্র হস্তান্তর

ঘড়ির কাঁটা এগারটা ত্রিশ মিনিটের ঘরে। বঙ্গবন্ধুকে বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে অস্ত্র জমা দেওয়ার মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো। অস্ত্র জমা দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে নানা ধরনের হাজার দশেক হাতিয়ার বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে সার করে দাঁড় করা ছিল। তিন হাজার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চের সামনে মাঠের এক পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্গবন্ধু, আনোয়ার উল আলম শহীদ ও আমি মঞ্চে উঠতেই প্যারেড কমাণ্ডার মেজর আবদুল হাকিম মাঠে দাঁড়ানো মুক্তিযোদ্ধাদের সতর্ক করল এবং সশস্ত্র অভিবাদন জানাল। অভিবাদনের জবাবে বঙ্গবন্ধু এবং আনোয়ার উল আলম শহীদ ও আমিও অভিবাদন জানালাম। অভিবাদন শেষে অস্ত্র সমর্পণের প্রতীক হিসাবে আমার ব্যবহৃত স্টেনগান প্রসারিত দুই হাতে সটান দেহ, টান টান সিনা, সুশৃংখল অনিন্দ্য সুন্দর সামরিক ছন্দে মেজর আবদুল হাকিম ত্রিশ কদম মঞ্চের দিকে এগিয়ে এনায়েত করিমের সামনে এলো। এনায়েত করিম ততক্ষণে মঞ্চের দিকে পিঠ ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। এনায়েত করিমের হাতে অস্ত্রটি তুলে দিয়ে ঘুরে পূর্বের ভঙ্গিতে মার্চ করে তার স্থানে দাঁড়ানোর পর মেজর হাকিম এবং এনায়েত করিম এক সাথে, এক তালে, মঞ্চের দিকে মুখ ফেরাল। এর পর এনায়েত করিম স্টেনগানটি প্রসারিত দুই হাতে সামরিক কায়দায় মার্চ করে মঞ্চে উঠলে আমি দুই পা এগিয়ে অস্ত্রটি নিলাম। এনায়েত করিম এক পা পিছিয়ে অভিবাদন জানিয়ে আবার পিছু ফিরে মার্চ করে তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এনায়েত করিমের দাঁড়ানোর সাথে তাল রেখে দুই জন এক সাথে বঙ্গবন্ধুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। এর পর দুই পা বামে সরে হাঁটু গেড়ে বহুদিনের ব্যবহৃত বহু লড়াইয়ের স্মৃতিবিজড়িত স্টেনগানটি বঙ্গবন্ধুর পায়ের সামনে রাখলাম। আমার হাঁটু গেড়ে বসার সাথে নিখুঁত সময় ও সুন্দর তাল রেখে মাঠের পাশে প্রতীক হিসাবে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো তিন হাজার মুক্তিযোদ্ধাও নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে লম্বালম্বি যার যার অস্ত্র মাটিতে রেখে আমার সাথে তাল রেখে দাঁড়িয়ে ডাইনে দুই কদম সরে গেল। বঙ্গবন্ধু নীচু হয়ে দুই হাতে স্টেনগানটি তুলে অনেকক্ষণ ধরে রাখলেন। অভিভূত আমি আস্তে আস্তে স্বস্থানে গিয়ে দাঁড়ালাম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হাতের অস্ত্রটি ডান পাশে দাঁড়ানো আনোয়ার উল আলম শহীদের হাতে দিয়ে দু'চোখে বন্যার জল, হৃদয়ে এক সাগর স্নেহ নিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর যেন পিতা-পুত্রের মিলন। আমাদের দু'জনের চোখের পানি কোন বাঁধ মানছিলনা। কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও উপস্থিত পঞ্চাশ-ষাট হাজার মুগ্ধ বিস্মিত মানুষ অশ্রুসিক্ত নয়নে দুর্লভ অনুপম মহৎ ক্ষণটি দেখলেন।

অস্ত্র পরিদর্শনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে আহ্বান জানানো হলো। শত শত দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের ভিড়ের মাঝদিয়ে মাঠে রাখা অস্ত্রগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং একটি ছোট্ট ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছেলেটি কে ?'

—ছেলেটির নাম শহীদ। আমাদের নামটি মনে থাকতো না বলে ওকে আমরা লালু বলে ডাকি। এই ছেলেটি গোপালপুর থানায় গ্রেনেড চার্জ করে আট জন হানাদারের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিল।'

বঙ্গবন্ধু দশ-এগার বছরের শহীদকে কোলে তুলে নিলেন এবং দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের ছেলেটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এরাই আমার মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সকল কৃতিত্ব, সকল প্রশংসা এদের।' অস্ত্র পরিদর্শন শেষে বঙ্গবন্ধুকে কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। বঙ্গবন্ধু উল্টে আমাকে বললেন, 'তুই বল্।'

—আমার যা বলার বিকেলের জনসভাতেই বলবো। আপনি বলুন।

—না, তুই কিছু বল্।

নেতার আদেশ পেয়ে বঙ্গবন্ধুকে সম্বোধন করে সমবেতদের উদ্দেশে বললাম।

'আমরা আজ গর্বিত। যে নেতার আহ্বানে অস্ত্র ধরেছিলাম, দেশ স্বাধীন করে সেই মহান নেতার আহ্বানে তারই হাতে আমরা অস্ত্র জমা দিলাম। আমরা আশা করব, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনে আমাদের এই অস্ত্র, এই পবিত্র আমানত কাজে লাগবে। দেশের মানুষ নয় মাস আধপেটা খেয়ে কোন কোন সময় না খেয়ে আমাদের খাইয়েছেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে সাধারণ মানুষকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করেছি। দেশের মানুষ যদি পেটপুরে খেতে না পারে, রাতে নিরাপদে ঘুমুতে না পারে, দিনে নির্বিঘ্নে চলতে না পারে, তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে। গত নয় মাসে হানাদারদের হাত থেকে মা, বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের রক্ষা করতে পারেননি। এই অস্ত্র দ্বারাই আমাদেরকে রক্ষা পেতে হয়েছে, এই অস্ত্র দ্বারাই দখলদারদের তাড়াতে হয়েছে। সেই অস্ত্রই আজ আমরা আপনার হাতে তুলে দিলাম। আমাদের কামনা, এর যেন অপপ্রয়োগ না হয়। আমরা মনে করি, সেনাপতির উপস্থিতিতে যোদ্ধাদের সেনাপতির ন্যায়সঙ্গত আদেশ পালনই একমাত্র কর্তব্য। আমরা তাই পালন করছি।

মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা বিগত নয় মাস যুদ্ধের ময়দানে আমি তোমাদের সামনে ঠেলে দিয়ে পিছনে পড়ে থাকিনি। প্রতিটি যুদ্ধে তোমাদের আগে থেকেছি, আগে থাকার চেষ্টা করেছি। আবার যদি বাঙালীরা অত্যাচারিত হয়, আবার যদি আঘাত আসে, তা হলে আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদেরকে আগে ঠেলে দিয়ে পিছনে পড়ে থাকবোনা। আবার জাতীয় প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা অবশ্যই অস্ত্র হাতে তুলে নেবো।'

আমার বক্তৃতার সময় বঙ্গবন্ধু অঝোরে কাঁদছিলেন। তিনি বার বার রুমালে চোখ মুছছিলেন। সমবেত হাজার হাজার জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারাও আনন্দ ও বেদনায় বারে বারে অশ্রুসিক্ত হচ্ছিলেন। আমার বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধু মাইক্রোফোনের সামনে এলেন। তার তখন ভিন্ন চেহারা, চোখে অশ্রু, কণ্ঠে আবেগ দেহ-মনে আবেশ। যিনি ঘণ্টা খানেক আগে শিবনাথ স্কুল মাঠে সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের 'আপনি' সম্বোধন করে বক্তৃতা করেছেন, তিনি এখানে নেতা, পিতা ও ভাইয়ের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের তুমি সম্বোধন করে কান্নাজড়িত দরদভরা কণ্ঠে এক অবিস্মরণীয় বক্তব্য রাখলেন,

'আমি তোমাদের সালাম জানাই। ত্রিশ লক্ষ মা, ভাই-বোন শহীদ হয়েছেন। আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আমি তোমাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে যেতে পারি নাই। শুধু হুকুম দিয়ে গিয়েছিলাম। তোমরা হানাদারদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বিজয় সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছ। তোমাদের তুলনা হয় না। বিশ্বে খুব কম এমন গৌরবোজ্জল ইতিহাস আছে। তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক, রক্তের বন্ধন। তোমাদের নেতা কাদেরকে আমি মায়ের পেট থেকে পড়ার পরই দেখছি। শহীদকে আমি হতে দেখেছি। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তোমরাই সত্যিকারের দেশ গঠনের উপযুক্ত সৈনিক। তোমরাই দেশ গঠন করবে। সরকারী কর্মচারী, পুলিশের কথা আমি শুনব না। তোমরা যে খবর দিবা, তোমরা যে রিপোর্ট পাঠাবা, তাই সত্য বলে ধরা হবে। কোন সরকারী কর্মচারী ঘুষ খেলে তাকে ছাড়া হবেনা। তোমরা আমাকে রিপোর্ট করবা। আমি তোমাদের রিপোর্ট বিশ্বাস করব এবং সরকারী কর্মচারীটিকে সোজা জানিয়ে দেয়া হবে, 'ইউর সার্ভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড'। আমি সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ কাজ দেবো। তোমরা যারা স্কুল কলেজে পড়তে চাও, তারা স্কুল-কলেজে যাবে। সরকার তাদের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে। যারা চাকরী করতে চায়, তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যারা কৃষিকাজ ও অন্যান্য পেশায় যেতে চাও, সরকার তাদের সব রকম সাহায্য করবে। কোন জাতি তার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান না দিয়ে বড় হতে পারেনা। আমি তোমাদের মাঝে আবার আসবো।

জয় বাংলা, জয় মুক্তিবাহিনী।

বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হলো বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠ থেকে তিন-চার শত গজ দূরে পুলিশ প্যারেড ময়দানে নতুন শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করতে। এই পথটুকু বঙ্গবন্ধু হেঁটে গেলেন। চল্লিশ-পঞ্চাশটি বিদেশী দল ও ঢাকা টি.ভি. এবং সিনেমার ছয়-সাতটি ক্যামেরা ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধুকে প্রতি মুহূর্তে অনুসরণ করছিল। টাংগাইল আসার পর যেন তাঁদের ক্যামেরা আর থামতে চাচ্ছেনা। পুলিশ প্যারেড ময়দানে বঙ্গবন্ধু ও আমি দুইপাশে থেকে শ্বেতপাথরের প্রস্তর ফলক স্থাপন করলাম। প্রস্তর ফলক স্থাপনের পর বঙ্গবন্ধু দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাথে সাথে আশেপাশে জন সমুদ্রের গর্জন নীরব হয়ে গেল। এমন নিস্তব্ধতা যে, সুঁই পড়লেও শোনা যাবে। দুই মিনিট নীরব থাকার পর শহীদ আত্মাদের মাগফেরাত কামনা করে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য সবাই মোনাজাত করলাম।

শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন

এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পুলিশ প্যারেড ময়দানের অন্য প্রান্তে দশ-বার বছর বয়সী কয়েক হাজার ভবিষ্যৎ বাহিনীর বাচ্চাদের সমাবেশে উপস্থিত হলেন। এটাও রীতিমত সুশৃংখল, সুসজ্জিত বাহিনীর সমাবেশ। বাচ্চারা কেউ খালি হাতে আসেনি। সবাইর হাতে বাঁশ দিয়ে বানানো নানা ধরনের অস্ত্র। এগুলো বাচ্চারা নিজেরাই বানিয়েছে। তারাই নিজেদের নাম দিয়েছে 'ভবিষ্যৎ বাহিনী।' বঙ্গবন্ধু সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ভবিষ্যৎ বাহিনীর সামনে মঞ্চে দাঁড়াতেই তারা শেখ মুজিব

ভবিষ্যৎ বাহিনীর সম্বর্ধনা

জিন্দাবাদ, কাদের সিদ্দিকী জিন্দাবাদ, ভবিষ্যৎ বাহিনী জিন্দাবাদ শ্লোগানে ময়দান মুখরিত করে তুললো। ভবিষ্যৎ বাহিনীর গার্ড-অব-অনার শেষে বঙ্গবন্ধু বললেন,

'তোমরা ভবিষ্যৎ বাহিনী বানিয়েছ, এখানে এসেছ, আমি খুশী হয়েছি। আবার যদি যুদ্ধ হয়, আবার যদি বাংলার মানুষকে শোষণ করা হয়, তোমরা তখন বাংলার মানুষের পক্ষে যুদ্ধ করবা। জয় বাংলা, জয় ভবিষ্যৎ বাহিনী।' এই টুকুতেই ভবিষ্যৎ বাহিনীর কয়েক হাজার শিশু আনন্দ কলরবে মুখর হয়ে উঠলো। জয়ধ্বনির মাঝে বঙ্গবন্ধু অভিবাদন মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

এরপর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হলো ওয়াপদা ডাক বাংলোয়। সেখানে বঙ্গবন্ধু স্নান সেরে নেবেন। বঙ্গবন্ধু যখন স্নান করছিলেন তখন তার কালো কোট (মুজিব কোট) একজন মুক্তিযোদ্ধা পরিষ্কার করছিল। গোড়াই থেকে টাংগাইল পর্যন্ত কাঁচা ও ইট বিছানো রাস্তা পেরিয়ে আসতে আসতেই জামা-কাপড় সব ধুলায় ধুসরিত হয়ে গিয়েছিল। একজন মুক্তিযোদ্ধার যখন এক হাতে ধরে অন্য হাতে কোটটি ভালভাবে ব্রাশ করতে অসুবিধা হচ্ছিল, তখন সে কোটটি আরেক জনের গায়ে চাপিয়ে ব্রাশ করতে চাইলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কোট পরবে কে? কেউ রাজী নয়। কাণ্ডটা আমার সামনেই হচ্ছিল। নুরুন্নবীকে বললাম, 'তুমি কোট গায়ে দাঁড়াও। কোট পরিষ্কার করা দরকার। তাই ঐটি গায়ে চাপানোয় দোষের কিছু নেই।' নুরুন্নবীর মরার উপর খাড়ার ঘার উপক্রম। কিছু বলার আগেই কোটটি তার গায়ে চাপিয়ে দেয়া হলো। নুরুন্নবীকে আগে বেশ মানানসই দেহ গড়নের অধিকার বলে মনে হতো। মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের সফল কর্মকর্তা নুরুন্নবী যে অত বেঁটে খাটো ও দেহে ছোট বঙ্গবন্ধুর কোট গায়ে চাপাবার আগে আমাদের কারো মনে হয়নি। বঙ্গবন্ধুর কোটটি নুরুন্নবীর হাঁটু অব্দি এসে ঠেকেছে। কোটের ভিতরে আরেক নুরুন্নবীকে ঢুকালেও খুব একটা অসুবিধা হবেনা। ভীষণ ঢিলে-ঢালা, বৈসাদৃশ্য ও বেমানান ভাবে কোট গায়ে নুরুন্নবী যখন নেড়েচেড়ে এবং নড়েচড়ে দেখার চেষ্টা করছিল কোটটা তার গায়ে কতটা বেঢপ হয়েছে, তখন ভীষণ মজার দৃশ্যের অবতারনা হলো। অবস্থাটা উপভোগ করে উপস্থিত সবাই প্রাণ খুলে হাসলো।

স্নান শেষে বঙ্গবন্ধু তৈরী হয়ে নিলে মুক্তিযোদ্ধারা তার সাথে অসংখ্য ছবি তুললো। এই সময় বঙ্গবন্ধু আমার সব ভাই-বোনদের সাথে একত্রে ছবি তুলতে চাইলেন। ভাইদের মধ্যে গণ-পরিষদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী ও আমি এবং তিন বোন রহিমা, শুশুমা, শাহানা উপস্থিত ছিল। এ ক'জনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ছবি তুলবেন। কিন্তু কোনক্রমেই দুই ভাই, তিন বোন বঙ্গবন্ধুর সাথে কোন ছবিই তুলতে পারলামনা। পারিবারিক ছবি তোলা হচ্ছে জানার পরও উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বলতা এত বেশী যে কেউ না কেউ ছবিতে এসেই যাচ্ছে। এনায়েত করিম, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, আনোয়ার উল আলম শহীদ, নুরুন্নবী, ডাঃ শাহজাদা চৌধুরী প্রায় প্রতিটি ছবিতেই আছেন। অনেক অনুরোধের পর কোনরকমে শুধু পারিবারিক ছবি তোলার মত অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন সময় দেখা গেল ঠিক ছবি তোলার মুহূর্তে আলিমুজ্জামান খান রাজু কোথা থেকে এসে বঙ্গবন্ধুর পিছনে গলা বাড়িয়ে দিল।

কিংবা খোদাবক্স মোক্তার সাহেবের ছেলে আনোয়ার বক্স কোথা থেকে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ক্যামেরায় ধরা পড়ে রইল।

দুপুর একটায় খাবার খেতে টাংগাইল সার্কিট হাউসে যেতে ওয়াপদা ডাকবাংলোর দোতলা থেকে বঙ্গবন্ধু নেমে এলেন। তিনি গাড়ীতে উঠতে যাবেন এমন সময় একজন সম্মানিত অতিথির আবির্ভাব হলো। এই মহান অতিথি বাংলাদেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত আন্দ্রে ফোমিন। গাড়ী বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুকে তার দেশের স্বীকৃতির বার্তা দিলেন। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে করমর্দন করে আন্দ্রে ফোমিনকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাকেও আঁন্দ্রে ফোমিনের সাথে। আঁন্দ্রে ফোমিনকে তাঁর সাথেই মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ জানালেন। টাংগাইল সার্কিট হাউসে বঙ্গবন্ধু সহ দুই-তিনশ লোকের খাবার তৈরী করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ও অতিথিদের খাবার খেতে পোনে দুটো বেজে গেল। খাবার শেষে বঙ্গবন্ধু সার্কিট হাউসের উপরে খোলা বারান্দায় বসে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কিছু কথাবার্তা বলছেন। আমি সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে বাকী অনুষ্ঠানের খোঁজখবর নিলাম। এত ঝুট-ঝামেলার মধ্যেও একটা বিষয়ে অনেকের মত আমার দৃষ্টি এড়ায়নি, গোড়াইতে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানানো থেকে গার্ড অব অনার, অস্ত্র জমা দেয়া শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, এর কোন জায়গায় আবদুল মান্নান সাহেবকে দেখা যায়নি। শেষ পর্যন্ত খোঁজ নিতে বাধ্য হলাম, জনসভাতেও মান্নান সাহেবকে দেখা না যাওয়ায় কোন সম্ভাবনা আছে কিনা? দুটো দশ মিনিটে বঙ্গবন্ধু সভা পথে রওনা হলেন।

২৪শে জানুয়ারী '৭২ দু'টা ত্রিশ মিনিট টাংগাইলের ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসভায় বঙ্গবন্ধু উপস্থিত হলেন। অনেকের ধারণা, এই জনসভায় পনের লক্ষের অধিক লোক সমাগম হয়েছিল। কারো আবার ধারণা, দশ লক্ষের নীচে নয়। আধ-মাইল প্রস্থ, এক মাইল লম্বা টাংগাইল পার্ক ভরে গিয়েছে, কোথাও তিল ধারনের জায়গা নেই। পার্কের আশেপাশে গাছ ও বাড়িঘরের ছাদও লোকে কানায় কানায় পূর্ণ। বঙ্গবন্ধু সভা মঞ্চে আসার সাথে সাথে কোরান ও গীতা পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হলো। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের এটাই রাজধানীর বাইরে প্রথম জনসভা। এখানেই প্রথম মান্নান সাহেবকে দেখা গেল। সভার নিয়ম অনুসারে সভাপতি শেষে ভাষণ দেন। সভাপতির বক্তৃতাই সমাপ্তি ভাষণ হিসাবে বিবেচিত হয়, সভাতে আর সবাই বক্তৃতা করেন। এখানে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হলো। সভাপতি আগে ভাষন দিলেন। টাংগাইল জেলা আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে দুইটি মানপত্র যথাক্রমে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গণ-পরিষদ সদস্য মীর্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল ও মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদের মানপত্র পাঠ শেষে সভাপতি তার বক্তব্য রাখলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে সভাপতি আবদুল মান্নান সাহেব মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম জানালেন। আনোয়ার উল আলম শহীদ সভা পরিচালনা করলেন। মান্নান সাহেবের বক্তৃতার পরই আনোয়ার উল

অবিস্মরণীয় জনসভা

আলম শহীদ আমাকে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানালেন। সমবেত জনতাকে সালাম জানিয়ে বললাম,

'আমরা আজ গর্বিত, বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে উপস্থিত। বঙ্গবন্ধুর হাতে আমরা দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিতে পেরেছি। এই জন্য আমরা আশ্বস্ত ও গর্বিত। আজ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি তাদের, যারা হানাদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে অমূল্য জীবন দান করেছেন। আমি সালাম জানাচ্ছি সেই ভারতীয় সৈনিকদের, যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে আত্মাহুতি দিয়েছেন। আমি মাগফেরাত কামনা করছি সেই সমস্ত বিদ্রোহী আত্মাদের যারা হানাদারদের হাতে নিহত হয়েছেন। আমি আহতদের আশু আরোগ্য কামনা করছি। বঙ্গবন্ধু, বাংলার মানুষ আজ আপনার কাছে ন্যায় বিচার চায়,নিরাপত্তা চায়, প্রাপ্য মর্যাদা চায়। স্বাধীনতার পর মাত্র একমাস কয়েকদিনে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নানা ভাবে হয়রানি করার চেষ্টা হয়েছে, নানা ভাবে গুজব ছড়ানো হয়েছে। আমরা গুজবের অবসান চাই। কোন নেতা কবে ভালো কাজ করেছিলেন, শুধু তার নিরিখে বিচার করলে চলবেনা। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা হঠকারিতা করেছেন, ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, তাদের সম্পর্কেও আপনাকে বিবেচনা করতে হবে। বাঙালীরা হঠকারীদের আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী নন। যারা আমাদের মা-বোনদের হত্যা করেছে, ইজ্জত লুট করেছে,তাদের বিচার করতে হবে। আপনাকে প্রতিটি মানুষের জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেভাবে সাহায্য করেছেন, আমি তাদের সালাম জানাই। আমি সালাম জানাই ভারতের ষাট কোটি জনগণ, তাঁদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও সেনাবাহিনীকে। আমি সালাম জানাই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে। সালাম জানাই আমার দেশের আপামর জনসাধারণ, মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রবন্ধুদের।

মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা' আমরা আজ বঙ্গবন্ধুর হাতে অস্ত্র জমা দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতা। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অস্ত্র ধরেছিলাম। তাঁর আহ্বানে ত্যাগ করলাম। এর অর্থ এই নয়, যে জনসাধারণ গত নয় মাস আমাদের সাহায্য করেছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাদের থেকে আমরা দূরে সরে গেলাম। যুদ্ধের সময় আমার আশা ছিল, স্বাধীন বাংলায় আমাদের হাতের মারণাস্ত্রগুলি দিয়ে লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে, হাতুড়ি, দা বানাবো। জানিনা আমার সেই আশা সফল হবে কিনা। বঙ্গবন্ধু, আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, সকল মারণাস্ত্রের লোহা গলিয়ে লাঙ্গল, কোদাল, গাইতি সাবল তৈরী করুন।

মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে আমি কথা দিচ্ছি, মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি যুদ্ধে যেমন পিছে থাকি নাই, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশগড়ার সংগ্রামেও পিছিয়ে থাকবো না। আপনাদের সাথে একই কাতারে, একই সারিতে দাঁড়াবো। আপনারা আমাকে নির্লোভ থাকার দোয়া করবেন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় মুক্তিবাহিনী,
ভারত-বাংলা মৈত্র' অমর হউক।'

আমার বক্তৃতা শেষে আমিই বঙ্গবন্ধুকে আহ্বান জানালাম। বঙ্গবন্ধু মাইক্রোফোনের সামনে এসে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

'আমি আপনাদের সালাম জানাই। আমি প্রতিটি শহীদ আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমি সালাম জানাচ্ছি আপনাদের, টাংগাইল বাসীদের, যাঁরা কাদেরের মত সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। টাংগাইলের মানুষ যা করেছে তার তুলনা হয়না। আমি তাই আপনাদের সম্মান জানাতে সবার আগে টাংগাইলে ছুটে এসেছি। আমাদের তিন'শ বছরের পুরানো গ্রামের বাড়ী পাকিস্তানী হানাদাররা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে, আমি সেই বাড়ী দেখতে যাইনি। আমি টাংগাইলে এসেছি। আপনারা যা করেছেন, টাংগাইলের মুক্তিযোদ্ধারা, স্বেচ্ছাসেবকরা যা করেছে, সেই জন্যই তাদের এই সম্মান পাওয়া উচিত। এই সম্মান না দেখানো হলে অন্যায় করা হবে। আমি তাই আপনাদের মাঝে আপনাদের সালাম জানাতে এসেছি, শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আমার দেশের এমন কোন একটি গ্রামও নেই, যেখানে পাকিস্তানী নরপশুরা অন্তত দশ জন লোককে হত্যা করেনি। আপনাদের এখানেও অসংখ্য লোক মারা গেছেন। টাংগাইল নিয়ে আমার গর্ব হয়। সারা দেশে প্রতিটি জেলায় যদি একজন করে কাদেরের জন্ম হতো তা হলে আমাদের নয় মাস যুদ্ধ করতে হতোনা। আমাকে সাড়ে নয় মাস ফেরাউনের জিন্দাখানায় থাকতে হতোনা। অনেক আগেই আমার দেশ স্বাধীন হতো। দশটা কাদেরও যদি থাকতো তা হলে হয়তো ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যের প্রয়োজন হতো না।

"কাদের পল্টন ময়দানে চারজন দুষ্কৃতকারীকে গুলি করে শাস্তি দিয়েছে। যারা লুটতরাজ করে, যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, তাদের আরও হাজার জনকে যদি ও গুলি করে শাস্তি দিত, তাহলেও কাদের আমার ধন্যবাদ পেত।" বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণায় সারা মাঠ করতালিতে ফেটে পড়লো। দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেয়ার পুরস্কার স্বরূপ ১৯শে ডিসেম্বর '৭১ তারিখে আমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল। আর ২৪শে জানুয়ারী '৭২ বঙ্গবন্ধু টাংগাইল পার্ক ময়দানে দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি প্রদান এমনিভাবে প্রশংসা করলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে মুজিব-নগর সরকারের গুণগত মৌলিক পার্থক্য এখানেই। এরপর বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা, আমি তোমাদের তিন বৎসর কিছু দিতে পারবনা। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশ্ন করলেন, 'আরও তিন বৎসর যুদ্ধ চললে, তোমরা যুদ্ধ করতা না?'

মুক্তিযোদ্ধা ও জনতা সমস্বরে চিৎকারে ফেটে পড়লো, 'করতাম, করতাম।'

'তাহলে মনে কর যুদ্ধ চলছে। তিন বৎসর যুদ্ধ চলবে। সেই যুদ্ধ দেশ গড়ার যুদ্ধ। অস্ত্র হবে লাঙ্গল, কোদাল।'

তিনি সরকারী কর্মচারীদের হুঁশিয়ারী দিয়ে বললেন,

'স্বজন প্রীতি, দুর্নীতি, ঘুষ খাওয়া চলবেনা। মুক্তিযোদ্ধারা তোমরা খবর পাঠাবা। দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের একজনকেও চাকরীতে বহাল রাখা হবে না।'

আমার মুক্তিযোদ্ধারা, আমি অস্ত্র জমা নেবার সময় বলে দিয়েছি, প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার মান-সম্মান, মর্যাদা রাখার দায়িত্ব সরকারের, আমার। তোমরা যারা লেখাপড়া করতে চাইবে তারা পুরো সুযোগ পাবে। মুক্তিযোদ্ধারা যে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে, যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, সব কিছু দিয়েও তোমাদের ত্যাগের সঠিক মূল্য দেয়া যাবে না। তোমরা এই দেশেরই সন্তান। তোমরা সম্মানের সাথে চিরকাল থাকবে। তোমরাই নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা। তোমাদের কোন অসুবিধা হলে আমাকে সরাসরি খবর দেবে। আমাকে না পাও কাদেরকে বলবে। শহীদকে বলবে। গণ-পরিষদ সদস্যদের বলবে। ওরা না শুনলে আমাকে বল। কেন শুনবে না? সবাই তোমাদের কথা শুনবে।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ভারতের জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সালাম জানাই। বিশ্বের এমন কোন দেশ নেই, যেখানে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য যাননি। অনেকে বলেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী কবে যাবে। মতিলাল নেহেরুর নাতনী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে আমি ভাল করে চিনি। তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য আমি ভালো করে জানি। আমি যেদিন বলব সেই দিনই ভারতীয় সৈন্য বাংলা থেকে চলে যাবে। ভারতীয় সৈন্যরা হানাদার নয়। তাঁরা আমার বাংলার মানুষের দুঃখের ভাগী হতে এসেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হানাদারদের পরাজিত করতে তাঁদের চৌদ্দ হাজার বীর সৈনিক আমার শ্যামল বাংলার মাটিতে বুকের রক্ত ঝরিয়েছে। আমি তাঁদের যেদিন বলব আপনাদের আর প্রয়োজন নেই, আমরা নিজেরাই পারবো, সেই দিনই তারা চলে যাবেন।

আমরা কারো সাথে শত্রুতা চাইনা। আপনারা আগ্রাসন বন্ধ করুন। রাশিয়া আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্যরাও আমাদের স্বীকৃতি দিন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, এটা বাস্তব সত্য। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হবে, সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়। আমরা জোট নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। আমরা শান্তি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। পৃথিবীর যেখানেই স্বাধীকার আন্দোলন হবে, মুক্তির আন্দোলন হবে, বাংলাদেশ সাধ্যমত মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়াবে। আমি সালাম জানাই বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষদের। রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক সরকার ও দেশবাসীকে। সালাম জানাই বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী সহ আমেরিকার প্রগতিশীল মানুষদের, যারা আমাদের আন্দোলন সমর্থন করেছেন। পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তাঁরা শান্তিতে থাকুন, এটা আমরাও চাই। কিন্তু পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যে অত্যাচার করেছে, তার কোন নজির নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এত লোক মারা যায়নি, যা আমার বাংলায় মারা গেছে। অত্যাচারী সৈন্যদের বিচার হবেই হবে। পাকিস্তান এখনও যে বাঙালী ভাইদের আটকে রেখেছে, অসদাচরণ করছে, পাকিস্তানের জনগণ, আপনারা আপনাদের সরকারকে তা বন্ধ করতে বলুন। আমার মানুষদের সসম্মানে দেশে আসার সাহায্য করুন।'

চীন, আমেরিকা সহ অন্য কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখ করে বলেন, 'আপনারা স্বীকৃতি দিন। আমার দেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে কোন উপায় নেই।'

জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছি, আমরা সংগ্রাম করেই জয়ী হবো। আমরা কোন অন্যায় করিনি তাই হার মানবোনা।

জয় বাংলা, জয় মুক্তিবাহিনী
এবারের সংগ্রাম—দেশ গড়ার সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম—মুক্তির সংগ্রাম।'